এবং নেপাল ও দ্বারভাঙ্গার রাজপরিবারের সহিত বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি কলা বিদ্যা, রন্ধন, পরিচর্য্যা এবং অশ্বারোহণ প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। মাতাজির বিবাহাদি সম্বন্ধে কিছু গূঢ় কথা আছে। কিন্তু তিনি গৃহধর্ম্ম করেন নাই, ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সচরাচর রাত্রি ৪টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া স্নান করিতেন এবং বেলা ৯টা পর্য্যন্ত আহ্নিক পূজায় রত থাকিতেন। তিনি রুটি অন্নাদি আহার করিতেন না। সচরাচর চা ও দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন, ইহাতেই তিনি বিলক্ষণ সুস্থ ও দীর্ঘজীবিনী হইয়াছিলেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের ঘোর আন্দোলন। হিন্দু সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোক তাঁহার সহায় হইলেন। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী, দ্বারভাঙ্গার ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মহারাজা, স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি ধনাঢ্য মহোদয় ও মহোদয়াগণ তাঁহার সহায়তা করেন। তাঁহার নিজেরও অর্থবল ছিল। ইহাতে এই কলিকাতা নগরে হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষার্থ মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হয়। কলিকাতার নানা পল্লীতেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বালিকারা বিনা বেতনে পড়িতে পায়। ইহারা উচ্চ শিক্ষা না পাইলেও কিছু কিছু লেখাপড়া ও নীতি শিক্ষার সুবিধা পাইয়াছে। ইহাদের মুখে দেব দেবীর নানাবিধ সংস্কৃত স্তোত্র শুনিতে বড়ই মধুর এবং শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রে পুষ্প-চন্দনাদি লইয়া রাজপথে পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে সারিবদ্ধ হইয়া গমন করে, এ দৃশ্যও মনোহর। এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রার্থনীয়। জগদীশ্বর মাতাজির সুকৃতির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে পরম শান্তিতে রক্ষা করুন্।

রাজেন্দ্রনাথ।*

১

স্নেহময় রাজু! নাকি গিয়েছ কোথায়?
কি শুনিনু নিরমম,
শত বজ্রাঘাত সম,
এ যে কি বাজিল বুকে সহা নাহি যায়,
সর্ব্বনাশ করি রাজু, কোথা গেছ হায়!

২

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?—
শুনেছি দানব-বাণে,
বাসব আকুলপ্রাণে
অচেতন, বর-বপু লুটিল ধূলায়;
পুনঃ সেই ইন্দ্র-পাত,
কে ঘটালে অকস্মাৎ,
মধ্যাহ্ন-তপন হেন কেন অস্ত যায়?

* যশোহর-চৌগাছার স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের স্মরণার্থ।

৩

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?
বীরবেশ চিরদিন,
আলস্য-ঔদাস্যহীন,
কর্ম্মিষ্ঠ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সদা সুস্থকায়;
সরল সহাস্যমুখ,
প্রাণভরা শান্তিসুখ,
পর-দুঃখ-তমোনাশে প্রভাকরপ্রায়।

৪

স্নেহময় রাজু, তুমি গিয়েছ কোথায়?
পরের মঙ্গল-তরে,
খাটিলে সহস্র করে,
ব্যথিতে টানিয়া নিলে স্নেহার্দ্র হিয়ায়;
উদ্যমী, সংযমী, যতী,
বিশ্বের কল্যাণ-ব্রতী,
অতুল অমূল্য ধন, দীন বাঙ্গলায়!

৫

স্বদেশের অনুরক্ত,
জনমভূমির ভক্ত,
কত জনে শিক্ষা দিলে মায়ের পূজায়;
সত্য ধর্ম্মে সদা মতি,
বিজ্ঞতায় বৃহস্পতি,
শান্ত ধীর যুধিষ্ঠির লক্ষ্মণের প্রায়।

৬

সোণার সংসারখানি,
তুমি রাজা * * রাণী,
আশ্বাস বিশ্বাস-মাখা সেথা সমুদায়;
আনন্দ, আরামভরা,
পরাণ শীতল-করা,
পুত্র কন্যা বন্ধুভরা, প্রেম উথলায়।

৭

অবহেলি এত সুখ,
ভাঙ্গিয়া সহস্র বুক,
অকালে অদিনে গেলে কেমনে কোথায়?
ব্যথিত, পীড়িত, দীন,
নিরাশ্রয়, অন্নহীন,
তোমারে কি ডেকেছিল অশ্রুত ভাষায়?

৮

বিপন্নের আর্ত্তনাদে,
সদা তব প্রাণ কাঁদে,
তাই কি কহিলে সদা "বুক ফেটে যায়?"
না চাহিয়া কারো পানে,
অলক্ষিত ব্যোমযানে,
চলি গেলে তাড়াতাড়ি—বাসন্তী উষায়?

৯

আজি যে অভাগী * *
গরজি অনল সিন্ধু,
গরাসিতে পোড়াইতে ছুটিয়াছে হায়!
বিশ্ব যে রাক্ষসরূপে,
আসিতেছে চুপে চুপে
গিলিবারে, তোমা বিনা কে বাঁচাবে তা'য়?

১০

সংসারে কত কি জ্বালা,
কিছু যে জানে নি বালা,
আজ তার কোন তাপ লাগে নি যে গায়;
জননের ভাগ্য-বলে,
স্নেহ-হিমাচল-তলে,
ঘুমাইয়া ছিল বাছা এ তপ্ত ধরায়।

১১

কি নিঠুর জাগরণ,
দিলে তারে বাপধন!

ভাবিলে না হেন দিনে কার মুখ চায় ?
তার যে জগতময়,
শত বিভীষিকা ভয়,
জগত-জননী মাগো! রেখ তারে পা'য়।

১২

স্নেহময় রাজু! তুমি গিয়েছ কোথায় ?
তোমার স্নেহের ধন,
শিশু পুত্র কন্যাগণ,
আদরের পারিজাত ফুটেছে হেথায়।
কিছুই বোঝে না তারা,
উল্লাসেই মাতোয়ারা,
আজি যে "বাবা"রে খোঁজে অনাথের প্রায়।

১৩

চিকিৎসা, শুশ্রূষা অত,
আশঙ্কা আশিস্ শত,
কেমনে জন্মের মত ডুবিল গঙ্গায় ?
কি আশ্চর্য্য!—বাস্তবিক,
মানব-জনমে ধিক্,
অনন্ত অসীম আশা পলকে ফুরায়!

১৪

তুমি তো দেবের ছেলে,
দেব-কাজ সাধি গেলে,
যায় যথা মধু-শেষে মলয়ের বা'য়;
আমরা-ই ধরাতলে,
ভাসিব নয়নজলে,
আমরা জনমশোধ দিয়াছি বিদায়,
আমাদেরি রাজু আর আসিবে না হায়!

১৫

প্রাণাধিক রাজু! আর আসিবে না হায়!
সেই রাজু স্নেহময়,
মুখে মাখা বরাভয়,
অনাথের চিরসখা মহাদেব প্রায়!
আপনা ঢালিয়া দিয়া,
শতপাকে জড়াইয়া,
বাঁধিলে উদাস হিয়া মহা মমতায়!
গুরু, বন্ধু, বাপধন,
বড় আপনার জন,
কর্ম্মে বুদ্ধি, মর্ম্মে বল, সেবক সেবায়;
তোমার অমর স্মৃতি,
প্রাণের পবিত্র-গীতি,
পূজিব হৃদয়-রক্তে নিত্য নিরালায়;
যাও বাবা! মা'র কাছে,
যেখানে অমৃত আছে,
অসহ্য রোগের জ্বালা যেখানে জুড়ায়,
যাও বাবা, মা'র কোলে স্বর্গ অমরায়।

তোমার "শুভাকাঙ্ক্ষিণী"
সেই হতভাগী।

লেডি রিপণ।

প্রায় ২৫ বৎসর হইল লর্ড রিপণ ভারতের গবর্ণর জেনারল্ হইয়া ভারতবাসীর যেরূপ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য এ দেশের সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। এই বয়সে পত্নী-বিয়োগ তাঁহার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর। বিশেষতঃ তাঁহার পত্নী একটী আদর্শ রমণী ছিলেন। জীবে

দয়া তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রধান গুণ ছিল। তিনি অসংখ্য পক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সন্তানবৎ পালন করিতেন। পক্ষীদিগের পীড়া হইলে তিনি নিজহস্তে চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি করিতেন। পক্ষীরাও তাঁহাকে এত ভাল বাসিত যে সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘেরিয়া থাকিত এবং অশেষ প্রকারে তাঁহার প্রতি তাহাদিগের মায়া মমতার পরিচয় দিত। কোন কোন পক্ষী তাঁহার এত "নেওট" ছিল যে, সিঁড়িতে তাঁহার পদ শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ডাকিত এবং দূর স্থানে গমনকালে তাঁহার সঙ্গী হইত। নর নারীর প্রতি তাঁহার ভালবাসাও অসাধারণ ছিল। ধনী দরিদ্র, গুণী মূর্খ, উচ্চ নীচ শ্রেণীর প্রভেদ তিনি জানিতেন না —সকলকেই তুল্যরূপ ভাল বাসিতেন। কোনও মহিলা যদি তাঁহার সহিত দেখা করিতেন, তিনি পর দিবস তাঁহার গৃহে গিয়া প্রত্যভিনন্দন করিতেন। পীড়া প্রযুক্ত যদি যাইতে না পারিতেন, পর দিবস তাঁহার নামের কার্ডখানি সেখানে যাইবেই যাইবে। তাঁহার উচ্চপদোচিত কর্ত্তব্য সাধনে তাঁহার গভীর মনোযোগ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল।

তাঁহার রুচি অতি সুন্দর ও বিশুদ্ধ ছিল। চেল্‌সি এমবাঙ্কমেণ্ট নামক স্থানে তাঁহার গৃহখানি ছবির ন্যায় সকল সুন্দর বস্তুতে সুসজ্জিত ছিল। অনেক ধন রত্ন ও মূল্যবান্ বস্তু যে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত, তাহা নহে; কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর গৃহে যেমন লক্ষ্মীশ্রী, তাহাই মূর্ত্তিমতী দেখা যাইত।

তাঁহার আকৃতি দেবীমূর্ত্তি ছিল এবং তাহাহইতে দেবজ্যোতি বিনিঃসৃত হইয়া সকলকে আনন্দ ও পবিত্রতায় পূর্ণ করিত। তিনি সুশীলতার কথা মুখে বলিতেন না, কিন্তু আচার ব্যবহার ও চরিত্রে নিয়তই তাহার পরিচয় দিতেন।

শারীরিক সৌন্দর্য্যে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। যৌবনকালে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা শতমুখে তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার যৌবনকালীন মূর্ত্তির ছবি দেখিয়া এখনও নয়ন মুগ্ধ হয়। তিনি যে বর্ষীয়সী হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে যুবতী বলিয়া বোধ হইত এবং তাঁহার মুখশ্রীর প্রফুল্লতা দর্শকমাত্রেরই মনে আনন্দ সঞ্চার করিত। তাঁহার স্বামিভক্তিও চিরদিন আন্তরিক ও অকৃত্রিম ছিল। এরূপ রূপবতী ও গুণবতী জীবনসঙ্গিনী হারাইয়া ভারত-বন্ধু লর্ড রিপণ কতই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত! জগদীশ্বর তাঁহার শোকানল নির্ব্বাণ করুন্ ও তাঁহার প্রাণে শান্তি বিধান করুন্।

খুল্লনা।

(৫২৪ সংখ্যা—৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

সদাগরের অনেক বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। খুল্লনা রন্ধনের অনুমতি পাইয়া ভীতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতীর নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসলা অভয়া তাঁহাকে অভয় দান করিলে খুল্লনা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কালের হিন্দু পরিবারের ভোজনে কিরূপ সৌখিনতা ছিল, তাহা খুল্লনার পাক করা ব্যঞ্জনের তালিকায় অনেকটা বুঝা যায়।—শুক্তা এখনও এ দেশের হিন্দু গৃহস্থের নিত্য খাদ্য—নটে শাকের সঙ্গে ছোট ছোট চিঙ্গড়ি মাছ, ফুলবড়ি দিয়া কাঁটাল বিচির ব্যঞ্জন—দুধে লাউ সিদ্ধ করিয়া তাহা মহুরীতে সন্তোলিত—মুগের ঝোলে আকরস দিয়া ডাউল—মরিচগুঁড়া আদার রস দিয়া কৈ মাছ ভাজা—মসুর ও মাস কলাই মিশ্রিত ডাউল, তাহা হিঙ্গ ও জিরা দিয়া সন্তোলিত—মানকচু ও বড়ি দিয়া রোহিত মৎস্যের ঝোল—চিংড়ি মাছের বড়া—খরসোলা মাছ ভাজা, আম দিয়া সৌল মৎস্যের অম্বল—এই সকলই সেকালের উপাদেয় ব্যঞ্জন—তাহার পর পায়স, কলার বড়া, মুগ সিদ্ধ ও চাউল বাটা ভিতরে ক্ষীর, তিল গুড় বা গুড় নারিকেলের পুর দিয়া মুগসাউলী ও ক্ষীর মোন্না ও ক্ষীরপুলি—ইহাই পিষ্টকের চূড়ান্ত। সদাগর বিদেশ হইতে আসিয়া এইরূপে সখের খাবার অনেক বন্ধু বান্ধব সঙ্গে আহার করিলেন! এখনকার কাল হইলে তাহাতে কাহার কি তৃপ্তি হইত? কারি, কাটলেট, পোলাও, কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতি আফগানী বিলাতী খাবার না হইলে কে সদাগরের বাড়ী খাইতে আসিত?

সেকালের রাজা রাজড়া ও সদাগর-গৃহে সোণারূপার পান ও ভোজন পাত্র ব্যবহৃত হইত—সোণার প্রদীপ জ্বলিত। শয্যার বড়ই আড়ম্বর ছিল, কিন্তু দড়ির খাটের কথা শুনিয়া মনে হয় বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বড় লোকের বাড়ীর শয্যা না দেখিয়া অনুমান বা অন্যের কথায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দড়ির খাটে মতির ঝালর দেওয়া রেশমী মশারির কথা শুনিলে তা বই অন্য কিছু মনে হয় কি?

দড়ি করিয়া আঁট, প্রথমে বিছায় খাট,
তুলিয়া মশারি সাজে ঝাপা।
ফিতা করিয়া বান্ধা, উপরে টানালা চাঁদা,
বিছায় মালতী যূথী চাঁপা।
ধবল চামর বান্ধা, উপরে টাঙ্গায় চাঁদা,
প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড়, ভূমে নামে গজ দেড়,
মাঝে মাঝে লাল পাটের ডোরা।

খুল্লনা বিদেশাগত পতিসকাশে গমন-কালে লহনার পদধূলি গ্রহণ করিলেন—সাপত্ন্য-দ্বেষ খুল্লনার তখন মনেই আইসে নাই। সাধারণ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যেমন প্রবলা হইয়া থাকেন, স্বামীর উপর

অসাধারণ প্রাধান্য বিস্তারে তাঁহাকে আজ্ঞাবহ করিয়া থাকেন, খুল্লনার তেমন কিছুই ছিল না। খুল্লনার প্রকৃতির মাধুর্য্য প্রশংসনীয়; মনের মহত্ত্বের সীমা হয় না, দুর্ব্বলাকে পুরস্কার কালেই তাহা দেখা গিয়াছে। খুল্লনা পরম পতিব্রতা, স্বামীর কৃত্রিম আজ্ঞা পরি-পালনার্থ একটী বৎসর কাল যেরূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

খুল্লনা বিনোদ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সদাগর ইতিপূর্ব্বেই তাহাতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। দেবী ভগবতী খুল্লনার ভক্তি পরীক্ষা জন্য এক ফাঁদ পাতিলেন—সদাগরের প্রাণবায়ু হরণ করিলেন। খুল্লনার চক্ষে ধনপতি প্রাণহীন প্রতিপন্ন হইলেন। তিনি কাঁদিয়া অস্থির—আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন—দেবতার অপূর্ব্ব লীলায় মানবী খুল্লনা অস্থির—তিনি অনেক কান্নাই কাঁদিলেন—শেষে বিষ ভক্ষণে আত্মজীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। তখন দেবী আবার প্রসন্ন হইয়া সদাগরের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া নব-প্রণয়িনীর সহিত প্রণয়সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সদাগর তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে খুল্লনা একে একে বারটী মাসের দুঃখের কথা সমস্তই জানাইলেন, আর মিষ্ট বচনে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা কোন মতে খুল্লনার বয়সের উপযুক্ত না হইলেও বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

দাণ্ডায়ে পতির পাশে, খুল্লনা মধুর ভাষে,
"জানিনু তোমার যত দয়া।
তোমার কপট বাণী মূল কাটি ঢাল পানি,
দূরে গেলা কোন্দল ভেজায়া॥
মুখে কর মধু বৃষ্টি, কেবল কপট দৃষ্টি,
হৃদয়ে তোমার হলাহল।
কি পাইলা অপরাধ, কেন এত বিষম্বাদ,
পরে পরে করাল্যা কোন্দল।
সাধু লোক যেবা হয়, কারো নাহি করে ভয়,
দোষ গুণ দেখি দেয় ফল।
না বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পরহাতে,
বিপরীত তোমার সকল॥
আইনু তোমার বাস, করিলাম বড় আশ,
বিধি বাম আমার উপর।
আশায় পড়িল বাজ, বনিতা সভায় লাজ,
লাখি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর।
তুমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্ম্মপথে তব রতি,
প্রকাশ করয়ে জগজন,
অন্নে না উদর পূরি, খুঞার বসন পরি,
এ তোমার ব্যাভার কেমন॥
জগজনে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী,
সাত নায়ে কর যে ব্যাপার।
তুমি হেন মোর স্বামী; ছাগল রাখিনু আমি,
এই লাভে পূরাবে ভাণ্ডার॥
উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পাণি,
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা, কহিব কতেক কথা,
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ॥
দুর্ব্বলা যেমন আছে, থাকিব তোমার কাছে,
দূর কর জায়া ব্যবহার।
জানিহে তোমার গুণ, করিবা আমারে খুন,
লহনা তোমার ক্ষুরধার।

কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ,
বিধি কৈল অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়ায়ে মন, দাবানলে যেন বন,
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা॥
যদি মোর ছিল দোষ, ক্ষমিতে নারিলা রোষ,
গলে কেন নাহি দিলা কাতি।
এই বড় ঠাকুরালী, মুখে দিলা চুনকালী,
সতিনী হাসিয়া মারে লাথি॥
কহিতে মনের দুখ, বিদরে আমার বুক,
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাচালী করিয়া বন্ধ,
বিরচিলা অভয়া মঙ্গলে॥

এই ভৎর্সনার অস্থিতে অস্থিতে উগ্রতার হলাহল আছে, অথচ প্রত্যেক কথায় শিষ্টতা, শীলতা ও মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ হয়—ইহার একটী কথাতেও স্বামি-ভক্তির বিন্দুমাত্র অপচয় হয় নাই। ইহা ধীরে ধীরে সর্ব্বস্বাপহারী তস্করের ন্যায় সদাগরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মর্ম্মপীড়ায় তাঁহাকে অধীর করিয়াছিল। তাহার পরে খুল্লনা তাঁহার কৃত্রিম পত্র খানি হাতে দিলে তিনি তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির ন্যায় হইলেন। লহনাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কারও করিলেন। লহনা খুল্লনার যথোচিত নিন্দাবাদ করিতে ছাড়িল না। ফলে সে সকল স্রোতোমুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ধনপতি বড়ই অনুতাপ করিয়া খুল্লনার সহিত পাশক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। পাশা খেলায় সেকালের স্ত্রী পুরুষ সকলেই অতিশয় আসক্ত ছিলেন। ধনপতি অতি সুবুদ্ধি পুরুষ—তিনি লহনার চিত্তবিনোদনার্থে মিষ্ট কথায় অনেক উপদেশ দিলেন। ফলতঃ তাহাতে লহনার মন উঠিল না, তাহার মনে সাপত্ন্য-দ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল—সে আপনার অতীত যৌবনের জন্য অনেক আক্ষেপ করিল।

অতঃপর খুল্লনা পুষ্পবতী হইলেন,—এই উৎসব উপলক্ষে সদাগর যে যেমন ব্যক্তি তাহাকে সেইরূপে সন্তুষ্ট করিলেন। স্ত্রীলোকেরা জলক্রীড়ায় প্রভূত আমোদ প্রমোদ করিল—শাস্ত্রানুসারে খুল্লনার গর্ভাধান হইল—সঙ্গে সঙ্গে তিনি গর্ভ-ধারণও করিলেন।

এই সময়ে স্বর্গে এক তৌর্য্যত্রিকী সভা—সেই সভায় স্বর্গবিদ্যাধর মালাধর নর্ত্তক—তাঁহার নর্ত্তনে দেবসভা সন্তুষ্ট হইয়া নানা প্রকার সুবর্ণ ভূষণ পুরস্কার করিলেন, দেবাদিদেব মহাদেব আপনার কণ্ঠ হইতে হাড়মালা খুলিয়া মালাধরের গলদেশে অর্পণ করিলে মালাধর ঈষৎ হাস্য করিলেন। ধূর্জটীর কোপ হইল। তিনি তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া অভিশাপ দিলেন—তুমি যেমন ধনলোলুপ, তেমনি মর্ত্ত্যে গিয়া বেণিয়ার কুলে জন্মগ্রহণ কর।

এই অভিশাপে মালাধর কাঁপিতে কাঁপিতে মহাদেবকে অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, তাহাতে তুষ্ট হইয়া ভবানীপতি বলিলেন—দেবলোকের চারি মাস কাল মর্ত্ত্যে অবস্থিতি করিয়া দেবী ভগবতীর ব্রত প্রচার পূর্ব্বক পুনরায় স্বর্গে আসিবে।

মালাধরের কলেবর দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইল, তাহার দুই স্ত্রীও স্বামীর সহমৃতা হইল। মালাধর উজানী নগরে খুল্লনার গর্ভে এবং দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন দক্ষিণ পাঠনে শালবান্ রাজার পুত্রী অপর উজানীরাজ বিক্রম কেশরীর কন্যা রূপে মর্ত্ত্যে জন্ম পরিগ্রহ করিল।

(ক্রমশঃ)

পরির গল্প।

ব্যাঙ্ রাজা।

একটী রাজকন্যা এমন পরমা সুন্দরী ছিল, যে পৃথিবীতে তেমন আর দেখা যায় না। একটী সোণার গোলা ইহার বড় প্রিয় ছিল এবং সে তাহা লইয়া খেলা করিতে ভাল বাসিত। এক দিন এক কূপের ধারে বৃক্ষতলে বসিয়া বালিকা সেই গোলা লুফিতেছে, হঠাৎ তাহা কূপে পড়িয়া গেল। রাজকন্যার বেড়ই দুঃখ হইল এবং সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় এক কদাকার ব্যাঙ্ কূপ হইতে মাথা তুলিয়া বলিল "অয়ি সুন্দরী, কাঁদিও না। জলে ডুব দিয়া তোমার খেলনা তুলিয়া দিব। কিন্তু তুমি অঙ্গীকার করিয়া বল যে আমাকে তোমার খেলার সঙ্গী করিবে, তোমার সহিত তোমার সোণার পাত্রে ভোজন করিতে দিবে, তোমার সোণার পিয়ালায় জল পান করিতে দিবে এবং তোমার ক্ষুদ্র তুষারশুভ্র শয্যায় আমাকে শয়ন করিতে দিবে।" রাজকন্যা সব স্বীকার করিল, কিন্তু ব্যাঙ্ সোণার গোলা তুলিয়া দিবা মাত্র রাজকন্যা ছুটিয়া পলাইল। ব্যাঙ চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে কর্ণপাত করিল না। পর দিন রাজপরিবারবর্গ মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছে, এমন সময় কে দরজায় ঘা দিতে লাগিল। রাজকন্যা দ্বার খুলিবা মাত্র দেখিল সেই কদাকার ব্যাঙ ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে। রাজকন্যা ভয়ে চীৎকার করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার পিতা রাজা তাহার কাছে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন "তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা অবশ্য প্রতি-পালন করিবে।" রাজকুমারী তখন অনিচ্ছার সহিত আবার দরজা খুলিল। ব্যাঙ ভিতরে আসিলে তাহাকে তুলিয়া টেবিলে বসাইয়া দেওয়া হইল। ব্যাঙ রাজ-কন্যার স্বর্ণপাত্র হইতে ভোজ্য আহার করিল এবং তাহার স্বর্ণ পেয়ালা হইতে জল পান করিল। ব্যাঙ উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়া বলিল "আমি খাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে রাজকন্যার শুভ্র-বিছানায় শোয়াইয়া দাও।" রাজকন্যা আপন শয্যায় তাহাকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক

হওয়ায় রাজা বলিলেন "তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে। এ তোমাকে বিপদে সাহায্য করিয়াছে,ইহাকে ঘৃণা করিতে পার না।" ব্যাঙকে শয্যায় তুলিয়া দেওয়া হইল,কিন্তু রাজকন্যা রাগিয়া তাহাকে দেওয়ালে আছাড় দিলেন। যেমন আছাড়, অমনি ব্যাঙ এক দিব্যকান্তি রাজপুত্রের বেশ ধারণ করিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল। কিছু দিন পরে সেই রাজকুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল এবং তাহারা সুখে সংসার করিতে লাগিল।

সত্য রক্ষার ফল আশ্চর্য্য দেখ।

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

২৬শে নরেম্বর বৃহস্পতিবার। রাত্রিতে চিমনিতে এত কাঠ দিয়াছিলাম যে, দেখিলাম সকাল পর্য্যন্তও ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই উঠিয়া স্নানাদির পর বাহির হইয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম; সম্মুখের উচ্চ পাহাড় হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গ হীরকের ন্যায় ঝকমক করিতেছে। বালসূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত হইয়া কখন কখন মাঝে মাঝে তাহাকে ইন্দ্রধনুর বর্ণে সাজাইতেছে। প্রকৃতির এমন রমণীয় শোভা দেখিয়া আপনাকে ভুলিতেছি। এখানে অন্ততঃ দুই তিন দিন থাকিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। দার্জ্জিলিং ছাড়া পর্য্যন্ত আহার বিভাগের ভার সাধারণতঃ আমার উপর পড়িয়াছিল। আজ প্রত্যূষে উঠিয়াই কোনও কাজে হাত না দিয়া কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিব স্থির করিলাম। উচ্চ একটা পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডের উপর বসিয়া সেই অনন্ত দেবের অনন্ত প্রসারিত রাজ্যে অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলাম। সাংসারিক চিন্তা আপনা হইতে হৃদয় ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া অনন্ত দেবের পূজার স্থান প্রশস্ত করিয়া দিল। এদিকে আমাদের বাঙ্গলায় আহারাদি ও যাত্রার জন্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। উপর হইতে বিলক্ষণ গোল শুনিতেছি। প্রকৃতির শোভায় মন প্রাণ এতই মুগ্ধ যে আহারাদির ইচ্ছা একবারেই নাই। তথাপি আমার প্রভুভক্ত চাকর অনেক পরিশ্রমে সেই দুরারোহ শৃঙ্গে কিঞ্চিৎ আহার আনয়ন করিল। আমি তাহাকে সেই আহার পুরস্কার দিলাম। সে পাইয়া মহা সন্তুষ্ট, নিমেষে ভোজনপাত্র শূন্য করিল। অনেকবার আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও আমি নামিলাম না। উপর হইতে দেখি, সহযাত্রিগণ জিনিস পত্র বাঁধিয়া সত্য সত্য রওনা হইতেছেন, কাজেই ধীরে ধীরে নামিয়া দলের সহিত একত্র হইলাম। আমার অনুপস্থিতে * * মহাশয়ের উপর কুলীদিগকে ডাকিয়া দ্রব্যাদি বোঝাই, কোথায় কি আছে দেখা ইত্যাদি ভার পড়িয়াছিল আসিয়াই দেখি, যুগান্তর উপস্থিত। ক্রমাগত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার কপালে ঘাম ছুটিতেছে, 'এমন বিশৃঙ্খলতার মধ্যে চলা ভার, এমন কি দার্জ্জিলিং ফিরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর' ইত্যাদি অনেক বলিলেন। এত সহজ কাজে পুরুষদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে ভাবি নাই, সুতরাং বিলক্ষণ হাসিতে লাগিলাম। পুরুষবর কাহারও প্রতি ক্রোধ ঢালিতে না পারিয়া নিরুপায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে লাঠি প্রহার করিতে করিতে ক্রোধাগ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত করিলেন। আজ যে অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছি, পরিচিত লোকে দেখিলেও ম্যাকবেথের ডাইনী বলিয়া ভয়ে দূরে পলাইতেন। ফটোগ্রাফ তুলিবার সুবিধা থাকিলে নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব ছবি তুলিয়া বন্ধুগণকে উপহার দিতাম। প্রথমতঃ অত্যন্ত মোটা সাড়ী ও জেকেট পরিয়া আয়তন দ্বিগুণ হইল, তাহার উপর মাথা কপাল সব ঢাকিয়া ৩।৪ খানা শাল জড়াইলাম। হাতে মোটা পশমের দস্তানা। দুই হাতে দুই খানা বাঁশের লাঠি ভর করিয়া চলিতেছি। আশঙ্কা হয়, এই বর্ণনা পড়িয়া অনেকে ভয় পাইবেন। আজ ঘোড়াগুলিকে অতি সাবধানে লইয়া যাইতে হইল, কারণ সম্মুখের পর্ব্বতসকল একোনাইট প্রভৃতি নানা প্রকার তীব্র বিষের গাছড়াতে পূর্ণ। ঘাসের সহিত অজ্ঞাতে এ বিষ আহার করিয়া অনেক পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এমন তেজস্কর বিষের গাছ দেখিলাম যাহার আঘ্রাণেই জীবন শেষ হয়। দুরন্ত শীতের কথা কি বলিব? এত কাপড়ে ঢাকা,তবু শীতে যেন অবশ করিয়া তুলিতেছে। এক এক বার বোধ হইল শরীরের রক্ত বুঝি জমিয়া গেল। শরীর গরম করিবার জন্য অত্যন্ত বেগে দৌড়িয়াও কিছু হইল না, অবশেষে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিলাম। চা প্রস্তুত হইল। তাহা পান করিয়া কত আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। দার্জ্জিলিং থাকিতে শুনিয়াছিলাম, ১০।১৫ মিনিট পরে পরে ব্রাণ্ডি প্রভৃতি তেজস্কর সুরাপান ভিন্ন ফেলুট-যাত্রিগণ বাঁচিতে পারে না আমরা এ কথায় কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আমাদের সহযাত্রী ** মহাশয় মহিলাদিগকে মোমের পুতুলী ভিন্ন ভাবিতে পারেন না। পথিমধ্যে আমরা মারা গেলে তিনিই সকল নিন্দার ভাগী হইবেন ইত্যাদি অনেক চিন্তা করিয়া এক বোতল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পথে কাহাকেও একটু বসিতে দেখিলেই নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিতেন, একটু ঔষধ খান, নতুবা আপনার ফেলুট পঁহুছান ভার। আমাকেই শেষটা অপদস্থভাবে ফিরিতে হইবে দেখিতেছি।" ভদ্রলোকটীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ হইলেও আমরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করি নাই। একটী বন্ধুর পরামর্শ অনুসারে দার্জ্জিলিং

হইতে ক্ষুদ্র শিশিতে কিঞ্চিৎ আদার আরক আনিয়াছিলাম, আজ এই ঘোর শীতে তাহা খুব কাজে লাগিল। অল্প পরিমাণে পান করিয়া বেশ গরম বোধ করিলাম। দেখিতে দেখিতে ঘন মেঘ আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। বৃক্ষশ্রেণী পর্ব্বতচূড়া কিছুই দেখা যায় না—এমন কি ৩।৪ হাত দূরস্থ পদার্থও দেখিতে পাই না। যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগ্‌-দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইহার মধ্যে আবার তুষারবর্ষণ আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় তুষারকণাতে শাল পূর্ণ করিলাম। কোন্ পথে চলিব, দূর হইতে কিছুই দেখা যায় না। তথাপি শীতের তাড়নায় সকলেই দ্রুতগতিতে চলিলাম। আজ পথে প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী পাইন ভিন্ন অন্য বৃক্ষ দেখি নাই। গাছগুলি যেন সৃষ্টির আরম্ভ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। পথ ক্রমেই অধিক দুর্গম হইতেছে—এমন কি আরোহী লইয়া যাওয়া দুষ্কর বুঝিয়া ঘোড়াগুলি আপনা হইতে থাকিয়া থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণ পথ একেই তুষারপাতে পিচ্ছিল, তাহার উপর আল্‌গা পাথর পড়িয়া শতগুণ দুর্গম হইয়াছে। ডাণ্ডিওয়ালাগণ আমাকে লইয়া খাদে গড়াইতে গড়াইতে বাঁচিয়া গেল। এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিলাম। ঘোর মেঘমালা ভেদ করিতে করিতে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আমরা ফেলুট বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। লক্ষ্য স্থানে সকলে নিরাপদে পঁহুছিলাম বলিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিল বলিবার নহে। সর্ব্বাগ্রে সেই মঙ্গলময় বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়া শয্যাদির শৃঙ্খলায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাত্রির অন্ধকারে বাহিরের কিছুই দেখা গেল না। এই বাঙ্গলাটী অন্যান্য বাঙ্গলা হইতে উৎকৃষ্ট। কুঠরীগুলি বেশ বড় বড়; গৃহসজ্জা, পাক ও ভোজন পাত্র যথেষ্ট পাওয়া গেল। গ্লাস-ঢাকা বারাণ্ডা এত লম্বা যে দৌড়িয়া শরীর গরম করিতে লাগিলাম, হাতের অঙ্গুলীর মাথায় অত্যন্ত ব্যথা বোধ হইল, ভাবিলাম ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। পুনরায় সেই আদার আরক পান করিলাম। চিমনীর আগুনে পাকাদি করিয়া আহার করা গেল। প্রত্যূষে যে মনোহর দৃশ্য দেখিব, কল্পনা চক্ষে তাহা চিত্রিত করিতে করিতে অনেক রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

নূতন সংবাদ।

১। লেডি মিণ্টো আগামী ৫ই জুলাই বিলাত হইতে ভারত যাত্রা করিবেন।

২। নাইস পর্য্যবেক্ষিকার এমজিয়া কলিনি গত ৯ই মার্চ্চ এবৎসরের ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা একাদশ শ্রেণীর তারকা সদৃশ।

৩। ভারত-হিতৈষী হজসন প্রাট ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

৪। ছোট লাটের বেলভিডিয়ার রাজপ্রাসাদে একটী নাচঘরের জন্য ১,৩০,০০০, টাকা এবং পলাসী রণক্ষেত্রে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য ২৫০০০, টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

৫। জাতীয় শিক্ষা-সমিতির অধীনে পশ্চিম বঙ্গে ২টী ও পূর্ব্ব বঙ্গে ৮টী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি হইতে ঢাকায় ১২৫, রংপুরে ১৪০, দিনাজপুরে ৭৫, কুমিল্লায় ৭৫, চাঁদপুরে ৫০, মাগুরায় ৪০ এবং কলিকাতা জুবিলি একাডেমিতে ৩০ টাকা মাসিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

৬। স্পেনের রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ফরাসী ভাষায় এক নাটিকা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন! ইহাঁর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। জগদীশ্বর কুশলে রাখুন্।

৭। ছাত্রদমনের জন্য কার্লাইল সার্কুলার প্রসিদ্ধ আছে। এই মে মাসে হোম সেক্রেটারী সার হার্ব্বার্ট রিজলি ভারতের সকল গবর্ণমেণ্টের অনুশাসন স্বরূপ সেইরূপ নিয়ম বাহির করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগ লইয়া যত কড়া কড়ি করিবেন, জাতীয় শিক্ষার পথ ততই প্রসারিত হইবে।

৮। জাতীয় শিক্ষা সমিতি আগামী ১লা জুলাই ৫ম ও ৭ম ষ্ট্যানডার্ডের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

৯। পূর্ব্ব বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া হিন্দু দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিতেছে, কাছারি ও বাজার লুট করিতেছে এবং আরও অনেক প্রকারে উপদ্রব করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী-দিগের হস্তে সাহায্য না পাইয়া জামাল-পুরের হিন্দুগণ দেশত্যাগী হইয়াছেন। অন্যান্য স্থানের লোকও ঘোর বিপন্ন। একি অরাজক?

১০। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য সভা বন্দ করিয়া দেশীয় প্রধান লোকদিগকে গ্রেপ্তার করাতে মহা হুলস্থুল পড়িয়াছে। সাধারণ লোক দলে দলে রাউলপিণ্ডি ও আরও কোন কোন স্থানে এত গোলযোগ করিতেছে যে, তাহার জন্য অশ্বারোহী সৈন্য আনা আবশ্যক হইয়াছে।

১১। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের উপকূলে একটী নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দীর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ-কুমার মহিমচন্দ্রের বিয়োগ-শোক উপশম হইতে না হইতে তাঁহার দ্বিতীয় জামাতার বিয়োগ-সংবাদ কি মর্ম্মভেদী ও ক্লেশকর! জগদীশ্বর মহারাজ ও রাজপরিবারকে স্বর্গের শান্তি জলে শীতল করুন্।

১৩। পঞ্জাবের স্বদেশব্রতী সুপ্রসিদ্ধ লাজপত রাওকে গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক দেশান্তরিত করিয়াছেন।

১৪। আগামী বর্ষে ইটালীর স্বাধীনতা-উদ্ধারক গারিবল্ডীর শতবর্ষীয় স্মরণোৎসব হইবে। এই উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রী আমিতার জন্য একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণার্থ ৪৫ হাজার টাকা মজুত রাখা হইয়াছে।

১৫। অমৃতসরের সনাতন ধর্ম্মসভা মহা সমারোহে এক কন্যা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

১৬। পঞ্জাবের রসুল নামক স্থানে ১০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৩০০ প্লেগে মরিয়াছে। লোকাভাবে ঝিলম খাল কাটা বন্দ।

১৭। গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলার রেলওয়ে লেণ্ড মিণ্টো ফণ্ডে বার্ষিক ৫০০ টাকা দিবেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১—৩। শ্রীযুত বাবু শ্রীহরি ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম ঃ—

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ; মূল্য ॥০ আনা।

বোধ গয়া ; মূল্য ।০ আনা।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ; মূল্য /০ আনা।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের পুরীর ইতিবৃত্ত এবং ভুবনেশ্বর ও লোকনাথ প্রভৃতির মন্দিরেরও বিবরণ আছে। বোধগয়ায় বুদ্ধদেবের স্থাপিত প্রাচীন-গয়ার পুরাতন ও নূতন বৃত্তান্ত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। প্রসূতি পরিচর্য্যায় হোমিওপ্যাথিক মতে প্রসূতির চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা আছে। পুস্তক কয়েক খানি সরল ভাষায় লিখিত এবং অনেক অনুসন্ধান পূর্ণ। পাঠিকাগণ পাঠ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

৪। রাজা রামমোহন রায়—শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত। রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান যুগের আদর্শ মহাপুরুষ এবং তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। শশি বাবু সংক্ষেপে সুন্দর আকারে ইহা প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটি মহৎ অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

বামারচনা।

নববর্ষ।

নববর্ষ সমাগত, পুরাতন হল শেষ,
নবীন বরষে হেরি, প্রকৃতির নব বেশ ।১
সাজায়েছে দিগঙ্গনা নব ভাবে নব ডালা,
বরষে বরিতে উষা গেঁথেছে নূতন মালা।২
সকলি নূতন আজ নূতন নূতন ময়,
নব গীতি গাহে পিক নদী নব তানে বয়।৩
নূতন চাঁদিমা আজি নূতন তপন তারা,
নূতন সৌন্দর্য্যে আজি প্রকৃতি আপনা-হারা৪
নূতন গজায় পাতা, নূতন ফুটেছে কলি,
নব মধুপান আশে ধেয়ে আসে নব অলি।৫
নূতন উদ্যমে আজি বুকে নব বল নিয়ে,
যে যাহার চলিয়াছে কর্ত্তব্যের পথে ধেয়ে।৬

পুরাতন নিয়ে শুধু পড়িয়া রয়েছি আমি,
মোরেও নূতন কর হে বিভু! জগত-স্বামী ৭
দাও বুকে নব বল, দাও প্রাণে নব আশা,
দাও নব কার্য্যভার, দাও মোরে নব ভাষা।৮
দুর্ব্বল পরাণ মোর, পুরাণ লাগে না ভাল,
এ নব বরষে শিরে নূতন আশিস ঢাল ৯
শিখাও গো বিশ্ব-প্রেম, শিখাও কর্ত্তব্য নীতি,
আত্ম-পর ভুলে যাব গাহিব প্রেমের গীতি১০
আজ কি মাগিব ভিক্ষা বিভু, তব পদে আর
মন প্রাণ তব কাজে সঁপি যেন অনিবার।১১
জানাও এ বিশ্ব সব তোমারি বিভূতি রাজ,
বিশ্ব-পূজা তব পূজা বিশ্ব-কাজ তব কাজ১২

শ্রীস্বভাবশোভনা সেন গুপ্তা, কাকিনা।

নববর্ষ আবাহন।

শ্যামল সুন্দর সাজে বরষ নূতন!
ধরণীতে আসি পুন দিলে দরশন।
শুষ্ক তরুরাজি অই তোমার পরশে
কিশলয়ে দেহ ঢাকি হাসে কি হরষে!
নব ভাবে বরি তোমা ডাকি সমাদরে,
সুনব ভাবেতে সাজি প্রফুল্ল অন্তরে
ভাঙাবীণা লও হাতে বাজুক সুতান,
হয়ত পাইতে পারি দিব্য নব প্রাণ।
ভাই বোন এস সবে হাত ধরা ধরি
শোক তাপ যাতনায় অশ্রু পরিহরি,
গভীর কৃতজ্ঞ ভরে অবনত-শিরে
প্রভুর আশিস মাগি চলি ধীরে ধীরে।
পশ্চাতে ফিরিলে শুধু শ্মশান-অনল!
যত হেরি ভগ্ন প্রাণ হয় হীনবল।
শ্যামলা প্রকৃতি-মুখ নিঁখুত সুন্দর
হেরিয়া জাগুক প্রাণে আশা স্তরে স্তর।
(প্রভু!) অসীম মরুর মাঝে শির নোয়াইয়া
তব আজ্ঞা বহি যেন যাইছে চলিয়া।
বসন্ত হিল্লোল তব কৃপা-সমীরণ,
সেবি তাহা লভি যেন নবীন জীবন।

শ্রী—ভা।

নববর্ষের উপহার।

এস ভাই, বোন গুলি, প্রাণের কবাট খুলি
প্রীতির কুসুম তুলি দিতে উপহার।
শুভ নববর্ষ দিনে, মিলি ভ্রাতা ভগ্নীগণে,
মনের মালিন্য ভুলি এস একবার।
ভুলি শোক দুঃখ জ্বালা,
আমরা বঙ্গের বালা,
এনেছি কুসুমমালা দিতে উপহার।
মনের কাপট্য ত্যজি, ভাই ভগ্নী এস সাজি
ভুলি ভাই দ্বেষাদ্বেষি, খুলি হৃদি দ্বার।
এনেছি যতনে তুলি, বনের কুসুমগুলি
ভাই ভগিনীর গলে করিতে অর্পণ।
তাজি ঈর্ষ্যা দ্বেষ, ভাই, এস সবে মিলে যাই,
করি সবে পরস্পর স্নেহ আলিঙ্গন।
ভুলিতে যাতনা দুঃখ, লভিতে বিমল সুখ,
একতার হার সবে করিব গ্রহণ।
এই নব বর্ষ দিনে, এস সবে প্রীতমনে,
ভাই ভগিনীতে হোক অনন্ত মিলন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

মহৎ শিশু।

(Casabianca হইতে অনুবাদিত)

কি এক মহান্ দৃশ্য,
কি সাহস তার!
প্রজ্বলিত জাহাজেতে
কেহ নাই আর।
বালক একাকী শুধু
চাহি শূন্য পানে
সাহসে দাঁড়ায়ে আছে
ভয় নাই প্রাণে।
জল-যুদ্ধ বাধিয়াছে,
সেই সে কারণে
পিতা আজ্ঞা দিয়াছেন
থাকিতে সেখানে।
বীর-প্রসবিনী মাতা,
বীরের সন্তান
জানে না ভয়ের লেশ
নির্ভয় পরাণ।
অগ্নি-শিখা বেগে যবে
হল অগ্রসর,
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে
অটল অন্তর।
ডাকিল সে উচ্চৈঃস্বরে
"বল পিতা বল
যাইতে কি পারি এবে
আমি তব স্থল।"
জানিত না বীর-শিশু
পিতা তার হায়!
মৃত্যুর করাল কোলে
শয়ান কোথায়।

পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিল পিতারে
"যাইতে কি পারি পিতা
কহ শীঘ্র করে।"
প্রজ্বলিত গোলা সব
ছুটিয়া ত্বরিতে,
মুখে চোখে চুলে তার
লাগিল পড়িতে।
আর একবার শুধু
কাতর অন্তরে
ডাকিল করুণ স্বরে
আপন পিতারে।
কহিল সে "তবে কিগো
নিতান্ত আমায়
থাকিতে আদেশ মত
হইবে হেথায়?"
রাশি রাশি অগ্নি আসি
বেড়িল বালকে,
তথাপি সে নির্ভয়তা
নিভিল না চোখে।
সহসা বজ্রের মত
ধ্বনিল কেবল—
ডুবিল অতল জলে
ফুরাল সকল।
কোন্ পথে এসেছিল
এ মহারতন,
রেখে গেছে অমরত্ব
মহত্ত্ব ভূষণ!!

শ্রীসন্তোষকুমারী দেবী।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

The earth gets new life in conjunction with the sun in the Ares. How wondrous are the effects of this mysterious union—new foliage grow, the blossoms and flowers bud forth, the air becomes warm and fragrant, the bowers resound with the chorus of singing birds and the whole creation is full of fresh animation and joy. The human soul has similar mysterious union with the divine spirit, which gives it new life, the effects of which are manifest in its new hope and joy, peace and purity, energy and activity to lead godly life and to establish on earth the kingdom of heaven.

Know God well by (তপস্যা) *devotion*.
Nothing is impossible to *devotion*.

THE LATE LADY RIPON.

BENEFACTRESS OF THE POOR.

The Marchioness of Ripon died on Thursday night, February 28th, at his Lordship's residence at Chelsea.

Her Ladyship, a first cousin of the Marquess, was daughter of the late Mr. Henry Vyner, of Goutby Hall Horncastle, and a grand daughter of the first Earl de Grey.

She was formerly Lady of the Bedchamber to Queen Alexandra and was married to Lord Ripon in 1851. Their golden wedding was celebrated with great rejoicings and festivities by Ripon, and the neighbourhood, which had good reason to be grateful to the Marchioness. Her mother, Lady Vyner, had spent a great deal of time and money in deeds of unostentatious kindness to her poorer neighbours and at her death left £1,000 towards the establishment of a nursing institution for the city and its neighbourhood.

The late Marchioness, acting on the same principle as her mother of doing good by stealth, actively supported this institution, and on the occasion of the golden wedding, the City's gratitude took the form of providing permanent home for these nurses.

Among the Marchioness's ancestors was Lady Jane Grey, and it is not, perhaps, far-fetched to trace some resemblance between the gentle victim of political intrigue and the quiet retiring Lady Bountiful of Ripon. King Edward sent a telegram of condolence on hearing of her Ladyship's death, followed by an autograph letter, and on March 1st Lord Hamilton of Dalzell called at 9, Chelsea Embankment, with a message of sympathy from the King and Queen.

Although Lord Ripon is a staunch Roman Catholic, his wife was a Protestant.

The Marchioness of Ripon was one of the finest gentlewomen that England over produced. Feeling more delicate tenderness of heart, more deep sympathy with all human sorrow and suffering, more sincere never existed in any woman, you could see these fine quialities in her face. In youth

she was quite wondrously beautiful. I read once an old man's book and the page he devoted to her—whom he had known in her girlhood—still glowed with the enthusiasm of young. There are still extant portraits of her in that halcyon period of her life and they confirm the tradition of he youthful beauty. Even in recent years when she was old and when she was ill you could see the traces of her beauty; the face never could be anything but a spiritual, a sympathetic and an affectionate face. The eyes remained bright, candid—a little shy to the very end. And though you knew she must be old, she never struck you as old.

One of the little things in her surroundings which proved the sweetness of the nature was the large collection of birds. She knew all about birds and could treat them when they were ill, and nurse them back to health. And the birds in return paid her back to the full her affection. They seemed all to know her. She had a bullfinch once—as instance—that began to sing the moment he heard the footstep of his beloved misress on the stairs and indeed, was so attached to his mistress and so unhappy without her that he had to be carried around with her when she was visiting country houses. One day the Marchioness was found by a friend seated and the Marchioness without rising apologised the bullfinch who was ill and indeed dying, had settled in her neck and she could not rise without disturbing him.

Another of Lady Ripon's charms was the combination in her of the grande dame to her finger tips and of sympathies broad, generous and without a trace or a thought of discrimination of class. A doctor who knew her said to a friend of mine that in his experience he had never known a woman who knew so little of the distinction of class as she did when her sympathies were appealed to. And yet no lady could have been more punctilious in the discharge of all the duties of her great social position. If a lady called on, her card was at the visitor's house the very next day, often when she lay ill and suffering. She was exquisite in her tastes; her house on the Chelsea Embankment was full of beautiful things. There was no display—no heaping treasure upon treasure, but dainty and beautiful things—the intimate little possessions which appeal to the womanly woman to whom her home is her kingdom.

If one were to try to find the adjective which best summed up her nature it would be the word spiritual. She did not talk about the simple life but led it, just took enough food to keep life and this accounted, I dare say, for the slightness of her figure—the purity and the spiritnality of the expression. That also was the reason perhaps why you had that feeling that she was young in spite of the record of calender. To sum her up she was one of those beautiful woman natures that to those she loved gave all and demanded nothing. As to the poor lonely husband whom she has left behind—after nearly sixty years of perfect companionship—his tragic lot is one too deep for tears.—J. T. O.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 525. June, 1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৫ বর্ষ। ৫২৬ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। জুন, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়ার পুত্রলাভ—স্পেনের রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়া একটী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন। ইহার নাম "আল্‌ফন্সো" ও "ইভার্ডোক" হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভ্রমণ—রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা একখানি তরণীযোগে ভূমধ্যস্থ সাগর ও তাহার তীরস্থ আথেন্স প্রভৃতি স্থান সকলে ভ্রমণ করিতেছেন।

অগ্ন্যুৎপাত—এটনার ন্যায় ইম্বলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়া নিকটস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রাদি দগ্ধ করিয়াছে।

বাঙ্গালীর দেশীয় রাজ্যে সম্মান—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল মজুমদার, এম এ, গবর্ণমেণ্ট রাজস্ববিভাগে কার্য্য করিতেছিলেন। মহীশূর রাজ্যে তিনি "কণ্ট্রোলার" নিযুক্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবে বিভ্রাট—গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি কার্য্য পঞ্জাববাসীরা অত্যাচার মনে করিয়া প্রকাশ্য সভায় আপনাদের মনোভাব প্রকাশ করে। ইহার ফল ভয়ঙ্কর হইয়াছে। লালা লাজপত রাওকে ধরিয়া গোপনে একেবারে ব্রহ্মদেশে চালান করা হইয়াছে। শিখ অজিত সিং পলাইয়া এরূপ বিপদ্ আপাততঃ এড়াইয়াছেন। নিম্নলিখিত ছয়জন প্রধান লোক হাজতে বিচারাধীন আছেন:—উকীল হংসরাজ সাহনী ও আমলোকরাম এবং বারিষ্টার গুরুদাস সাহনী, খাজান সিং ও পণ্ডিত জানকীনাথ কল।

দেশের আরও অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সৈন্যদলের মধ্যে গোলযোগ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতেছেন।

প্রকাশ্য সভা বন্ধ—পঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় হুলুস্থুল পড়িয়াছে দেখিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টে এই দুই প্রদেশের প্রকাশ্য সভা দমনের হুকুমজারী করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট দেশের শান্তিরক্ষার জন্য সময় সময় কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু শাসনের দোষত্রুটি শ্রবণের জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকা এবং সময়ে তাহার প্রতীকার করা জ্ঞানী গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম।

লর্ড কর্জ্জনের শুভদিন—লর্ড কর্জ্জন

রীতিপূর্ব্বক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর পদে অভিষিক্ত ও এল এল ডি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

দিল্লীর সুলক্ষণ—যমুনাতীরে নীল-ছত্রী নামক দেবমন্দিরের মূল্যবান্ প্রস্তর সকল গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ স্থানান্তরিত করিতেছিলেন। হিন্দু মুসলমান এক হইয়া ইহাতে বাধা দিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমান উভয়ে সমস্বার্থ ও সমস্বার্থী হইলে ভারতের দুঃখ থাকে না।

উল্কাপাত—গত ৯ই মে গাজীপুরে জুলালপুর রেলওয়ে ষ্টেষণের নিকট এক গ্রামে প্রায় ১০ সের হইতে ২ মণ ওজনের বৃহৎ উল্কাপিণ্ড পড়ে। ইহা প্রস্তর ও লৌহময়। ইহার পতনে গ্রামবাসীরা ভয়ার্ত্ত হয়।

উল্কা আকাশস্থ গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির ভগ্নাংশ, দ্রুতবেগে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। ইহার সহিত মানব-সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের কি সম্পর্ক বুঝা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাফল—এ বৎসর এফ এ পরীক্ষায় ১১০৩ জন উত্তীর্ণ; তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ১৩৩, ২য় বিভাগে ৪৫৪ ও তৃতীয় বিভাগে ৫১৬ উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ৭জন উত্তীর্ণা, তন্মধ্যে ৪জন দেশীয়া। বেথুন কলেজের কুমারী পুণ্যলতা রায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

(৫২৫ সংখ্যা—১৩ পৃষ্ঠার পর)

তারিণী বাবুর চরিত্রে অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকিলেও তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি বড় জেদালো প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। নিজে যাহা ভাল বোধ করিতেন, অন্যে তাহাতে সহস্র দোষারোপ করিলেও সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না; নিজে যাহা করিবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহা অশুভ হইলেও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিও তাঁহাকে সে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিত না। বাসন্তী স্বামীর স্বভাব ভালরূপেই জানিতেন, স্বামীকে সাধ্য সাধনা করিলে আর কিছু হইবে না বুঝিলেন। তখনও নিরাশার অন্ধকারে আশার ক্ষীণালোক বাসন্তীর হৃদয়ে দেখা দিতেছিল যে, পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়া বিবাহ করাইবেন।

তারপর আরও তিন চারি বৎসর অতীত হইল। লক্ষ্মীর মাতুল স্বীয় ভগিনীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া তারিণী বাবুকে লিখিলেন যে, লক্ষ্মীকে আর অবিবাহিতা রাখিতে পারেন না, লোকে নিন্দা করিতেছে, তিনি শীঘ্র পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ গৃহে লইয়া যাউন। তারাণীবাবু সে পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না, এবং বাসন্তীকেও কিছু জানাইলেন না। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীর মাতুল তারিণী বাবুকে

অনেকগুলি পত্র লিখিলেন। তাহাতেও কোনও ফলোদয় না হওয়ায় নিজে অনুসন্ধানার্থ লাহোরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারিণী বাবুর সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, সন্ধান লইয়া তারিণী বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে, তারিণীবাবু উত্তর দিলেন, "তিনি সে প্রতিজ্ঞা ও বিবাহের কথা কিছুই অবগত নহেন, সে বোধ হয় অন্য কেহ হইবে, তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে" বলিয়া অম্লান বদনে মিথ্যা কহিলেন। পাছে বাসন্তী লক্ষ্মীর মাতুলের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া কিছু অনর্থ ঘটান, সেই আশঙ্কায় তারিণীবাবু তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে লক্ষ্মীর মাতুল দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং অন্যত্র তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কিন্তু মুমূর্ষু মাতার অন্তিম শয্যায় মাতৃ-অঙ্গ স্পর্শ করিয়া লক্ষ্মী যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা মাতুলকে স্মরণ করাইয়া বিবাহে অসম্মতি জানাইল। তখন হতাশ হইয়া লক্ষ্মীর মাতুল বলিলেন, "তোমার অদৃষ্টে বিবাহ লিখিত নাই, বিধাতার বিড়ম্বনা না হইলে এরূপ ঘটিবে কেন? আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, চিরকুমারী থাকাই তোমার ভাগ্য-লিপি।"

এদিকে স্বামীর কৌশল সমস্ত জানিয়া বাসন্তী মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তিনি অপরের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীর সংবাদ লইতেন। লক্ষ্মী আর বিবাহ করে নাই, তাহা তিনি জানিলেন। এই সময় একদিন বাসন্তী রমানাথকে কাছে ডাকিয়া সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানাইয়া লক্ষ্মীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে রমানাথ উত্তর করিল, "মা, তুমি এমন গুরুতর বিষয়ে ছেলে খেলা করিতে গেলে কেন? বাবার অমতে আমি কিরূপে বিবাহ করিব? তুমি কি বাবার স্বভাব জান না? তাঁর অনিচ্ছায় বিবাহ করিলে বাবা আমাকে শুদ্ধ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু মা তুমি সেজন্য আর দুঃখ করিও না, অতঃপর তোমার অনুমতি না পাইলে আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। ইহার পর আর বাসন্তী পুত্রকে বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি অহর্নিশি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত মনস্তাপে এবং অভাগিনী লক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, অচিরে তাঁহার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইয়া গেল।

৪

তারিণী বাবুর যত্নে শীঘ্রই হেমলতার সহিত রমানাথের বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন রমানাথ পাত্রী দেখিতে গেল। শ্রীপতি বাবুর সুবৃহৎ প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষে রমানাথ উপবিষ্ট, সায়াহ্নের স্নিগ্ধ সমীর অট্টালিকা-পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানের সুরভি-রাশি বহন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিতেছিল। দূরস্থ কোনও বাটী হইতে হারমোনিয়মের মোহন যন্ত্রে মধুর বামা-কণ্ঠের করুণ স্বরলহরী দূর দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতেছিল। রমানাথ সেই উন্মাদক সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে ভাবমুগ্ধ—বিভোর হইয়াছিল। এমন সময় বিচিত্র বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা সুসজ্জিতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরী হেমলতা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সায়াহ্নের অস্তগামী দিনকরের উজ্জ্বল লোহিতাভা মুক্ত বাতায়ন-পথে আসিয়া হেমলতার সুন্দর মুখের উপর পড়িয়াছিল। মোহিতচিত্তে রমানাথ হেমলতার দিকে চাহিল, সলজ্জ দৃষ্টিতে হেমলতাও একবার রমানাথকে দেখিয়া লইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল। মোহিনীর চারু অঙ্গনিঃসৃত মধুর সৌরভ রমানাথের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছিল। সে রূপে রমানাথ মুগ্ধ হইল, হেমলতার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মহারা রমানাথ গৃহে ফিরিয়া গেল। তারিণীবাবু জিজ্ঞাসিলেন "রমানাথ! বিবাহে সম্মত আছ ত?" হেমলতার সৌন্দর্য্যের মোহ তখন যুবক রমানাথের শিরায় শিরায় তাড়িত সঞ্চার করিতেছিল, সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মতি জানাইল। মাতার অসম্মতি অথবা লক্ষ্মীর কথা তখন আর তাহার মনে ছিল না। ক্ষুদ্র বালিকা লক্ষ্মীর অস্ফুট স্মৃতি স্বপ্নের ন্যায় একবার রমানাথের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হেমলতার ভুবনমোহন রূপের ছটায় রমানাথের মানস নেত্রে লক্ষ্মীর সে ছায়া-মূর্ত্তি নিতান্তই ম্লান বোধ হইল। রূপ-মোহে উন্মত্ত রমানাথ তখন ভাবিল "হেমলতার কাছে কি লক্ষ্মী?"

তারপর একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে হেমলতার সহিত রমানাথের বিবাহ হইয়া গেল। সেই দিন বাসন্তীও কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন।

৫

মুমূর্ষু অবস্থায় একদিন বাসন্তী রমানাথকে নিকটে ডাকিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে কহিলেন "বাবা রমানাথ! তুমি আমার সুসন্তান, তবুও মাতাকে সত্য-পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিলে না। আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না, কিন্তু অঙ্গীকার পালন করিতে না পারিলে মরণেও আমি শান্তি পাইব না। অভাগিনী লক্ষ্মীর চিন্তা দিবানিশি আমাকে নরকযন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, আমি একটি বালিকার চিরজীবনের সুখ হরণ করিয়াছি। সে তেজস্বিনী বালিকা, আজিও অবিবাহিতা থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী-বেশে মাতৃ-সত্য পালন করিতেছে; আর তাহার মাতার প্রেতাত্মা—ধর্ম্মশীলা প্রাণসখীর পরলোক-গত পবিত্র আত্মা বালিকার দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া—বিশ্বাসঘাতিনী পাপিষ্ঠা আমাকে নিয়ত অভিশাপ প্রদান করিতেছে। রমানাথ বাছা, তুমি কি আমায় এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পার না? আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" বলিতে বলিতে বাসন্তীর বিশীর্ণ কপোল প্রান্তে কয়েকটি অশ্রুধারা গড়াইয়া

পড়িল। রমানাথ অধীর হইয়া উঠিল, মাতার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "মা! মা! তোমার নরাধম সন্তান—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, বল কি করিলে তুমি শান্তি পাইবে? এই তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, প্রাণপণে তাহা পালন করিব।" বাসন্তীর মুখ ক্ষণেকের জন্য প্রফুল্ল হইল, পুত্রকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করতঃ কহিলেন, "বাবা, তুমি চিরসুখী হও, আমার নিজের কর্ম্মফল নিজেই ভোগ করিতেছি, তোমার অপরাধ নাই। এখন আর তোমাকে বেশী কি বলিব, তবে এই সময় তুমি যদি লক্ষ্মীকে আনিয়া একবার আমাকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে বুঝি কিছু শান্তি পাই।" অনুতপ্ত রমানাথ বলিল "তাহাই হইবে, আমি আজই মধুপুরে যাইতেছি।" বাসন্তী কহিলেন, "বৎস, লক্ষ্মীকে ও তার মামাকে আমার অবস্থার কথা বলিও, তাহা হইলে সরলা বালিকা নিশ্চয়ই আমাকে দেখিতে আসিবে। এই লও রমানাথ, একখানি ছবি—বিবাহের দিন এই ফটো আমি তোলাইয়া আনিয়াছিলাম। ইহা দেখিয়া তুমি লক্ষ্মীকে চিনিতে পারিবে বোধ হয়।" বলিয়া শয্যার নিম্ন হইতে এক খানি ছবি বাসন্তী রমানাথের হাতে দিলেন। রমানাথ দেখিল পুষ্পভূষণে ভূষিতা মুক্তকেশী হাস্যময়ী একটি অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকামূর্ত্তি, রমানাথের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। "এই লক্ষ্মী?" —লক্ষ্মীর কথা রমানাথের একটুও স্মরণ হইত না, কবে ছোট বেলায় দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহা স্মৃতির বহির্ভূত, অনেক চেষ্টায় স্বপ্নের মত সে কথা তাহার মনে পড়িত। রমানাথ ভাবিল "এই লক্ষ্মী, না জানি এখন কেমন হইয়াছে?" সেই দিনই রমানাথ মধুপুরে যাত্রা করিল। তারিণী বাবুও পত্নীর অবস্থা দেখিয়া ইদানীং কিছু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিণাম যে এইরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। আর পুত্রের বিবাহ দিবার পর হইতে তিনি এ বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এখন আর কোনও বাধা দিলেন না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুশীলাবালা দেবী

ব্রহ্মদেশে শিশুপ্রদর্শনী।

ভারতবর্ষে রাজপুতানা সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে শিশুহত্যা-প্রথা প্রচলিত ছিল, ইংরাজশাসন-প্রভাবে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। শুনা যায় ব্রহ্মদেশে এইরূপ কদাচার অদ্যাপি আছে। মগ শিশু-দিগের প্রতি উপযুক্ত যত্ন করা হয় না, সেই জন্য তাহাদিগের মৃত্যুসংখ্যা অত্যধিক। এই অত্যাচার নিবারণ এবং

শিশুদিগের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশে শিশু-মৃত্যু-নিবারণী (Society for the Prevention of Infantile Mortatity in Burma) নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা হইতে এ বৎসর শিশু প্রদর্শনীর উদ্যোগ হয়। ব্রহ্মদেশীয় জননীরা এ কার্য্যের সহায়তা করিবেন আশা ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। গত ২৭এ এপ্রেল রেঙ্গুণের জুবিলী হলে প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ হয়। মেজর উইলিয়ম এবং কাপ্তেন রষ্ট (Major William and Captain Roast) তালিকা গ্রহণের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ২।৩ ডজনের অধিক শিশু আসিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য ২৬এ শুক্রবার হইতে শিশুসমাগম হইতে লাগিল। সে দিন রেজেষ্টারী করা হইল না। ২৭এ শনিবার বর্ম্মি মা বাপ, বড় ভাই ও ভগ্নী দলে দলে ছেলে মেয়েদিগকে লইয়া আসিতে লাগিল। জুবিলী হল, বারাণ্ডা ও রাস্তা লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বয়স অনুসারে শিশুদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মাদুরের উপর সাজান হইল। দৃশ্য অতি মনোহর হইল। জননী প্রভৃতি যাহার দেওয়া কাপড় চোপড় পরিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে দৃশ্য আরও উজ্জ্বল ও নয়নমুগ্ধকর হইল। বর্ম্মি-শিশুরা অতি শান্ত ও সুশীল, কোন প্রকার গোলমাল না করিয়া স্থির ভাবে রহিল। মেজর উইলিয়ম এবং কাপ্তেন রষ্ট প্রত্যেকে ৫০০ প্রতিযোগীর নাম তালিকাভুক্ত করিলেন এবং বয়স অনুসারে প্রত্যেকের ওজন লইয়া পুরস্কার নির্দ্ধারণ করিলেন। বালকবালিকাদের স্বাস্থ্যও বিবেচনা-স্থলে গৃহীত হইল। পুরস্কারযোগ্য শিশুদিগের বাহুতে নীল, লাল ও পীতবর্ণের ফিতা সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইল এবং যেমন তাহারা পুরস্কার পাইতে লাগিল, অমনি এক একটী করিয়া তাহাদিগকে দর্শকদিগের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইল। স্যার চার্লস ফক্স এক এক করিয়া সকলকে পুরস্কার দিতে লাগিলেন। দর্শনেই সকলের তৃপ্তি, তাঁহাকে আর কোনও বক্তৃতা করিতে হইল না। তিন মাসের কম বয়সের শ্রেণীর শিশুদিগের মধ্যে মাংথামং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত হইল। এই বয়সের বালকের শরীরের গড় ওজন সাড়ে নয় পাউণ্ড; কিন্তু তাহার দেহের ওজন ১৮ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯ সের। মেজর উইলিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৃহৎ পরিবারে পারিতোষিক দান করেন, তাহা যে পরিবার পায়, তাহার বালক-বালিকাদের সংখ্যা ১১টী,২০ বৎসর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত তাহাদের বয়স। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীমতী লাউং, বিচারকদের মধ্যে ৪ জন সাহেব ও ২ জন বিবি ছিলেন।

তপস্যা।

(১

আমি একজন বঙ্গবাসিনী। আমার মামাতো ভাইঝির বিবাহের জন্য বড়ই স্নেহের, বড়ই আদরের নিমন্ত্রণ পাইলাম। সেই স্নেহ ও আদর পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে মায়ের সহিত মামার বাড়ীতে গেলাম। আনন্দে উৎসবে কয় দিন বেশ কাটিয়া গেল।

সুখের দিন যাইতে বড় বিলম্ব হয় না; সুতরাং আমাদেরও সেখানে থাকার দিন শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইতে লাগিল। সহর-বাসিনী ভগিনীরা কেহ কেহ শুনিয়া বিস্মিতা হইবেন, আমি সে পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে অবাধে বেড়াইতে পারিতাম, তার উপরে কয়টী সমবয়স্কা সখীও পাইয়াছিলাম, ছাড়িয়া আসিতে হইবে ভাবিয়া বড়ই মন কেমন করিতে লাগিল।

একদিন দুপুর বেলায় বাটীর প্রায় সকলে ঘুমাইয়াছেন, আমি একা জাগিয়া একখানি সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম; সহসা পূর্ব্বের বাড়ীর মণি দিদি আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কোথায় টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার আচরণে আমি বিস্মিতাও হইলাম, আপ্যায়িতাও হইলাম; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মরণ আর কি! নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?"

মণি দিদি গম্ভীরমুখে উত্তর করিল "যমের বাড়ীতে—আপত্তি আছে কি?"

আমি উত্তর করিলাম "যমের বাড়ীতে যাইবার সময়ে কোনও আপত্তি খাটে না, মণি দিদিও সে পথের পাণ্ডা নয়; আপাততঃ কাহাকে না বলিয়া আসাটা কি ভাল হইল?"

মণি দিদি পূর্ব্ববৎ টানিয়া লইতে লইতে বলিল "বৈতরণী পার হইবার সময়ে কাহাকেও বলা কাহারও রীতি নাই, তবে আজ আর যমের বাড়ীতে গিয়া কাজ নাই, ভূতের বাড়ী দেখিবে চল।"

ভূতের বাড়ীর গল্প আমি এখানে আসিয়া অনেকবার ইহাদিগের মুখে শুনিয়াছি। আমি সে সব কথা বিশ্বাস করি নাই বুঝিয়া ভূতের বাড়ী দেখাইবার জন্য মণি দিদির এত আগ্রহ! তখন আমি উৎফুল্ল হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে মণি দিদির হাত ধরিয়া চলিলাম; আর আমাকে টানিতে হইল না।

(২)

আমি মণি দিদির সঙ্গে চলিলাম। খানিকটা ভাঙ্গাচোরা বাঁকা পথ; খানা, ডোবা, বাঁশ গাছের সারিপূর্ণ বনপথ; সূর্য্যের কিরণ ক্বচিৎ উঁকি দিতেছে; দোয়েল, পাপিয়া, কোকিল মধুরকণ্ঠে কাকলী করিতেছে, তমাল ফুলের গন্ধে বন আমোদিত করিতেছে; ভ্রমর মৌমাছি সব মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছে; এই সব দেখিতে শুনিতে পথ বাহিয়া চলিলাম।

সহসা মণি দিদি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল—ঐ। চাহিয়া দেখি প্রায় সাত আট হাত দূরে একটা পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ী। ছাদের আলিসা খসিয়া পড়িয়াছে, দেয়ালে ফাট ধরিয়াছে, চূণের জমাট পড়িয়া গিয়াছে; প্রাচীরের গায়ে বট অশ্বত্থ মাথা জাগাইয়া আছে; সদর দরজার কপাট খানিকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

"ভূতের বাড়ী" শুনিয়া যে কেহ ভাবিবেন এ বাড়ী ভূতেরাই রাজমিস্ত্রী আনিয়া, ইট, কাঠ, চূণ, সুরকী কিনিয়া প্রস্তুত করিয়াছে, ভরসা করি বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে সে রকম "সরল" লোক কেহই নাই। কথা এই যে ঐ বাড়ীতে নাকি এক সময় তিনটি লোকের অপমৃত্যু ঘটনা হয়; তাহারা তো উপদেবতা হইয়া ঐ বাড়ীতে আছেই, অধিকন্তু তাহাদের সমাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ওখানে যাতায়ত করিয়া থাকে; কেননা ক্ষান্ত গোয়ালানী, নাপিতানী বুড়ি, রামা চাঁড়ালের পিসী, ইহারা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছে, ভূতেরা কোন দিন শৃগাল কুকুর বা সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেড়ায়, কোন দিন পরম সুন্দর যুবক ও যুবতীর রূপ ধারণ করে, কোন দিন ঢিল ছোড়ে; অধিক কি কলু বৌকে একদিন বৃষরূপে তাড়া করিয়া মারিতে আসিয়াছিল, ইত্যাদি।

প্রতি দিনের মত আজিও যে এই ভূতের বাড়ীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া এই "সনাতন সত্য" ঘটনাগুলি আমি একেবারেই অবিশ্বাস করিব, ইহা মণি দিদি স্বপ্নেও জানিত না। তার পরে যখন আমি সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার একান্ত আগ্রহ জানাইলাম, তখন মণি দিদির আজন্মের বিস্ময়াপন্নতা তাহার আপাদমস্তক অধিকার করিল। এরকম অসম্ভব সাহস মনুষ্যে—বঙ্গবাসিনী স্ত্রীলোকে কিরূপে করিতে পারে, তাহা সে ধারণা করিতে পারিল না।

তারপরে যখন আমি সেই যারপরনাই বিস্মিতার হস্ত নিজের হস্তে টানিয়া লইয়া সত্য সত্যই ভূতের বাড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল; সে আমাকে প্রথমে নিবারণ করিল, তাহাতে অশক্তা হইয়া শেষে বলিল "তোর সাহস হয়, তুই দেখিয়া আয়, আমি এই খানে দাঁড়াই।"

তখন কে জানিত যে, ভূতের অধিক ভূত আমার ঘাড়ে চাপিবে বলিয়া আমি একাকিনী সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

(৩)

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, বাড়ীটা বেশ বড়, কিন্তু জনশূন্য। এখন উঠানে জঙ্গল; বারাণ্ডায় মাকড়সার জাল; কোনও ঘরের ভিতরে চামচিকা উড়িতেছে, কোনও ঘরের ইষ্টক খসিয়া পড়ায় ঘরের ভিতর সূর্য্যকিরণ ঝলমল করিতেছে, কোনও ঘরের কারনিসের উপরে পাখীতে বাসা বাঁধিয়াছে। আমি

এই সব দেখিতেছিলাম। যদিও ভূতের কোন চিহ্ন পাইলাম না, তথাপি এরকম নির্জ্জনে একা একা বেড়াইতে মনে যেন অজানা আশঙ্কা আসিতে লাগিল। তখন মনে মনে এই গৃহের সেই ভূতপূর্ব্ব অধিস্বামী এবং অধিস্বামিনীর কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা কেমন ছিল, কি ভাবিয়াছিল, কি করিত, আজি কেবল এই বাড়ীই সে সব কাহিনী জানে। এই বাড়ী কত সুখ দুঃখের কথা জানে; কত হাসি অশ্রুর কথা জানে; কত জন্ম মৃত্যুর কথা জানে, কত বিবাহের, কত বিচ্ছেদের কথা জানে—এমন সময়ে ও কি ও?

মৃদু মৃদু মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। এখানে মানুষ কোথা হইতে আসিল? সত্য সত্য ভূত নাকি? আমি ধীর পাদক্ষেপে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলাম; সেই ঘরের বন্ধ জানালার ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া দেখিতে পাইলাম, পাশের ঘরের মধ্যে দুই জন লোক বসিয়া আছে; একখানা পুরাতন তৈলনিষিক্ত চেয়ারের উপরে একজন যুবক, কিছু দূরে ঘরের মেজের উপরে একজন যুবতী; দুজনের আকৃতি এত সুন্দর যেন আঁধার বনের ভিতর দুটী গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে; দুজনেই সম্ভ্রান্তবংশীয় বোধ হইল; যেন কোনও শাপভ্রষ্ট দেবদেবী এই আঁধার ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন! কিন্তু ইহারা কারা? এইরূপ গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহাদের কথা বার্ত্তা শুনা কি আমার উচিত? মেয়েটীকে সদ্বংশ-জাতা ও সধবা বলিয়া বোধ হইতেছে, মেয়েটীকে ডাকিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে হইত, কিন্তু পুরুষ মানুষটীর কাছে আত্মপ্রকাশ করিব কি করিয়া?

সহসা আমার চিন্তায় বাধা পড়িল; কেন না শুনিলাম, রমণী যুবককে কিছু রুক্ষ ভাবে বলিল "এ সব মিছা কথা কাটাকাটি করিয়া কি হইবে, আমি এখন আসি।" এই কথায় যুবক বড়ই ব্যথিত হইল, আকুলস্বরে বলিল "এখনই যাইও না সুষমা, আর একটু খানি বোসো।" মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া যুবক আবার বলিল "দেখ, তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব; নিশ্চিত জানিও।"

সুষমা হাসিল, সে আনন্দের হাসি নহে; একটা কি তিরস্কার-পূর্ণ অভিমানের হাসি; সেই হাসি হাসিয়া বলিল "আমার আর কি বলিবার আছে বল দেখি? সকল পথই ত খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু একমাত্র মৃত্যুপথ ভিন্ন আর আমার কোন্ পথ খোলা আছে বল দেখি?" যুবক অধিকতর আকুল হইয়া সাগ্রহে বলিল "আচ্ছা তাই, এস! দুজনে একত্রে বিষ খাইয়া মরি।"

সুষমা! আমি মরিতে পারি—মরিলেই এ জ্বালা জুড়াইবে তাহা জানি, কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ; এত বড় পাপ করিয়া ভগবানের কাছে মুখ দেখাইব কিরূপে? আর তুমি যে কথায় কথায়

বিষ খাইতে চাও, তাহা হ'লে তাঁদের উপায় কি হবে?

যুবক অশ্রু মুছিয়া বলিল "তাঁদের উপায় ভগবান্ আছেন। আত্মহত্যা মহাপাপ তা জানি, কিন্তু আমি যে মহা পাপী সুষমা! তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তোমার প্রাণে এত ব্যথা দিয়াছি, এ যন্ত্রণা যে আর সহিতে পারিতেছি না সুষমা—" যুবা আর কিছু বলিতে পারিল না; কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এবারে সুষমার আর সে দর্পিতা তেজস্বিনী মূর্ত্তি রহিল না। স্নেহময়ীর মত নিজের অশ্রু মুছিতে মুছিতে যুবকের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; বাষ্পাকুল গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল "তুমি কাঁদিও না; সত্যই কি তুমি আমার প্রাণে আঘাত করিয়াছ? গত জীবনের কথা ভাবিয়া দেখ, তাহা কদাপি নহে; আমার অদৃষ্টই আমার এ দশা করিয়াছে। কিন্তু—কিন্তু আমার বড় ক্ষোভ এই যে, তুমি আমার স্বামী, আমার পবিত্রতার দেবতা, আমি কি না লুকাইয়া কুলটার মত তোমার সহিত দেখা করিতে আসি!"—

সুষমা সহসা থামিয়া উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার স্বামীও কাঁদিতে লাগিল; ঠিক্ এই সময়ে একটা বউ কথা কও পাখী করুণকণ্ঠে মধুর রবে আকাশ মাতাইয়া দিল; এই মধুর মধুরতম সঙ্গীত ভঙ্গ করিয়া মণি দিদির সভয়-আহ্বান আমার কাণে পৌঁছিল। আমি সাবধানে অথচ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম।

আমাকে জীবিতাবস্থায় অক্ষতদেহে ফিরিতে দেখিয়া মণিদিদি যেন কৃতার্থা হইল; সে আমাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি ভাল করিয়া কোনও উত্তর করিতে পারিলাম না; কেননা সুষমাই বা কে, তাহার স্বামীই বা কে, কেনইবা এরূপ অবস্থায় পরের নির্জ্জন বাড়ীতে উভয়ে দেখা করে, এই সব চিন্তায় আমার মন আকুল হইতেছিল। এক দিন যে ভবিষ্যৎ আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবে, তাহা তখন আমি জানিতাম না।

(ক্রমশঃ)

মহিলা সমিতি—বাদ প্রতিবাদ।

(প্রাপ্ত)

বিগত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে বেথুন কলেজে আহূত মহিলা সমিতির অধিবেশন ক্ষেত্রে উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে কতকগুলির বেশভূষা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির বিষয় আলোচনা করিয়া জনৈক লেখিকার এক ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গত চৈত্র সংখ্যায় মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের টীকাসহ অপর এক মহিলার প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধ বাহির হইবার পর মনে করিয়াছিলাম এ বিষয়ে তাঁহার কোন কোন কথার সমর্থন আবশ্যক, কিন্তু শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করি। কিন্তু প্রতিবাদপত্র ও টীকা বাহির হওয়ায় বিষয়টি আর উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া আমার আলোচনা পত্রস্থ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

নব্যবঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আপনাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিতে বাধা নাই। আপনি বর্ত্তমান সমাজ গঠনের সূচনাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্তই পরিজ্ঞাত, এবং ইহার গঠনকার্য্যে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। আপনাদের পরিশ্রমে সুফল ফলে নাই, এ কথা বলিলে ঠিক্ কথা বলা হইবে না। অবশ্যই স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় শুভ ফল ফলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীনতন্ত্রের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির শতবিধ দুর্দ্দশার মধ্যে যে সারল্যপূর্ণ নিষ্ঠা ও সদাশয়তা বিরাজ করিত, আজ তাহা অপহৃত বলিয়াই মনে হয়। আমার এ ধারণা ভুল কি না আপনিই তাহা বিচার করিবেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এজন্য দায়ী কে? —রমণীগণ, না পুরুষগণ? স্ত্রীজাতি প্রকৃতিপরম্পরা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোথাও পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। পুরুষগণের নিকট স্ত্রীজাতি আপনাদের অধিকারের সমগ্র ভাগ কবে বুঝিয়া লইতে পারিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। জগতের সর্ব্বত্র প্রবল যাহা অধিকার করিয়া বসে, দুর্ব্বলের তাহা আদায় করিতে বেগ পাইতে হয়—আর দুর্ব্বলকে সর্ব্বদাই প্রবলের ইঙ্গিতে উঠিতে বসিতে, ও তাহার মনোরঞ্জনে নিযুক্ত থাকিতে হয়, ইহাও সহজ সত্য কথা।

বাঙ্গালী বাবুদের যখন শিখা ফোঁটা ছিল, তখন গৃহিণীগণ শাঁখা সাড়ীতে তুষ্ট ছিলেন। বাঙ্গালী বাবুরা যখন বাব্‌রি-কাটা চুলে বাহার দিতে শিখিলেন, তখন পুরাঙ্গনারা ঝাপ্‌টা কেশে কেশবিন্যাসে ব্যস্ত হইলেন। এখনকার হ্যাট কোটে "ঘাড় কামান" কর্ত্তার সম্মুখে গৃহিণীর শাঁখা শাড়ী ও ঝাপ্‌টাও মানায় না। যাহা মানায়, তাহাই হইতেছে। আর আমার বিশ্বাস শত সহস্র বাদ প্রতিবাদে ও তিরস্কারে ইহার প্রতীকার হইবে না, কারণ মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বত্রই রুচির অধীন, রুচি বস্তুটা প্রবৃত্তিমূলক। যে দেশে বা যে সমাজে যেরূপ প্রবৃত্তির প্রবাহ বহিতে থাকে, সেখানে রুচি তদনুরূপ আকার ধারণ করিবেই করিবে।

আড়ম্বর, বেশ ভূষার পারিপাট্য ও অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করা স্ত্রীজাতিসুলভ, এটা দোষই বলুন, আর গুণই বলুন, সাধারণ মানবসমাজের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া

যায়। বর্ব্বরের বন্য জীবনে ও সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্না নারীগণ সুসভ্য সমাজে সর্ব্বত্রই আপনাদিগকে কতকটা শোভনীয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মানবের সামাজিক ইতিহাসে কোন কোন স্থলে ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমা লেখিকা প্রসঙ্গক্রমে তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে আদর্শ করিয়া সমালোচনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া ভাল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মহর্ষি কণ্বের আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার অকপট সারল্যই এক মাত্র সম্বল। কাব্যকাননে শকুন্তলা মনোজ্ঞ মূর্ত্তি; সংসারের ভীষণ সংগ্রাম-পাথারে শকুন্তলা সঙ্গিনী হইবার যোগ্যা নহেন, সামাজিক জীবনে আদর্শ হইবার অধিকার তাঁহার তখনও ছিল না, এখনও নাই। তাঁহার আশ্রমযোগ্য বেশভূষার অন্তরাল হইতে মাতৃক উচ্ছৃঙ্খলতা যেন উঁকি মারিতেছে।

ইংলণ্ডের পিউরিটানিক আন্দোলন (Puritanic Movement) ক্ষেত্রে যে সকল গরীয়সী মহিলা পুরুষগণের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল মানব সমাজের সামাজিক জীবনে বেশ ভূষার চাকচিক্য ও অঙ্গরাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মানব-সমাজের সমক্ষে নারীজীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগে, সেই ত্যাগের দিনে, সেই সহস্র সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আদর্শ-জীবনের পার্শ্বে নারীসমাজ কি আকার ধারণ করিয়াছিল, ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে ব্রাহ্মসমাজে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্রের অভ্যুদয়কালে ও ঠিক্ তাহার পরবর্ত্তী যুগে, যখন অঘোরনাথ ও বিজয়-কৃষ্ণ ইত্যাদি তপস্যানিরত ও ব্রহ্ম-সঞ্জীবিতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে দেশবিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গীয় নারীসমাজে কেশব-চন্দ্রের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এক বিন্দু আড়ম্বর-পরিশূন্যতা স্থান পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজের সর্ব্ববিধ অন্তঃসারশূন্য রীতি-নীতি যেমন পুরুষগণকর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, রমণীরাও ঠিক্ সেই সময়ে বিবি সাজিতে আরম্ভ করিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবৎকালে ব্রাহ্মমহিলাগণ বিলাতী ঢংএর ততটা পক্ষপাতী হইতে সাহস করেন নাই। হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের বাহিরে যাঁহারা থাকিতেন, প্রয়োজনমত কখন হিন্দু কখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেন; তাঁহারাই অধিক পরিমাণে বিলাতী মহিলাকুলের অনুকরণে আপনাদের গার্হস্থ্য জীবন যাপন আরম্ভ করেন। অনুকূল অবস্থানিবন্ধন ইহাঁরা সমাজে অনেকটা সম্মান সম্ভোগ করিবার সুযোগ পাইয়া সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে বিচরণ করায় অনেকে ক্রমে ইহাঁদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুঃখের বিষয় অনু-করণে অনেক স্থলেই গুণের অপেক্ষা,

দোষের ভাগ অধিক গ্রহণই ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনে ইংরাজী রীতি নীতির ষোল আনা অনুকরণ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ও সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এই সত্য কথাটি প্রথমা লেখিকা ও তাঁহার প্রতিবাদকারিণী উভয়েই উত্তম-রূপে তলাইয়া বুঝেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। যে বাঙ্গালা দেশে এখনও শতকরা আশীটি প্রাণী নিরক্ষর; অবশিষ্ট কুড়িজনের অর্দ্ধেকের অধিক কেবলমাত্র বর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছে মাত্র। এই হিসাবে যাহারা উচ্চ শিক্ষায় দাবী করিতে পারেন, আটকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহাদের পরিমাণ বিন্দুর আকার অপেক্ষা কত বড়? এই বিশাল জন-তরঙ্গের তুলনায় নিরাকারপ্রায় শিক্ষিত সমাজের কতটুকু অংশ ব্রাহ্মসমাজ, তাহাও ভাবিবার বিষয়। এই ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ ব্রাহ্মসমাজের মহিলা-গণের সুরুচিসঙ্গত বেশ ভূষা ও শিষ্টাচার-সঙ্গত চলা ফেরা যে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে মতান্তর হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু সে কার্য্যে অবহেলার জন্য মহিলাগণ অপেক্ষা পুরুষগণই অধিক অপরাধী। পুরুষের প্রিয়সাধনে মহিলা-কুলের এই অবনতির সূত্রপাত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তাহার নিবারণ-কল্পে পুরুষগণ কোনও সঙ্গত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করেন না। তাহার পর সমগ্র দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার মাঝ-খানে যেমন একখানি গণ্ডগ্রাম দীর্ঘকাল বিনা যত্ন চেষ্টায় নীরোগ থাকিতে পারে না; ঠিক্ সেইরূপ এক দিকে স্বদেশীয়া মহিলাগণের রাশি রাশি অলঙ্কারের শোভা সৌন্দর্য্য-বিমিশ্রিত মধুরতর নিক্কণ, অপর-দিকে বিদেশীয়া মহিলাদের হাবভাবময় বেশবিন্যাস, এতদুভয়ের আক্রমণের মধ্য-স্থলে বাস করিতে কতটা বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কি সংস্কারপ্রিয় ব্যক্তিগণ উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন? বৎসরে একবার মাঘোৎসবের দিনের উপদেশের মধ্যে বিলাসবাসনার প্রতি—অর্থসম্পদের প্রতি বৈরাগ্যের ভ্রূকুটিপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ-পাতে কি বৈরাগ্যের সূচিকাভরণরূপে এই সমাজবিকারে ঔষধির কার্য্য করিতে পারে? প্রতিবাদকারিণী যে সকল সুশিক্ষিতা মহিলাগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষিতা মহিলা-সমাজে গণনীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা বাদে আর সকলকেই কি তাঁহার কথিত "রামা শ্যামা"? প্রতিবাদ-কারিণী যতগুলি মহিলার নাম করিয়াছেন আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ সংখ্যার নামোল্লেখ করিয়া দেখাইতে পারি যে তাঁহারা রামা শ্যামা নহেন, প্রতিবাদকারিণীর আদর্শে তাঁহারা শিক্ষিতা, পদস্থা ও গণনীয়া মহিলা, এবং তাঁহারা অনেকে মহিলাসমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। কেবল তাঁহাদের অব-মাননা ভয়ে আমি তাঁহাদের নামোল্লেখে বিরত রহিলাম। তবে তাঁহাদের আচরণ

যে দিন দিন আমাদিগকে অধোগতির পথে লইয়া চলিয়াছে, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের তাহা ভাবিবার অবসর নাই।

ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধন জন্যই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই ব্রহ্মপ্রীতির ভাব এ দেশের নারীসমাজে যেমন সহজে ফল পুষ্পে সুশোভিত হইতে পারিত, এমন আর কোথাও সম্ভব নহে। শত দোষ, ত্রুটি ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও ভারত-ললনার হৃদয় যেমন ধর্ম্মপ্রবণ, যেমন পরসেবাপ্রিয়, যেমন স্বার্থপরিশূন্য, এমন আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সেই অনুপম সুন্দর ক্ষেত্র পাইয়া ব্রাহ্মগণ উপযুক্ত পরিচর্য্যার দ্বারা উত্তম ফল ফলাইতে পারিলেন না। ইহা অপেক্ষা বিষম পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আহার বিহার, বসন ভূষণ ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদির প্রবল প্রবাহে যাঁহারা ভাসিলেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইবার লোক কোথায়?

ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত—

"না মাগি সুন্দর কায়; অর্থে মন নাহি ধায়
যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে।"

তাঁহার নিজের সমাজে কেহ শুনিল না, যাহারা শুনিল, তাহারা মানিল না। এই কথা বলিলে অনেকে হয়ত রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবেন, কিন্তু সমাজে সকলেই আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করিয়া আপন অবস্থার উচ্চতর চালে চলিতে অগ্রসর, সে বিষয়ের হিসাব নিকাশ লইবার চেষ্টা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দানে দাতাকর্ণ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কপর্দ্দকশূন্যতা সহ্য হয়, কিন্তু ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্য সাধনপ্রিয় গার্হস্থ্য জীবনে ডিউক অব্ আর্গাইলের সমারোহ শোভা পায় না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সমাজসেবকগণ এক্ষণে স্থবিরত্বের প্রান্তদেশে পদার্পণ করিতে বসিয়াছেন, কেহ কেহ বা স্বর্গে। এখন এই সকল সামাজিক ব্যাধির নির্দ্দেশ ও প্রতীকারে নবীন ব্রাহ্মগণকে আহ্বান করাই শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে ইহার অধিক আর কিছু বলা অনাবশ্যক। তবে বঙ্গের পক্ষে, সভার সমাগতা সমগ্র মহিলাগণের পক্ষে ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অসঙ্গত ও অশিষ্ট পরিচ্ছদ ও অঙ্গরাগ অপমানজনক; বিশেষতঃ বরোদার অসামান্যা গুণবতী মহিষী-সদনে বঙ্গগৃহিণীর এরূপ ব্যবহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

তার পর আর একটি কথা বলিয়া আমি আমার আলোচনা শেষ করিব। শ্রীমতী অনামিকা ও শ্রীমতী সরলা এই উভয় লেখিকাই একটা গুরুতর বিষয় উপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। ঘৃণার ভাবে অনুল্লেখযোগ্য বলিলাম। এই সকল ব্যাধির মূল কোথায়? মহিলাসমিতির আলোচিত বিষয় সকলের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেই লেখিকারা দেখিতে পাইবেন একটা আলোচনার বিষয় হইল, "এক শত টাকা মাসিক আয়ে সন্তান

লইয়া সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহ করিয়া মাসে মাসে পাঁচ টাকা কিরূপে সঞ্চয় করা যায়?" ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের কথা ছাড়িয়া দিলাম, বঙ্গের আট কোটি লোকের ভাবনাও ভাবা দায়, অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও যথেষ্ট শিক্ষিত অসংখ্য লোক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এক শত টাকার অনেক কম মাসিক আয়ে আজিও দিন যাপন করিতেছে। ১৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা আয়ের লোকই অধিক। ইহারা সকলেই ভদ্রবংশজাত। ইহারা অবশ্যই কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে. ইহাদের সংগ্রামপূর্ণ সংসারে যে সকল রমণী সুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে দুঃখ কষ্টের বোঝা বহন করিয়া মালক্ষ্মীর মত আদর্শ নারীজীবন ধারণ করিতেছেন, তাঁহারাই কি ঐ প্রশ্নের জীবন্ত সদুত্তর নহেন? এক শত টাকার মধ্যে পাঁচ টাকা বাঁচাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা এ দেশে কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে? এ চিন্তা যাঁহাদের মনে উদয় হয় না, তাঁহারা যে বেশভূষা ও অঙ্গরাগে মাতোয়ারা হইবেন, ইহা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অর্থাভাব ভারতের ব্যাধি হইলেও, ব্যয়বাহুল্য যে আরও গুরুতর রোগে পরিণত হইয়াছে, সে দিকে লোকের দৃষ্টি অল্প। বলিলে অনেক কথাই বলা যায়, তবে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমেরিকার নারী সমাজ।

(৫১৫ সংখ্যা—১৫ পৃষ্ঠার পর)

সিংহলের আডভোকেট অনরেবল রমানাথ আমেরিকার নারীসমাজ সম্বন্ধে যে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।* বাঙ্গলায় ইহার সারাংশ দিতেছি:—

আমি সিংহলদ্বীপে ২০ বৎসরের অধিক

*"I practised as an advocate in Ceylon for a period extending over twenty years, and am now appointed there as the Solicitor General of the Supreme Court of the Colonial Government, and therefore it is not at all unnatural that I should evince very lively interest in the present Bar and Bench question of America. There are about 1,110 ladies in the United States who practise law * * * So prosperous are the lady lawyers of New York city, it may be remarked in passing, that they have their own women lawyers' club and Bar Association. One lady who is a patent lawyer in Chicago makes £25,000 a year; and there are regular law firms in New York, such as 'Ashley, Pope, and Dotoy & co." of the Windsors Arcade, in which no one would suspect the sex of the partners until he turned the handle of the door and found himself in the luxurious offices."

আডভোকেটের কার্য্য করিয়া এখন সুপ্রিম কোর্টের সলিসিটার জেনারল নিযুক্ত হইয়াছি। আমেরিকার উকীল ও জজদিগের সম্বন্ধে মনোনিবেশ আমার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। যুক্তরাজ্যে এখন ১১১০ মহিলা ওকালতী করিতেছেন। নিউ ইয়র্কের স্ত্রী-উকীলদের এমন উন্নত অবস্থা যে তাঁহাদের আইন সংক্রান্ত নিজস্ব সভা সমিতি আছে। সিকাগোতে একটী স্ত্রী উকীল বৎসরে ৩,৭৫,০০০৲ টাকা উপার্জ্জন করেন এবং নিউইয়র্ক সহরে উকিলদিগের সমৃদ্ধিশালী ফারম্ ও তাহার সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহা স্ত্রীলোকের কি পুরুষের বুঝা যায় না। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা যায় অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরাই কর্ত্তা।"

এতদ্ব্যতীত আমেরিকায় প্রায় তের হাজার স্ত্রীলোক ধর্ম্মযাজন কার্য্যে নিযুক্তা আছেন। মার্কিন মুল্লুকে এক সহস্র রমণী ঘড়ি তৈয়ার করিতে জানে এবং শতকরা সাড়ৈক স্ত্রীলোক শিকারে প্রেরিতা হইলে বন্দুক চালাইতে সক্ষমা হইয়া থাকে। ৫৩ জন নারী "পালোয়ান" বলিয়া প্রসিদ্ধা। ইহাঁরা বিবিধ প্রকার কুস্তী বিদ্যায় পরিপক্কা।

মার্কিন দেশে নারীসমাজে শতকরা ৯৩½ জন শিক্ষাপ্রাপ্তা এবং শতকরা ৮৯ জন বিবাহিতা। এ দেশে বিবাহিতা স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রীলোকাপেক্ষা অধিক কাল বাঁচিয়া থাকেন। গড়ে উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কুমারীদিগের বিবাহ হয় এবং স্ত্রীলোকের পরমায়ু গড়ে ৫২ বৎসর একাদশ মাস ও চতুর্দ্দশ দিন। বাঙ্গালী রমণীর পরমায়ু গড়ে ৩৪ বৎসর দুই মাস !! আর আমাদের মেয়েদের শিক্ষার পরিমাণ শুনিলে গালে হাত দিয়া থাকিতে হয়; গড়ে প্রতি একাদশ সহস্র ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনও পূর্ণমাত্রায় লেখা পড়া জানে না। মার্কিন মুল্লুকে দুই সহস্রাধিক স্ত্রীলোক সংবাদপত্রে লেখনী পরিচালনা করেন, হতভাগ্য ভারতবর্ষে দুই হাজার স্ত্রীলোক সমাচারপত্র রীতিমত পাঠ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। সে দেশে রমণী তাঁহার স্বামীর প্রতিকার্য্যে সহচরী ও সহযোগিনী, আর এ দেশে স্ত্রীলোকগণ স্বামীর দাসী ও কেবল পাচিকা মাত্র !! সমস্ত দিবসের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হয় না, নিশাকালে শয়নের সময় গৃহস্থের বাটীর নিয়মানুসারে স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইয়া থাকে !! যাহাই হউক, প্রকৃত কথা এই, যেমন দুইটা হাত না থাকিলে কাজ চলে না, তেমনি পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ে উন্নত না হইলে জাতি বা সমাজ কখনই উন্নত হইতে পারে না।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

স্বভাবের শিক্ষা।

মনুষ্যরচিত শাস্ত্রাদি হইতে অল্প সময়ে অল্প আয়াসে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়, কিন্তু সে সকল শিক্ষা তত গভীর, হৃদ্‌গত ও চিরস্থায়ী হয় না। প্রকৃতি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া সকল জ্ঞানের আকর হইয়া আছে, জ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তাহা হইতেই জ্ঞান শিক্ষা করিয়া সেই জ্ঞান সাধারণের হিতার্থ গ্রন্থবদ্ধ ও প্রচারিত করিয়া থাকেন। বাহ্য প্রকৃতি এই জগৎ এবং অন্তঃপ্রকৃতি মানবাত্মা—অনন্ত জ্ঞানের রত্নাকর হইয়া আছে, কে তাহা হইতে কত রত্ন উদ্ধার করিবে? সে রত্নাকর চিরকাল অক্ষয়, অগাধ ও পূর্ণ। প্রকৃতি হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই খাঁটি জ্ঞান এবং তাহাদ্বারাই জীবন প্রকৃতরূপে গঠিত হয়।

মহাকবি সেক্‌সপিয়ার বলিয়াছেন পর্ব্বত ও নির্ঝরিণী উপদেশ দিতেছেন। আমাদের দেশের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস প্রভৃতি প্রকৃতিগ্রন্থ হইতে সকল রস ও উপমা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। বেদ কোরাণ প্রভৃতিরও উদ্ভব এই প্রকৃতি রত্নাকর হইতে। কবি গে (Gay) এক চাষার মুখ দিয়া এক মহাপণ্ডিতকে নীতি-শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন :—

"And from the most minute and mean
A virtuous mind can morals glean."

সুসূক্ষ্ম সুনীচ বস্তু হ'তে অনুক্ষণ,
ধর্ম্মার্থী অশেষ নীতি করেন চয়ন।

আমাদের দেশের প্রাচীন নীতিবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত স্বভাব হইতে নীতি-শিক্ষার যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে গৃহীত হইল, আশা করি ইহা পুরাতন বলিয়া হেয় হইবে না।

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি ॥ ১

সিংহ হইতে এক, বক হইতে এক, কুক্কুর হইতে ছয়, গর্দ্দভ হইতে তিন, কাক হইতে পাঁচ এবং মোরগ হইতে চারিটী গুণ শিক্ষা করিবেক।

প্রভূতস্বল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতং ॥২

মনুষ্য অল্প হউক, অধিক হউক, যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা সুসিদ্ধ করিবেন, সিংহের নিকট হইতে এই একটী উপদেশ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥৩

পণ্ডিত ব্যক্তি অগ্রে সকল ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া বকের মত নিশ্চল হইয়া থাকিবেন, পরে উপযুক্ত দেশকাল বুঝিয়া সকল কার্য্য সাধন করিবেন।

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ ॥৪

ভোজনে অনেক আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অল্পেতেই সন্তোষ, গভীর নিদ্রা অথচ শীঘ্র চেতনা, প্রভুভক্তি এবং শৌর্য্য এই ছয় গুণ কুক্কুরের জানিবে।

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সদন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ ॥৫

গর্দ্দভ শীত কি গ্রীষ্ম বিচার করে না, অবিশ্রান্ত ভার বহন করে এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, গর্দ্দভ হইতে এই তিন গুণ শিক্ষা করিবেক।

গূঢ়মৈথুনং ধার্ষ্ট্যঞ্চ কালে কালে চ সংগ্রহং।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ ॥ ৬

গোপনে দম্পতীর মিলন, কর্ত্তব্যসাধনে সাহস, যথাসময়ে সঞ্চয়, সতর্কতা ও পরিশ্রম এই পঞ্চগুণ কাকের নিকট শিখিবেক।

যুদ্ধং চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেং চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ ॥৭

নির্ভয়ে শত্রুর সহিত যুদ্ধ, প্রাত্যূষে গাত্রোত্থান, সগোষ্ঠী ভোজন এবং বিপদাপন্ন স্ত্রীদিগকে রক্ষা কুক্কুট হইতে এই চারিটী শিক্ষা করিবেক।

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমিয় ও অমলা বহুক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। দেখিলেন নবীন সন্ন্যাসিনীর বাক্যস্রোতের সম্মুখে অন্য কাহারও বাক্‌স্ফূর্ত্তির অবসর হওয়া সুকঠিন। তিনি ক্লান্ত হইলে মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী ২।১টী মাত্র বাক্যালাপ করিয়া নিরস্ত হন। যুগলমূর্ত্তির ৮।১০ হস্ত পরিমাণ দূরে আর একটী কুটীরে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার গলায় তুলসীর মালা ও ললাটে তিলকের ফোঁটার অভাব ছিল না। এই বাবাজীর সহিত তপস্বিনীর বাক্যস্রোত কিছু খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছিল; মোট কথা দুই জনেই আসর জমকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

এই স্থানের লীলা অবলোকন করিতে করিতেই অমিয় ও অমলার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সন্ন্যাসী যথার্থই সাধু হইতে পারেন; সাধনার নানা প্রকার পথ থাকিতে পারে; কিন্তু অমিয় অমলা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তৎসিদ্ধির আশা অতি অল্প দেখিয়া তাঁহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। সন্ন্যাসীর কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া অল্পদূর গমন করিবা মাত্র তাঁহারা অবগত হইলেন যে, অনতিদূরে আর একজন সাধুপুরুষ সস্ত্রীক বাস করেন। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা সেই সাধু সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, স্থূলদেহী এক সন্ন্যাসী তাকিয়া ঠেস দিয়া সতরঞ্চের উপর উপবিষ্ট; চারিদিকে কম্বল ও মাদুরের বিছানা এবং নিকটে ২।৩টী বাধান হুঁকা। সন্ন্যাসীর গলদেশে তুলসী-

মালা, পরিধানে সাদা ধুতী, এবং গাত্রে একটী মোটা বোম্বাই চাদর। তাঁহারা দেখিলেন সন্ন্যাসীর হাবভাব কিছু নূতন ধরণের। তিনি গৃহী কি সন্ন্যাসী কিছুই স্থির করিবার যো নাই। পথিমধ্যে তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, যিনি সন্ন্যাসী, তিনি অতি বৃদ্ধ এবং তাঁহার মস্তক জটাজূট-সমন্বিত, অঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত এবং পরিধানে কৌপীন ও গৈরিক বসন থাকিবে; তিনি মৌনী, কাহারও দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, কিন্তু কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি যোগবলে আগন্তুকের হৃদয়স্থ ভাব অবগত হইয়া নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দুই এক কথায় বিপদ উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিবেন। উভয়ে যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যখনি কোন বৈষ্ণব বা ভদ্রলোক তাঁহার নিকট গমন করিতেছেন, তখনি তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের সহিত কোলাকুলি ও ভদ্রলোকের সহিত আদর-সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছেন; সরল প্রাণে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; আগন্তুকেরাও অবিরত ধূমপানে পরিতৃপ্ত হইতেছেন; এবং সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই মালা জপ করিতেছেন।

অমিয় ও অমলা একটু অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "মা, তোমরা ভিতরে যাও।" সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া একজন ভৃত্য তাঁহাদিগকে অন্দরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসি-পত্নীকে বেষ্টন করিয়া অসংখ্য স্ত্রীযাত্রী বসিয়া আছেন। ধূলোট উপলক্ষে যে সকল বাবাজী ও সন্ন্যাসিনী আশ্রমে আসিবেন, তাঁহাদের জন্য অন্দরে আহারের উদ্যোগ হইতেছে। অমিয় ও অমলা অন্দরে গৃহীর ন্যায় যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু যে আশায় আসিয়াছিলেন, সে আশা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। বহুক্ষণ অন্দরে যাপন করিয়া উভয়ে দুঃখিত অন্তরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইল।

আশা! লোকে তোমায় কুহকিনী বলে কেন? যে পৃথিবীর মায়াতেই সৃষ্টি, মায়াতেই স্থিতি ও মায়াতেই বিলোপ, তাহা অপেক্ষাও কি তুমি অধিক মায়াবিনী! যে সংসার মনুষ্যকে অহরহঃ নাচায়, হাসায় আবার কাঁদায়, শেষে নিরাশায় ডুবায়, তুমিতো কই সেরূপ কর না; নিরাশ আঁধারেও তুমি আলো। আশা! তুমিই মনুষ্যের চির-সঞ্জীবনী শক্তি। স্নেহময়ী জননী যে দশ মাস দশ দিন ধরিয়া গর্ভধারণ-কষ্ট আনন্দ-সহকারে সহ্য করেন, সে কেবলমাত্র কয়েক দিন পরে সন্তানের মুখচন্দ্র অবলোকন করিতে পাইবেন এই আশায়; সদাগর যে না ভাসাইয়া সাত সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে বহুকষ্টে দিন কাটায়,

যে কেবল মাত্র ভবিষ্যতে মহাধনী হইবে এই আশায়; সন্ন্যাসী বা যোগিঋষিগণ যে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া দিবারাত্রি কঠোর নিয়ম পালন করিয়া কষ্টকর তপশ্চারণে রত হন, সে কেবল মাত্র দেহাত্যয়ে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবেন এই আশায়। গৃহী হইতে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত যখন আশার উপর নির্ভর করিয়া কষ্ট-সাধ্য ও দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন অমিয় ও অমলা সরলা রমণী হইয়া যে তাঁহাদের জীবনের এক মাত্র অবলম্বনকে পুনঃপ্রাপ্তির আশায় প্রণোদিত হইয়া কোনরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? সন্ন্যাসীর নিকট আশা পূর্ণ না হইলেও তাঁহাদের মন হইতে আশাকে একেবারে অন্তর্হিত করিতে পারিলেন না। শুষ্কপ্রায় আশালতা পুনরায় মুঞ্জরিত হইয়া ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইতে পারে, এই আশায় তাঁহারা হতাশ প্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া বনচারী বাগান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

জীবরাজ্যে ঐশ্বরিক বিশেষ ব্যবস্থা।

১। সৃষ্টিকর্ত্তা পক্ষী জাতির দেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য এক আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছেন—ইহাদিগের শরীরে এক একটি তৈলভাণ্ড আছে। শরীরের যে স্থান হইতে পুচ্ছ বা লাঙ্গুল বাহির হইয়াছে, সেখানে স্তনের বোঁটার মত একটি থালি আছে, ইহা টিপিলে মাখনের মত এক প্রকার তৈলাক্ত দ্রব্য বহির্গত হয়। পক্ষীরা চঞ্চুদ্বারা থালি ঠোকরাইয়া এই তৈল বাহির করে। এই তৈল ঠোঁটে লইয়া আপনাদের গাত্রাবরণে মাখাইয়া দেয়, তাহাতেই পালক সকল মসৃণ, কোমল, ও চিক্কণ থাকে। পক্ষী স্বভাবতঃ আপনার অভাব বুঝিয়া বারবার তৈল বাহির করে এবং তাহা সমুদায় গায় মাখাইয়া দেয়। আবার তৈলের সংস্থান বুঝিয়া তাহার যথোপযুক্ত ব্যয় করিয়া থাকে। তৈলভাণ্ড, ভাণ্ডের স্তনের বোঁটাকৃতি, নিঃসারিত স্নেহ পদার্থের স্বভাব ও গুণ, যে প্রণালীতে শরীরাভ্যন্তর হইতে ইহা গৃহীত হয় এবং গৃহীত হইয়া যে প্রকারে কার্য্যে ব্যবহৃত হয়—এই সকল বিষয় একত্র বিবেচনা করিলে ইহার মধ্যে যে সৃষ্টিকর্ত্তার নিগূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? পশু জাতির মধ্যে এরূপ তৈলাভাঙ্গের ব্যবস্থা নাই, কেবল পক্ষী জাতির মধ্যেই ইহা দৃষ্ট হয়। ইহা নিশ্চয়ই পক্ষিগণের শুভ উদ্দেশে বিধাতার একটি বিশেষ বিধান।

২। বায়ুকোষ বা মাছের পটকা মৎস্য জাতির জন্য একটী বিশেষ ব্যবস্থা। ইহাতে মৎস্যজাতির বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে, বলা বাহুল্য। মৎস্য-শরীরে এই যন্ত্র থাকাতে তাহারা ইচ্ছামত জলের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্যে আপনাদিগের শরীর স্থির রাখিতে এবং ভাসাইয়া উচ্চ বা নিম্ন দিকে লইয়া যাইতে পারে। যদি এই যন্ত্র ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে মৎস্য জলের তলে গিয়া হাঁকু পাঁকু করিয়া বেড়ায়। কতকগুলি মাছের শরীরে এই যন্ত্র নাই, জলের উপরিভাগে উঠিতে হইলে তাহাদিগকে অনেক চেষ্টা করিতে হয়। ডানা এবং লেজের দ্বারা নৌকার দাঁড় ও হালের মত মৎস্যেরা আপনাদিগের দেহ নানা দিকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তদ্ভিন্নও এই উপায়ে তাহাদের চলিবার সহায্য হয়। বায়ুকোষ সঙ্কুচিত করিলে তৎসঙ্গে মৎস্যের দেহ-পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে (Specific gravity) আপেক্ষিক গুরুত্বের নিয়ম অনুসারে শরীর জল অপেক্ষা ভারি হইয়া নিম্নগামী হয়। এইরূপে বায়ুকোষ প্রসারিত করিয়া জলের উপর উঠিবার সাহায্য হয়। একপাত্র জলে বায়ুপূর্ণ কাচের গোলক সকল এই নিয়মে উত্তোলিত বা নিমগ্ন করা যায়। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সিন্ধু-নিমজ্জন যন্ত্র সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। মৎস্যেরা চিরকাল জলে বাস করিয়া দেহমধ্যে বায়ুর থলি কিরূপে পাইল? মৎস্যের বিশেষ অভাব মোচনের জন্য ইহা জগদীশ্বরের বিশেষ কৌশল।

৩। উষ্ট্রের পাকস্থালী। জলশূন্য বহুযোজনবিস্তৃত বালুকারণ্যে উষ্ট্রকে বাস ও ভ্রমণ করিতে হয়, এজন্য ইহার পাকস্থালীর অদ্ভুত নির্ম্মাণকৌশল দেখা যায়। ইহার একটী প্রধান পাকস্থালী আছে, তৎসঙ্গে অনেকগুলি ছোট ছোট থালীও আছে, এই ছোট থালী কখনও কখনও ৩০টা দেখা গিয়াছে। ছোট ছোট ছিদ্র দ্বারা পাকস্থালীর সহিত এই ক্ষুদ্র থালিদের যোগ আছে। কোনও স্থানে জলপানের সুযোগ হইলে উষ্ট্র জলে পাকস্থালী পূর্ণ করে, সেই জল উপরিস্থ ছিদ্র দ্বারা ছোট ছোট থালীতে সঞ্চিত হয়। ইহাতে ৩টী আশ্চর্য্য কার্য্য হয়ঃ—(১) জল প্রকৃত পাকস্থালীতে সহজে যাইতে পারে না; (২) কঠিন ভুক্ত বস্তু হইতে জল পৃথক্ থাকে; (৩) পাচক রসের সহিত যুক্ত হইয়া জল পাকস্থালীর পাককার্য্যের অধীন হয় না, সুতরাং বিকৃত হইতে পারে না। এইরূপে উষ্ট্র শরীর-যন্ত্রে বিশুদ্ধ জল লইয়া দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিতে পারে এবং আবশ্যক হইলে পাকস্থালীর বিশেষ সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা সেই জল বাহির করিয়া আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে এবং চালককেও পানীয়ের কিছু অংশ দিতে সমর্থ হয়।

৪। কাঠ ঠোকরার জিহ্বার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি চমৎকার। কাঠ ঠোকরা কীট ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে এবং এই কীট সকল মুমূর্ষু বা জীর্ণ বৃক্ষ-

ত্বকের মধ্যে বাস করে। কাষ্ঠে ছিদ্র করিবার উপযোগী চঞ্চু ইহার আছে। এই চঞ্চু সোজা, কঠিন, ধারাল, এবং ফলাযুক্ত। চঞ্চু কীটের বাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে চঞ্চুপুটের ভিতর হইতে ৩।৪ বুরুল লম্বা জিব প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাই কীট ধরিয়া ইহার গ্রাসের মধ্যে আনিয়া দেয়। যেমন গভীর গর্ত্তে কীট দর্শন—অমনি তাহা ধারণ ও ভক্ষণ চলিয়া থাকে। আর কোনও জাতীয় পক্ষীর জিহ্বার আকৃতি ও কার্য্য এরূপ দেখা যায় না। জিবের আগায় কঠিন, ধারাল, অস্থিময় কণ্টক আছে। আরও আশ্চর্য্য, জিবের অগ্রভাগ যেমন সূচাগ্র, তেমনি তাহার দুই দিকে তীরের ফলার মত দুইটী ফলা আছে। চঞ্চুদ্বারা কীট বাহির হইবামাত্র জিব দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হয়—তাহার সূচের ন্যায় অগ্রভাগ কীটকে বিদ্ধ করে এবং ফলাদ্বয় শীঘ্র শীঘ্র কীট টানিয়া বাহির করিবার পক্ষে সাহায্য করে। এখন বিবেচনা কর কাঠ-ঠোকরা কি নিজে জানিয়া শুনিয়া জিবটী কীট-ধারণের উপযুক্ত যন্ত্ররূপে প্রস্তুত করিয়াছে? জগদীশ্বর বিশেষ জীবের বিশেষ প্রয়োজন জানিয়া তৎসিদ্ধির এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা পক্ষীর জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, বৃক্ষও অনেক সময় কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়। সৃষ্টি রক্ষণ ও পালনে সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত লীলা! *

* From Paley's Natural Theology.

প্রেমের শক্তি ও পাশব শক্তি।

দুর্ব্বৃত্তের শাসনকল্পে সচরাচর দ্বিবিধ শক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে, এক পাশব শক্তি, অপর প্রেমের শক্তি। পাশব শক্তি শাসিতের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া তাহার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু এই শক্তি ভয় জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গে গূঢ় ভাবে ঘৃণারও সঞ্চার করিয়া দেয়। শাসনকর্ত্তা সে ভাবের বাহ্য বিকাশাভাব বলিয়া উহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারেন না; পরন্তু পাশব শক্তির কার্য্যকারিতা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তাহার প্রয়োগপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। এ দিকে শাসিত সর্ব্বদাই অসন্তুষ্টচিত্তে বাস করে এবং শাসনমুক্ত হইবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। যাই সেই সুযোগ উপস্থিত হয়, অমনি সে ভয়কে দূরে সরাইয়া ফেলিয়া শাসকের শক্তিকে অবজ্ঞার সহিত পদাহত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না এবং তৎপরে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রেমের শক্তির প্রভাব অন্যবিধ। এই শক্তি শাসিতের মনে ভক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লয়। প্রেমিকের শাসন-দণ্ডও শাসিতের

নিকট মিষ্ট বোধ হয়। সুতরাং প্রেমিকের রাজত্ব চিরস্থায়ী। যতদিন প্রেমের আধিপত্য থাকে, ততদিন তাহার রাজত্বের কোনও অপচয় হয় না। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে প্রেমের শাসনের বহুল উপদেশ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। অদ্য আমরা কারাগার শাসনের একটি সদ্ দৃষ্টান্ত পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি।

কারাগারে সাধারণতঃ পাশব শক্তির খেলাই বিশেষ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কারারক্ষিগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করেন যে, পাশব শক্তি প্রয়োগ না করিলে সংসারের দুর্ব্বৃত্ত প্রকৃতির লোকদিগকে সুস্থির রাখা যাইতে পারে না। তাই তাহাদিগের হস্ত পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা; তাই তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ঘানি গাছে যুড়িয়া দিবার বিধান; তাই তাহাদিগকে অতি সংকীর্ণ, বায়ু ও আলোকশূন্য প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া রাখিবার নিয়ম প্রচলিত দেখিতে পাই। কাপ্তেন পিলস্‌বেরি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন না; তিনি প্রেমের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাই যখন কনেকটিকাট রাজ্যের ওয়েষ্ট বেরি কারাগারের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অবলম্বিত পাশব শক্তি প্রয়োগের বিধি আপনার দায়িত্বে উঠাইয়া দিলেন। তিনি সমস্ত বন্দীদিগকে গারদের চতুঃসীমা মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিতেন। কয়েদীদিগের উপর এবংবিধ বিশ্বাস স্থাপন জন্য তাঁহাকে কখনও বিপন্ন বা অনুতপ্ত হইতে হয় নাই। এক সময়ে একজন নামজাদা দুর্দ্দান্ত জেলে প্রেরিত হইল। সে ১৭ বৎসরকাল নানা দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত থাকিয়া অনেকবার গারদে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। একাধিক বার গারদ হইতে পলায়ন করিয়া পুনঃপুনঃ ধৃত হইয়াছিল। তাহার প্রকৃতি যেমন অসৎ, আকৃতিও তেমনি ভয়াবহ ছিল, তাহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় বোধ হইত। সে গারদে আসিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন পিলসবেরি তাহার দুষ্ক্রিয়াসমূহের সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি তজ্জন্য বিন্দুমাত্র আশঙ্কিত না হইয়া তাহাকে অন্যান্য বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ সহজে স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। কারাবন্দী সুখে সচ্ছন্দে সংরক্ষিত হইলেও তাহার তদ্রূপ জীবন ভাল লাগিল না। সে পলাইবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। একদিন পালায়নকালে ধৃত হইয়া শাসনকর্ত্তার নিকট আনীত হইল। তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের নিকট লইয়া গেলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখ আমি তোমাকে এ পর্য্যন্ত প্রেমের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে বিপন্ন করিতে প্রস্তুত; এখন আমি দুঃখের সহিত তোমাকে এই

প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি।” তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে কারাবন্দীর প্রস্তরসদৃশ কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। সে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তদবধি আর সে কুপথ-গামী হয় নাই; পরে সংশুদ্ধ জীবন লইয়া কারামুক্ত হইয়াছিল।

কাপ্তেন পিলসবেরি আর এক সময় শুনিতে পাইলেন যে, অপর একজন বন্দী তাঁহাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছে। জীবনের এইরূপ আশঙ্কাজনক সংবাদেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহাকে সম্মুখে আহ্বান করিলেন এবং তাহার হস্তে একখানি শাণিত ক্ষুর প্রদান করিয়া তাহাকে ক্ষৌরি করিতে আদেশ দিলেন। সে কম্পিতহস্তে আদেশ প্রতিপালনে উদ্যত হইল। অবশেষে কার্য্য সমাধা করিয়া উপবেশন করিলে মহাপুরুষ বন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম তুমি আমাকে হত্যা করিবে, আমি ক্ষুর হাতে দিয়া সে কার্য্যের সুযোগ দিলাম, তুমি হত্যা করিলে না কেন?” মহাত্মা কাপ্তেন পিলসবেরির বাক্য শুনিয়া বন্দীর কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সে তদবধি হৃদয়ের পঙ্কিল ভাব সমস্ত বিদূরিত করিয়া শুদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

প্রকৃতপক্ষে কাপ্তেন পিলসবেরির প্রেমপ্রণোদিত শাসনপ্রণালীগুণে ওয়েষ্ট-বেরি গারদের অনেক বন্দী সংশোধিত হইয়াছিল। যাঁহারা মনে করেন পাশবিক শক্তি প্রয়োগ না করিলে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না, অনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলতা দূরীকৃত হয় না, অসাধুকে সাধু ও দুর্ব্বৃত্তকে শান্ত করা যায় না, তাঁহারা কাপ্তেন পিলসবেরির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন, দেখিতে পাইবেন তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক সংস্কার অমূলক ও ভিত্তিহীন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

ষাণ্মাসিক।

“তুমি নাই এ জগতে” কানে বড় বাজে,
অভিন্ন হৃদয় যথা, ও কথা কি সাজে?
আছ তুমি মরমের প্রতি স্তরে স্তরে,
সুমধুর সেই স্মৃতি কত সুধা ক্ষরে!
মলয়াত আছে ব্যস্ত সদা সর্ব্বক্ষণ
ও সুরভি হৃদিপুরে করিতে বহন।
পূত আভা বিরাজিছে আবিলতা মাঝে,
তবে তুমি নাহি হেথা বলি কোন্ লাজে?
অন্ধ আঁখি মোহ ঘোরে কাঁদে দিবারাত,
তুমি কি রয়েছ দূরে? আছ সাথ সাথ।
আঁধারে ফুটাও আলো, বসন্ত আসিবে,
তোমার সুশুভ্র হাসি প্রাণে বিরাজিবে।
হাহাকার ভুলে যাব, বিরহ-বেদন
করিবে না শুষ্ক প্রাণ সদত দহন।
(প্রভো!) অবলা বলিয়া আমি হব না
বিকল,

বল বুদ্ধি তুমি মম জীবন-সম্বল।
যে পরশে এ পরাণ উঠিত জাগিয়া,
বিশ্বাস-বর্ম্মেতে দৃঢ় হ'ত ক্ষীণ হিয়া,
বিভুর আশিস শিরে করিয়া ধারণ
জীবনে অসাধ্য কাজ করেছি সাধন;
প্রগাঢ় শান্তির কোলে লভেছি বিরাম,
সংসারে দেখেছি চিত্র নয়নাভিরাম।
আজিত সবাই আছে, শুধু নাই তুমি,
এই গেহ তাই কিহে শ্মশানের ভূমি?
আজো জ্বলে দীপ ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
মরমের ঘোর ঘন কে সরাতে পারে?
তব জ্ঞান তব ধ্যান করে আত্মহারা,
তব স্মৃতি মম জীবনের ধ্রুবতারা।
দয়াময়! এই ভাবে ডুবাও আমায়,
ভবে যেন জয়ী হই এই তপস্যায়।

অভাগিনী।

বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

২৭এ নবেম্বর, শুক্রবার।

ক্রমে সুপ্রভাত দেখা দিল। প্রকৃতি যে অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন, তাহা দেখিতে মন নিতান্ত ব্যগ্র। রাত্রি থাকিতেই জাগিয়াছি। আমরা তিনটী মহিলা খুব পুরু কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া একটু দূরবর্ত্তী উচ্চশৃঙ্গে চলিলাম। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোল আমাদের শরীর মনে যেন নবজীবন সঞ্চার করিয়া দিল। যে অভিনব দৃশ্য সম্মুখে বিরাজমান, তাহা দেখিতে দেখিতে সত্যই আপনাকে ভুলিতেছি। এ অতুলনীয় দৃশ্যের এক কণাও চিত্রিত করা ভাষার সাধ্য নহে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত শিল্পী প্রকৃতি-দেহ অমূল্য ভূষণে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীব আত্মহারা হইয়া স্তম্ভিত হইবে আশ্চর্য্য কি? পর্ব্বতদেহে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডগুলি এমন ভাবে লাগিয়া আছে যে, মনে হয় এখনই গড়াইয়া পড়িবে; অথচ কতশত বৎসর হইতে যে এ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা একখণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণে বসিয়া নীরবে একদৃষ্টিতে স্বভাবের রমণীয় সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতেছি। আজ আমাদের সম্মুখে এমন এক নূতন রাজ্য প্রকাশিত, যাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে কল্পনাতেও আঁকিতে পারি নাই। দার্জিলিং হইতে তুষারমণ্ডিত যে সকল গিরিমালা দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া কতই মুগ্ধ হইয়াছি। তাহাদের দীর্ঘতা ও উচ্চতা ভাবিয়া কতই বিস্মিত হইয়াছি। সে সকল পর্ব্বত ব্যতীত আরও কত নূতন গিরিমালা তুষারের অমল শুভ্রবসনে শরীর ঢাকিয়া আজ আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বোচ্চ এভারেষ্টশৃঙ্গ পূর্ণমাত্রায় নিজ সৌন্দর্য্য খুলিয়া দেখাইতেছে। এমন মেঘ ও কুয়াসা-শূন্য দিন অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এভারেষ্ট-শৃঙ্গের তুষার-মণ্ডিত উন্নত শির যেন স্বর্গের পথে

মিশিয়া গিয়াছে। এই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-মালা কতশত ক্রোশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। মাথার উপর মেঘশূন্য অনন্ত নীলাকাশ, তাহারই নীচে ক্রমশঃ উচ্চ প্রাচীরশ্রেণীর ন্যায় সুদূর-প্রসারিত গিরিমালা, নিম্নে ভয়ঙ্কর খাদ, এ সকল আমার ক্ষুদ্র মনে কেবলই এক অনন্ত অসীম ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছে। এ স্বর্গভূমিতে পঁহুছিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদয়ও যেন সাগরের ন্যায় তরঙ্গময় ও প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বের রাজত্ব এখানে তিষ্ঠিতে পারে না। চারিদিকে এক অনন্তের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। এ সকল যাঁহার হস্তে গঠিত হইয়াছে, তিনি কত বড় মহান্, কত অসীমশক্তিশালী! যে হস্তে তিনি এ অসীম রাজ্য গড়িয়াছেন, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীও সে হস্তেরই রচনা, ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়-সমুদ্রে ডুবিতেছি। এ অনন্ত রাজ্যে দাঁড়াইয়া নিজকে কি ক্ষুদ্রই দেখিতেছি! এক বন্ধু বলিয়াছিলেন "পর্ব্বত ও সমুদ্র না দেখিলে ঈশ্বরের অসীম ভাব হৃদয়ে ধারণ করা যায় না" আজ আমি তাহার সত্যতা বুঝিলাম। পূর্ব্বকালে ঋষিমুনিগণ এ হিমাচলে বসিয়া নিরাহারে সেই অনন্ত দেবের ধ্যান ধ্যারণায় নিযুক্ত থাকিতেন শুনিয়াছি, আজ এ দৃশ্য দেখিয়া সে কথা আর কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতির এ নন্দনকাননে ক্ষুধা তৃষ্ণা বিষয়চিন্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র সাংসারিক ভাব আপনা হইতেই পলাইয়া যায়—মানুষের মন সেই অনন্তদেবের অসীম ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া স্বর্গের শোভা ধারণ করে।

ক্রমে বালসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণমালা, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। তরুণ অরুণ-আভা সর্ব্বাগ্রে এভারেষ্ট-শৃঙ্গের তুষারমণ্ডিত উচ্চ শিরে পতিত হওয়াতে ক্ষণে ক্ষণে ইন্দ্রধনুর বর্ণ প্রতিফলিত দেখিতেছি। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তুষাররাশি উজ্জ্বল হীরকস্তূপের ন্যায় ঝলসিতেছে। চাহিতে চাহিতে চক্ষে ধাঁধা লাগে। চারিদিকের দৃশ্য স্বর্গের অনন্ত সৌন্দর্য্য হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। আমাদিগকে আজই যে স্বভাবের এ নন্দনকানন হইতে বিদায় লইতে হইবে, একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। মনে ভাবিতেছি, এমন স্থানে বাস করিলে মানব স্বর্গের জীব হইতে পারে। স্বভাবের এ অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় আপনা হইতেই স্বর্গের পথে ধাবিত হয়।

সংসার-ভাবনা ভুলিয়া গিয়াছি। হৃদয়ে যে উচ্চভাব হইয়াছে, তাহার কতক অংশ লইয়াও যদি গৃহে ফিরিতে পারি, নিজকে ধন্য মনে করিব। কোন মতেই ইচ্ছা হয় না, এ দৃশ্য ছাড়িয়া যাই। অন্ততঃ দুই দিন থাকিবার জন্য দলের অধিনায়িকাকে যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করিলাম। বিশ্রামদিন রবিবার দার্জিলিঙে না কাটাইলে চলিবে না বলিয়া, তিনি কোন মতেই আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কাজেই আমরা যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম। মধ্যাহ্ন-

ভোজনের পর আহার-দ্রব্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। যে লোক আহার-দ্রব্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে গোপনে খাদ্যগুলি নিঃশেষ করিয়াছে, স্পষ্ট বুঝিয়াও কিছু বলিলাম না। অধিনায়িকার পরামর্শে নূতন পথ ধরিয়া দার্জিলিং ফিরিয়া চলিলাম। তাঁহার ধারণা যে, এপথে গেলে অন্ততঃ ১৫।১৬ মাইল পথ বাঁচিয়া যাইবে। নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিব ভাবিয়া আমরাও প্রফুল্ল হইলাম। দলনেত্রীর বর্ব্বর সহিস আমাদের পথ-প্রদর্শক, তাহার একটী কথাও বুঝিতে পারি না। বেলা প্রায় ১২টার সময়ে সেই গগনস্পর্শী গিরিমালা, সেই অমল শুভ্র এভারেষ্ট-শৃঙ্গ, সকলেরই নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দার্জিলিং অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছি। পথের বর্ণনা সম্ভবপর নয়। এখন কেবল নীচে নামিতেছি। এমন উচু নীচু পথ যে, খালি ডাণ্ডি লইয়াই লোকগুলি আছাড়িয়া পড়িতেছে। কোমর পর্য্যন্ত গভীর গর্ত্তের মত স্থানে নামিয়া উপরে উঠি, আবার গর্ত্তে পড়ি। এই সুগম পথে কত দ্রুত চলা সম্ভব, সহজেই অনুমান করা যায়। ক্রমে আমরা পর্ব্বতের মূল দেশে নিবিড় বাঁশবনে যাইয়া পড়িলাম। সেই গগনভেদী পর্ব্বত-চূড়া, সুনীল আকাশ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর জঙ্গল ভেদ করিয়া সূর্য্য-কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম। বর্ষার সময়ে বোধ হয় স্থানগুলি জলে পূর্ণ ছিল, কারণ এখনও পদভরে মাটী বসিয়া যাইতেছে। বন্য জন্তুর সাক্ষাৎলাভ একটুও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এ কয়-দিনের অল্পাহারে ঘোড়াগুলি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছিল, আজ অপর্য্যাপ্ত বাঁশপাতা আহার করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইতেছে। দলের অধিনায়িকা আশা করিয়াছিলেন, ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিলেই আজ রাত্রির জন্য ফরেষ্ট বাঙ্গালায় বিশ্রামস্থান পাইবেন। কিন্তু প্রায় ১০ মাইল পথ আসিয়াও যখন মনুষ্যের বসতি-চিহ্ন লক্ষিত হইল না, তখন সকলেরই ধারণা জন্মিল পথ হারাইয়াছি। এখন কোথায় আশ্রয়স্থান, কতদূর গেলে লোকের মুখ দেখিব, দার্জিলিং আর কতদূর, সকলই অনিশ্চিতের মধ্যে দাঁড়াইল। এত দুর্গম পথও আমোদে চলিতেছিলাম, বিপথে পড়িয়াছি শুনিয়া মনের ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তথাপি ভয়ে আকুল না হইয়া সকলেই সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফল।

বি এ।

বিক্‌টোরিয়া মুখোপাধ্যায় ইংরাজী

অনর ২য় শ্রেণী প্রাইভেট

সুরবালা সিংহ পাস বেথুন কলেজ

চারুবালা মণ্ডল „ „

এফ এ।

পুণ্যলতা রায়চৌধুরী ১ম বি বেথুন কলেজ

হেমবালা দে ২য় „

আল্‌টন হানা „ „

„ মোজেল „ „

মেরী বানর্জি „ প্রাইবেট

সুনীতিবালা ঘোষ „ „

পিরিয়া আইরিণ ৩য় „

প্রবেশিকা।

সুলেখা বসু ১ম বেথুন

বনলতা মজুমদার „ ব্রাহ্মবালিকা শিঃ

মৃণালিনী বসু „ ইউ এফ সি নর্ম্মাল

সর্কার মাউডে ১ম লোরেটো হাউস

মেরী ঘোষ „ „

ষ্টোডার্ড ফ্রডেন্স „ „

হর্ষবালা বিশ্বাস „ ক্রাইষ্ট চর্চ্চ

মার্থা আণ্টনি ২য় ডায়সিয়ান মিসন

ইন্দুপ্রভা ঘোষ „ „

নির্ম্মলাবালা নায়ক „ ক্রাইষ্ট চর্চ্চ

হেমনলিনী বসু „ বেথুন

শৈলজা গুপ্তা „ „

বিভুবালা সরকার „ „

ভক্তিলতা চন্দ „ ময়মনসিং আঃ জাঃ

জ্যোতির্ম্ময়ী রায় „ „

সুমতি চট্টো ৩য় বেথুন

শান্তিময়ী দত্ত „ „

যামিনী গুপ্ত „ „

আশা হালদার „ „

লাবণ্যবালা ঘোষ „ „

নূতন সংবাদ।

১। চিন জাপানে কত দ্বেষাদ্বেষি ছিল, এখন চিন জাপানকে শিক্ষকরূপে বরণ করিয়াছে। ১৭০০০ চিন যুবক জাপানে নানা বিষয় শিক্ষা করিতেছে।

২। রামকৃষ্ণ মিসনের নফরচন্দ্র কুণ্ডু দুইজন নর্দ্দামা সাফকারী কুলীকে উদ্ধার করিতে গিয়া আপনার প্রাণ দিয়াছেন। নফরচন্দ্রের আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকারে সাহেবেরাও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ত্যক্ত পরিজনদিগের পালনার্থ চাঁদা দিতেছেন। ফণ্ডে ইতিমধ্যে প্রায় হাজার টাকা উঠিয়াছে, আরও উঠা চাই।

৩। অজিত সিংহকে ধরিবার জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে। তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

৪। পঞ্জাবের ছোটলাটের ক্যানসার হওয়াতে ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছে।

৫। ফরিদপুরের মাদারিপুর প্রভৃতি স্থানে হিন্দুমুসলমানদিগের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনার্থ বন্ধুসভা হইতেছে। বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

৬। খুলনার মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় জেলাসমিতির অধিবেশন বন্দ করিয়াছিলেন, পুনর্বিবেচনা করিয়া ইহাতে সম্মতিদান করিয়াছেন, সুখের বিষয়।

৭। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী কলিকাতায় যে শিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছেন, তাহার কার্য্য বেশ চলিতেছে। বোর্ডারদিগের জন্য ৫ করিয়া ছাত্রীবৃত্তি দেওয়া হয়। অনেক ভদ্রগৃহের স্ত্রীলোককে গাড়ী করিয়া আনিয়া বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

৮। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাসের পুত্র অনরেবল রাধাচরণ পাল একটী মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটী কমিটির সভ্যরূপে যে ২০০০ টাকা ফি তাঁহার প্রাপ্য, তাহা এইরূপে ব্যয় করিবেন :—

(১) ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা	২৫০
(২) বিজ্ঞান সভা	২৫০
(৩) অন্ধ বিদ্যালয়	১০০
(৪) হিন্দু অনাথাশ্রম	১০০
(৫) মুসলমান অনাথাশ্রম	১০০
(৬) লেডী ডফারিণ হাসপাতাল	৫০
(৭) গরিবদের ছোট ভগিনীদল	৫০
(৮) কয়েদী সাহায্য সভা	৫০
(৯) নফর কুণ্ডুর পরিবার	৫০

অপর ১০০০ টাকা করদাতাদিগের স্বত্ববিচার আন্দোলন ফণ্ডের মূলধনস্বরূপ রাখিবেন।

বামারচনা।

মাতৃভূমি।

নমি তোমা জন্মভূমি! আনন্দদায়িনী—
ধন ধান্যে পরিপূর্ণা ভুবনমোহিনী।
বিহগ ললিত ছন্দে, তোমারি চরণ বন্দে,
সমীর বীজন করে দিবস যামিনী।
মৃদুল কাকলী তানে, তোমারি মহিমা গানে,
চুমিয়া চরণ তব ছুটিছে তটিনী।
নক্ষত্র-খচিত কেশ, ভুবনমোহিনী বেশ,
ফল ফুল শস্য ভরা মোহন ধরণী!
মহাদেবী মনোরমা, শুভদা, সুখদা, শ্যামা,
মহিমামণ্ডিতা কায়া নমস্তে জননী।
পালিছ সন্তানগণে, দয়া ধর্ম্মে প্রীতি সনে,
অন্নদে, বরদে, দেবী শান্তিস্বরূপিণী।
অনন্ত স্নেহশালিনী, বীরপুত্র-প্রসবিনী,
মায়াময়ী মহাদেবী সুবিদ্যা-দায়িনী।
যুগে যুগে পাল ধর্ম্ম, কে বুঝে মা তব মর্ম্ম,
অনন্ত মহিমাপূর্ণ চৈতন্যরূপিণী।
মাতৃভূমি আদ্যা শক্তি, দিয়া এ হৃদয়-ভক্তি
বন্দি পদ কোকনদ আজি গো জননী।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

প্রিয়।

আমার জীবনে তুমি বসন্ত সমান
কিম্বা প্রভাতের ফুল, বিহঙ্গ-ঝঙ্কার ?
মলয় অনিল ? কিম্বা নির্ঝরের গান ?
পুষ্পসার তুমি ? তুমি কুসুম-সম্ভার ? ১
মনোজ্ঞ চাঁদিনী তুমি ? মধুর চন্দ্রমা ?
চকোর ? চাতক ? টীয়া ? পাপিয়া ?
কোকিল ?
প্রভাতের প্রীতি-রাশি ? সন্ধ্যার সুষমা ?
ঊষার শরীর-ভূষা ? শিশির-সলিল ?
দিবার আলোক তুমি ? সন্ধ্যার আঁধার ?
গোধূলির আধ ছায়া ? প্রদোষের শোভা।
পবিত্র প্রত্যূষ তুমি ? তুমি জ্যোতি তার,
পূর্ণ শশী ? পূত বাল-অরুণের আভা ?
কি তুমি ? তুমি কি প্রেম ? কিম্বা কুবলয় ?
যত কিছু ভাল আছে যেখানে যেখানে,
তুমিই সবার সার মনে মনে হয়,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, জেগে উঠে প্রাণে। ৪

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রতি জননী।

আজি গো প্রভাতী বায় স্বর্গের সুরভি ভরা,
আজি গো অমৃতময়ী আমার নিখিল ধরা।
জানিনা আজিকে হেথা দয়েল কি সুরে
গায়,
স্বর্গের মলয় যেন অমৃত ছড়ায়ে যায়।
আজি কি পবিত্র ভাবে ভরিয়া সামান্য
হৃদি—
বৈকালিক বেল ফুলে কপোত ঢালিছে
প্রীতি,
লক্ষ্য পথভ্রষ্ট কিম্বা স্বর্গকক্ষ-চ্যুত তারা,
আসিলি দরিদ্র ঘরে হয়ে বুঝি পথহারা।
তোর ও অধর স্পর্শে জুড়াইল দগ্ধ প্রাণ,
তুমি রে বিষাদে হাসি আঁধারে আলোক-
দান।
কোন্ দেব আনি দিল তোমা হেন ধন
আহা!
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে ভাবিয়া না পাই
তাহা।
অনন্ত অব্যয় তিনি তুষ্ট কি হবেন ধনে ?
প্রাণের ভকতিটুকু ঢেলে দিব সে চরণে।
জন্ম মাত্র এই ফুল সঁপেছি তাঁহার পায়,
দেবের প্রসাদী ফুল বিপদ কি ছোঁবে
তায় ?
চিরজীবী হয়ে বাছা! থাক মোর কোল-
যুড়ে,
মায়েরে একলা ফেলে কখন যেওনা দূরে,
স্নেহের মুকুল মম ক্রমে বিকশিত হও,
যাঁর করুণার দান, তাঁর প্রেমে মজে রও।
স্বরগ কোথায় বাছা! স্বরগ কোথায় রয় ?
তোমারই হৃদয় যেন সহস্র স্বরগ হয়।
সত্য ধর্ম্ম ক্ষমা নিষ্ঠা এদেরি দেবতা কয়,
তোমারি হৃদয় যেন দেবতা-আলয় হয়।
পারিজাত মধুভরা স্বর্গের পুতুল,
লও প্রেম স্নেহাশিস স্নেহের মুকুল।
দীনা আমি কোথা পাব রত্ন ভূষা অলঙ্কার,
এইটী তোমার লও জন্মদিন-উপহার॥

তোমার মা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

July, 1907.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২৭ সংখ্যা। { বর্ষ। আষাঢ়, ১৩১৪

জুলাই, ১৯০৭। { ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৫
২। ভাগবতোপাখ্যান ৬৬
৩। রসায়ন—
সায়নোজেন বা নীলজন ... ৬৯
হাইড্রসায়েনিক এসিড ... ৭০
৪। স্বর্গীয় আনন্দমোহনের ঈশ্বর-ভক্তি ৭১
৫। মহাযাত্রা (পদ্য) ... ৭৬
৬। আতিথেয়তা ... ৭৭
৭। প্রতিজ্ঞা পূরণ ৭৯
৮। কাল ৮২
৯। আষাঢ়ের চাঁদ (পদ্য) ... ৮৩
১০। অদ্ভুত গোদোহন (সচিত্র) ... ৮৪
১১। বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ ... ৮৫
১২। নূতন সংবাদ ৮৭
১৩। বামারচনা—কি যেন গো নাই ৮৮
প্রার্থনা ৮৮
১৪। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ... ৮৯
১৫। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৪র্থী শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে পঠিত ৯০

কলি[illegible]
২৯।৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান
মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত কুমার দত্ত ক[illegible]
হইতে [illegible]

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসি[illegible]

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ক

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আয়ুর্ব্বে

সোমেশ্ব

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরু
জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সে
অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে
ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উ
উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বা
উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থ
যথা বুক দুড় দুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন
ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মল
নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ
৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শি

শ্বা

(হাঁপানি কাশি

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাক
গলার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকিবে না। কাশিতে ক
৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান ব
বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালক বালিকাদিগের জলকাশি, ঘু
করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে

কাশরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। ে
বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত
থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন,
১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১॥

...মেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সে...
আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, পেট
..., পেট ঠোশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই
...য়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার যথেষ্ট
...সরল মল নির্গত হইবে, অম্লজনিত হৃদ্রোগ
...প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে,
...ত্যাগ, আমাশয় ... উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা
...ল রোগেই হিতকর।
...শি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৸০, মাশুল ॥০ আনা।

...সারি।

...র ইহাই মহৌষধ)।

...ষ্ট উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে,
...শিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।
...হইবে, বুক পিঠ সাঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা
...ড়ী কাশি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড়্ ঘড়
...সকল রোগীর শ্বাস কাশ নিয়ত বর্ত্তমান আছে,
কাশিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান
...প্তাহমধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।
টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা, মোট ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,
৪ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,
কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 527. July, 1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৫ বর্ষ। ৫২৭ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৪। জুলাই, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—সাম্রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রা ভূমধ্যস্থসাগর ভ্রমণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে ফিরিয়াছেন।

বুদ্ধোৎসব—গত (১২ই জ্যৈষ্ঠ) বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্ম, সিদ্ধিলাভ ও পরিনির্ব্বাণ উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা হইয়াছে। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন এবং ধর্ম্মপাল মহোদয় বক্তৃতা করেন।

আর্য্য সমাজের রাজভক্তি—সার ডেনজিল ইবেটসনের বিলাতযাত্রাকালে আর্য্যসমাজের লালা হংসরাজ ও রায় বাহাদুর সোহনলাল প্রভৃতি কয়েকজন আর্য্য সমাজের প্রধান সভ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকখানি ধর্ম্ম পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পঞ্জাবী ছোট লাট একটু অনুযোগ করিয়া পরে ইহাঁদের রাজভক্তির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ছোট লাটের আরোগ্য—সার আণ্ড্রু ফ্রেজার দার্জ্জিলিঙে পীড়িত ছিলেন, আরোগ্যলাভ করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

রাজ-সম্মাননা—ইংলণ্ডেশ্বর সিপাহী-বিদ্রোহকালীন দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-আক্রমণকারী সেনাপতিদিগের ১১৪ জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গত ৩রা জুনের বিশেষ রাজদরবারে উহাঁদিগের বিশেষ সম্মাননা করা হইয়াছে।

আমীরের বিলাত ভ্রমণ—আগামী ১৯০৮ সালে কাবুলের আমীর ইংলণ্ড ভ্রমণের মানস করিয়াছেন।

চিনে স্ত্রীজাতির উন্নতি—চিনের চ্যাঙ নামে রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী স্ত্রীজাতির উন্নতি-কল্পে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার করিতেছেন, ইহার নাম "Peking Woman's News" পিকিঙের স্ত্রী-সংবাদপত্র। ১৯০৪ সাল হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

হাকিম সাহেবের দণ্ড—বরিশালের প্রসিদ্ধ জ্যাক সাহেবের নামে স্বদেশ-হিতৈষী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত যে মান-হানির অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে আদালতের বিচারে খরচাসহ ১০১ টাকা ডিক্রী পাইয়াছেন।

লর্ড মিণ্টোর সদ্বিবেচনা—যে (Colonization Bill) ঔপনিবেশিক আইন পঞ্জাববাসীদিগের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইলেও লর্ড মিণ্টো অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

হিন্দু বিধবাশ্রম—পুনাতে স্বর্গগত রাণাডের গুণবতী পত্নী যে আশ্রমের নেত্রী, তাহার উন্নতির সংবাদ পাইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। গত ১৯০৬ সালে ইহার অধিবাসিনীর সংখ্যা ৬০ হইতে ৭৫ হইয়াছে। বার্ষিক আয় ২২ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ১২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আশ্রমস্থ একটী মহিলা প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীস্বত্বাধিকার—সুসভ্য ইংরাজজাতি আজও স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্বত্বাধিকার দানে কেবল কুণ্ঠিত নহেন, কিন্তু তাহার বিরোধী। রুসিয়ার ফিন্‌লণ্ডবাসিনীদের ন্যায় অষ্ট্রীয়ার মহিলারাও পার্লেমেণ্টে বসিবার ও ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন।

ভাগবতোপাখ্যান।

পরাশর-নন্দন ব্যাসদেব বেদাদি গ্রন্থ সকল সঙ্কলন ও কল্পবৃক্ষসম বেদার্থ-প্রতিপাদক মহাভারত গ্রন্থ জাতি-নির্ব্বিশেষের হিতার্থে রচনা করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি কঠোর তপস্যাপরায়ণ হইয়াও হৃদয়ে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। একদা অতিশয় অপ্রসন্নমনে সরস্বতী-নদীতীরে নির্জ্জনে অবস্থিতি করতঃ নিজের অপ্রসন্নতার হেতু বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদকে দেখিয়া বেদব্যাস সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহার থোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। নারদ ব্যাসদেবকে অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন?" ব্যাস উত্তর করিলেন "দেখুন, আমি নিয়মিত ব্রতধারী হইয়া বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছি—অগ্নি গুরু ইত্যাদির যথা-বিহিত অর্চ্চনা ও হোম যাগ করিয়াছি এবং লোকহিতার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। আমি আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। এত বেদাধ্যয়ন করিলাম, এত ব্রহ্মস্বরূপ বিচার করিলাম, এত তপস্যা করিলাম,

কিন্তু হৃদয়ের অভাব দূর হইল না, আমি এখন কি করিব?" নারদ বলিলেন "শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে, ব্রতাচরণ ও প্রাণায়ামাদিতে, কেবল বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিলে হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি উথলে না। ভগবানে মতি ও রতি জন্মান চাই। তাঁহার অখিল লীলা-রসে মগ্ন না হইলে বাহিরের বৈরাগ্য বা যাগ, যজ্ঞ, তপস্যায় কি ফল? তাহাতে হৃদয়ের শুষ্কতা ঘুচিবে না; বরং দিনের পর দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইবে। স্বচ্ছবালুরাশিতে যেমন তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, তেমনি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানেও হৃদয়ের পিয়াস যায় না। তুমি ব্রহ্মবিচার করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার বিমল যশঃকীর্ত্তন কর নাই, তাঁহার নিত্য লীলা দর্শন কর নাই। ভগবানের লীলা-রসাস্বাদন করিতে না পারিলে কিছুতেই প্রাণ জুড়াইবে না, অতএব তুমি এখন হইতে ভগবানের যশঃকীর্ত্তনে ও তাঁহার মধুর লীলা বর্ণনে নিযুক্ত হও, দেখিবে অচিরে তোমার হৃদয় প্রসন্ন হইবে। তোমার বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় আকাশ নির্ম্মল হইয়া প্রেমচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। প্রেমভক্তি বিনা তপস্যার কি প্রয়োজন? আর প্রেমভক্তি হইলে তপস্যারই বা কি প্রয়োজন? ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, ভক্তিবিহীন জ্ঞান শূন্যবাদে পরিণত হয়। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ইহার কিছুই পরম ধর্ম্ম নহে। ভগবানের নিত্যলীলা দর্শন এবং সেই লীলা-রসাস্বাদনই একমাত্র পরম ধর্ম্ম। ইহাতেই জীবের বুভুৎসার পরিতৃপ্তি হয়।"

নারদের এই আশ্বাসবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া ব্যাসদেব সেই সরস্বতী-জলে আচমনানন্তর অতীন্দ্রিয় ভগবানে চিত্ত-সমাধানপূর্ব্বক ভক্তিযোগে তাঁহার অরূপ-রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন এবং মায়াভি-ভূত অজ্ঞান লোকদিগের হিতার্থ লীলা-রসময় এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অস্মদ্দেশীয় গোস্বামী সম্প্রদায় ইহাকে বিকৃত অবতার-বাদে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানে সচ্চিদানন্দ অরূপ রূপের সহিত জড়মূর্ত্তি ও জড় রূপের সংমিশ্রণ করিয়াছেন, বিশেষ মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রকাশ ও লীলা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহারা প্রেম ও ভক্তির যে উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন, সেজন্য শুষ্ক জ্ঞানী মানুষ তাঁহাদের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি শিক্ষা করিবে। আমরা এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হইতে পাঠক পাঠিকাদের চিত্ততোষণার্থ মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি। সম্প্রতি ব্যাসদেব কুন্তিদেবীর মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি।

"হে ভগবন্, হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অনাদি হইয়া সকলের আদি হইয়া আছ, তুমিই

প্রকৃতির নিয়ন্তা। তুমিই সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহ্য পূর্ণ করিয়া রহিয়াছ অথচ তোমাকে কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না। তোমাতে সকল বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ, আবার তুমি গুণাতীত। তুমি মায়ারূপ তিরস্করণী (পরদা) দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছ। ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান দ্বারা তোমাকে কিরূপে জানা যাইবে? ইন্দ্রিয়গণ সেই মায়ার বিকার। তুমি অপরিচ্ছিন্ন, মূঢ়দৃষ্টি মানুষ যেমন নাট্যঘর নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ দেহাভিমানী নরনারী তোমাকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না। হে বিশ্বাত্মন্, তুমি অজ হইয়া সর্ব্বজীবে বিদ্যমান আছ, কেবল ইহাই নহে; কিন্তু নিজ অদ্ভুত চরিত্র দ্বারা তাহাদের চরিত্র দিন দিন উন্নত ও বিশুদ্ধ করিতেছ। তোমার লীলা আমি অবলা কি বলিব? তোমার প্রকাশে জগৎ মোহিত হইয়াছে, কি আর বলিবে? তুমি স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া আছ, তাই অনেকে অনেক প্রকারে তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন। মলয় পর্ব্বতের কীর্ত্তি বিস্তারের জন্য যেমন তাহাতে চন্দনতরু জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ হে ভগবন্! মানবের গৌরব বর্দ্ধনার্থ তুমি তাহার হৃদয়ে জন্ম-গ্রহণ কর। কেহ বলেন এই সংসার পরম আনন্দস্বরূপের আবরণরূপা অবিদ্যা এবং তদুৎপন্ন কাম্য কর্ম্মাদি দ্বারা জীব সকল ক্লিশ্যমান হইতেছে দেখিয়া তুমি স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাক। কেহ বলেন তুমি দেবকী-নন্দন, বসুদেবতনয়; যশোদার বাৎসল্যে, শ্রীদামাদি রাখালদিগের সখ্যে, রাধিকার প্রেমে তুমি আবদ্ধ, তুমি গোপীজনের প্রাণবল্লভ। প্রভু! এ সকলি তোমার মায়িক রূপ। তোমাকে যে যে ভাবে ভজিতে চাহিয়াছে, তুমি তাহাকে সেই সেই ভাবে ভজনা করিতে দিয়াছ, কিন্তু তোমার এই মায়িক ভজনের অবসানে তোমার স্বরূপ তুমি প্রকাশ করিয়াছ। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি জীবের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখ না। তাহার বাঞ্ছিতরূপে তাহার কাছে প্রকাশিত হইয়া তাহার সকল বাসনা, সকল কামনা পূর্ণ করিয়া, তাহার ভবদুঃখ হরণ করিয়া যখন দেখা দাও, তখনি হে হরি, সে তোমার প্রকৃতরূপ দেখিতে পায়, এবং চিরজীবন তোমারি শরণাপন্ন হইয়া থাকে। হে ভক্তজনবল্লভ, তুমি ভক্তেরই প্রাণধন, ভক্তগণই তোমার সর্ব্বস্ব, তুমি তাহা-দিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পার না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এ সকলে তোমার অভিলাষ নাই, তুমি আত্মারাম এবং শান্ত, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, সকলের প্রতি তোমার সমান ভাব, কিন্তু তোমার ভক্ত ভিন্ন এ কথা অন্যে বুঝিতে পারে না। তুমি সকল জীবে সমভাবে বিদ্যমান আছ অথচ ধর্ম্মান্ধ লোকে তোমাকে নিমিত্ত করিয়া পরস্পর কলহ

করে, তোমাতে বৈষম্য দৃষ্টি করে। হে জগদ্‌গুরো, লোক সকলের সম্পদ ঐশ্বর্য্যই তাহাদের দুঃখের কারণ হয় —কেননা সদ্বংশে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বহু শাস্ত্রে জ্ঞান এবং ক্রিয়াকলাপে লোকের মদই বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সে আপনাকে অকিঞ্চন ভাবিতে পারে না। তুমি অকিঞ্চন-ধন। অনন্যগতি ও অনন্য-মতি না হইলে তোমার দর্শন পাওয়া যায় না। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদিগকে নিরন্তর এই সংসারে বিপদের মধ্যেই রাখ, তাহা হইলেই তোমাকে নিকটে পাইব, তোমাকে ডাকিব, তোমার শরণাপন্ন হইব, আর তুমি আমাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া কখনই ছাড়িতে পারিবে না। হে হৃষীকেশ, আমি নারী হইয়া আর তোমার কি স্তব স্তুতি করিব? তুমি অনাত্মাত্ম-বিবেকী পরমহংস, ও মননশীল রাগদ্বেষ-বিরহিত মুনিগণেরও জ্ঞানের অগোচর, আমি আর তোমাকে কি বলিব? তোমাকে মানবীয় ভাবে আমি যে আদর করিয়াছি, তুমি আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর—আর হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে অখিলগুরো, হে ভগবন্, আমি অতি ব্যাকুল হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, পাণ্ডব ও যাদব-গণের প্রতি আমার যে দৃঢ় মায়িক স্নেহ-বন্ধন আছে, তাহা তুমি ছেদন করিয়া দেও এবং এখন হইতে আমার মতি অনন্যবিষয়িণী হইয়া তোমাতে প্রীত হউক, তাহা হইলে গঙ্গা যেমন সাগরে মিলিত হইতে গিয়া প্লবকে বিঘ্ন বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ আমার মতি ও গতি তোমাতে মিলিতে গিয়া কোনও প্রতি-বন্ধক গণনা করিবে না।

শ্রীকেদারনাথ কুলভী।

রসায়ন।

সায়নোজেন বা নীলজন।

Cyanogen (CN or Cy)

NC = 26

ইতিহাস—১৮১৪ অব্দে গে লুসাক্ (Gay-Lussac) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন। অঙ্গার সবক্ষার জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া সায়েনোজেন নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অনেক নীল-বর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে নীলজন কহে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহার এক প্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। জলে অধিক দ্রব হয়। ইহার গন্ধ পিচ-ফলের শাঁসের বা আঁটির গন্ধের অনুরূপ। ইহার দহনে C_2O বা শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন করা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। সায়নো-

জেন যৌগিক পদার্থ হইলেও রূঢ় পদার্থের ন্যায় ইহার পরমাণু অপরাপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাকে যোগরূঢ় (Compound Radical) পদার্থ কহে এবং এই নিমিত্তই ইহার অপর চিহ্ন Cy হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—মার্কিউরিক্ সায়নাইডকে (Mercuric Cyanide) উত্তপ্ত করিলে Cy বিমুক্ত হয়,পারদ থাকিয়া যায়; যথা—$Hg\ Cy_2 = Hg + Cy_2$ অঙ্গার ও যবক্ষারজন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া Cy উৎপন্ন করে না। কয়লা ও পটাসিয়ম্ কার্ব্বনেট উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া N (যবক্ষারজন) বাষ্পের স্রোত চালাইলে পটাসিয়ম্ সায়েনাইড্ প্রস্তুত হয়। সচরাচর উক্ত প্রকারে পটাসিয়ম সায়েনাইড প্রস্তুত করে না। সিং, চামড়া প্রভৃতি জান্তব পদার্থে পটাসিয়ম কার্ব্বনেট ও লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাসিয়ম্ ফেরো-সায়নাইড্ প্রস্তুত হয়; তাহা হইতেই পটাসিয়ম্ সায়নাইড প্রস্তুত হয়।

৬৫ ভাগ পটাসিয়ম সায়নাইড্ ও ১৭ ভাগ আর্জেন্টিক নাইট্রেড পৃথক্ পৃথক্ রূপে জলে গুলিয়া মিশাইয়া রাখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ জন্মে। ঐ পদার্থ শুষ্ক করিয়া পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিলে সায়নোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবল বিষধর্ম্মী বলিয়া এই গ্যাস যখন তখন সংগ্রহ করা উচিত নহে।

হাইড্রসায়েনিক এসিড।

Hydrocyanic Acid.

$HCN = ২৭$।

ইহার অপর নাম প্রসিক এসিড (Prussic Acid)। এক ভাগ সায়নোজেন ও এক ভাগ হাইড্রজেন সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন করে।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৬০৫ অংশ তাপে ফুটিয়া উঠে এবং ১৫ অংশ শৈত্যে জমিয়া কঠিন হয়। গ্রীষ্মকালে ইহাকে তরল অবস্থায় রক্ষা করা দুঃসাধ্য। ইহার ঘ্রাণ দ্বারা শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। ইহার প্রকার-বিশেষে তীক্ষ্ণ গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ প্রখর; কিন্তু অম্ল নহে। অধিক জলের সহিত না মিশাইয়া ইহার কোন প্রকার ব্যবহার করা উচিত নহে। ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ মিশাইয়া ঔষধার্থে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন স্থলেও একবারে এক ফোঁটার অধিক কিম্বা বার বার দেওয়া যাইতে পারে না। ফলতঃ এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনভিজ্ঞ ভিষকের ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে; এবং ইহা ঔষধালয় ভিন্ন বাসভবনে রাখা

উচিত নহে। এই বিষজন্য অনিষ্ট উৎপত্তি হইলে শীতল জল ব্যবহার দ্বারা তাহার প্রতীকার হইতে পারে। এই বিষ দ্বারা কুক্কুরাদি মৃতপ্রায় হইলে তাহাদের শরীরে শীতল জল প্রবল বেগে ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করা গিয়াছে। এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলেও এই বিষের তেজ মন্দীভূত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—পটাসিয়ম্ সায়নাইড্কে গন্ধক দ্রাবকের সহিত সংযুক্ত করিয়া বকযন্ত্রে চোঁয়াইবার সময় যাহাতে এই গ্যাস উড়িয়া যাইতে না পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলতঃ বিশেষ সাবধান হইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হয়; এবং প্রথম শিক্ষার্থীদিগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

স্বর্গীয় আনন্দমোহনের ঈশ্বর-ভক্তি।

কয়েক মাস হইল "প্রবাসীতে, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী হেমলতা দেবী স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর জীবনী বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মের গৌরব যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, তিনি কখন আনন্দমোহন বসুর ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী বিস্মৃত হইবেন না।" আমরা আজ এই কথাটি লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে চাই।

এ কথা সকলেই জানেন যে আজকাল গীতাগ্রন্থের বড় আদর; কারণ গীতার আদর্শ অতি উচ্চ। গীতার প্রধান শিক্ষা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম—এই তিনটীকেই চোখের সম্মুখে রাখিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে। যেমন উদ্যানের বৃক্ষটি পত্র পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইলেই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় ও তাহার বৃক্ষ-জন্ম সার্থক হয়, তেমনি মানুষ যদি জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করিয়া জীবনের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই মানব-জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এবং দুর্ল্লভ নরজন্ম সার্থক হয়।

কিন্তু পত্র, পুষ্প ও ফল—একই সময়ে এই তিন বস্তুতে অতি অল্প বৃক্ষকেই সুশোভিত হইতে দেখা যায়। কোনও বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প থাকে ত ফল থাকে না; আবার পত্র ও ফল থাকে ত পুষ্প থাকে না। সেইরূপ সংসারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-সমন্বিত মানুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেরই জ্ঞান আছে, অনেকে সৎকর্ম্মও করেন; কিন্তু দুর্ল্লভ ঈশ্বরভক্তি তাঁহাদের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আবার অনেক ধর্ম্ম-রসজ্ঞ ভাবুক লোকের অন্তরে ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে গভীর জ্ঞান ও কর্ম্মস্পৃহা বড় বেশি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আনন্দমোহনের জীবনে কিন্তু এই ত্রিবিধ ভাবেরই সমাবেশ হইয়াছিল। জ্ঞানের দিব্য-রশ্মিতে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সে হৃদয়ে ভক্তির ফুল প্রস্ফুটিত হইতে দেখা গিয়াছে এবং কর্ম্মেতে তিনি একজন কর্ম্ম-যোগী পুরুষ বলিয়াই গণ্য। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিস্তর পড়া গিয়াছে; তাই আজ তাঁর ভক্তি সম্বন্ধেই দুএকটী কথা বলিব।

বহুবৎসর পূর্ব্বে আমরা কলিকাতায় মাঘোৎসব দেখিতে আসি। তাহার আগে কলিকাতা আসিয়াছি, কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যোগ ছিল না বলিয়া ব্রহ্মোৎসব দেখিতে যাই নাই। সে বার ব্রহ্মোৎসব দেখিতে আসিয়া কয়েকজন লোককে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। তাহার মধ্যে স্বর্গীয় প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং শ্রদ্ধা-স্পদ রবীন্দ্র বাবুর নাম করিতে পারি।

কলিকাতায় আমি যে বন্ধুর বাসায় উঠিয়াছিলাম, তিনি আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া আশ্বাস দিলেন, আমি উৎসবের মধ্যেই এই চারিজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইব। তাঁহার কথাই সত্য হইল। উৎসবের মধ্যে আমি প্রথম যে দিন সাধারণ সমাজের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, সেই দিনই শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়কে ত দেখিলামই; তা ছাড়া তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার এক একটি কথা যেন কামানের গোলার মত আসিয়া আমার মনের উপর পড়িতে লাগিল; আমার হৃদয়-দুর্গের চতুর্দ্দিকে কুসংস্কারের যে প্রাচীরটুকু ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।

তার পর একদিন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্রের উৎসাহে যুবকদিগের একটি সভার উৎসব হইতেছিল; সেখানে প্রতাপচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজনকেই দেখিতে পাইলাম। সে দিন প্রতাপচন্দ্রের সৌম্য ও প্রশান্ত এবং রবীন্দ্রনাথের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে "বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়" এই সঙ্গীতটি শুনিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আজিও পরিষ্কার মনে আছে।

কিন্তু অন্য সকলকেই দেখিলাম, স্বর্গীয় আনন্দমোহনকে ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর ১১ই মাঘ আসিল। সেদিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই আমরা ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে ভয়ানক ভিড়! সেই ভিড়ের মধ্যে সম্মুখে বসা ত দূরের কথা; কোন রকমে পশ্চাতের একটি আসনের একটুখানি জায়গা অধিকার করিয়া বসিলাম। তখন আনন্দমোহনকে দেখিতে পাইলাম। কি ভাবে তাঁহাকে দেখিলাম? দেখিলাম সেই সৌম্যমূর্ত্তি আনন্দমোহন বক্ষঃস্থলে দুখানি হাত রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন; ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার সুন্দর মুখকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার নীলোৎপল নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া যাইতেছে; তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা বালিকা কন্যা বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে পিতার প্রেমোজ্জ্বল মুখশ্রীর বিচিত্রভাব নিরীক্ষণ করিতেছে। আমিও অনিমেষ-নয়নে আনন্দমোহনের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহার "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া উপকৃত হইলাম; বুঝিতে পারিলাম, আনন্দমোহন শুধু কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার নহেন, কেবল স্বদেশহিতৈষী ও রাজনীতিজ্ঞ নহেন, কেবল স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদাতা ও সমাজ-সংস্কারক নহেন; আনন্দমোহন একজন ভক্ত। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উৎস লুক্কায়িত আছে, তাই এই উৎসবের ভগবৎ-আরাধনায় অন্তরের ভক্তিভাব নয়নে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর কতবারই ত সাধারণ সমাজের মন্দিরে তাঁহার "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া পুলকিত, বিস্মিত ও উপকৃত হইয়াছি। একবার মাঘোৎসবে সাধারণ সমাজের মন্দিরে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র উপাসনা করিয়াছিলেন। সেবার তাঁহার সুগভীর আরাধনায় এবং কবিত্ব ও দর্শনসংমিশ্রিত অপূর্ব্ব উপদেশে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলাম! কিন্তু দেখিলাম উপদেশের সময় আনন্দমোহনের এরূপ ভাবোদয় হইয়াছে যে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না; উপদেশের মধ্যেই বুকের উপর দুখানি হাত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

আর একবার আমরা দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন স্বর্গীয় বসু মহাশয় একটি পীড়িত সন্তানকে লইয়া দার্জ্জিলিং বাস করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সন্তানটির মৃত্যু হইল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় আমরা অনেকেই বসু মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্বিনমাসের "প্রবাসী"র প্রবন্ধলেখিকা শ্রদ্ধেয়া হেমলতা দেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভুটিয়া স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করিলেন। তার পর বসু মহাশয় স্বয়ং যখন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নয়ন শিশিরসিক্ত পুষ্পদলের ন্যায় ভক্তির অশ্রুতে আর্দ্র হইল; তাঁহার সেই "ভক্ত্যশ্রুপ্লাবিত অপূর্ব্ব মুখশ্রী" দেখিয়া আমাদের অন্তরও বিগলিত হইল।

এই ঈশ্বরভক্তিতেই বোধ হয় বসু মহাশয়ের প্রকৃতি অতিশয় মধুর হইয়াছিল। একে ত তাঁহার সুমিষ্ট মুখশ্রীরই কেমন একটা আকর্ষণ ছিল। তার পর তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের মিষ্ট কথায় সকলকেই আকৃষ্ট হইতে হইত। একবার তাঁহার দমদমার বাটীতে মাঘোৎসবের উদ্যানসম্মিলন হইয়াছে। আমরা প্রায় তিন চারি শত পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার মেহগুনি গাছের তলায় বসিয়া গিয়াছি। প্রথম মেয়েরা সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করিলেন; পরে উপাসনা হইল। তার পর বসু মহাশয়কে কিছু বলিতে অনুরোধ

করা হইল। তাঁহার এমনই বিনয় ছিল যে, সহজে কোনও ধর্ম্মের কথা বলিতে চাহিতেন না। কিন্তু সেদিন সকলের অনুরোধে পড়িয়া কিছু বলিতে স্বীকৃত হইলেন। একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা করিয়া, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট বর্ণনা শুনিয়া মনে হইল, তিনি বাঙ্গলাকাব্যের রসগ্রাহী পাঠক ছিলেন, নচেৎ বাঙ্গলা ভাষায় অমন সুন্দর করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারিতেন না, এবং সেই বর্ণনা দ্বারা আমাদের চিত্তে সুনির্ম্মলা ভক্তির রসধারা উচ্ছলিত করিয়া তুলিতে পারিতেন না।

তাঁহার সুমিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি। কলিকাতায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, আমরাও গিয়া সেই আশ্রমে যোগদান করি। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে একসঙ্গেই বাস করিতাম। একবার স্বর্গীয় বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদিগকেও তাঁহার বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা লজ্জাবশতঃ ইহার পূর্ব্বে কখনো বসু মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্ত্তা বলি নাই। সে বার শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে বসু মহাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া আলাপ করাইয়া দিলেন। বসু মহাশয় আমাদিগকে কত মিষ্ট কথাই শুনাইতে লাগিলেন। আমরা যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী এবং আনন্দমোহন বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাদিগকে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আমরা একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী দ্বারা রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলাম, অন্যদিকে বসু মহাশয়ের সুললিত বাক্য শুনিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিতে লাগিলাম। এমন কি, কেহ যদি কৌতূহল বশতঃ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন,—সে দিন বসু মহাশয়ের বাড়ীর খাদ্যসামগ্রীই অধিক মিষ্ট, না তাঁহার কথা বার্ত্তাই অধিক মিষ্ট, তাহা হইলে সে কথার জবাব দেওয়া কিছু মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইবে। কেন না, খাদ্যসামগ্রীও যেমন মিষ্টরসে পরিপূর্ণ ছিল, বসু মহাশয়ের কথাগুলিও তেমনি সুমিষ্ট বোধ হইয়াছিল;—এই দুই রকম মিষ্টতার তারতম্য করা বড় কঠিন।

আমরা আর একটি কথা বলিয়াই আমাদের বক্তব্য বিষয় শেষ করিব। আনন্দমোহন ব্রাহ্মসমাজের নিকট যে বার শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, সে বারের কাহিনী বড় মর্ম্মান্তিক। গত মাঘোৎসবের পূর্ব্বে মাঘোৎসবের এক রবিবার অপরাহ্ণকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বার বসু মহাশয়ই সমাজের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু

পীড়িত ছিলেন বলিয়া সভার সকল অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উক্ত দিবস তিনিই সভায় আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যখন সভাপতির বক্তৃতা করিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি কিছু বলিতে চাহিলেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন বসু মহাশয়কে কিছুই বলিতে দেওয়া হইবে না, কারণ বসু মহাশয়ের যে পীড়া, তাহাতে বেশি কথা বলা একেবারে বারণ।

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা শুনিয়া বসু মহাশয় যেরূপ করুণস্বরে ও কাতরভাবে কিছু বলিবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও চক্ষুতে জল আসে। তাঁহাকে মাত্র পনর মিনিট বলিবার সময় দেওয়া হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"আপনাদের নিকট হয় ত আজই আমার শেষ বিদায়, আর যে কখনও এইরূপভাবে এই মন্দিরে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, আমার সে আশা আর নাই, শরীরের অবস্থা একেবারেই সেরূপ নয়। সেইজন্যই আজ আমি ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও মনের প্রবল আবেগে দু একটী প্রাণের কথা বলিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।" তৎপরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, সমাজের মধ্যে ভক্তির ভাব যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, ব্রাহ্মদিগকে তদ্বিষয়ে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ইহার দুই দিন পরেই ১১ই মাঘ। সে দিন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে লোকে লোকারণ্য। আনন্দমোহন বাবু অন্তরের প্রবল আবেগে সেই ভিড়ের মধ্যেই সমাজে প্রবেশ করিলেন। প্রায় সমস্ত দিন মন্দিরের মধ্যেই রহিলেন। তাঁহার পত্নী এবং পুত্র কন্যাগণ তাঁহাকে মন্দির হইতে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বসু মহাশয় হয় ত মর্ম্মের নিভৃততম স্থান হইতে এই বাণীই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, আর তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার সুযোগ হইবে না, অদ্য তাঁহার প্রিয় মন্দিরে আসার শেষ দিন; তাই তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধও শুনিলেন না। কিন্তু আমরা ১১ই মাঘ বৈকালে লক্ষ্য করিলাম—তিনি যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে।

হায়! সেই ১১ই মাঘ রাত্রে গৃহে গমন করিয়াই যে রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলেন, আর তাহার হস্ত এড়াইতে পারিলেন না, আর একটি বারও তাঁহার প্রিয় সমাজমন্দিরে আসার সুযোগ হইল না; তাঁহার কথাই সত্য হইল; সেই ৯ই মাঘের বিদায় গ্রহণই তাঁহার শেষ বিদায় গ্রহণ হইল।

তারপর যে দেড় বৎসর বাঁচিয়া-

ছিলেন, তাঁহার পত্নী সঙ্গীত করিতেন, আর তিনি বিছানায় পড়িয়া উপাসনা করিতেন। পীড়া বৃদ্ধি হইবার ভয়ে ব্রাহ্মগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন না, ব্রাহ্মসমাজের কোন খবরও কেহ তাঁহাকে জানাইত না; তিনি সেজন্য কতই আক্ষেপ করিতেন। এই অবস্থায় একবার সাধনাশ্রমের পরিচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন—"আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে বলিয়া কেহই আমার কাছে আসেন না; যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিব সে কয়দিনও যদি ধর্ম্মবন্ধুদিগের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতে না পারি, তবে বাঁচিয়া ফল কি?" গুরুদাস বাবুকে বলিলেন—তিনি পরলোকে গমন করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে কোনও ভয় নাই।

এই সকল কথা ও ঘটনাদ্বারা আমরা কি প্রমাণ পাই? আমরা বুঝিতে পারি আনন্দমোহনের অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত হইয়াছিল; তিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের ন্যায় ভক্তিযোগেও অনেক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিসমন্বিত জীবন যথার্থই আমাদের অনুকরণের যোগ্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

মহাযাত্রা।

(২০এ আগষ্ট)

ঘোর তমসায় রেতে একা দাঁড়াইনু
বৈতরণী এ পারেতে, যথা বেলা ভূম।
লুণ্ঠিত কতই হলো এ অবশ তনু,
ভাবিলাম মায়া খেলা, ডাকি কোথা তুমি।
যবে ঘন অবিরল গোধূলি-ললাট,
জগৎ তমসাচ্ছন্ন, আলো নিভে গেল;
সরম দুয়ারে চির পাড়ল কবাট,
অবরুদ্ধ এ নিভৃতে পশিবে না আলো।
বৈতরিণী এ পারেতে একাই কাঁদিব,
একাই বহিতে হবে দুর্ব্বহ জীবন,
অসীম এ মরুমাঝে একাই চলিব,
একা মাথা পেতে নিব অসহ্য দাহন।
অবশেষে মহাযাত্রা আসিবে যখন,
হাহাকার ঘুচে যাবে, পাইব সান্ত্বনা;
ধাইব বিভুর কোলে, লইব শরণ,
চিরশান্তি মাঝে ডুবি ভুলিব বেদনা।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

আতিথেয়তা।

(প্রাপ্ত।)

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশে অতিথি-সৎকার প্রথা বহুদিন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আদিম অতিথিসেবার ব্যবস্থা যাহাতে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে ভারতীয় নরনারীমাত্রেরই মনোযোগ দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। অতিথিসৎকারই এককালে এদেশে একতার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। এক দেশের অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আতিথ্যনিবন্ধন ভিন্নদেশীয় ব্যক্তির মিত্রতা স্থাপন হইত। সাময়িক আতিথ্যের সাদর যত্নে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরস্পরে সাংসারিক, সামাজিক এবং দেশহিতকর সর্ব্ববিধ কার্য্যে পরস্পরকে সহায়তা করিতে পারিতেন। এইরূপে প্রীতি প্রণোদিত হইয়া, পরস্পরে প্রয়োজনমত পরস্পরের সহানুভূতি লাভ করিতেন। প্রাচীন কালে গৃহস্থেরা সমাগত অতিথিকে দেবতা-সদৃশ পরিচর্য্যা করিতেন। অতিথি ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, অথবা শূদ্র হউন, কেহই জাতিধর্ম্ম বিচার করিতেন না। অভ্যাগত অতিথিগণ সেকালে তাঁহাদিগের নিকট নারায়ণ নামে অভিহিত হইতেন; সে বিষয় নিম্ন শ্লোকেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োহতিথিঃ।"

অন্য স্থানে আছে:—

"সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।"

তাঁহারা অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ বিবেচনা করিতেন। নিম্নশ্লোকে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ
প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

কালের আবর্ত্তনে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থগণ এখন অতিথিসেবা হইতে বিরত হইয়াছেন। প্রবাসী ব্যক্তিগণও এখন গৃহস্থদিগের আবাসে আতিথ্যগ্রহণে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। কিন্তু অতি পুরাকালে পথশ্রান্ত প্রবাসী ব্যক্তি অকুণ্ঠিতভাবে গৃহস্থ-আশ্রয়ে অতিথি হইয়া, পরিচর্য্যালাভে শারীরিক যাবতীয় শ্রান্তি দূর করিয়া, অন্তরের অন্তস্তলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন। আমাদিগের পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। কত সসাগরা ধরার অধিপতি মুনি ঋষিগণের পুণ্যাশ্রমে আতিথ্য লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান

করিতেন। আবার কত প্রবাসী মুনি ঋষি ও দীনদরিদ্র ব্যক্তিদিগকে রাজা ও রাজোয়ারাগণ স্বীয় প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। এক্ষণে সে প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। আজকাল পরের কাছে অতিথি হইয়া সেবা যত্ন লাভ করা দূরে থাকুক, আত্মীয় কুটুম্বের আশ্রয়ে একরাত্রি যাপন করিবার মত একটু নির্দ্দিষ্ট স্থান পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিশ্বজনীন সম্মিলন ভাব বিস্মৃত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আতিথেয়তার অভাবেই আমাদের জাতীয় একতার দৃঢ় বন্ধন যে সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এখন আমরা দারুণ অবনতির চরম সীমায় উপনীত। আমাদিগের আর্য্য পিতৃ-মাতৃগণ, অতিথি-সৎকার-ব্রত বিভিন্ন জাতি-সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্বার্থপরায়ণতায় আমরা অতিথি-সৎকার প্রথার নিগূঢ় তথ্য বিস্মৃত হইয়া, উহা হেয়জ্ঞানে পরিহার করিয়াছি। এক্ষণে অতিথি-সৎকারের কথা উত্থাপিত হইলে অনেকেই উল্লেখ করিয়া থাকেন, এই বিষম মহার্ঘতার দিনে অতিথি-সৎকার ব্রত পালন করা অসম্ভব। আর ইহাতে কোনও ফলোদয় হয় না, অনর্থক পরের নিমিত্ত সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। কিন্তু এই দারুণ মহার্ঘতার দিনে তাঁহারা স্ব স্ব বিলাসের নিমিত্ত যে অর্থ বৃথা ব্যয় করেন, সে ব্যয় কত সংক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা অনুধাবনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের অনাবশ্যক বিলাসিতা হেতু যত অর্থ বৃথা অপব্যয় হয়, তদ্দ্বারাই পুনর্ব্বার অতিথি-সৎকার প্রথা পালন করা যাইতে পারে। যদি আমরা প্রত্যেক গৃহস্থ, আপনাপন বিলাসিতার মাত্রা সংযত করিয়া, সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ অতিথি-সৎকারে ব্যয় করি, তাহা হইলে আবার আমাদের জাতীয় একতা পুরাকালের ন্যায় দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে। ভারতীয় নরনারীর সমীপে আমার ঐকান্তিক সানুনয় নিবেদন, যাহাতে সেই পুণ্যময় অতিথি-সৎকার ব্রত পুনরায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলে দৃঢ়সংকল্প হউন।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার-রাজবাটী।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

৬

একদিন দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মী মন্দিরে বসিয়া দেবীপূজায় নিবিষ্ট ছিল, এমন সময়ে লক্ষ্মীর মাতুল রমানাথকে সঙ্গে করিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী তখন ধ্যানমগ্না,—তাঁহাদের আগমন জানিতে পারিল না। মাতুল বলিলেন, "রমানাথ! এই লক্ষ্মী।" মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত পথক্লিষ্ট রমানাথ দেখিল,—কাননের ছায়াস্নিগ্ধ মনোরম স্থানে যৌবনে যোগিনীর ভুবনমোহিনী প্রতিমা—ব্রহ্মচারিণীর পবিত্র অঙ্গ-কান্তিতে প্রফুল্ল মুখকমলে যেন শান্তি ও প্রীতি উছলিয়া পড়িতেছিল, সে লাবণ্যে যেন স্বর্ণের সুষমা ঝরিতেছিল। এই করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি, এই কি রমানাথের অপরিণীতা পত্নী লক্ষ্মী? শ্রান্ত রমানাথ ভগ্নহৃদয়ে মন্দির-সোপানে বসিয়া পড়িল; ভাবিল, "আমার জন্যই লক্ষ্মী আজ যৌবনে যোগিনী, আমিই সাংসারিক ভোগৈশ্বর্য্য হইতে লক্ষ্মীকে বঞ্চিতা—নির্ব্বাসিতা করিলাম।"

মাতুলের আহ্বানে লক্ষ্মীর ধ্যানভঙ্গ হইল। মাতুল বলিলেন, "লক্ষ্মী! এই দেখ, রমানাথ আসিয়াছে, তোমার তপস্যা আজ পূর্ণ হইল। ওঠ মা, আজ আমরা তোমার অতিথি।" অতিমাত্র চমকিত ও বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মী রমানাথের দিকে চাহিল, চারি চক্ষুর মিলনে উভয়ের মর্ম্মস্থল আলোড়িত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া লক্ষ্মী উঠিয়া মাতুল ও রমানাথকে প্রণাম করিল। বহুদিনের তপস্যালব্ধ চির-বাঞ্ছিত অতিথিকে আজ সহসা অভাবনীয়রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের আতিশয্যে লক্ষ্মী আত্মহারা হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র কুটীরে সে সাধ্যানুসারে আপন ইষ্ট দেবতার অতিথি-সৎকার করিল।

শ্রান্তি দূর হইলে লক্ষ্মীর মাতুল ইন্দু-ভূষণের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন নির্জ্জন কাননের নিস্তব্ধতার মধ্যে লক্ষ্মী ও রমানাথের নিভৃত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের হৃদয় কাঁপিতেছিল, উভয়েই বহুযত্নে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া রাখিতেছিল। বহুক্ষণ রমানাথকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল "মাসীমা কেমন আছেন? এতদিনের পর কি আমার কথা তাঁর মনে পড়িল?" সেই স্বর রমানাথের মর্ম্মভেদ করিল। অপরাধী রমানাথ কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে কেমন করিয়া বলিবে যে, লক্ষ্মী তোমার চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া

আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান এবং সে পাষণ্ডের মত আর একটা বিবাহ করিয়া মাতাকে সত্যভ্রষ্ট করিয়াছে। রমানাথের তৎকালীন মানসিক যন্ত্রণা অসহনীয় হইয়া উঠিল। সে অধীরভাবে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে জানাইয়া স্বকৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। শুনিয়া লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখকান্তি ক্ষণেকের জন্য রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গেল। রমানাথ আবার বলিল "লক্ষ্মী! তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে না? আমার দোষ কি ক্ষমা করিবে না লক্ষ্মী?" নিমেষের মধ্যে আত্মসংযম করিয়া মধুর হাস্যের সহিত লক্ষ্মী উত্তর করিল, "মাতৃ-আজ্ঞায় আমি তোমাকে এতদিন পতিরূপে পূজা করিতেছি, আজীবন পতিরূপেই তোমার আরাধনা করিব। তোমার কোনও দোষ গ্রহণের অধিকার আমার নাই, যাহা হইয়াছে, ভবানীর কৃপায় সমস্তই মঙ্গল হইবে। আমার জন্য তোমরা কেহ আর অনুতাপ করিও না। আমি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া পরম সুখে ও আনন্দে আছি, ভোগ-বিলাসের সাধ এখন আর আমার কিছুমাত্র নাই। আমি তোমার সহিত যাইব, আমার স্নেহময়ী মাসীকে একবার জন্মের মত শেষ দর্শন করিয়া আসিব।" লক্ষ্মীর মধুর স্বরে রমানাথের ক্ষত হৃদয়ে যেন অমৃতবর্ষণ হইল। দুর্ভাগ্য রমানাথ ভাবিল, হায়! দুই বৎসর আগে কেন লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম না?

রত্নালঙ্কারভূষিতা, বিলাসচাঞ্চল্যময়ী সুন্দরী হেমলতার মোহিনী প্রতিমা ঢাকিয়া, ক্ষণকালের জন্য রমানাথের মনোমন্দিরে ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মীর শান্তিময়ী, করুণাময়ী মূর্ত্তি দেবীমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেই দিনই সন্ধ্যাকালে রমানাথ লক্ষ্মী ও তাহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

৭

বাসন্তীর আর জীবনের আশা নাই, তারিণী বাবু যথাসাধ্য পত্নীর চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু দুঃসাধ্য প্রাণান্তক ব্যাধি কিছুতেই উপশমিত হইল না। কেবল লক্ষ্মী ও রমানাথকে দেখিবার আশায় এখনও বাসন্তীর দেহে প্রাণ আছে। সর্ব্বক্ষণ বাসন্তী জ্ঞানে অজ্ঞানে, জাগ্রতে স্বপনে লক্ষ্মীর নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। তারপর যখন লক্ষ্মী ও রমানাথ আসিয়া মুমূর্ষু বাসন্তীর চরণপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, তখন বাসন্তী বহুক্ষণ নির্নিমেষলোচনে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অশ্রুপূর্ণনয়নে আর্দ্রকণ্ঠে রমানাথ কহিল "মা! এই তোমার লক্ষ্মীকে আনিয়াছি, আর কিরূপে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, বল মা?" বাসন্তী ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিয়া পুত্রকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর অতি আদরে অতি স্নেহভরে লক্ষ্মীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "এস মা, আমার

গৃহলক্ষ্মী! তোমার অভাবে আমার সোণার সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল। ঘাতকিনী আমি, সরলা বালিকা তোমার পবিত্র জীবনের সকল সুখ সাধ হরণ করিয়া তোমাকে যৌবনে যোগিনী সাজাইলাম, মরণেও মা! আমি এ অনুতাপ-যাতনা হইতে মুক্তি পাইব না। তুমি আমায় ক্ষমা কর, মা লক্ষ্মী! নহিলে অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলিয়া মরিব, আমি সত্য পালন করিতে পারিলাম না।" কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মী বলিল, "মাসীমা, অমন কথা বলিও না। তুমি পুণ্যবতী, ভগবান্ তোমার আত্মার শান্তি বিধান করিবেন। আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, মাসীমা! তোমার কৃপায় আমি মুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, সংসারের ভোগে আর আমার কিছুমাত্র আসক্তি নাই, আমি অতুল আনন্দে কাল কাটাইতেছি; তুমি শান্ত হও, আশীর্ব্বাদ কর, এইরূপ শান্তিতেই যেন আমি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।" বাসন্তীর কোটরপ্রবিষ্ট নয়ন হইতে দরদর ধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল, তিনি অতিকষ্টে একবার উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে রমানাথের হস্তে লক্ষ্মীর হস্ত প্রদান করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন "বাবা রমানাথ! লক্ষ্মীকে আমি তোমার হস্তে প্রদান করিলাম, আজীবন তুমি এই সুবর্ণ প্রতিমাকে সমাদরে রাখিয়া মাতার অন্তিম অনুরোধ পালন করিও।" তারপর বাসন্তী স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "তোমার বিনা অনুমতিতে আজ আমি লক্ষ্মীর সহিত রমানাথের বিবাহ দিয়া সত্যপালন করিলাম, দেবতা! এই মৃত্যুকালে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, নহিলে দাসীর গতি হইবে না।" সাধ্বী ভার্য্যার অন্তিমের কাতর প্রার্থনা নিষ্ঠুর গম্ভীরপ্রকৃতি তারিণী বাবুকে বিচলিত করিল। তিনি এখন বুঝিয়াছেন, পত্নীর জীবনব্যাপী বিষাদ ব্যাকুলতার হেতু তিনিই, তাঁহারই নিষ্ঠুরতার ফলে আজ বাসন্তীর জীবনসংশয়। প্রবল অনুতাপে তারিণী বাবুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে আবার বাসন্তী বলিলেন, "আমার যাহা কিছু ধন ও অলঙ্কারাদি আছে, সমস্তই লক্ষ্মীকে দিলাম; মা লক্ষ্মী! তুমি আমার রমানাথকে ক্ষমা করিও, আশীর্ব্বাদ করি উভয়ে সুখী হও।" লক্ষ্মী ও রমানাথ একত্র মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন।

তারিণী বাবু পত্নীর সন্তোষের নিমিত্ত সেই দিনই গোধূলীলগ্নে লক্ষ্মী ও রমানাথের যথাশাস্ত্র বিবাহ দিলেন। সেই দিনই নিশীথরাত্রে বাসন্তীর পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গেল।

তারপর লক্ষ্মী মাতুল সমভিব্যাহারে আপনার শান্তিকুটীরে ফিরিয়া গেল। তাহার ধনসম্পদের স্পৃহা নাই। লক্ষ্মী বাসন্তীর প্রদত্ত সমস্ত ধন ও অলঙ্কারাদি হেমলতাকে দান করিয়া গেল।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

কাল।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল জীবই কালের অধীন হইয়া সংসারের ধর্ম্ম রক্ষণ ও পরিচালন করিতেছে। এই ধর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং জীবের জন্মকাল হইতেই আরব্ধ।

কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে এই কালরূপী মহা রাক্ষসের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য ও ভীত হই।

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব বনবাসকালে যম কর্ত্তৃক অনেকগুলি প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কি?' ইহাও ছিল। প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বপ্রাণ-সংহারক মৃত্যুকে লোকে দেখে না, ইহাই আশ্চর্য্য বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

এই মৃত্যুই এই রমণীয় জগতের অসারতা ও নশ্বরতা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়, আমাদের অন্তস্তলের সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন পৃথিবীতে ছিন্ন করে ও শোকের বিষাদময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তি ঘোরতর আকারে চিত্রিত করে। মৃত্যুর অনিবার্য্যশক্তি দেখিলে যতই পাষাণ হৃদয় হউক না কেন, ভীত ও বিকম্পিত হইয়া উঠে। পরম জ্ঞানীর চক্ষেও মৃত্যু বিরহ-অশ্রুকণা প্রকটিত করে। মৃত্যুর করাল কবল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সময়ে অসময়ে, স্থানে, অস্থানে ইহার সর্ব্বত্র গতি। জগতে যদি মৃত্যুর আধিপত্য না থাকিত, তবে রোগ-শোক-জরাক্লিষ্টের শান্তি কোথায় হইত? তাই বুঝি বিধাতা সর্ব্ববিধ্বংসকারী মহাকালকে অবনীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

কিন্তু আমরাত মৃত্যুর ছায়াকে মহা অমঙ্গলকারী জ্ঞান করি। যখন অকালে মাতার ক্রোড় হইতে পুত্র, পত্নীর হৃদয় হইতে স্বামী, ভগিনীর প্রাণ হইতে ভ্রাতা, সন্তানের স্নেহ হইতে পিতা মাতাকে বিচ্যুত করিয়া অকালে তাহাদিগকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করেন, তখন কায়মনোবাক্যে এই মহা ভীষণ মৃত্যুর উচ্ছেদ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রিয়জনের বিয়োগে আমরা সৃষ্টির কঠোর নিয়ম সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু বিধাতার নিয়ম অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয়। মানবচিত্ত স্বার্থপর—মায়াশীল। নিজের শরীর মন ও আত্মার তুষ্টি পুষ্টি সাধন ইহার উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে থাকি আর স্বর্গেই যাই, আপন সুখসাধন জীবের প্রধান কার্য্য। দান ধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় স্বীয় সুখের জন্য। ভগবানে চিত্তার্পণ—তাহাও স্বকীয় মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য। তাই জগতে আপনাকে লইয়া এত সুখ ও দুঃখ, এত হাহাকার। যে বস্তুটি লইয়া আমার সুখ, তাহার অভাবেই পীড়া। সেই জন্য সংসারে বিধাতা মায়াবন্ধন

গ্রথিত করিয়া একজনকে অপরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, এই মায়াই সুখ দুঃখের সহচরী। "কাল" যখন আসিয়া জীবের প্রতি কটাক্ষ করে, মায়া স্বীয় সুকুমার অঞ্চলে তাহাকে আচ্ছাদিত করিতে চায়।

আমরা নিশ্চিত, নিরুপায় ও ধ্রুব সত্য জানিয়া এত আকুল হই কেন? মরমের অন্তস্তল হইতে বেগে প্রবাহ ছুটিতে থাকে, জ্বালাময় অন্তর্দ্দাহ কোটি কোটি শিখা প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সৃষ্টির বিধান গ্রাহ্য করিতে সমর্থ হই না, বিধাতাকেও চিনিতে পারি না। তাই কালের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি এত নিদারুণ দেখি। যদি মানবের অন্তঃকরণ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্যের অখণ্ড প্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, তাহা হইলে আর কালের গতি বলিয়া পরিতাপ ঘটে না—প্রভুর আজ্ঞা বলিয়া শোক করিবার কারণ থাকে না। কিন্তু মায়া আসিয়া মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া ভুলাইয়া দেয়। তাই আমরা অন্ধ ও অজ্ঞান হইয়া তাহা দ্বারা পরিচালিত হই। কালের গতিবিধি কেহই নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তাহার প্রভাবই কেবল পরিলক্ষিত হয়।

নিরাকার হস্তপদবিহীন কাল অলক্ষ্যে আসিয়া বিরলে বিরলে আপনার কার্য্য করে। মর্ম্মে মর্ম্মে মানব সেই গুপ্তাঘাত ভোগ করেন। সে ব্যথা নয়নের দৃশ্য নহে, বাক্যেরও বর্ণনীয় নহে; শুধু মানস ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয়। আর দুঃখের বেদনা কেবল অশ্রুজল হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করে। কালের আঘাত কালেই মন্দীভূত হয়, তথাপি এককালে নির্ম্মূল হয় না। সেই ঘোরকৃষ্ণময়ী রেখা চিতাশয্যায় চিতাবহ্নির সহিত দগ্ধ হইয়া ধূমরূপে গগনমণ্ডলে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত থাকে। ইহার ঔষধ মায়ার ভাণ্ডার এ সংসারে নাই। তবে যদি আমরা ইহলোকের দৃশ্যবস্তুর জ্ঞান ছাড়িয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে শান্তির শীতল ছায়া দূরে প্রতিভাসিত হইবে।

আষাঢ়ের চাঁদ।

কেন গো বিষাদে লুকায়ে বদন
রয়েছে চন্দ্রমা! নীরদ-মাঝ?
মধুর আননে নাহিক সে হাসি,
বল কি বেদনা হৃদয়ে আজ?

নয়ন আসারে তিতিছে বসুধা,
ভ্রমিছ আঁধারে মলিন বেশে।
প্রেম-পাগলিনী কুমুদিনী পানে,
কেন না চাহিছ মধুর হেসে?

কোথা সে তোমার কৌমুদী বসন?
নক্ষত্রভূষিত সুন্দর মুখ?
কোথায় লুকাল সে চারু সুষমা!
হেরিয়ে তোমারে বিদরে বুক।

বিপদে তোমায় কেহ না সম্ভাষে,
চকোর চকোরী নাহিক পাশে।
উদাস পরাণে ভ্রমিছ একাকী।
সম্পদে সবাই নিকটে আসে।

বুঝেছি বুঝেছি নিয়তি-পীড়নে,
চিরস্থায়ী কোথা নাহিক সুখ।
আজি যেই রাজা—কাল সে ভিখারী,
তাইত তোমার এতেক দুখ।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।



উপরে কিসের ছবি দেখিতেছ? একটা প্রকাণ্ড গরুকে দুইজন বলবান্ পুরুষ শিং ও লেজ ধরিয়া দুই বিপরীত দিকে এমন জোরে টানিয়া ধরিয়াছে যে,

তাহার নড়িবার চড়িবার সাধ্য নাই। আর এক ব্যক্তি এক প্রকাণ্ড পাত্র লইয়া ঐ গরুর দুগ্ধ দোহনে নিযুক্ত। সে এমন কসিয়া দুহিতেছে যে, সব শুষিয়া লইবে, ছিটা ফোঁটা দুধও রাখিবে না। দুধ সকলি তাহার প্রাপ্য, বলবান্ দুইটি লোক গাভীর অধিকারী হইয়াও দুগ্ধদোহনের সাহায্য করিতেছে। এই দোহনে গাভী ক্রমে শীর্ণ ও মৃত হইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে দোহনকর্ত্তার কোনও ক্ষতি নাই, সাহায্যকারিদ্বয়েরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। কিন্তু তাহারা দুইজন পরস্পরের প্রতি রাগান্ধ, এইজন্য আপনাদিগের হিতাহিত বুঝিতে পারিতেছে না। যখন গরুটী নিতান্ত রক্তহীন হইয়া মুমূর্ষু হইবে, তখন তাহাদের চৈতন্য হইবে, কিন্তু তখন গরুকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না।

পাঠকপাঠিকাগণ! এই চিত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কি বুঝিয়াছেন? একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন। গাভীটীর অর্থ দুই ভ্রাতার পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি। ইহা লইয়া তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা আদালতের শরণাপন্ন। উভয়েরই জিদ্ পরস্পরকে হারাইবে। এক বুদ্ধিমান্ এটর্নী এই সুযোগ পাইয়া উভয়কে খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিতে বলিতেছেন এবং নিজে যথেষ্ট ফি (fee) আদায় করিয়া লইতেছেন। সম্পত্তির অধিকারীরা যত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মকর্দ্দমা চালাইতেছেন, এটর্নী ততই সম্পত্তি দোহন করিয়া অর্থ শোষণ করিতেছেন। অবশেষে মকর্দ্দমা-খরচেই ধনী দুই ভ্রাতা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, এটর্নীর পেট ভরিল। ইহারা আপোষে বিবাদের মীমাংসা করিলে এবং ভাই বলিয়া পরস্পরের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে এ দুর্গতি ঘটিত না—তাঁহাদের সম্পত্তি বজায় থাকিত এবং পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবও রক্ষা পাইত।

আদালতের মোহজালে পড়িয়া কত বনিদি রাজসংসারও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মকর্দ্দমাপ্রিয় ধনিগণ ইহা হইতে যেন বিশেষ শিক্ষালাভ করেন।

বঙ্গ মহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

(৫২৬ সংখ্যা—৫৯ পৃষ্ঠার পর)।

আমাদের সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান্ পাহাড়ী ছিল, রাত্রির অবস্থানের উপযুক্ত একটী স্থান দেখিবার জন্য তাহাকেই অগ্রে পাঠান গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমরা ক্রমেই ঘোর দুর্গম পথে প্রবেশ করিলাম। পথ বলা যাইতে পারে, এমন

কিছুই নাই। বর্ষার জলে ধৌত হইতে হইতে স্থানে স্থানে গভীর গর্ত্ত হইয়াছে। কখন তাহাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূল অবলম্বনে উপরে উঠিতেছি। স্থানে স্থানে ভীমকায় বৃক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা কখনও লম্ফ দিয়া, কখনও নীচের সুড়ঙ্গের পথে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছি। কাপড় জুতা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে। সহযাত্রী একটী মহিলা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কোন মতেই চলিতে পারেন না। তাঁহার সঙ্গে ৩ জন যাত্রী পশ্চাতে রহিলেন। ৩ টী মহিলা পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছেন। আমি ডাণ্ডি-ওয়ালা-গুলিকে লইয়া সেই বনপথে চলিতেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে চলিতে পারিলাম না। তাহারা অনেক আগে চলিয়া গেল। কত ডাকিয়া উত্তর পাই না। সেই নিবিড় জঙ্গলে আমি একাকিনী জঙ্গল ভেদ করিয়া দক্ষিণে কি বামে অগ্রসর হইব জানি না। এখন গৃহে বসিয়া সেই অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে কম্পিত হইতেছি, কিন্তু তখন মনে এমন এক অপূর্ব্ব সাহস জন্মিয়াছিল যে, তাহার বলে এই প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচলিত হইয়া পড়ি নাই। দিবসেও যে দুর্গম পথে চলা ভার, রাত্রির অন্ধকারে সে পথে কি কষ্টে একা চলিতেছি, তাহা বর্ণনীয় নহে। একটু শব্দ শুনিলেই আশঙ্কা হয় যে, হয় ত বা ভালুক আসিতেছে। ভালুকের দৌরাত্ম্যের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম, তাই ভালুকের কথা মনে পড়িতেছিল। ২।৩ মাইল এই ভাবে চলিতে চলিতে অগ্রগামী মহিলাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যেন মৃতদেহে জীবন পাইলাম। রাত্রিটা এই ঘোর জঙ্গলে বন্যজন্তুদের সহিত কাটাইতে হইবে ভাবিতেছি। পথশ্রমে এতই ক্লান্ত যে, আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, তথাপি সহযাত্রী মহিলাদের আশাজনক কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম, ঘোর অন্ধকারে কোথায় যাইয়া পড়িব, ঠিক্ নাই। হঠাৎ দূরের আলোক দৃষ্টে প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল। আমাদের লোকেরাই যে বুদ্ধি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিতেছে, তাহাতে বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। পশ্চাতের যাত্রীদের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম। একটী লণ্ঠন দিয়া ৩ জন লোককে তাঁহাদের অনুসন্ধানে পাঠান গেল। এদিকে আলো হস্তে লইয়া আমরাও অগ্রসর হইতেছি। সম্মুখে একটু সমতল ভূমি দেখিয়া তথায় রাত্রি কাটাইব স্থির করিয়া কম্বল পাতিয়া বসিলাম। সহযাত্রী মহিলাগণ তখনও আশ্রয়স্থান পাইবার আশা ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা কতকদূর যাইয়াই আমাকে আহ্বান করিলেন। এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উঠিতে ইচ্ছা হয় না; তথাপি অগ্রসর হইলাম। একটী ভুটীয়া রমণী সহাস্য মুখে হাত বাড়াইয়া অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে তাহার বাঁশের কুটীরে লইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত আতিথ্যলাভ করিয়া অবাক্ হইলাম। গৃহখানি কেবল বাঁশে গঠিত, অধিকাংশ স্থান শস্যে পূর্ণ। বসিতে

স্থান পাইয়া যে আরাম বোধ হইল, বলিবার নহে। এখন পশ্চাদ্বর্ত্তী সহযাত্রীদের জন্যই যত চিন্তা হইতেছে। প্রায় এক-ঘণ্টার পর সকলেই নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিলেন। দীর্ঘকাল পরে আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎলাভে যত না আনন্দ জন্মে, ৯ জন সহযাত্রী একত্রিত হইয়া তদপেক্ষা আনন্দিত হইলাম। এত ক্লান্তির মধ্যে আহার-চিন্তা আসিল না। শয়নের একটু স্থান পাইলেই কৃতার্থ হই। আশ্রয়দায়িনী ভুটীয়া নারী আমাদিগকে সুখী করিতে কত ব্যস্ত! মুখ ধুইবার জল ঢালিয়া দিতেছে। আহারের কথা বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছে, যেন আমরা কুটুম্বভাবে আসিয়াছি। আমরা প্রথমে আহারের অনিচ্ছা জানাইলাম, সে কিছুতেই ছাড়িবে না। অবশেষে ৬ সের আলু সিদ্ধ ও ৩ সের চমরী গরুর দুধ আনিয়া দিল। সঙ্গে কিছু মাখন সম্বল ছিল, তাহার সাহায্যে সেই সিদ্ধ আলু যে তৃপ্তির সহিত আহার করা গেল, বর্ণনা করিতে পারি না—রাজভোগেও এত তৃপ্তি হয় না। এখন শয়নের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইলাম। একখানা কম্বল ঝুলাইয়া কুটীরের সেই সঙ্কীর্ণ স্থান দুই ভাগ করা গেল এক অংশে পুরুষগণ ও অন্য অংশে আমরা ৬টী মহিলা আশ্রয় লইলাম। পথের কথা বলিতে বলিতে আমাদের মধ্যে হাসির লহরী উঠিল। আজ জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। যে নূতন অবস্থায় পড়িয়াছি তাহা চিন্তা করিতে করিতে একবারও নিদ্রা আসিল না। কলিকাতার পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী হিমালয়ের ঘোর জঙ্গলে ভুটীয়া-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব, কল্পনাতেও ভাবিতে পারি নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এই প্রতিকূল অবস্থাতেও মন নির্জ্জীব হইয়া পড়ে নাই, বরং নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

নূতন সংবাদ।

১। অজিত সিং অমৃতসরে লুক্কায়িত ছিলেন, ধরা পড়িয়াছেন। তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হইয়াছে।

২। জাপানে টোকিও শিল্পপ্রদর্শনী মহা সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। দর্শনী ফি দশ পয়সা মাত্র। প্রতিদিন ৫০ সহস্র দর্শকের সমাগম হইতেছে।

৩। বিলাত-ভ্রমণকারী বিকানীর ও আলোয়ারের মহারাজা এবং গণ্ডোলের ঠাকুর ইণ্ডিয়া আফিসে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

৪। বিগত ১৯ শে জুন রাত্রিকালে বরিশালে ভীষণ বাত্যা হইয়া গিয়াছে। ঝড় অতি প্রবল বেগে বহিয়াছিল এবং প্রায় বার ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ঝড়ের প্রকোপে অনেক বড় বড় গাছ ও বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

৫। মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব চীফ জজ ও অস্থায়ী দেওয়ান টি. আর, এ, শম্ভু সেটী, সি আই ই, মহাশয় ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

৬। বিগত ২৪শে জুন, সোমবার, কলিকাতা সহরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। গাছ পড়িয়া তার কাটিয়া যাওয়াতে কোন কোন রাস্তার ট্রামগাড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বামারচনা।

"কি যেন গো নাই।"

কি যেন গো নাই, এ পরাণ তাই
হয়েছে অধীর প্রায়।
কে যেন গো ছিল, কোথা চলে গেল
করি সব শূনাময়।
যেন কোন সুরে নিকটে কি দূরে
বাজিল মোহন বাঁশী।
নয়ন মেলিতে যেন সে চকিতে
কোথায় গিয়াছে মিশি।
ছায়ার মতন আসিয়া কখন
গিয়াছে না বলে চলি।
তপ্ত লোহা দিয়া যেন মোর হিয়া
কে আজি দিয়াছে জ্বেলে।
কে যেন অজানা দিতেছে বেদনা
প্রাণের মাঝেতে থাকি।
দুদিনের তরে এ হৃদি-মাঝারে
উঠিছিল পিক ডাকি।
নিশাটি পোহাতে অরুণ উদিতে
আমার তরুণ পাখী—
আধ ফোটা ফুল সুবাস অতুল
দিয়ে গেছে মোরে ফাঁকি।
সে যে হেথা নাই' মোর প্রাণ তাই
কাঁদেগো বেদনা-ভরে
ব্যাকুল হৃদয় আজ কোথা ধায়
ধরিতে হৃদয়ে তারে।

শ্রীমতী সন্তোষ-কুমারী দেবী।

প্রার্থনা।

প্রাণপ্রিয় চিদানন্দ হে চিত্ত-বিহারী!
কমল শ্রীপদতল দ্রবিয়া তোমারি—
এসেছে ভারতে এবে যে পূত প্রবাহ।
স্বদেশী ভাবের মহা পূরিত উৎসাহ।
যেন সে ভাবের নব প্রবাহ আবার,
সগর-বংশের ন্যায় করে হে উদ্ধার;
মোহেতে পতিত সব ভারত-সন্তানে,
প্রক্ষালিয়া মোহ-মসী নবশক্তি দানে।
প্রণমি চরণে নাথ! করি এ প্রার্থনা,
দয়া করে পূর্ণ কর দাসীর কামনা।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

আমরা গভীর-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকাদিগকে অবগত করিতেছি যে, যিনি প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন, বিগত ৪ঠা আষাঢ় (১৯ শে জুন) রাত্রি ১০ ঘটিকার পর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সেবা করিতে নিজের ক্লেশ, রোগ, পারিবারিক বিপদ ও শোক অগ্রাহ্য করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহার প্রিয় বামাবোধিনীর কল্যাণ অন্বেষণ করিতেন। অদ্য আমরা তাঁহার অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছি। সে অভাব কেহ পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক নাই। বামাবোধিনী তাঁহার মানস-কন্যা ছিলেন, এখন তিনি পিতৃহীনা হইলেন।

পাঠকপাঠিকারা আছেন, লেখক-লেখিকারা আছেন, কিন্তু সেরূপ যত্ন করিবে কে? সেই অধ্যবসায়, সেই অকৃত্রিম অনুরাগ কোথায়? স্ত্রীজাতির উন্নতি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। যখন এদেশে একখানিও স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা ছিল না, তখন তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় ১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস হইতে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার এই মহতী কীর্ত্তি ভগবান্ আপনি রক্ষা করিবেন, কিন্তু এক জনের অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইবে না।

স্ত্রী-জাতির উন্নতির জন্য প্রথমে তিনি অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত করেন। পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হইত। যে সকল অন্তঃপুরবাসিনীরা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসরান্তে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত এবং যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইত। আমাদের অনেকের গৃহিণীরা ঐ পরীক্ষা দিতেন এবং পুরস্কার লাভ করিতেন।

যেমন স্ত্রীশিক্ষা তাঁহার জীবনের একটী কার্য্য ছিল, সেইরূপ বালকদিগের শিক্ষার জন্যও তিনি স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসুর সহিত সিটি কলেজ স্থাপন করেন। সেই সময়ে ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয় কলিকাতায় অতি অল্পই ছিল। জীবনের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত তিনি ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান কর্ম্মচারী (Principal) ছিলেন। কিরূপে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে হয়, সিটি কলেজে তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য ছিলেন। বিদ্যাদানই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রথম বয়সে তিনি হিন্দু স্কুল ও স্বদেশস্থ হরিনাভি, নিবাদই স্কুল প্রভৃতিতে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে উমেশচন্দ্র প্রথম বয়স হইতেই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়, উৎসাহ, নির্ভীকতা এবং বিবেকপরায়ণতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত

তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হয়। আমরা ক্রমে সেই সকল প্রকাশ করিব। যখন ধর্ম্মমত লইয়া দেশের জমিদারদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ, তাঁহাদিগকে প্রহার, সমাজগৃহে কালীমূর্ত্তি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করেন। উমেশচন্দ্র অটল পর্ব্বতের ন্যায় সে সকল সহ্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথম হইতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছিলেন, এবং শুনা যায় ঐ সমাজে দীক্ষিতও হইয়াছিলেন। তখন অন্য সমাজ ছিল না। পরে তিনি কেশব-চন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তিনি ঐ সমাজের একজন অধ্যবসায়ী সভ্য এবং তৎ-কালীন সঙ্গত সভার সম্পাদক ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের পর তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং শেষ জীবন ঐ সমাজস্থাপনাবধি তাহারই সেবায় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার অভাব পূরণ করিবার লোক নাই। সকল বিভাগেই তিনি হৃদয়ের গভীর উৎসাহে কার্য্য করিতেন। তিনি আচার্য্য, কার্য্যনির্ব্বাহক ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য এবং সাধনাশ্রমের সেবক ছিলেন। তাঁহার যত্নে সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল।

মূক-বধির বিদ্যালয়ের তিনি জন্মদাতা। প্রথমে সামান্য সূত্রে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশেষে রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের সহায়তায় এখন তাহার অবস্থা সুন্দর এবং তাহার গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলিকাতা ও স্বীয় জন্মভূমির অনেক হিতকর কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখী দরিদ্রদিগের জন্য অনাথবন্ধু ভাণ্ডার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইবহুগুণসম্পন্ন পুণ্যাত্মা বৃহৎ পরিবার রাখিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার পুণ্যের পুরস্কারলাভার্থে অমরধামে যাত্রা করিয়া-ছেন। সেখানে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও স্নেহ-ভাজন কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার শোক-সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে তদীয় শীতলাশ্রয় প্রদান করুন।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৪র্থী শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে পঠিত।

আজ আমাদের পরমপূজনীয় স্নেহময় পিতৃদেব চারি দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া পিতার পিতা পরম পিতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা মাতৃ-পিতৃহীনা অনাথা; এ সংসার এখন আমাদের নিকট ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখন আমরা কোন্ পথে যাইব, কিরূপ ভাবে জীবন-পথে চলিব, কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না যে এত শীঘ্র আমাদের ভাগ্যাকাশ এরূপ ঘোর অন্ধকার-মেঘে আবৃত হইবে। পিতার স্নেহ-ক্রোড়ে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইতে-ছিলাম। তিনি কত দিন আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য বলিয়াছেন "আমার শেষ হইয়া আসিল, আমি চলিলাম। আমার ডাক পড়িয়াছে।" এরূপ কথা প্রায়ই তাঁহার মুখ হইতে শুনিতাম, কিন্তু আমরা কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারি নাই। আজও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না যে, পিতা আমাদের ছাড়িয়া চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছেন। মনে হইতেছে যেন তিনি কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন, আবার আসিবেন। তাঁহার সেই স্নেহ-মাখা মধুর ডাক আবার শুনিব, আবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিব, তাঁহার মুখের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিব। অহো! আর এ জীবনে তাঁহার দেখা পাইব না, ভাবিতে গেলে হৃদয় যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রেমময়! দয়াময়! চিরদিন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। আমরা যেন পিতার আদর্শ জীবন ধারণ করিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া, তাঁহার মনের মত হইয়া, প্রেমময়! তোমার প্রদত্ত এই জীবন-পথে চলিতে পারি। তুমি আজিকার এই পবিত্র দিনে আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। এখন তোমার আশীর্ব্বাদ ও আমাদের পরমপূজনীয় পিতা, মাতা ও পিতৃপুরুষদের আশীর্ব্বাদই এ ভগ্ন হৃদয়ের ও অন্ধকারময় জীবনের এক মাত্র ভরসা। আজিকার এই দিনে পিতার বিশেষ বিশেষ গুণের কথা আলোচনা করিয়া, তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আমাদের জীবনকে যেন ধন্য করিতে পারি। তিনি জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রশংসা শুনিলে দুঃখিত হইতেন, তাঁহার লজ্জা বোধ হইত। কিন্তু আজ আর তিনি এ পৃথিবীতে নাই, সুতরাং তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া দুঃখিত বা লজ্জিত হইবেন না। আজ এই মনে করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আপনাদের জীবনকে ধন্য করিব।

পিতা ১০ বৎসর বয়সের সময় পিতৃহীন হন। অভিভাবক আর কেহ ছিল না। তাঁহার বিধবা মাতা ও ঠাকুরমাতাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অপেক্ষা ২৷৷০ বৎসরের বড় ছিলেন। পিতার তিন সহোদর ও দুই ভগ্নী। ভগ্নীগুলি অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করেন। বাবা প্রথমে দেশের পাঠশালায় পড়িতেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিলে ঠাকুর মা গায়ের দোলায়ে মুড়ি বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইতেন, সেই মুড়িগুলিই প্রাতঃকালের

জলযোগ। ঠাকুর দাদা তাঁহাদের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সামান্য নায়েবীর কার্য্য করিতেন, বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য ছিল, যাহা পাইতেন তাহাদিগকে খাওয়াতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই অল্প আয়ের মধ্যেও তিনি তিনটী পুত্রের জন্য তিন খানি চক লইয়া যাহাতে তাহাদের খাওয়া ও পরা চলে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান। সেই আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আমার ঠাকুর মা তিনটী পুত্রকে প্রতিপালন করেন। বাবার নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুর মার অতিথিসেবার প্রতি এরূপ ভক্তি ছিল যে, অনেক দিন এরূপ ঘটিয়াছে, ঠাকুর মা খাইতে বসিবেন এমন সময় এক জন আসিয়া পড়িল, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নিজের মুখের ভাত অতিথিকে দিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ঘরে এমন আর কিছু নাই যে সেদিন খান, একটু গুড় মুখে দিয়া দিন কাটাইয়া দিলেন। এরূপ প্রায়ই ঘটিত; কারণ আমাদের পৈতৃক বাসস্থান গঙ্গার নিকটে ছিল, অনেক দূর দেশ হইতে লোকে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া থাকিত। তাহাদের আহার করান, রোগীর তত্ত্বাবধান করা ঠাকুরমার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। পিতা তাঁহার মাতার নিকট হইতে এই সকল গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

পিতা দেশের বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং পরে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া বৃত্তি পান। সেই বৃত্তির টাকা লইয়া তিনি এফ, এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি নিজে রন্ধন করিয়া খাইয়া ও ২।৪ জন আত্মীয়কে খাওয়াইয়া স্কুলে যাইতেন। তাঁহার উপর প্রাইভেট টুইসনিও ছিল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিতেন, আসিয়া রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া পড়িতে বসিতেন। শুনিয়াছি, সেই বাড়ীর উপর তলায় যত সব অসৎ লোক থাকিত, তাহারা রাত্রে এরূপ উৎপাত করিত যে, সেখানে এক মুহূর্ত্ত থাকা যেন অসম্ভব মনে হইত। সেই বাড়ীর একতলার একটী ঘরে বাবা পড়িতে বসিতেন, সেই সময়ই উহারা উৎপাত আরম্ভ করিত। বাবা ভাবিতেন এরূপ করিয়া তিনি কখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। যখন তিনি দেশে যাইতেন, তখন তাঁহার উপর বাড়ীর কার্য্য এত পড়িত যে, এক পাতা পড়িতেও তিনি সময় পাইতেন না। এদিকে এরূপ, ওদিকে সংসারের সকল খরচ বাবাকে দিতে হইত। আত্মীয় স্বজন যখন শুনিলেন, বাবা বৃত্তি পাইতেছেন, চাকরি করিতেছেন, একে একে সকলে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। এইরূপে বহু দূর সম্পর্কের কত লোক আসিয়া জুটিল। ঠাকুর মা কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। তাহারা থাকিয়াই গেল।

এফ এ, পাশ করিয়া বাবা ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পড়িয়া ডাক্তারি ছাড়িয়া দেন। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। শুনিয়াছি, অক্ষয় বাবুর লেখাই তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে আকর্ষণ করে। ২৫ বৎসর বয়সের সময় পিতার বিবাহ হয়। তখন প্রথম ব্রাহ্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতেছে। বাবা স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হইবে। তখন এরূপ কোন নিয়ম পদ্ধতি হয় নাই, ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। মার বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এই বিবাহ দেন।

বি, এ পাশের পর হিন্দু স্কুলে বাবার প্রথম কাজ হয়। পরে নিবারধই ও অন্যান্য স্থানে কার্য্য করেন। এ সকলের মধ্যে হরিনাভিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাভি ইংরাজি বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সিটি স্কুল ও মুক-বধির-বিদ্যালয়ও তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যও তিনি অনেক করিয়াছেন। এখানে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে দিন শেষ হইয়া যাইবে। সেই জন্য সংক্ষেপে তাঁহার বিষয় কিছু বলিব।

পিতার মনের বল অসাধারণ ছিল। প্রথম যখন তিনি ব্রাহ্ম হন, দেশের লোক সকলে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে, এমন কি দেশের জমিদারেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে শাস্তি দিবার (জব্দ করিবার) জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। শুনিয়াছি, বাবার ঠাকুর মা যখন মারা যান, তখন জমি-দারেরা ও অন্যান্য সকলে দোকানদারদের নিষেধ করিয়া দেন যে, কেহ যেন তাঁহাদের কাঠ বিক্রয় না করে ও তাঁহাদের বাড়ী না যায়। বাবা বলিয়া-ছিলেন যে, তিনি সমস্ত দোকান ঘুরিয়া-ছিলেন, কেহ কাঠ দিল না; রাত্রি হইয়া গেল, একটা লোক, কি কাঠ কিছুই পাইলেন না। তখন তাঁহার জেঠা মহাশয় অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি দেশের লোক আমাদের জব্দ করিবে? আচ্ছা দেখি কিরূপে তাহারা আমাদের উদ্দেশ্য নষ্ট করে!" এই বলিয়া তিনি একখানি কুঠার লইয়া, বাবাকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের বাড়ীর বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে একটা বড় গাছ কাটিয়া আনিয়া ঠাকুরমাকে দাহ করিলেন। তখন সমস্ত দেশের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার পর শ্রাদ্ধের সময়ও অনেকে বাধা দেয় ও গোলযোগ উপস্থিত করে। বাবা শেষে কলিকাতা হইতে উপাসক ও বন্ধুদিগকে লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তাহার পর হরিনাভি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিবার সময় কত কষ্ট যে ভোগ করিয়াছেন, বলা যায় না। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য অতি আশ্চর্য্য ছিল। প্রথমে একটা

ঘরে ব্রহ্মোপাসনার স্থান ঠিক করেন। সেখানে তাঁহার ২।১ টী বন্ধু ও ছাত্রেরা আসিয়া উপাসনায়যোগ দিতেন,ইহা দেখিয়া দেশেরলোকের বড় ভয় হয়। তাহারা এরূপ কার্য্য দেশে যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করে এবং বাবাকেও এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করে। তাহাতেও যখন উহা বন্ধ না হইল, তখন তাহারা ভয় দেখাইতে লাগিল। পিতা পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং এখানকার ২।১ জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক সপ্তাহে উপাসনা করিতে যাইতেন। দেশের লোকেরা দেখিল, দেশ হইতে উঁহাকে তাড়াইয়াও কার্য্য বন্ধ করিতে পারিল না। পরিশেষে একদিন উপাসনা হইতেছে এমন সময় কতকগুলি লোক ভয়ানক গোল মাল করিয়া উপাসনা ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং যে সকল ছাত্র আসিয়া যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে মার পিট করে। পর সপ্তাহে বাবা গিয়া দেখেন উপাসনাগৃহের মধ্যে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহার সেবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানে যে ব্রহ্মোপাসনা হইত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। বাবা ও তাঁহার বন্ধুগণ গিয়া উপাসনা-গৃহের দাবী করাতে, তাহারা অম্লান বদনে বলিল এখানে কোন কালে ব্রাহ্মসমাজ ছিল না, এটা আমাদের চির কালের কালীমন্দির, তোমরা চলিয়া যাও। পরে প্রতিবেশী লোকদিগকে ডাকিয়াও ব্যাপারটী বলা হইল,তাহারাও বলিল আমরা জন্মিয়া অবধি উহা কালীর মন্দির জানি, ওখানে ব্রাহ্মসমাজ কোন কালে ছিল না। পিতা নিরুপায় হইয়া চলিয়া আসিয়া ভাবিতেছেন কি করিবেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল যে, আপনাকে বাবু ডাকিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যত দিন না অন্য কোন স্থলে উপাসনার স্থান ঠিক হয়, তত দিন তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা করিবেন ও এইখানেই আহার করিবেন। বাবা ইহা ভগবানের বিশেষ দয়া মনে করিয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তথায় চলিলেন। তথায় সেই বন্ধু অতি যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপাসনার স্থান করিয়া দিলেন এবং উপাসনান্তে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইলেন। যত দিন অন্য স্থান না পাইলেন, তত দিন সেই স্থানেই উপাসনা চলিল। আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের বিরুদ্ধে থাকিয়া সমাজ উঠাইয়া দেন, শেষে তাঁহারাই আবার ব্রাহ্ম সমাজ নির্ম্মাণের ভূমিদান করেন ও উহা প্রস্তুত করিবার সময় সাহায্য করেন।

পিতা যাহা করিবেন বলিতেন, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। ১২ বৎসর বয়সের সময় তিনি মৎস্য ত্যাগ করেন। একবার তাঁহার ভয়ানক অসুখ হয়, কবিরাজ সিঙ্গিমাছের ঝোল ও ভাত খাইতে বলেন। তাহাতে তিনি কিছুতেই সম্মত হন না। ইহা দেখিয়া ঠাকুর মা লুকাইয়া মাছের ঝোল রাঁধিয়া তাহা ছাঁকিয়া খাওয়াইতে যান। বাবা ভাত মাখিবা মাত্র বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি মাছের ঝোল আমাকে দিয়াছ, আমি ভাত খাইব না। ঠাকুর মা শেষে মিথ্যা কথা কহিলেন; বলিলেন, না মাছের ঝোল নয়, মাছের ঝোল কি এইরূপ হয়। বাবা কিছুতেই তাহা খাইলেন না। তখন পুনরায় নিরামিষ ঝোল করিয়া তাঁহাকে খাওয়ান হয়।

তিনি যে সকল মহৎ কার্য্য করিতেন, তাহা কাহাকেও জানাইতেন না। নিজে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" পিতা নিজের জীবনে ইহা সুন্দররূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি কত শত অপমান সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাহাকেও কখন জানান নাই। তিনি নিজে কখন মান লইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই, কিন্তু অন্যকে সম্মান দিবার জন্য অস্থির হইতেন। সংসারে শোক তাপ দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কখন দুঃখ প্রকাশ কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। যত দিন শরীরে এক বিন্দু শক্তি ছিল, তত দিন তিনি জগতের হিতের জন্য খাটিয়াছেন। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি বামাবোধিনীর কার্য্যের জন্য চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্য তাঁহার ধৈর্য্য! তিনি অসহ্য রোগের যাতনা কখন প্রকাশ করেন নাই, নীরবে সহিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না, ইহা কাহাকেও বলেন নাই। একদিন রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই আমি এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে যখন উপাসনায় আসি, তখন জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে কি তোর ঘুম হয় নাই? আমি আশ্চর্য্য হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম কেন? তখন বলিলেন, তোর কথা শুনিতে পাই, তুই এঘর ওঘর করিস, শব্দ পাই। আমি শুনিয়া ত অবাক্। বলিলাম কেন তোমারও কি রাত্রে ঘুম হয় না? তখন বলিলেন হাঁ আজ দিন কতক হইল রাত্রে ঘুম হয় না, আর বড় গা জ্বালা করে। ইহা শুনিয়া আমরা সকলে বড় চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে একটু বিশ্রাম লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলাম। তখন তিনি বলিলেন "আমার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, যে কটা কাজ করিতে পারি করি।" ক্রমে ক্রমে মাথাঘোরা আরম্ভ হইল। ডাক্তার দেখাইবার জন্য বলা হইল, কিছুতে দেখাইবেন না, অনেক কষ্টে রাজি করিয়া দেখান হইল। কিন্তু ঔষধ খাইতে ইচ্ছা নাই, জোর করিয়া আমরা ওষধ খাওয়াইতাম। এই অবস্থায় তিনি এক দিন সত্য সুন্দর দেবের ফ্যাক্টরিতে উপাসনা করিয়া, না খাইয়া,সেখান হইতে হরিনাভি চলিয়া যান। সকলে নিবারণ করিলাম, কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন "শরীর খারাপ, খাওয়া হয় নাই বলিলে কি হইবে, আজ

কয় সপ্তাহ ধরিয়া আমি সমাজে উপাসনায় যাইতে পারিতেছি না, আজ যাইবই।”

দার্জ্জিলিং যাইবার দিনকতক পূর্ব্বে মাথা ঘোরা ভয়ানক বাড়ে, উপর হইতে নীচে নামিতে কিম্বা দুই এক পা চলিতে গেলেও ঘুরিয়া পড়িতেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি ছিল না। মহলানবিশ মহাশয় মটর গাড়ি চাপা পড়িয়াছেন শুনিয়াই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ঐরূপ অবস্থাতেই হাঁটিয়া গেলেন, গাড়ি আনিতে দিলেন না। তাহার পরও আবার বিবাহের রেজিষ্টারি করেন।

দার্জ্জিলিং গিয়া, তিনি দশ দিন মাত্র তথায় ছিলেন। যখন তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে কাঁদিতে লাগিলাম। সে সময় তাঁহার কথা কহিতেও কষ্ট হইতেছিল, তথাপি তিনি পাড়ার ও বাড়ীর সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সোমবার দিন ১১ টার সময় দার্জ্জিলিং হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। বুধবার রাত্রি ১১ টার সময় তাঁহার নশ্বর দেহ পৃথিবীতে ফেলিয়া অনন্তধামে চলিয়া যান। এ কয় দিন মুখে অন্য কোন কষ্ট প্রকাশ করেন নাই। কেবল খাইতে কষ্ট হইত, বলিতেন। বড় মামা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা করে? তাহাতে বলিয়াছিলেন সেরূপ কিছুই নয়, পাতলা জিনিস যাহা কিছু পার, গলায় ঢালিয়া দিলেই খাইব। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। যখনই ডাকিয়াছি, তখনই চাহিয়া দেখিয়াছেন। সোমবার বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, মঙ্গল বার একটু ভাল ছিলেন, বুধবার সকাল হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং ধীরে ধীরে নীরবে এ পৃথিবী ত্যাগ করিলেন। অনেক মৃত্যু দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কখন দেখি নাই। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে ঠিক যেন মনে হইতে লাগিল, তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার শরীরের এই অসহ্য যন্ত্রণা যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একটু একটু করিয়া মহাযোগী মহাযোগ-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

অহো! বাবা আজ কোথায়! আজ আমাদের গৃহ শূন্য! আজ আমাদের হৃদয় শূন্য! আর আমাদিগকে কে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিবে! দয়াময়! এ সংসার যে মরুভূমির মত বোধ হইতেছে। দয়াময় প্রেমময় পরম পিতা! আজ আমাদের হৃদয়ের অবস্থা, মনের অবস্থা সকলই তুমি জানিতেছ। এই পরীক্ষাপূর্ণ সংসারে তুমি আমাদের সহায় হইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া চল। দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পিতার উপযুক্ত পুত্র কন্যা হইয়া, তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া, আপনাদের জীবন কৃতার্থ করিতে পারি।



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—১২৪৭ সাল ৩রা পৌষ বুধবার কৃষ্ণা নবমী রাত্রি ৮ দণ্ড।

স্বর্গারোহণ—১৩১৪ সাল ৪ঠা আষাঢ় বুধবার শুক্লা নবমী রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিট।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

Registered No. C. 134.

No. 528. August, 1907.

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৮ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৪। আগষ্ট, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১। ধর্ম্মবীর ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত ...	৯৭	৭। প্রয়াণ	১২৩
২। শোকোচ্ছ্বাস	১০৯	৮। ভগিনীর বিলাপ ...	১২৪
৩। তুমি নাই	১১৪	৯। শোক-গাথা	১২৬
৪। শোকোচ্ছ্বাস	১১৬	১০। শোকোচ্ছ্বাস	১২৭
৫। প্রার্থনা	১১৮	১১। নূতন সংবাদ	১২৮
৬। মহিলা স্মৃতি-সভা ...	১২০		

কলিকাতা।

২৯।৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩, টাকা মাত্র।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি বিবিধ জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পর অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, হাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোঁশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শী উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হইবে, অম্লজনিত জ যথা বুক দুড় দুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হই ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৫০, মাশুল ।৵০ আন

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাশির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনা কষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে য গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাশিতে কাশিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ সাঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেট বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাশি, ঘুংড়ী কাশি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাশরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাশ নিয়ত বর্ত্তমান বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাশিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানি থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৷৷০ আনা, মোট ২৲ টাকা

কবিরাজ
শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,
৪নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজ
কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 528. August, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৮ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৪। আগষ্ট, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

ধর্ম্মবীর

৺উমেশচন্দ্র দত্ত।

জন্ম—১২৪৭ সাল, ৩রা পৌষ, কৃষ্ণা নবমী। স্বর্গারোহণ—১৩১৪ সাল, ৪ঠা আষাঢ়, বুধবার, রাত্রি ১০৷৷০টা।

এই দুর্দ্দিনে আজি দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, আমাদের প্রাণে বজ্র হানিয়া, পুণ্য জীবনের অপূর্ব্ব আদর্শ, পুণ্যশ্লোক উমেশচন্দ্র দত্ত অমরধামে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ৺আনন্দমোহনের ও ৺কালীচরণের বিয়োগাশ্রু না থামিতেই একি সর্ব্বনাশ! আজি পূর্ব্ব দুইটীর শোক নবীভূত হইল, এবং তিনের শোকাশ্রু বাঙ্গালার প্রত্যেক নরনারীর নয়ন ও বক্ষ প্লাবিত করিয়া ত্রিবেণীর ন্যায় ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল। পুণ্যশ্লোক উমেশচন্দ্র একাধারে গৃহী ও যোগী ছিলেন। অগ্নিময় সংসারমধ্যে থাকিয়া, আদ্যোপান্ত এমন প্রশান্ত, এমন নির্ম্মল, নিষ্কাম, পুণ্যময় জীবন গৃহিমাত্রেরি শিক্ষার স্থল।

যথায় সৎসঙ্কল্প, সদনুষ্ঠান, সৎপ্রসঙ্গ, তথায় উমেশমূর্ত্তি বিদ্যমান। যেন একই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব অসংখ্য তরঙ্গে সমভাবে দীপ্যমান।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥"

কায়মনোবাক্যে পরপীড়াবর্জ্জন, সকলেরি প্রতি অভিন্ন প্রীতি ও প্রিয়হিতচিকীর্ষা, যথাশক্তি দান,—ইহাই সাধুর সনাতন ধর্ম্ম। আর্য্যের এই শাশ্বত ব্রতে উমেশচন্দ্র আবাল্য দীক্ষিত। তিনি দশ বর্ষ বয়সে পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে আমিষত্যাগী এবং কায়মনোবাক্যে সংযমী। তিনি কর্ত্তব্যপালন-মহাব্রত যাবজ্জীবন অটল-ভাবে পালন করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার দেহ অতিমাত্র অবসন্ন, তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্খলিতপদে গৃহে গৃহে গিয়া

PAGE CONTAINS TWO C

লোকসংগ্রহ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের বার্ষিক স্মৃতিকৃত্য, তাঁহার সমাধিস্থানে গিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কামক্রোধাদি রিপু তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল। ধৈর্য্যচ্যুতির অসংখ্য কারণে পরিবেষ্টিত হইয়াও, প্রফুল্লহৃদয়ে অসংখ্য দৈনিক কার্য্য ধীরে ধীরে সম্পন্ন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। কোনও অবস্থায়, কোনও কারণেই তিনি ধৈর্য্যচ্যুত বা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। কর্ত্তব্যে এরূপ অশ্রান্ত অক্লান্ত পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও অভিনিবিষ্ট, শান্ত, দান্ত, স্বভাবধার্ম্মিক সাধুপুরুষ অল্পই দেখিয়াছি। ঘটনাক্রমে এক দিন তিনি আমার গৃহে রাত্রিযাপন করেন। তাঁহার নৈশ কার্য্য গোপনে দেখিয়াছি। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁহার ভগবৎপ্রসঙ্গ হইল। পরে যৎসামান্য একটু জলযোগ করিয়াই শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাকে শয়ন করিতে বলিয়া, অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য দেখিলাম। তিনি নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে ধ্যানস্থ হইলেন (১), পশ্চাৎ মৃদুস্বরে ভগবানের স্তব ও প্রার্থনা করিয়া, নিদ্রিত হইলেন। রাত্রি ৩টা না বাজিতেই, গাত্রোত্থান করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া, পরে স্তব ও প্রার্থনা করিলেন। পরক্ষণেই (অতি-প্রত্যূষে) পুঁথিপত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। প্রভাতে পরমভক্তিভাবে পুণ্যশ্লোক-গণকে স্মরণ না করিয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, ঈশা, মুষা, নানক, মহম্মদ, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব প্রভৃতি তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বহুতর লোকের আপদে বিপদে, রোগে শোকে সংবাদ লওয়া ও প্রাণপণে সাহায্য করা তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম ছিল। অসংখ্য কার্য্যের প্রত্যেকটীকে সমান গুরুতর জ্ঞান করিতেন, এজন্য একটী কার্য্যেও তাঁহার শৈথিল্য কেহ কখনও লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার দান এত গোপনীয় ছিল যে, গ্রহীতা ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিতে পারিত না।

তাঁহার ধর্ম্মভাব বড় উদার ছিল। ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ হইয়াও, তিনি ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কাহাকেও স্বধর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দেন নাই। বরং বিপদের সময় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মোক্ত শান্তি স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ দিতে শুনিয়াছি।

(১) কলিকাতায় 'রায় মহাশয়' নামে একটী অতিবৃদ্ধ পরমযোগী ছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য জীবনচরিত বলিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। যিনি তাঁহাকে না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রভাবের বিষয় বুঝান যায় না। তেমন সাদা-সিধা, সরল, অটল, নির্ব্বিকার, সদানন্দ সাধু আর দেখি নাই। আমি জানিতাম, উমেশচন্দ্র প্রত্যহ কোনও সময় অতি গোপনে তাঁহার নিকট যাইতেন।

তিনি অন্যের বিপদ শুনিলে নিজের বিপদ বিস্মৃত হইতেন। যে সময় তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা বিভুবালার মৃত্যু হইল, সেই সময় তিনি কোনও বন্ধুর বাটীতে পীড়ার সংবাদ পাইয়াই তথায় উপস্থিত হন এবং চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিয়া ও ভীত পরিবারকে আশ্বাস দিয়া যান। যেন তাঁহার নিজের কোনও বিপদ ঘটে নাই। ধন্য সাধুপুরুষ! দয়াময়কে তুমিই চিনিয়াছিলে।

"শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং
শোকা নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্ব্বং
নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥"

শোক মানবের ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞানকে নষ্ট করে, শোকে সকলি নষ্ট হয়, শোকের সমান শত্রু আর নাই। রাম-যুধিষ্ঠিরাদি দেবচরিত্রেও ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু যে দিন উমেশচন্দ্রের সর্ব্বাবস্থায় অনুকূলা পতিপ্রাণা সাবিত্রীসমানা সতী লক্ষ্মী প্রিয়তমা পত্নী পতির চরণরেণু লইয়া বিদায় গ্রহণ করেন, যে দিন তাঁহার প্রাণাধিকা দুহিতা বিভুবালা বিদায় গ্রহণ করেন, সে দিন সে সময় উমেশচন্দ্রের ধৈর্য্য এবং তাৎকালিক কর্ত্তব্যপালনে ঐকান্তিকতা দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। জানি না বিধাতা তাঁহাকে কি উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন!

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব হি
দুষ্কৃতম্॥"

"আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব
গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।"

এই সনাতন ঋষিবাক্য উমেশচন্দ্রের পুণ্যময় জীবনের মূলমন্ত্র। এই সার সত্য অবলম্বন করিয়া তিনি স্বাবলম্বন, আত্মসংস্কার ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

নিজ বিবেক ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নিকট তিনি সহস্র নিগ্রহ নির্য্যাতনকে তৃণজ্ঞান করিতেন। নিগৃহীত করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে, এমন লোক অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। একদা কোনও ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ অকারণে তাঁহার প্রতি অতি নৃশংস ব্যবহার করে। তিনি নীরবে চলিয়া আসিলেন। কয়েক দিন পরেই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অতি কাতরভাবে বলিলেন, ভাই! যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন। সে ব্যক্তির তখন চৈতন্য হইল, সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও অপরাধ পাইল না। তখন অনুতপ্ত ও পদানত হইয়া সাশ্রুনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মবিদ্বেষীরা তাঁহার উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, প্রত্যুত তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার

পদানত হইয়াছিল। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান; বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিলাম না। "শীলেন সর্ব্বে বশাঃ" চরিত্রের নিকট সকলকেই নত হইতে হয়। উমেশচন্দ্রের সহিত আমার পঞ্চাশ বৎসর ঘনিষ্ঠতা। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও তাঁহার মুখে উচ্চ কথা শুনি নাই, তাঁহাতে কোনও চিত্তবিকারের লক্ষণ লক্ষ্য করি নাই।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিদ্রুতে
প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥

অনিষ্টকারীর প্রতিও যাঁহার নিষ্পাপ ব্যবহার, নিষ্ঠুরভাষীর প্রতিও যাঁহার মধুর সম্ভাষণ, বিশ্বপ্রেমে যাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত, মুক্তি তাঁহার হস্তেই। উমেশচন্দ্র জীবন্মুক্ত।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষার পূর্ণতাই মানবের পূর্ণ শিক্ষা। এ দেশের ছাত্র-জীবন এই ভাবে গঠিত করিবার জন্য তাঁহার অহরহঃ ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। আমার সঙ্গে যখনি দেখা হইত, এই বিষয়ের কথাই অধিকক্ষণ হইত। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সিটিকলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে বহুতর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এবং প্রধানতঃ তাঁহারি প্রবর্ত্তনায় সংকৃত সদ্ভাব, শিক্ষা, আশাবাহিনী মঙ্গলগাথা(১), চাণক্যনীতির অভিনব সংস্করণ, শিক্ষাসার, প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হয়।

কোনও বৃহৎ কার্য্য প্রায়ই সাময়িক ঘটনায় ও তাৎকালিক উত্তেজনায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য, ঐ সকল ঘটনা দ্বারা লোকচিত্তের যথার্থ স্থায়ী ভাব বুঝা যায় না। মানবের প্রকৃত মহত্ত্ব বা হীনতার পরীক্ষাস্থল,—তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য। কোনও ব্যক্তিকে ঠিক্ চিনিতে হইলে, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যগুলির উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। আমি পঞ্চাশবর্ষব্যাপী ঘনিষ্ঠতা দ্বারা উমেশচন্দ্রের অসংখ্য ক্ষুদ্র কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি যথার্থই মহান্। তাঁহার আভ্যন্তরিক সমস্ত বৃত্তিই মঙ্গলময়ের মাঙ্গলিক ভাবে গঠিত ও পরিপুষ্ট। এ বিষয়ে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

কোনো স্ত্রীলোকের তুলসীবৃক্ষ বিনষ্ট হয়। সে প্রত্যহ উহা পূজা করিয়া জল-গ্রহণ করিত। তুলসীবৃক্ষ না পাইলে তাহার আহার হইবে না, ইহা জানিতে পারিয়া, উমেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পদব্রজে বহুদূর গিয়া তাহার জন্য একটী তুলসীবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে আনিয়া তাহাকে দিলেন। কোন হিন্দু এ কার্য্য করিলে বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত না। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ কার্য্য বিশেষ মহত্ত্বের পরিচায়ক। উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে অটলবিশ্বাসী হইয়াও অন্যের ধর্ম্মভাবকে সম্মান ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন, অন্যের মর্ম্মব্যথা স্বয়ং অনুভব করিয়া কার্য্য করিতেন। এমন ব্যথার ব্যথী, উদার সাধুপুরুষ দুর্লভ। আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতাম,—এটী "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্"; কলির কলুষিত নিঃশ্বাস ইহাঁকে স্পর্শ করে নাই। যদি তাঁহাতে কোনো দোষ থাকে, তবে সে তাঁহার অতিমৃদুতা। তাঁহার অতিমৃদুতা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশে সাহসী হইত।

রোগীর পীড়াশান্তির জন্য তিনি রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, বাত, নিজের পীড়া প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। যেরূপে হয় তাহার জন্য ঔষধপথ্যাদি সংগ্রহ করিতেন। তাহার মানসিক শান্তির জন্য পার্শ্বে বসিয়া মধুর ব্রহ্মনাম শুনাইতেন। প্রতি পৌষ মাসে প্রত্যহ রাত্রি থাকিতে উঠিয়া, সহচর সংগ্রহ করিয়া, গৃহে গৃহে তারকব্রহ্মনাম বিতরণ করা তাঁহার জীবনের একটী মহোৎসব ছিল। তিনি ব্রাহ্ম বলিয়া অনেক হিন্দু নিজ বাটীতে ক্রিয়াকলাপে তাঁহাকে আহ্বান করিতে আপত্তি করিতেন না। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এ বিষয়ে যেমন কাহারও মতভেদ নাই, তেমনি উমেশচন্দ্রের সাধুতা বিষয়ে কাহারও মতভেদ দেখি নাই।

তিনি নানাস্থানের অভাবক্লিষ্ট লোকের সংবাদ রাখিতেন। নানা উপায়ে ও বহুকষ্টে অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে গোপনে সাহায্য করিতেন। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বা প্রতিবেশীর হাঁড়ির খপর আমি রাখি না, কিন্তু তাহাদের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়াও, উমেশচন্দ্র তাহাদের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়া আমি কতবার আত্মাকে ধিক্কার দিয়াছি। দক্ষিণ অঞ্চলে মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, মুড়াগাছা, ডায়মণ্ডহার্বার প্রভৃতি স্থানে ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়, উমেশচন্দ্র এবং হরিদাস দত্ত প্রভৃতি মহাত্মারা যাহা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। প্রধানতঃ তাঁহাদের চেষ্টায় অসংখ্য মহাপ্রাণী ভীষণ যন্ত্রণা ও মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহাদের উদ্যোগে "সাহায্য ভাণ্ডার" স্থাপিত হয়।

চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি-গ্রামে এণ্ট্রান্সস্কুলের প্রধানশিক্ষকরূপে তিনি ঐ স্থানে বহুকাল বাস করেন। ঐ সকল স্থানে উন্মার্গগামী যুবকের সংখ্যা অধিক ছিল। উমেশচন্দ্রের ঐকান্তিক যত্নে ঐ সকল স্থানে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার সহবাসে ও উপদেশে অনেকেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছেন। ঐ স্থানের নিরন্ন পরিবারদিগকে সাহায্য

(১) সিটিকলেজ-গৃহে ছাত্রগণকে লইয়া "আশাবাহিনী" নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রজীবনকে প্রকৃত ধর্ম্মভাবে গঠিত করা। ঐ সভায় নিয়মিত দিনে ৺আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র প্রভৃতিকে ও আমাকে গিয়া ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে হইত। সদ্ভাবে দয়া, মৈত্রী, গুরুভক্তি, শৌচ, উদ্যমশীলতা, ব্যসন-বর্জ্জন,—এই কয়টী 'আশাবাহিনী'-সভার সাধনীয় বিষয় ছিল।

করিতে এবং দরিদ্র ছাত্রদিগের বেতন দিতে তাঁহার নিজের বেতনের টাকা প্রায় নিঃশেষ হইত। ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। একদা ঐ প্রদেশে ভীষণ ওলাউঠা মারীভয় উপস্থিত হয়। উমেশচন্দ্র এক সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন (১)। পরে হোমিওপ্যাথি অধ্যয়ন করেন। তিনি সেই মারীভয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স বহন-পূর্ব্বক, অহোরাত্র গৃহে গৃহে রোগীদিগকে ঔষধ দান করিতেন। একদা গভীর রজনীতে ঔষধহস্তে দূরবর্ত্তী রোগীর নিকট যাইতেছিলেন। সমস্ত দিন অশ্রান্ত পরিশ্রমে তখন তাঁহার দেহ নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। চলিতে চলিতে কখন তাঁহার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় যাইতে যাইতে ইটের পাঁজায় পড়িয়া মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই দারুণ আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, রোগীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। পরপ্রাণের জন্য নিজ প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে ভূরি ভূরি।

তিনি অতি শৈশব হইতেই কঠোরতায় ও সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত। স্বাভাবিক ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগ প্রভৃতি গুণে তিনি বিভিন্ন-প্রকৃতি লোকদিগকে লইয়া বহুতর লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণার নিকট সকলকেই বাধ্য হইতে হইত। কার্য্যকরী শক্তির মূল উপাদান—নৈতিক উৎকর্ষ। সে উৎকর্ষে তিনি সুসমৃদ্ধ ছিলেন। "উত্তাপঃ সর্ব্বসিদ্ধীনাং প্রত্যূহঃ প্রথমঃ কিল,"—মনের উত্তাপই সর্ব্বসিদ্ধির প্রধান বিঘ্ন। সে উত্তাপ যাবজ্জীবন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি দশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া কেবল স্বাবলম্বনে শিক্ষিত। বাল্যাবধি বহু কষ্টে ও জননীর কঠোর নিয়মে পালিত ও বর্দ্ধিত বলিয়া অম্লানভাবে সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের বেতনাদি বিষয়ে এবং আহার ও পরিচ্ছদাদি বিষয়ে কিরূপ নিস্পৃহতা ছিল, তাহা সর্ব্বলোকবিদিত। তাঁহার মাতা-পিতা-পিতামহী-সোদর প্রভৃতির প্রতি ব্যবহার সকলের শিক্ষণীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তৎকালে দেশের

(১) ১৮৬০ ও ১৮৬১—এই দুই বৎসর তিনি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনেক শিক্ষালাভ করেন। অনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠের দারুণ পীড়া হয়। জ্যেষ্ঠের শিশুসন্তানগুলির সহিত জ্যেষ্ঠকে কলিকাতায় লইয়া আসায় তাঁহার কষ্টের আতিশয্য এবং পাঠের ব্যাঘাত ঘটিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে মস্তকের ও চক্ষুর পীড়ায় তিনি নিরতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়, তাঁহার জীবিকার উপায় স্কলার্সিপও শেষ হইল। অগত্যা তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ ছাড়িতে হইল।

লোকে খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। সে সকল অত্যাচারে পর্ব্বতও বিচলিত হয়, ছিন্নশিলাও অগ্নিময় হয়। তিনি সে সকল অত্যাচার যে ভাবে সহ্য করিয়াছিলেন, এবং অত্যাচারীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট বা হরিদাস বলিয়া জ্ঞান হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺অভয়াচরণ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরোপকারী, পণ্ডিত-মর্য্যাদা-রক্ষক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দৈবঘটনায় তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সময়ে সময়ে উন্মাদ এত বৃদ্ধি পাইত যে, তখন তাঁহার দ্বারা আত্মহত্যাদি দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নহে। যতদিন তাঁহার ঐ অবস্থা থাকিত, উমেশচন্দ্র ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক গুরুতর প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও জ্যেষ্ঠকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেন না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি যখন যে স্থানে বাস করিয়াছেন, স্থানীয় লোকমাত্রেরি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে বহুতর উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মুখপাত্র পত্রিকা বামাবোধিনীর সম্পাদক তিনিই। তাঁহার প্রচারিত বামাবোধিনীর প্রভাবে অনেক স্ত্রীলোক মহোপকার লাভ করিয়াছেন। বামাগণের সুনীতিগর্ভ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনায় তিনি তাহাদের গুরু ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোনো বামার সুশীলতার পরিচয় পাইলে বা বামারচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাইলে তাঁহার আনন্দ ধরিত না। তাঁহার বামাবোধিনী হিন্দু-ব্রাহ্ম-খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেরই জন্য উন্মুক্ত। অনেক হিন্দু-মহিলার হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ উহাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষ বামা-বোধিনীর বার্ষিক জন্মোৎসবে বিদুষী রমণীরা তাঁহার গৃহে সাদরে আহূত ও পূজিত হইতেন। বার্ষিক ব্রাহ্মোৎসবে তিনি অনেক লেখিকাকে উপাদেয় ভক্তি-গ্রন্থ উপহার দিতেন।

সিটিকলেজ ও বোবা-কালা-বিদ্যালয়ের মূল পত্তন হইতে বর্ত্তমান সমুন্নতি, প্রধানতঃ উমেশচন্দ্রের চেষ্টার ফল। সিটিকলেজের গৃহনির্ম্মাণ জন্য অনেক টাকা ঋণ ছিল; তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক দান সংগ্রহ করিয়া ঋণমোচনের সাহায্য করিয়াছেন। বেথুন কলেজ ও অন্যান্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ভূয়িষ্ঠ সংযোগ ছিল। ঐ সকলের উন্নতিকল্পে তাঁহার যত্ন ও শ্রমের ইয়ত্তা ছিল না। ইহা ভিন্ন, জয়নগরপ্রভৃতি স্থানের স্কুলে, নানাস্থানের ব্রাহ্মমন্দিরে, স্বর্গীয় মহাত্মা-দের স্মৃতিরক্ষায়, পাঠাগার, পুস্তকালয়, দাতব্যভাণ্ডার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায়, ধর্ম্মানুশীলনক্ষেত্রে উমেশচন্দ্রের সংযোগ ও সহানুভূতি

সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রাত্রি-কালে কয়েক ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে সকল দিন ঘটিত না। কার্য্য করাই তাঁহার আরাম বিরাম বা বিশ্রাম ছিল।

তিনি নিজে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন, তাহা স্বয়ং পালন করিতে কোনো বাধা বা কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, তিনি নিজে অসবর্ণ বিবাহ করেন নাই এবং সোদর বা কন্যাদের অসবর্ণ বিবাহ দেন নাই। ব্রাহ্মবিবাহ, নবরচিত পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। কিন্তু উমেশ-চন্দ্র ঐ নবীন পদ্ধতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আমা দ্বারা হিন্দুবিবাহপদ্ধতির উপাদেয় মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজ কন্যার বিবাহে প্রয়োগ করেন। তিনি আর্ষ ধর্ম্মের সনাতন সার সত্য অতীব শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিতেন।

সংস্কৃত উপনিষদে তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ অভয়াচরণ দত্তের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ৺অভয়াচরণ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন অপৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন। ৺অভয়াচরণ প্রকৃত বৈদান্তিক। আমি তাঁহার রচিত বেদান্তবিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি সময়ে সময়ে আমাকে সংস্কৃত ভাষায় পত্র লিখিতেন। উমেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠের সাহায্যে ও নিজ চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। রামায়ণোক্ত সীতা, সুমিত্রা, শ্রমণা, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, গুহক, হনুমান্ প্রভৃতির চরিত্রে তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার প্রাণের সামগ্রী ছিল। ঐ সকল চরিত্র বলিতে বা শুনিতে তিনি গলদশ্রু হইতেন। কথকতা, রামায়ণগান, বেহুলা-লখিন্দরের কথা প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষোপযোগী প্রাচীন প্রথাগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া তিনি যৎপরো-নাস্তি ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। পুস্তক-পাঠ তাহার বাল্যকালের একটী নেশা। তিনি বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'কালী-বিলাস' পুস্তক পড়িতে শেখেন। পরে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি পুঁথি নিজের আমোদের জন্য এবং পাড়ার মেয়েদিগকে শুনাইবার জন্য পড়িতেন। দোল, রথ প্রভৃতি পর্ব্বাহে খেলনা কিনিতে যে পয়সা পাইতেন, তাহাতে পুস্তক কিনিতেন। সকল পুস্তক ক্রয়ের সঙ্গতি না থাকায় হস্তে লিখিয়া লইতেন। একখানি পুস্তক সঙ্গে না লইয়া তিনি কোথাও যাইতেন না। তাঁহার বাল্য-বন্ধু বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া নানাবিধ পদ্য রচনা করিতেন। তাঁহার বাল্যকালের সে পদ্যগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত রোমরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৫৯ সালে মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত সঙ্গীতরত্নাবলীতে প্রকাশিত হয়।

কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি ইংরাজি শিখিতে অতিমাত্র ব্যগ্র হন। কিন্তু অবস্থাগতিকে প্রথমতঃ সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মাতৃ-দেবী পুত্রের নিরতিশয় আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে কষ্টে শ্রেষ্টে আট আনা বেতন দিয়া ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিলেন। অতীব কষ্টে, কেবল স্বাবলম্বনে ও ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার শিক্ষা হইতে লাগিল। তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ও স্বগৃহে কয়েকখানি মাত্র পুস্তক পড়িয়া, পরকীয় সাহায্যে, ভবানীপুরে আসিয়া একেবারে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং সেই বারেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কলার্সিপ প্রাপ্ত হন। ক্রমে এল, এ, ও বি এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দুই বৎসর মেডিকেল কলেজে পড়িয়া বিজ্ঞানবিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতি-মাত্র পীড়া ও অন্যান্য গুরুতর কারণে তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ ছাড়িতে হয়। ভবানীপুরে অবস্থানকালে তিনি যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

প্রেমভক্তিরসাত্মক কাব্যে ও ভগবৎ-সঙ্গীতে তাঁহার অতুল অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণবকবিগণের কাব্য তিনি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। কোথাও সংকীর্ত্তন হইবে জানিলে, তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমার বাটীতে অনেকবার কীর্ত্তন শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ঐ সকল সঙ্গীত হইতে সুন্দর ব্রহ্মভাবের ব্যাখ্যা করিতেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা—"জীবে দয়া ও নামে রুচি"। এটী তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এই অমূল্য গাথায় তাঁহার প্রাণনাড়ী গ্রথিত ও পরিপুষ্ট। এজন্য তাঁহার জীবনে 'ভিতর,' 'বাহির'—দুইটা, দিক্ ছিল না, তাহা আগাগোড়া, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, স্তুতি-নিন্দায় অভিন্ন ও অবিকারী।

অনেক বড় লোকের জীবনচরিত প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা বাদ দিয়া লিখিতে হয়। কেননা, বড় লোকের দোষের কথা প্রকাশ করায় সমাজের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। কিন্তু উমেশচন্দ্রের জীবনে এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করা না যায়। যে চরিত্র শাশ্বত ধর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সর্ব্বকালেই সমান পবিত্র। নিরবচ্ছিন্ন লোককল্যাণই তাঁহার সাধনা ছিল। তিনি সারাদিন খাটিয়া শুষ্কমুখে গৃহে আসিয়া দেখিলেন,—নানা কার্য্যের জন্য অনেকে উপস্থিত। মুখে বারিবিন্দু না দিয়াই আবার কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। একদিন আমি তাঁহাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলায়, তিনি হাস্যমুখে বলিলেন,—"যত-ক্ষণ পারা যায়, করা যাউক; যাঁহার কার্য্য তিনিই করেন, মনুষ্য নিমিত্তমাত্র।"

পিতা-মাতার গুণেই সুসন্তান হয়। উমেশচন্দ্রের নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল, পুণ্যময় জীবন তাঁহার পিতা-মাতার গুণেই গঠিত।

অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা, কঠোর শ্রমশীলতা, মিতাচার, শৌচ, সুব্যবস্থা প্রভৃতির গুণে তাঁহার পিতা মাতা সামান্য আয়ে অসাধ্য সাধন করিতেন। সন্তানগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের উপর তাঁহাদের একাগ্রদৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের শাসনে কাহারও কোনও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস ছিল না। সন্তানদিগকে কঠোর নিয়মে রক্ষণ ও শিক্ষাদান তাঁহাদের ব্যবস্থা ছিল। তাঁহাদের পরোপকার ও আতিথেয়তা সর্ব্বলোকের শিক্ষণীয়। নিজের যতই অভাব বা বিপদ ঘটুক না কেন, বাটীতে ভিক্ষুক, অতিথি, অভ্যাগত কেহই নিরাশ হইয়া ফেরেন নাই। বাটীর নিকট শবদাহস্থান থাকায় নানা স্থান হইতে শব-সৎকারের জন্য তথায় লোক-সমাগম হইত। তাঁহারা প্রাণপণ যত্নে তাহাদের সাহায্য করিতেন। তাঁহারা গঙ্গামাতৃক স্থানে বাস করায়, দূরস্থ জ্ঞাতি-বন্ধু-আত্মীয়েরা গঙ্গাস্নান, পাল-পার্ব্বণ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রায়ই তাঁহাদের বাটীতে আসিত। অনেকে সাংঘাতিক পীড়া লইয়া গঙ্গালাভের জন্য সবান্ধবে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া বাস করিত। তদ্ভিন্ন, কার্য্যোপলক্ষে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা ও অন্যান্য প্রজারা দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের বাটীতে অবস্থান করিত; সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারাদি দানপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিতে তাঁহারা কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। আতিথ্য ও পরোপকার বিষয়ে তাঁহাদের নিকট জাতিবিচার ছিল না। তাঁহাদের নিজের জন্য নিত্য-ব্যয়ে কড়াকড়ি থাকিলেও, নৈমিত্তিক ব্যয় অনেক হইত। অতিথি, কুটুম্ব ছাড়া কোনও দিন যাইত না। এমন পিতা মাতা না হইলে কি এমন সুসন্তান হয়?

উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ সোদর দীননাথ দত্ত জয়নগর এণ্ট্রান্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ৺রাজ-নারায়ণ বসুর জামাতা। তাঁহার অমায়িকতায় ও সৌজন্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। পিতৃপিতামহক্রমে এ পরিবারের ভদ্রতা চিরপ্রসিদ্ধ। উমেশচন্দ্র চারি পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রকন্যাগুলি পিতামাতার ন্যায় অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র। এ পরিবারে কাহারও মুখে কেহ কখনও উচ্চ বা অভদ্র কথা শুনে নাই। বিলাসিতার ছায়াও এ পরিবারকে স্পর্শ করে নাই। পিতৃ-পিতামহাদির ন্যায় ইহারা সকলেই মিতাচারী ও কঠোরতায় অভ্যস্ত।

জীবের জন্ম, কর্ম্ম, মৃত্যু সকলি ব্রহ্ম-কৃপা; সুখ-দুঃখ সকলি ব্রহ্মকৃপা; "অহং করামীতি বৃথাভিমানঃ" আমি করিতেছি, ইহা বৃথা অভিমান। "ঈশ্বরদেশিতং জগৎ"—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ জগৎ পরিচালিত; একটী পরমাণুরও ক্রিয়া তাঁহার অগোচর নাই। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিষ্কামভাবে পুণ্যানুষ্ঠানই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য,—ইহাই উমেশচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

তিনি ব্রহ্মকৃপা জ্ঞানে মৃত্যুকে অমৃত বোধ করিতেন।

গুরুতর পরিশ্রমে ইদানীং তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম লওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। তিনিও তাহা বুঝিতেন, এবং সময়ে সময়ে বিজনে গিয়া বাস করিতেন। কিন্তু নানা কার্য্যের অনুরোধে বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিতে হইত। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলেও, হঠাৎ যে এ সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, হৃদয় এ কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। হে দীনবৎসল! হে পরদুঃখকাতর! হে সর্ব্বগুণনিধে! তুমি কি সত্যসত্যই চলিয়া গেলে!

"জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
পরার্থবদ্ধকক্ষাণাং ত্বাদৃশামুদ্ভবঃ কুতঃ॥"

মাদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণী কত শত জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু পরহিতে বদ্ধপরিকর তোমার ন্যায় দেবতা কোথায় পাইব?

হৃতা ত্বয়া শান্তিসুধাপ্রদানৈঃ
শোকাতুরাণাং নয়নাম্বুধারা।
অশ্রূণি হা ত্বদ্বিরহোত্থিতানি
হে জীববন্ধোঽদ্য নিবারয়েৎ কঃ॥

তুমি শান্তিসুধাদানে শোকার্ত্তগণের অশ্রুধারা নিবারণ করিতে। হে জীব-বন্ধো! বল! আজি তোমার বিরহে আমাদের এ অশ্রুধারা কে নিবারণ করিবে?

হে দয়াময়! সচ্চিদানন্দ! জগদীশ! তুমি তোমার হৃদয়ানন্দ পুত্ররত্নকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ। তাহার গুণের পুরস্কার এ জগতে ছিল না, তাই তাহাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ। তাহার নিভৃত নিঃশব্দ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহার চির-জীবনের সাধ পূর্ণ করিয়াছ। তোমার প্রিয় পুত্র অবিরাম তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে, অন্তিমে নিঃশব্দ-নিঃস্পন্দ ভাবে তোমাকেই ডাকিতেছিল। যখন এক-কালে সংজ্ঞালোপ, পুত্রকন্যার দত্ত জলবিন্দু ওষ্ঠপ্রান্তে গড়াইতেছে, নাভিদেশ ঘন ঘন স্পন্দিত, তখন তাহার বদনে 'মা' 'মা' 'মা' এই অমৃতাক্ষর বাহির হইল। শুনিলাম, স্তম্ভিত হইয়া মুখপানে চাহি-লাম, দেখিলাম,—মহাযোগী যোগনিদ্রায় অভিভূত, মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্তি! অপূর্ব্ব মাধুরী! জীবাত্মা দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে পরমাত্মায় লীন হইতেছে। এ মহাসঙ্গম—এ গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া বার বার নমস্কার করিলাম।

হা তে দরিদ্রভরণব্রতমপ্যপূর্ণং
ব্রহ্মামৃতার্পণমহাব্রতমপ্যপূর্ণং।
বামামহোন্নতিমহাব্রতমপ্যপূর্ণং
অস্তং গতোঽসি ধরণীতল-পূর্ণচন্দ্র!॥

হায়! তোমার দরিদ্র ভরণ-ব্রত পূর্ণ না হইতেই, তোমার ব্রহ্মসুধাদান-ব্রত পূর্ণ না হইতেই, বামাকুলের মহোন্নতিসাধন-মহাব্রত পূর্ণ না হইতেই,

হে ধরাতলের পূর্ণচন্দ্র! তুমি অস্তাচলে গমন করিলে!

হাহাদ্য বঙ্গজননী হৃতরত্নসারা
নিঃস্বার্থলোকহিতমদ্য নিরাশ্রয়ঞ্চ।
দীনস্য দুর্গতিমনুস্মরতোঽশ্রুসিক্তঃ
গ্রাসঃ স্খলিষ্যতি মুখাৎ পুনরেব কস্য॥

হায়! আজি বঙ্গজননীর সাররত্ন অপহৃত হইল; নিঃস্বার্থ পরোপকার আজি নিরাশ্রয় হইল; দীনহীনের দুঃখ স্মরণ করিয়া আর কার মুখ হইতে অশ্রু-সিক্ত অন্নগ্রাস স্খলিত হইবে?

ব্রহ্মার্পিতেন্দ্রিয়মনোবচনাত্মকর্ম্মা
ভূমামৃতেঽদ্য ভজসে ত্বমনন্তশান্তিম্।
শোচ্যা বয়ং তু নিতরাং যদসূন্ ধরামো
হীনা অমূল্যনিধিনাপি ভবাদৃশেন॥

কায়-মন-বাক্য, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে পরমব্রহ্মে সমাহিত করিয়া, তুমি আজি তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়াছ। কিন্তু হায়! আমরা কি হত-ভাগ্য! আমরা তোমার ন্যায় অমূল্য নিধি হারাইয়াও প্রাণধারণ করিতেছি!

যাতেঽপি দেব! বিলয়ং তব ভৌতকায়ে
ত্বং সর্ব্বলোকহৃদয়ে চিরজীবিতোঽসি।
জাতা ম্রিয়ন্ত ইহ মাদৃশপুণ্যশূন্যাঃ
মৃত্যুঃ কুতো জ্বলদনশ্বরকীর্ত্তিভাজাম্॥

হে দেব! তোমার ভৌতিক দেহ বিলীন হইলেও, সর্ব্বলোকের হৃদয়ে তুমি চির-জীবী হইয়া আছ। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মাদৃশ পুণ্যহীনেরাই মরিয়া থাকে। যাঁহারা জ্বলন্ত অনশ্বর কীর্ত্তিপ্রভায় প্রদীপ্ত, তাঁহাদের মৃত্যু কোথায়?

ক্লেশানস্থনপি চিরায় তৃণায় মত্বা
নিত্যং পরোপকৃতয়ে প্রযতিষ্যতে কঃ।
কো বা প্রভূতকরুণাগলদশ্রুনেত্রো
ব্রহ্মামৃতেন শময়িষ্যতি পাপিতাপম্॥

যাবজ্জীবন সমস্ত ক্লেশকে এবং নিজের প্রাণকেও তৃণ জ্ঞান করিয়া, নিরন্তর পরোপকারের জন্য আর কে যত্ন করিবে? প্রভূত করুণায় গলদশ্রুনেত্রে ব্রহ্মনামা-মৃতদানে কে আর পাপিগণের সন্তাপ হরণ করিবে?

যাতে দিবং পিতরি হন্ত গতাসি বামা-বোধিন্যয়ি ত্বমতিশোচ্যতমামবস্থাম্।
স্বপ্রাণনির্গলিতসাররসেন কো বা
ত্বাং পালয়িষ্যতি পিতেব চ মাতৃকেব॥

বামাবোধিনি! তোমার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, অহো! আজি তোমার কি শোচনীয় দশা! আপনার প্রাণনাড়ীর সারসত্ব নির্গলিত করিয়া, সেই রসে কে আর তোমাকে পোষণ করিবে?

হে মঙ্গলময়! তাপিতের শোক-হারী ঈশ্বর! আজি তোমার প্রিয়পুত্রের শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ কর! তাহাদের তোমা বিনা আর গতি নাই। তোমার সে প্রিয় পুত্র কেবল তোমাকেই জানিত, তোমাকেই ডাকিত, তোমাকে লইয়াই সকল কর্য্যে করিত, তোমাতেই তাহার সমস্ত নির্ভর; গিরিরাজের ন্যায় সে তোমাতেই অটল ছিল। তাহার সন্তানগণকে শান্তি, পিতৃকীর্ত্তিরক্ষণে শক্তি ও সিদ্ধি দান কর।

হে স্বর্গীয় মহাত্মার পুত্রকন্যাগণ!

আজ এ শোক শুধু তোমাদের নয়, আমাদের সকলেরি। বিদ্যার্থী,ধর্ম্মজিজ্ঞাসু, দীনহীন, অন্ধ, আতুর, বোবা, কালা, নরনারী সকলেই আজি পিতৃহীন। সকলেই তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী। তিনি জীবনের যে পুণ্যময় সনাতন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই তাঁহার প্রকৃত শ্রাদ্ধ। অহরহ এ শ্রাদ্ধ করিতে কেহ বিস্মৃত হইও না।

তারাকুমার।

শোকোচ্ছ্বাস।

আজি এ কি শুনিলাম! এ যে শত বজ্র গরজিয়া মাথার উপরে পড়িল! ভগবন্! এ কি শুনাইলে?

আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার, সমস্ত জ্যোতিষ্ক, সমস্ত আলো একসঙ্গে নিবিয়া গেল! এই ভীষণ অন্ধকারে, ৪ঠা আষাঢ় বুধবারের রাত্রিতে আমরা — বঙ্গজননীর সন্তান আমরা — কি হারাইলাম? আঁধার ঘরে চোর ঢুকিয়া আমাদের কোন্ অমূল্য রত্ন লইয়া গেল? —আমরা বুঝিতে পারিলাম না, খুঁজিতে পারিলাম না, ঠাওরাইতে পারিলাম না, আঁধারে আঁধারে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! ভগবন্! এ কি করিলে?

আর কি বলিব, আমার দেশীয় ভগিনী-গণ! বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকা ও পাঠিকাগণ! আর কি বলিব, আজি আমাদের সকলেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমরা সকলেই পিতৃহীনা হইয়াছি। যিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, যিনি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ হিতৈষী, যিনি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয়, আমাদের সেই পিতৃস্থানীয় ভক্তিভাজন বামা-বোধিনীসম্পাদক মহাশয় এ জগতে আর নাই! যিনি নিয়ত স্ত্রীজাতির কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির উপকার করা যাঁহার এক প্রধান ব্রত, স্ত্রীজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই করুণাময় নরদেবতা এ জগতে আর নাই! বঙ্গবাসিনীদিগের পক্ষে এমন সর্ব্বনাশের কথা আর কি আছে জানি না।—যখন পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এ দেশে "স্ত্রীজাতির উন্নতি" অন্ধ-কারসমুদ্রে মগ্ন ছিল, তখনও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য যিনি একান্ত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, অন্তঃপুরশিক্ষা, বেথুন কলেজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, বিধবা-আশ্রম প্রভৃতি যিনি প্রভূত অনুরাগে পরিচালন ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, এই পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ যিনি স্ত্রীজাতিকে জ্ঞান ধর্ম্মে ভূষিত করিবার জন্য বামাবোধিনী পত্রিকা পরি-চালনা করিয়াছেন, আমাদের সুখ-দুঃখে যাঁহার হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি, আমরা যখন নিতান্ত অবহেলনীয়া এবং নগণ্যা ছিলাম, তখনও যিনি আমাদিগকে একান্ত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং সম্মানের পবিত্র চক্ষে

দর্শন করিয়াছেন, তখনও যিনি "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" বুঝিয়া তদনুসরণ করিয়াছেন, আমাদের সেই ব্যথার ব্যথী, শুভাকাঙ্ক্ষী চিরসুহৃদ্ আমাদিগকে এ জনমের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন!—এ হেন হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদের আর কি আছে? দেশের পুরুষগণও আজি তাঁহার বিয়োগে কাতর—যার পর নাই কাতর হইয়াছেন এবং তাঁহার অভাব সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছেন। তিনি সহস্র কর্ম্মে লিপ্ত কর্ম্মযোগী ছিলেন; দেশের বর্ত্তমান প্রায় সকল সাধুকর্ম্মের মূলে তিনি কোথাও উদ্যোগী, কোথাও পরামর্শদাতা, কোথাও নেতা, এইরূপ দেখা যায়। সিটি কলেজ, স্মৃতিসভা-সমিতি, কালা-বোবা স্কুল, মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠা, অনাথবন্ধু সমিতি, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, সঙ্গীতসমাজ, সঙ্গত সভা, হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড, গিরিশ বিদ্যারত্ন দাতব্য ফণ্ড, প্রভৃতি লোকহিতকর বহুবিধ কার্য্যভার তিনিই সম্পন্ন করিয়াছেন। আজি সেই কর্ম্মযোগীর অভাবে বঙ্গভূমি যেন শূন্যময় শ্মশান হইয়াছে। তাঁহার কথা কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী বলিব? এত কাজে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি রোগীর শুশ্রূষা, শোকীর সান্ত্বনা, বিপন্নের সহায়তা এবং আত্মীয়বন্ধুদিগকে আপ্যায়িত করিতে সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত ছিলেন। সেই চিরপ্রসন্নতাপূর্ণ পবিত্র সস্মিত মুখ দেখিলে যেন প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত। তাই বলিতেছি, সেই ভগবৎ-নিষ্ঠ সাধু, সেই জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়, সেই ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার প্রতিরূপ, সেই সংযমী, দয়ালু, অনলস, উদ্যোগী, সেই ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ, সেই ক্ষমাশীল দয়াময় প্রেমময়, সেই পাপস্পর্শমাত্র-পরিশূন্য পুণ্যবান্, সেই ঋষিপ্রতিম বিশ্বহিতৈষী, সর্ব্বগুণান্বিত আদর্শ চরিত্রবান্, পুত্র রত্ন হারাইয়া বঙ্গজননী আজি জগতের কাঙ্গালিনী হইয়াছে! এমন সর্ব্বনাশ মানুষের প্রাণে কি করিয়া সহিবে? ভগবন্! এ যে সহিষ্ণুতার অধিক শোক চাপাইলে, করিলে কি?

আজি যে কত কথা মনে পড়িতেছে, তাঁহার গুণের কথা কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী বলিব? মনে পড়িতেছে,—তিনি জ্ঞানে, গুণে, ধর্ম্মে কর্ম্মে এতাধিক শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন দিন আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন নাই; তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতায় এবং তাঁহার লোকাতীত মহত্ত্বে সকলেই সর্ব্বত্র তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিতেন, কিন্তু হায়! সে বিনীত বীর কেবল লুকাইয়া কাজ করিতে চাহিতেন। আমরা জানি, তিনি যেমন ব্রাহ্মের কাছে প্রকৃত ব্রাহ্ম, সেইরূপ হিন্দুর কাছে তিনি আদর্শ হিন্দু, খ্রীষ্টান, মোস্‌লেম প্রভৃতি ধর্ম্মোপাসকদিগের কাছে তিনি যথার্থ ধার্ম্মিক জ্ঞানে সম্মানিত ও সমাদৃত, কিন্তু তাঁহার নিজের কাছে তিনি ভগবৎ-সেবক মাত্র। তাই

তিনি এত গৌরবান্বিত হইয়াও আত্মগৌরব-বিমুখ। তিনি কি না সত্য সত্যই স্বরাজ, তাই পরের কাছে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। আরও মনে পড়িতেছে তাঁহার ধৈর্য্য! সর্ব্বংসহা মা বসুমতীর মত ধৈর্য্য বুঝি তাঁহারই ছিল! তিনি সকলের দুঃখ সাধিয়া গ্রহণ করিতেন, নিজের হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি ঢালিয়া পরের বুকের জ্বালা জুড়াইয়া দিতেন, কিন্তু রোগ শোক ভয় বা ভাবনায় কোন দিন তাঁহাকে অস্থির দেখি নাই, সেই ভগবৎ-পদে সমর্পিত চিত্তের প্রসন্নতা কদাপি বিনষ্ট হয় নাই। সহধর্ম্মিণী-বিয়োগে, কন্যা-বিয়োগে সেই সহৃদয় স্নেহপ্রবণ মহাত্মার প্রাণে কি নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, সকলেই অনুভব করুন, কিন্তু সে নরদেবতার তখনও স্থিরতা! নিজের দারুণ রোগ, যাতনা, শরীর আর রক্ষা হয় না, তথাপি তাঁহার সেই স্থিরতা! শুনিয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি আজীবনের মত স্থির, ধীর এবং সংযত! হায়! এমন দেবতাকে আমরা পাইয়া হারাইলাম! তাঁহার গুণের কথা কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী মনে করিব? শুনিয়াছি নরদেবতা রামচন্দ্রের গুণে অজ্ঞান পশু ও হিংস্র রাক্ষস পর্য্যন্ত বশীভূত ছিল। স্বচক্ষে দেখিয়াছি আমাদের পূজনীয় মহাত্মার গুণে পশুর অধম মূর্খ, রাক্ষস অপেক্ষা ভয়ানক শত্রু পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছে! (হায়! তাঁহাকে দেবতা বলিয়া এতদিন বুঝিতে পারি নাই!—তিনি স্নেহময় পিতা, তিনি শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু, তিনি চির বিশ্বাসী সুহৃদ্ হইয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দেবত্বের কথা ভাবিবার অবকাশ পাই নাই, তাই তো কাঁদিয়া মরিতেছি!) তাঁহাকে "মানব" বলিলে তাঁহার অখ্যাতি হইবে, তিনি সত্য সত্যই দেবতা। আজি তাঁহার শূন্য আসনে বসিবার মত আর কাহাকেও যে দেখিতেছি না! কি বলিব! আমরা বঙ্গবাসিনীগণ সেই স্নেহময় আত্মীয়তমকে হারাইলাম, বলিয়াই এমন করিয়া বুক ফাটিতেছে! এই হতভাগিনীদিগের জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, একে একে সকলেই প্রায় চলিয়া গেলেন, এখন, কাহার ভরসায় বুক বাঁধিব?—ভগবান্! এ কি করিলে? হায়! এ কি হইল!

এই সময়ে আমি আমার নিজের কাহিনী একটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অনেক দিন আগে আমি যখন মহাভারতের মৌসল পর্ব্ব পড়িয়াছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল, যিনি অর্জ্জুনের জীবন-পরিচালক, একাধারে যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, মন্ত্রী, পিতা ও বন্ধু, যিনি অর্জ্জুনের বল, বুদ্ধি, সাহস ও ভরসা, অধিক কি যাঁহার জীবিতে অর্জ্জুন জীবিত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন চলিয়া গেলেন, তখন অর্জ্জুন জীবিত রহিলেন কিরূপে? হায়, তখন আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সুদূর ভবিষ্যতে ভগবান্ এই অভাগিনীর

জন্য সেইরূপ এক ভীষণতম পরীক্ষার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন! অতি তরুণ বয়সে যখন এ জীবনের আশা-আলোকনিবিয়া গিয়াছিল, যখন সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা আমাকে লক্ষ্য-হীন, উদ্দেশ্যহীন করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দারুণ সময়ে বামাবোধিনীর ভিতর দিয়া এক দেবতার করুণাপূর্ণ কোমল হস্ত আমাকে ভীষণ অন্ধকার হইতে তুলিয়া আনিল। আমি বুঝিলাম, ইনি মানব নহেন দেবতা; পর নহেন, স্নেহময় পিতা; অন্য কিছু নহেন, এই বজ্রাহত হৃদয়ে বিধাতার অমৃতময় আশীর্ব্বাদ। তার পরে এই দ্বাবিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যে স্নেহ মমতা, যে আদর যত্ন, যে উৎসাহ উপদেশ এবং যে আনন্দ শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা আমার প্রাণের প্রতি অণু ও পরমাণুতে সঞ্চিত হইয়া আছে, প্রকাশ করিবার ভাষা আমি জানি না। এই সুদীর্ঘ দিনের মধ্যে এক তিলের জন্য তাঁহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই বা তাঁহার মধুময় প্রকৃতির অন্যথা ঘটে নাই! রোগ শোক প্রভৃতি যে কোন সময়ে তাঁহার কাছে গিয়াছি, আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছেন।

শাস্ত্রে বলে "এ সংসারে সাধুসঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা"। সেই দেবের সঙ্গই আমার প্রকৃত সাধুসঙ্গ ছিল; তাঁহার চরণতলে বসিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহা কোন তীর্থ দর্শনে বুঝি নাই, জ্ঞানীর উপদেশে বুঝি নাই, গীতা ভাগবতে বুঝি নাই। তাঁহার চরণতলে বসিয়া বুঝিয়াছি যে, জগতে সত্য সত্যই নিষ্কাম ধর্ম্ম আছে, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা আছে; বুঝিয়াছি যে, পরোপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ভগবৎ-পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া সকল অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্পন্ন করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; বুঝিয়াছি, যে ঘৃণিত, যে দলিত, যে অপরাধী, তাহাকেও "আমার" বলা যায়; শত্রুকেও প্রীতি করা যায়, সর্ব্ব জীবকেই ভাল বাসা যায়; বুঝিয়াছি মহাযোগী মহাদেবের মত আকন্দ, ধুতুরা ফুলেও প্রীত, ভূত পিশাচেও স্নেহবান্, ভোগ-সুখেও নিঃস্পৃহ, বিশ্বহিত-নিরত মনুষ্যত্ব সময়ে সময়ে জগতে জন্মিয়া থাকেন; বুঝিয়াছি সাধুসঙ্গই জগতে ত্রিতাপ-জ্বালা দূর করে! যেমন সূর্য্যের আলোকে কাচখণ্ড উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাঁহার পবিত্র কিরণে এ মলিন চিত্তও তেমনি আলোকিত হইয়া উঠিত। হায়! জানিতাম না যে, এ সৌভাগ্য আমার ফুরাইয়া আসিতেছে! যখন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া আসি, তখনও জানিতাম না যে, জন্মের মত প্রণাম করিলাম! কি পবিত্র ধর্ম্মোপদেশে, কি সাহিত্য-ক্ষেত্রে, কি পারিবারিক জীবনে সকল দিকেই তিনি সুশিক্ষিতা হইয়া আমার জীবনের পরি-চালক ছিলেন, তাঁহার কাছে "সঙ্কোচ" আমার মনেও পড়িত না।—অধিক কি, তাঁহার বাড়ীই আমার "স্নেহভবন" বলিয়া আমার ধারণা।—তাই বলিতেছি, মৌসল-

পর্ব্ব-কথিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চলিয়া গেলে অর্জ্জুন তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ কিরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন, তাহা আজি আমি নিজ হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতে পারিতেছি।

আহা পিতঃ! স্নেহময়, করুণাময়, মমতা-ময় পিতঃ! একবার চাহিয়া দেখ, তোমার অভাবে দেশে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তোমার স্নেহের ধন সন্তানেরা পিতৃমাতৃ-হীন, তোমার বন্ধুবান্ধবগণ আশা-ভরসা-হীন, তোমার বঙ্গবামাকুল অবলম্বনহীন, এবং বামাবোধিনী জীবনী-শক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছে। মরণ আমাদের চির-পরিচিত, মরণ আমাদের নিত্য সহচর; কিন্তু তোমাকে কাড়িয়া লইয়া মরণ আমাদের যে ক্ষতি, যে সর্ব্বনাশ করিল, শত শত বৎসরেও বুঝি তাহার আর পূরণ হইবে না। তোমার ৬৭ বৎসর মাত্র বয়সে আমরা তোমাকে হারাইলাম; কিন্তু তোমার মত মানবরত্নের, তোমার মত নর-দেবতার কি এই বয়সই যথেষ্ট? তুমি শতাধিক বর্ষ মাতৃ-কোল আলো করিলে না কেন? মাতৃ-ভূমি শতাধিক বর্ষ তোমার গৌরবে গৌরবান্বিত হইল না কেন? এত শীঘ্র আমরা তোমার শোক পাইলাম কেন? হায় রে! কত চাপা দিতে চাহিতেছি, কিন্তু এ শূন্যতা, এ অভাব যে কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না! জানি পিতঃ! তুমি শোকের অতীত।—জানি পিতঃ! তুমি যেখানে আছ, স্বর্গ সেইখানেই। দেখি-য়াছি, যেখানে তুমি থাক, সেখানে রোগ থাকে না, শোক থাকে না, জরা থাকে না, পাপ থাকে না, কোন সন্তাপই থাকে না; বুঝিতেছি সে অজ্ঞাত দেশে সকলেই তোমার মত ধার্ম্মিক, তোমার মত সহৃদয়, তোমার মত পবিত্রতম। বুঝিতেছি, ভগবান্ তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্পাপ, বিশ্বস্ত পুত্রকে আজি সেই পুণ্যবতী দেবী, স্বর্গ-বাসিনী সহধর্ম্মিণীর সহিত, স্নেহের কন্যা বিভুবালার সহিত মিলিত করিয়া উপযুক্ত পুরস্কারদানে কৃতার্থ করিতেছেন—কিন্তু হায়! স্বার্থপর আমরা বলিব কি?—তোমার স্নেহ, তোমার দয়া এবং তোমার সহায়তা হারাইয়া এ পৃথিবী মরুভূমির মত শুষ্ক, মরুভূমির মত হৃদয়হীন এবং মরুভূমির মত ভয়ানক বোধ হইতেছে! নয়নের মণি, অঞ্চলের রত্ন, অদৃষ্টের সৌভাগ্য স্বরূপ তোমা হেন পুত্র হারাইয়া বঙ্গজননী জগতের দ্বারে কাঙ্গালিনী হইয়াছে; সাধুতা অনাথা হইয়া পড়িয়াছে। মানবের সৌভাগ্য অতি নশ্বর, তাই আমরা তোমাকে হারাইলাম! "তোমাকে হরাইলাম" বলিতে বুক ফাটিয়া যায়! দেব! ভগবানের মত তুমিও আমাদের অন্তস্তলে বিরাজমান হও; ভগবানের মত তোমার পবিত্র জ্যোতিতে আমাদের প্রাণ অমৃতময় কর; তোমার মহাপ্রাণে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত কর; প্রত্যক্ষেই হউক, আর পরোক্ষেই হউক, সমগ্র বঙ্গ-বাসিনী তোমারই শিষ্যা, তোমারই কন্যা এবং তোমারই হস্তগঠিতা; আজি তুমি যে লোকেই থাক, আমাদের এই চতুর্থী-

কৃত্য, এই ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থা কর।—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব-দেবতাঃ॥"

প্রণতা স্নেহের কন্যা
অভাগিনী শ্রীমা—।

তুমি নাই?

("বামাবোধিনী"-সম্পাদক, দেবকল্প পূজ্যপাদ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে শোকোচ্ছ্বাস)।

"তুমি নাই?"—বিশ্বাস না হয়,
সত্য কি গো! এই জনরব?
ও কথায় অন্তরমাঝারে
কি শূন্যতা করি অনুভব!
সেই সৌম্য মূরতি তোমার,
শিশুসম সরল প্রকৃতি,
আর কি গো! হেরিব না কভু?
—সব হ'ল অতীতের স্মৃতি?
কি করিয়া বুঝাইব প্রাণে
সান্ত্বনা যে মানে না হৃদয়,
"তুমি নাই," এ নিঠুর বাণী
কোন্ প্রাণে করিব প্রত্যয়?
"তুমি নাই?"—সে কেমন কথা!
বেশী দিন হয় নাই গত,
লভিয়াছি শেষ আশীর্ব্বাদ
তব পদে শির করি নত!
হাসি-মুখে কত সমাদরে,
করেছিলে স্নেহ-সম্ভাষণ,
এখনো তা বাজিছে শ্রবণে,
"তুমি নাই,"—এ কথা কেমন?

"তুমি নাই" বল না তাহ'লে
কি হইবে আমা সবাকার?
শোকে-দুঃখে আপদে বিপদে
কার কাছে দাঁড়াইব আর?
বসি কার চরণছায়ায়
শুনিব সে আশ্বাস-বচন?
কার স্নেহ-উপদেশ-বাণী
জুড়াইবে তাপিত জীবন?
"তুমি নাই?"—বল না তাহ'লে
কি হইবে মূকবধিরের?
তাহাদের দুরদশা হেরি
দয়া হবে কোন্ হৃদয়ের?
কে গো! আর বাড়ী বাড়ী গিয়া
আপনার শত কাজ ফেলে,
(বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম)
কোলে নিয়া বোবা-কালা ছেলে,
সযতনে আনি বিদ্যালয়ে
খুলে দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠ তার
শিখাইবে "মা" "মা" "বাবা" বুলি?
তুমি বিনা এত দয়া কার?

কত মূক, কত কালা ছেলে
বেঁচে থেকে ছিল মৃতবৎ,
হাতে ধরে তুমি তা'সবারে
দেখায়েছ দীপ্ত ভবিষ্যৎ!
"তুমি নাই"—বল না তা হ'লে
কি হইবে "বামাবোধিনীর"?
কে মুছাবে করুণ অন্তরে
রমণীর নয়নের নীর?
অতি ভীতা সঙ্কুচিতা যত
অন্তঃপুরবাসিনী ললনা,
তাহাদের উচ্চ শিক্ষা দিতে
তুমি বিনা কে আছে বল না?
সুপ্ত বিশ্ব, নিবিড় নিশীথে,
পরিজন সকলে নিদ্রিত,
ক্ষুদ্র এক বাতায়নকোলে
ক্ষুদ্র দীপ করি আলোকিত,
বিকম্পিত অন্তরে রমণী
লিখিতেছে ছোট ছুটী কথা,
কে গো! তারে উৎসাহ দেখাতে
সযতনে নিবে সে বারতা?
"তুমি নাই"—বলনা তাহ'লে
কি হইবে "সিটিকলেজের?
তব সম প্রাণ পাত করি
কে খাটিবে? তার নয়নের
শুকায়নি আজো অশ্রুকণা
চ'লে গেছে আনন্দমোহন,
তুমিও চলিলে যদি দেব,
কে "কলেজ" রাখিবে এখন?
"তুমি নাই"—বল না তাহ'লে
কে রাখিবে "অনাথ-সমিতি"?
তোমা বিনা অনাথ অধমে
আর কার হবে হেন প্রীতি?
"তুমি নাই,"—বল না তাহ'লে
কি করিবে শিশু "সুকুমার"?
একাকী সে কেমন করিয়া
পালিবে বিশাল পরিবার?
বহুদিন হয়েছে অতীত
পায় নাই জননীর স্নেহ!
একা তুমি ছিলে পিতা মাতা!
আজ তার রহিল না কেহ!
এত দিন স্নেহ-পক্ষপুটে
রেখেছিলে ঢাকিয়া যতনে,
আজ এই সংসারের ভার
একাকী সে বহিবে কেমনে?
"তুমি নাই,"—বল না তাহ'লে
কি করিবে ছোট শিশুগুলি,
সন্ধ্যাকালে কে দিবে তাদের
মুছাইয়া কাদা-মাটি-ধূলি?
মার মত নিকটে বসিয়া
কে সহিবে শত আবদার?
কোন্ প্রাণে ফেলে গেলে তুমি
ভগ্না, রুগ্না তনয়া তোমার?
"তুমি নাই"—শুনিলে এ কথা
রোধিতে পারি না অশ্রুধার,
বুক যেন খালি মনে হয়,—
মর্ম্ম ভেদি উঠে হাহাকার!
ভাবি যবে, আর এ জগতে
পাইব না তব দরশন,—
নিরাশ্বাসে ভেঙ্গে আসে বুক,
বিষাদে আচ্ছন্ন করে মন!
যাও দেব! ত্রিদিবদুয়ারে
দাঁড়াইয়া আকুলনয়নে,

পত্নী তব পথ চেয়ে আছে,
তোষ গিয়া প্রেম-সম্ভাষণে!
স্নেহময়ী "বিভুবালা" ওই,
দাঁড়াইয়া পদপার্শে মার,
কি উল্লাসে আছে পথ চেয়ে,—
আজ তুমি কাছে যাবে তার!

যাও দেব!—থাক্ ধরণীর
শোক তাপ আমাদের লাগি,
শান্তি হোক্ অন্তরে তোমার,
বিভুপদে এই ভিক্ষা মাগি!

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
দাকুপী, খুলনা।

মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের
স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে—

শোকোচ্ছ্বাস।

আজ আমি মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত বামাবোধিনীর সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকা ও সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৯ শে জুন বুধবার, রাত্রি ১০ ঘটিকা ৫০ মিনিটের সময়, দুই দিবস মাত্র রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া এক পরম আনন্দময় ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভূমির প্রিয়পুত্র, সিটী-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, অবলাকুলের পরম-বন্ধু, সর্ব্বসাধারণের পরম আত্মীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র যথার্থই স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি সদা স্নেহময়, সদা হাস্যময় ছিলেন। তিনি নির্ব্বিকার ও নিত্যানন্দ-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র নিষ্পাপ, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে সমস্ত জগদ্বাসীর হিত-কামনায় আপনার সমস্ত সুখশান্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আত্মা স্বর্গেরই অধিকারী।

এই মহাপুরুষ অকাল মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হন নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের উপযুক্ত সময় না হইলেও সময় হইয়াছিল, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে স্ত্রী ও বিভুবালা-নাম্নী একমাত্র কন্যার শোক ব্যতীত অন্য কোন শোক তাঁহার পবিত্র হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

স্ত্রীর আত্মার সহিত তাঁহার আত্মা অভিন্ন ছিল। কিন্তু সেই স্ত্রীর বিয়োগের পর কেহই তাঁহার কোনরূপ শোকচিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। যে কন্যাকে তিনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন, সেই কন্যার লোকান্তরগমনেও তাঁহাকে কেহ রোদন করিতে দেখে নাই। বরং কন্যার জীবনান্ত হওয়ার পরক্ষণেই

তিনি সেই বিষম দুঃখের সংবাদ সমস্ত আত্মীয়বর্গকে জানাইয়াছিলেন। তাঁহার মত জ্ঞানী, সাধু, সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী সন্তানকে হারাইয়া বঙ্গমাতা আজ ঘোর বিষাদে বিষাদময়ী। সেই জগদ্বিখ্যাত সাধুর অপার অনুগ্রহ,সেই পিতৃস্থানীয় মহাত্মার অপার স্নেহ হারাইয়া আজ সহস্র সহস্র নর নারী নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত। মহাত্মা উমেশচন্দ্র কতশত নরনারীকে মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে তুলিয়াছেন, স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে লইয়া গিয়াছেন। মহাত্মা উমেশচন্দ্র কত শত জ্ঞানহীন নরনারীর অন্ধকারময় হৃদয়গর্ভে উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। কত শত বিদ্যা-হীন ও বিদ্যাহীনাকে বিদ্যারত্নে বিভূষিতা করিয়াছেন।

মহাদেবতুল্য উমেশচন্দ্র নিজে অনন্ত অসংখ্য গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন, ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের সার ছিল। তিনি তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকেও সেই বিমল ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তির মধ্যে অনেক ব্যক্তিকেই ভাগ্য-হীন দেখা যায়। কিন্তু ইঁনি যেন নিজ পুণ্যবলেই চির ভাগ্যবান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এ বৃদ্ধকালেও তিনি চারি পুত্র, তিন কন্যা এবং জামাতা ও দৌহিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এমন ষোল-কলা-সম্পূর্ণ জ্ঞানবান্, পুণ্যবান্ আর কয় জন আছে?

কেমন করিয়া সহিবে? বল বঙ্গবাসি-গণ! তাঁহার এই বিষম শোক তোমরা কেমন করিয়া সহিবে? সহিতে কি পারিবে? না—এ যে অসহ্য। এমন মহাত্মা জগতে যতদিন ছিলেন, ততদিন মঙ্গল ছিল। আর তিনি নাই, সে মঙ্গল আর ফিরিয়া আসিবে না। হায় কি হইল! অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়া বঙ্গমাতার উচ্চ মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। দেশময় বিষম হাহাকার উত্থিত হইল। বিষম শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। হায় রে বিধাতঃ! কি করিলি? এমন করিয়া দেশের লোকের মাথায় বজ্রাঘাত করিলি, এমন রত্ন কাড়িয়া নিলি! বিদ্যার্থিনী, জ্ঞানার্থিনী অবলাকুলকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিলি! কে আর তাহাদিগকে গুরুর মত জ্ঞানদান করিবে? কে আর তাহাদিগকে পিতার মত বিদ্যা ও মাতার মত গৃহকর্ম্ম শিখাইবে? হায়! অবলা-বান্ধব উমেশচন্দ্র আজ কোথায়? হায়! নারীগণের চিরমঙ্গলার্থী উমেশচন্দ্র আজ আর এ জগতে নাই। হায়! বামা-বোধিনি! তুমি আজ নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল। পিতৃমাতৃভ্রাতৃহীনার ন্যায় রোরুদ্যমানা। হায় কৈলাসকামিনি! তোমার চির আদরের ধন, বামাবোধিনীর চিরসম্বল উমেশচন্দ্র আজ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইলেন, বামাবোধিনীর মুখের দিকে আর কে চাহিবে? হায়! সিটী-কলেজ! তোমার প্রিন্সিপ্যাল আজ কোথায় গেলেন? হায়, কলিকাতা-বাসিগণ! উমেশ চন্দ্র দত্ত আজ কোথায় গেলেন?

তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, ঐ যে মহর্ষিতুল্য পরম পবিত্র উমেশচন্দ্রের আত্মা স্বর্গের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছেন।

এস! বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক, লেখিকাগণ! এস আমরা আজ সকলে একত্র হইয়া ঈশ্বরের নিকট সেই মহাপুরুষের অক্ষয় স্বর্গ প্রার্থনা করি, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন তাহাতে আর আমাদের দুঃখ কি! আমরা ত এ জীবনে তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না, তাঁহার সেই সৌম্যমূর্ত্তি এখনো ত চক্ষে চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। এখনও প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার পবিত্র প্রীতি ভোগ করিতেছি। তিনি স্বর্গের লোক স্বর্গে গিয়াছেন। কিছু দিনের জন্য স্বর্গের আলোকে ধরা অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। এখন তিনি নাই, কিন্তু ধরাতলে চিরদিন সে আলোর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে।

মর্ম্মাহতা
অম্বুজাসুন্দরী।

প্রার্থনা।

ভগ্নীগণ!

আজি বামাবোধিনীর মহাশোকের দিন। যিনি ইহার স্রষ্টা, পালয়িতা, সেই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আজ কোথায়? এত কাল তিনি অশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে নারীকুলের শুভ কামনা করিয়া নানা বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণভাবে এই পত্রিকা চালাইয়াছেন। যে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের জন্য কোন প্রকার মাসিক পত্রিকার সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে ইহার জন্ম হয়। আমাদের জননী হইতে আমরা ইহার গ্রাহিকা, অতএব এই বামাবোধিনী আমাদিগের অতি পুরাতন বন্ধু।

যাঁহার প্রবর্ত্তনায়, যাঁহার পরিশ্রমে আমরা নানা প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যিনি বিশেষরূপে নারীজাতির উচ্চ-শিক্ষাকাঙ্ক্ষী হইয়া দেশে বিদেশে, ঘরে বাহিরে, আত্মপরভেদাভেদে, আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন সহকারে কার্য্য সাধন করিয়াছেন, আজ তিনি অনন্তধামে!

আমরা সকলে একদিন এই সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট জীবনের অবসানে তথায় গিয়া মিলিত হইব। কিন্তু এই উপস্থিত জাগতিক বিচ্যুতি আমাদের বড় ব্যথা আনিয়া দেয়। আমরা এই দেহান্তরিত অবস্থায় ভীষণ শোক প্রাপ্ত হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়ি। আমাদের অখণ্ড আত্মার কোন প্রকার বিনাশ হয় না জানিয়াও এই অপ্রত্যক্ষীভূত কারণে বিহ্বল হইয়া পড়ি। তাই আজ স্বর্গীয় পুণ্যাত্মার অভাবে তীব্র দুঃখ ঘটিয়াছে। তাঁহার উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে

হারাইয়া সকলে অশ্রুধারায় অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দেবাদিদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া শান্তি পাইব।

এমন উজ্জ্বল রত্নহারা হইয়া মাতৃভূমির সেবার আজ কত বিঘ্ন ঘটিল! সে ক্ষতি কি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে? আমরা সকলে মিলিয়া সেই মহাত্মার উদ্দেশে ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে পূজা করিব, যেন তাঁহার অক্ষয় স্বর্গভোগ হয়। ঈশ্বর যেন সেই দেবচরিত্র পিতার ব্যথিত ও শোকসন্তপ্ত পুত্রকন্যাদিগের অন্তঃকরণে পরম করুণাধারা ঢালিয়া শান্তি দান করেন এবং "বামাবোধিনী"কে সবল করিয়া অক্ষুণ্ণভাবে জীবিত রাখেন। বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগ্নীগণ! একবার সমস্বরে সেই মহান্ ভূমা অনন্তদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে ভিক্ষা প্রার্থনা কর, আমাদের স্বদেশের প্রিয় পুত্র ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মার উন্নতি হউক; তিনি পরমা গতি লাভ করুন। তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি তাঁহাকে এ সংসার হইতে কখন অন্তরিত হইতে দিবে না। তিনি নিজেই নিজের সুকৃতিফলে বঙ্গভূমির শ্যামল বক্ষে শোভমান থাকিবেন। তাঁহার সকল সদ্গুণের মধ্যে রমণীগণের উন্নতির জন্য তাঁহার যেমন ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন ছিল, এরূপ অতি বিরল; এ জন্য বিশেষ করিয়া মহিলাগণ তাঁহার অভাব অনুভব করিবেন। কিন্তু যাঁহার সন্তান, তিনি ডাকিলে কাহার সাধ্য তিলমাত্র অপেক্ষা করে। সর্ব্বকর্ম্ম অসমাপ্ত রাখিয়া, দিবসে নিশীথে, ঘরে বাহিরে, স্থানে অস্থানে, যে স্থানে যে কালে যে ভাবে থাকি না কেন, ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা বা ধন সম্পত্তির কালাকালের কিছু বাধা বিঘ্ন মানিলে চলিবে না। তাই আজ এমন কর্ম্মবীর সংসার পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয় যে, এমন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ জগতে যতদিন থাকেন, ততই মঙ্গলসাধন হয়। কিন্তু দেবতার ইচ্ছা মনুষ্যের ইচ্ছার বিপরীত, তাই আমরা প্রত্যহ সংসারে যেন কত অসামঞ্জস্য ভোগ করিতেছি। ভগবান্ যেমন দুর্জ্ঞেয়, তদনুরূপ তাঁহার কার্য্য সকলও অতি জটিল। আমরা অজ্ঞান, মহামোহান্ধ, তাই এত হাহাকার! এই শোকাভিনয়ে কত লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে।

এই পিতৃহারা অনাথ পুত্রকন্যাগণের হৃদয়-বিপ্লবের কি অন্ত আছে? মানুষের সহস্র সহানুভূতিতে কি এ আগুন নির্ব্বাণ হইতে পারে? কেবল সেই অবিনাশী অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের অলৌকিক অসাধারণ মহিমান্বিত শক্তি আসিয়া রক্ষা করিবে মাত্র! আমরা তাঁহারই মহীয়সী আশ্চর্য্য ক্ষমতার দিকে প্রত্যাশিত হইয়া থাকি মাত্র। আইস ভগ্নীগণ! আমরা গলায় গলায় বাঁধিয়া বামাবোধিনীর শোকে সহানুভূতি প্রদান করি। পরদুঃখে যে চক্ষে অশ্রুধারা না পতিত হয়, সে চক্ষু মানবচক্ষু

নহে। এক্ষণে আমাদের আরও একটী কর্ত্তব্য এই যে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত, মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা। কিন্তু তিনি যে প্রকার আড়ম্বরহীন বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিলেই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করা হইবে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পরম পক্ষাপাতী ছিলেন, অতএব বামাবোধিনীর সহৃদয়া পাঠিকাগণের উচিত উহারই বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং অতিপ্রিয় বামাবোধিনীকে সযত্নে রক্ষা করা এবং সর্ব্বতোভাবে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া; ইহাতেই তাঁহার সম্মান রক্ষা এবং প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জগতে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করা হইবে।

বঙ্গভূমিতে বিস্তর শিক্ষিতা উদারান্তঃকরণা মহিলা আছেন। তাঁহাদের নিকটেও আমার এই বিনীত নিবেদন যে, পরলোকগত মাহাত্মার অক্ষয়কীর্ত্তি যেন মহিলাকুলের দ্বারা সুরক্ষিত হয়। আমরা প্রবাসী হইয়াও তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হই নাই, তাই আজ শোকতপ্ত প্রাণে পরম পিতার পদপ্রান্তে দেবাত্মার শোকার্ত্ত পরিবারের শান্তি প্রার্থনা করিতেছি এবং বামাবোধিনীর মঙ্গলার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। সেই পুণ্যময় জীবনের ছায়া যেন আমাদের দেশকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে। তিনি যেরূপ স্বার্থহীনভাবে সৎকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, সেইরূপ উচ্চ আদর্শ গঠিয়া আমাদের কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। আশা করি, এ অধমজনের প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে। হরি ওঁ শান্তি।

শ্রী নিস্তারিণী দেবী
মনোজবারচয়িত্রী।

মহিলা-স্মৃতি-সভা*,

১৩৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১

কে বলে গো দেব! তুমি নাহি এ ধরায়?
কে বলে ছেড়েছো তুমি দুঃখী অনাথায়?
অই শত ভগ্ন প্রাণ, কার বলে বলীয়ান্,
ধন্যবাদ-ভরে শির দিতেছে নমিয়া?
কে বলে গো দেব! তুমি গিয়েছ ত্যজিয়া?

২

কে বলে গো দেব! তুমি নাহি এ ধরায়?
কে বিতরে আজি বল এই অনাথায়?
বিধাতার বরপুত্র, পুণ্যবান্ সুচরিত্র,
চিরতরে শুভস্মৃতি থাকিবে বজায়,
কে বলে ছেড়েছ তুমি দুঃখী অনাথায়?

* গত ১৯শে জুলাই শুক্রবার পরলোকগত বামাবোধিনীসম্পাদক উমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয়ের স্মরণার্থ এক মহিলাসভা হয়, তাহাতে অনেকগুলি বিদুষী মহিলা সমবেত হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার বিষয় আলোচনা করেন।

৩

কে বলে গো দেব তুমি নাহি গো ধরায়?
ব্রাহ্মধর্ম্ম কার আজি নিশান উড়ায়?
"পাপী তাপী অবহেলে, অমরায় যাবে চলে,"
এই যে উদার প্রেম ঢেলেছো ধরায়,
অই শত মহাপাপী ঘোষে সেই জয়।

৪

কে বলে সাধুর বাঞ্ছা বিফলেতে যায়?
কে বলে ধনেই শুধু সব লব্ধ হয়?
সাধনা যে সিদ্ধিমূল, কে বলিবে ইহা ভুল?
ও পূত জীবনমাখা এরি পরিচয়,
কে বলে ধনেই শুধু সব লব্ধ হয়?

৫

তুমি ত ভিখারী ছিলে কিবা ক্ষতি তায়?
শত লক্ষ ধনে ছিল পূর্ণ ও হৃদয়,
দেখিয়াছি যোগাসনে, বসিয়া কর্ম্মীর সনে,
কত জ্ঞান কত পুণ্য ঢেলেছো ধরায়,
তুমি ত ভিখারী ছিলে কিবা ক্ষতি তায়?

৬

কে বলে ধর্ম্মের বল খাটে না হেথায়?
প্রাণপাত যে সাধনা কভু বৃথা যায়?
বিশাল কার্য্যের ক্ষেত্র, অই হোথা সুবিস্তৃত,
অবিশ্বাসী মানবের ভাঙ্গিতে সংশয়
বিশ্বাসী জীবন তব থাকিবে অক্ষয়।

৭

কে বলে গো দেব তুমি নাহি এ ধরায়?
সেই ধর্ম্ম বিলায়েছ কে মুছিবে তায়?
সতত প্রফুল্লমন, প্রভুপদে অনুক্ষণ,
আপনাকে সমর্পিয়া লভিলে বিজয়
ও পূত জীবন শুধু বিশ্বাস ছড়ায়।

৮

কে বলে গো দেব তুমি নাহি এ ধরায়?
কাহার আশীষ পাই দমনী শিরায়?
ধর্ম্মযুদ্ধে মহাবীর, কর্ম্মক্ষেত্রে অতি ধীর,
অটল পর্ব্বত সম বিপদের ঘায়,
সম্ভব এতই গুণ শুধু দেবতায়।

৯

কে বলে গো দেব তুমি নাহি গো ধরায়?
অই যে কর্ম্মের ক্ষেত্র ঘোষে কার জয়?
পাপী তাপী অভাজন, কিবা সাধু পুণ্যবান্,
সবারে শীতল কোলে দিয়াছ আশ্রয়,
সম্ভবে এতই গুণ শুধু দেবতায়।

১০

কে বলে ধর্ম্মের বল খাটে না হেথায়?
'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং' মন্ত্র বৃথা যায়?
বিশাল এ ধরণীতে, অই শত পরাণেতে,
কি শুভ্র জ্যোতির আভা বিকাশে হেথায়
কে বলে ধর্ম্মের বল খাটে না ধরায়?

১১

কে বলে ধর্ম্মের কথা কভু বৃথা যায়?
কে বলে যোগীর বল—শেষ কল্পনায়?
অই ত আদর্শ প্রাণ, আছে চির নিদর্শন,
সাধনাতে সিদ্ধিলাভ সাধুর বচন,
মহাঋষি! জীবনেতে দিয়াছ প্রমাণ।

১২

সর্ব্বোপরি দেব তুমি হয়ে মহাবীর,
রচিয়াছ সিংহাসন ভারত-নারীর
হৃদয়ের অভ্যন্তরে, মরমের স্তরে স্তরে,
অমর অজেয় নব থাকিবে বজায়
সেই মহাসিংহাসন, কে ভাঙ্গিবে তায়?

১৪

কে বলে গো দেব তুমি নাহিগো ধরায় ?
মলয় কাহার এত সুবাস ছড়ায় ?
অভাগিনী নারী তরে, প্রাণপাত অকাতরে,
মেতেছে তাহারা অই তব বন্দনায়,
কার প্রভা তারা আজি হেথায় ছড়ায় ?

১৪

কে বলে, নারীর বন্ধো ! নাহিক হেথায় ?
অই দেখ নারীকুল তব পরিচয় ;
(তাহারা) তোমারি হাতের গড়া,
তোমারি আশীষ-ভরা,
জ্ঞান-বলে বলবতী এ পাপ ধরায়
কণ্টকের বনে তারা অই চলে যায়।

১৫

কি বলে পূজিব মোরা থাকহে মাথায়,
নিত্য নব বল দাও দুঃখী অনাথায় ;
আবিলতা তেয়াগিয়ে, বিবেক বৈরাগ্য লয়ে,
যে সব নারীর দল চলেছে ধরায়,
তুমি দেব হোয়ো হোয়ো তাদের সহায়।

১৬

কি বলিব আর দেব ? এ পরাণ চায়
পেতে সেই মহামন্ত্র, যে বলে ধরায়
এত ধর্ম্ম সমাপন, পুণ্যরাশি বিতরণ,
করিয়ে হইলে জয়ী ঘোর তপস্যায়,
সবে দাও সেই মন্ত্র, এ মিনতি পায়।

১৭

কে বলে গো দেব তুমি নাহিক ধরায় ?
স্বদেশ-সেবক কোথা হেন দেখা যায় ?
যত কিছু আবিলতা, আবর্জ্জনা কুটিলতা,
ছুঁতেও না পেলে তোমা কম সাধনায় ?
মহাঋষি সিদ্ধি পেলে এ পাপ ধরায়।

১৮

ভালই হয়েছে দেব গেছ অমরায়,
কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেছে মলিন ধরায় ;
(সেই)
মহারাজা পাশে তব, রয়েছে আসন নব,
হোথা হতে সুবাস যে আসিছে হেথায়,
ভালই হয়েছে সুখে আছ অমরায়।

১৯

তাঁহার বিধান "ভাল" বলিব নির্ভয়ে,
"ভালই" তাঁহার বজ্র যেতে হবে সয়ে ;
তিনি মঙ্গলের মূল, এতে কিছু নাহি ভুল,
"তাঁহার বিধান ভাল, মানিতেই হবে,"
বৃথা হাহাকার কেন কান্দে এই ভবে ?

২০

থাক থাক সুখে থাক মাথার উপর,
অনুক্ষণ ভাঙ্গা প্রাণে আশীষ বিতর ;
হৃদয়ের বন্ধু সনে, অমরার সে উদ্যানে,
চিরতরে হইয়াছে শুভ সম্মিলন,
ওরো গো আমার তরে রেখ কিছু স্থান।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

প্রয়াণ।

১

হে তাপস ! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
হেথাকার যজ্ঞক্রিয়া,
এবে বুঝি সমাপিয়া,
করিলে অনন্তধামে সমাধি-শয়ান,
পার্থিব পিপাসা হ'তে পাইলে হে ত্রাণ।

২

হে তাপস ! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
এ ধরার তপোবনে,
পেলে না সাধন ধনে,
শান্তির বিজন বনে লভিলে হে স্থান।
প্রেমানন্দে তৃপ্ত মনে হলো দিব্য জ্ঞান।

৩

হে তাপস ! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
শুদ্ধ শান্ত স্থিরমতি,
পরদুঃখে দুঃখী অতি,
দয়ার জ্বলন্তমূর্ত্তি হৃদয় মহান্।
দেবতা মানব-দেশে মহা গরীয়ান্॥

৪

হে তাপস ! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
মাতৃভূমি হলো শূন্য
হারায়ে সুপুত্র পুণ্য,
যাঁর তরে ছিল ধন্য স্বদেশ সম্মান।
মহাব্রত ছিল তব পরের কল্যাণ।

৫

হে তাপস ! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
পরম ধর্ম্মাত্মা হয়ে,
সবে ধর্ম্ম বিতরিয়ে,
শিখাইলে নীতিশিক্ষা হয়ে ভক্তিমান্।
উচ্চ নীচ নর নারী সকল সমান।

৬

হে তাপস ! আজি তুমি করিলে প্রয়াণ।
অশ্রান্ত অক্লান্ত ভাবে,
সেবিলে সবে নীরবে,
নাহি ছিল কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠান,
গোপনে গোপনে পুণ্য হতো সমাধান।

৭

হে তাপস ! আজি কোথা করিলে প্রয়াণ
নিষ্কলঙ্ক দিবাকর,
ধর্ম্ম পুণ্যে মনোহর,
বিদ্যাপ্রিয় অনুরাগী দূরিত অজ্ঞান।
বহুদর্শী চিন্তাশীল বিনয়ী সুজন।

৮

হে তাপস ! আজি কোথা করিলে প্রয়াণ ?
আর কে রমণীকুলে
স্থাপিবে উন্নতি-মূলে,
উচ্চ শিক্ষা সুসম্মানে করিবে পূজন।
তনয়া সোদরা সম করিবে যতন।

৯

হে তাপস ! আজি কোথা করিলে প্রয়াণ ?
বামার উন্নতি তরে,
সৃজি বামাবোধিনীরে,
পতি পত্নী দোঁহে মিলি সাধিলে কল্যাণ,
ধন্য স্বদেশের প্রেম মহা অতুলন !

১০

আজি তোমা-হারা হয়ে হলো ভগ্নপ্রাণ,
ছিল হে কুশলী চিত্ত
যাহাদের তরে নিত্য
পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু ভগিনী সমান।
শিক্ষা দীক্ষা দিয়া আর কে বাড়াবে মান ?

১১

বহুগুণযুত জ্ঞানী সুধীর সুজন।
তোমা তরে হে উমেশ,
কাঁদিছে বিদেশ দেশ,
ঘরে ঘরে অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন।
কিবা নর কিবা নারী শোকতপ্তমন।

১২

বঙ্গের উজ্জ্বল রবি হে সত্যরঞ্জন!
বাণী লক্ষ্মী শচীন্দ্রাণী,
করিতেছে উলুধ্বনি,
আজিকে অমরাভূমে অমরশোভন।
মহর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ করে সম্ভাষণ।

১৩

ব্রহ্মপদ লাভ করি মুক্ত দেহ মন।
আপন সুকৃতিফলে,
ধন্য ইহ পরকালে,
বিজয়ী পুরুষ সম করিলে গমন।
গৃহসংসারের সুখ করিয়া বর্জ্জন।

১৪

আমরা অগ্রজপদে করিয়ে বরণ
দিব ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
সবে ভাই বোন মিলি,
দেবের চরণে তব সুগতি কারণ।
দেহের পতনে নহে আত্মার মরণ।

শ্রীমনোজবারচয়িত্রী।

ভ্রাতা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে

ভগিনীর বিলাপ।

১

হা দাদা, তোমারে ছাড়ি এখন ধরায়
জীবিত রয়েছি আমি,
কোথায় গিয়েছ তুমি?
আজি আমি শান্তিহারা, পথহারা প্রায়।

২

কার সনে গেছ তুমি, আছ কোন্ খানে?
কে তোমারে নিয়ে গেছে,
গেছ তুমি কার কাছে,
এ স্নেহের ভগিনীরে আছে কি স্মরণে?

৩

যেখানে যখন তুমি করিতে গমন,
সর্ব্বাগ্রে বলিতে মোরে,
আজি কেন অনাদরে,
ভগিনীরে একেবারে করিলে বর্জ্জন।

৪

ওহে ভ্রাতঃ স্নেহময়! তোমারে ছাড়িয়া
কেমনে বাঁচিব আমি,
কেমনে বা রবে তুমি
এ স্নেহের ভগিনীকে চক্ষে না দেখিয়া।

৫

যেখানে যখন থাক, মাস দুই পরে
আসিয়া আমার কাছে,
দেখ কে কেমন আছে,
আজি কেন তেয়াগিয়া গেলে অনাদরে?

৬

শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা তুমি আমার কল্যাণে
খাটিয়াছ নিশি দিন,
আজ আমি ভাগ্যহীন,
এখন রয়েছি তোমা সঁপিয়া শমনে।

৭

কোথায় গিয়েছ দাদা, কেন দাদা গেলে?
ঊষা, শান্ত, চারুশীলা,
আজো খেলে ধূলাখেলা,
তারা কি বাঁচিবে আহা বাবাহারা হ'লে।

৮

শিশু সুকুমার আজ ভ্রাতা ভগ্নী সহ
কাঁদিছে ধূলায় গড়ি,
দিয়ে কত গড়াগড়ি,
সন্তোষ, আনন্দ, মণি কাঁদে অহরহ।

৯

পিতৃস্নেহে মাতৃশোক ভুলেছিল তারা,
আজ তারা ভাগ্যহীন,
আজ তারা বিমলিন,
এক সঙ্গে হলো আজ পিতৃমাতৃহারা।

১০

মাতৃহীন শিশুগণে কোলে পিঠে করে
মানুষ করিয়াছিলে,
এবে ফেলি শোকানলে,
চির জনমের মত দূরে গেলে সরে।

১১

তোমাকেই শিশুগণ মা বলিয়া জানে,
তুমিও মায়ের মত,
যতন করিতে কত,
কিরূপে আনন্দ, মণি বাঁচিবে পরাণে?

১২

ফিরে এস ভ্রাতৃবর! ফিরে এস ঘরে,
দেবতার মত তুমি,
সম তব স্বর্গ, ভূমি,
মুনিরা জীবন মৃত্যু সম জ্ঞান করে।

১৩

যেও না পরের দেশে ফিরে এস ভাই!
চির রোগা ঊষা মেয়ে
তব কোলে মাথা থুয়ে
বাঁচিত, এখন আর কোন আশা নাই।

১৪

পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে সদা সর্ব্বক্ষণ
স্বাস্থ্য হেতু দেশে দেশে
ভ্রমিতে কতই ক্লেশে,
সে চিররুগ্নার দশা কি হবে এখন?

১৫

কে জানেগো ভ্রাতঃ, তুমি এমন করিয়া
এত শীঘ্র যাবে চলে,
বিপদসাগরে ফেলে,
প্রিয় বস্তুগণে—প্রাণ পাষাণে বাঁধিয়া।

১৬

সংখ্যাতীত গুণ তব ছিল গুণময়!
জানিতে বিভুর তত্ত্ব,
তাই তাতে ছিলে মত্ত,
সংসার-আশ্রমে থাকি রাজর্ষির প্রায়।

১৭

জগৎ হইল অন্ধ তোমার বিহনে,
শত শত নর-নারী,
কাঁদিছে করুণা করি
ঝরিছে শোকাশ্রুধারা পশুরও নয়নে।

১৮

উঠিল জগৎব্যাপী হাহাকারধ্বনি!
খুঁজিছে সমস্ত দেশ,
হা উমেশ,—হা উমেশ!
বামাবোধিনীর শিরে পড়িল অশনি।

১৯

বামাবোধিনীর যত লেখক লেখিকা,
সকলি বাপের মত,
সম্মান করিত কত,
আদরে ছাপিতে তুমি সবাকার লেখা।

২০

অবলাকুলের বন্ধু তুমি মহাশয়!
তব সম পরহিতে,
কে পারে পরাণ দিতে,
ও হো হো, এ শোকবহ্নি নিবিবার নয়।

২১

যাও তবে যাও ওহে অমূল্যরতন!
যদিও তোমার তরে,
কাঁদিব জীবনভরে,
সদা ভ্রাতৃ-শোকানলে হইব দহন।

২২

তথাপি তোমারে আজি দিতেছি বিদায়,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া;
যাও ভ্রাতঃ! স্বর্গে গিয়া
সস্ত্রীক হইয়া থাক দেবতার প্রায়।
তোমার স্নেহের ভগিনী—

অম্বুজা।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে,—

শোকগাথা।

(১)

দুরদৃষ্ট বঙ্গ-মার! অঙ্ক হতে আজি তাঁর,
অকালে করাল কাল চির তরে হায়!—
সহসা লইল হরি, মাতৃ অঙ্ক শূন্য করি,
মহাত্মা উমেশচন্দ্র হে দেব! তোমায়!

(২)

ব্রহ্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, নির্ব্বিরোধী, ন্যায়বান্,
দেশভক্ত, সুবিদ্বান্, বঙ্গের সন্তান;
দেশকার্য্যে দেহ মন করেছিলে সমর্পণ,
দেশের উন্নতি তরে তুমি হে মহান্!

(৩)

তব শোকে নিমগন বঙ্গবাসী সর্ব্বজন,
কাঁদিছে আকুল প্রাণে করি হাহাকার;
জগতের কোন্ পারে,
কোথা গেলে কোন্ ধারে?
বিষম বিষাদে বঙ্গ করি অন্ধকার?

(৪)

তব হৃদয়ের ধন, প্রিয় পুত্রকন্যাগণ,
কাঁদিছেন মহাশোকে দেখ আসি হায়!
হয়ে তাঁরা মাতৃহীন ছিলেন যে এতদিন,
তব পুত শান্তিময় স্নেহের ছায়ায়।

(৫)

তুমি সিটি কলেজের—
হিতাকাঙ্ক্ষী ছাত্রদের—
সুদক্ষ অধ্যক্ষ ছিলে পিতার সমান;

কাঁদিছে আজি যে তারা,
শোকে হয়ে আত্মহারা,
কর গো তাদের এসে সান্ত্বনা প্রদান।

(৬)

তুমি যে পরের তরে, স্বার্থ সুখ ত্যাগ করে,
খাটিতে দৈহিক কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করি;
অনিদ্রায় উপবাসে, রোগীর শয্যার পাশে
থাকিয়া করিতে সেবা অনুক্ষণ ধরি।

(৭)

আত্ম-বন্ধু নাহি যার, মৃত্যু হলে তুমি তার,
স্বেচ্ছায় করিতে সেই দেহের সৎকার;
দীনা ভদ্র বিধবায়, নেহারিলে অসহায়,
তুমি যে সাহায্য কত করিতে তাঁহার।

(৮)

ক্ষুধিত দরিদ্রগণে, অন্ন দিয়ে সযতনে,
করিতে তাদের তুমি ক্ষুধা নিবারণ;
বিপন্নের উপকার, করিতে যে অনিবার,
পাওনি বিশ্রাম কভু এদের কারণ।

(৯)

ভারত-বালার যত, হিতে সদা ছিলে রত,
করিতে সম্মান কত তুমি রমণীর;
বামাকুলে বোধ জ্ঞান, করিবারে সম্প্রদান,
হয়েছিলে সম্পাদক 'বামাবোধিনীর'।

(১০)

ভারতমহিলা যত, হয়ে আজি শোকাহত,
করিছেন দুঃখভরে নীরবে রোদন;
কেমনে গো স্নেহময়! হয়ে তুমি নিরদয়,
মোদের কাঁদায়ে কোথা করিলে গমন?

(১১)

কে আর তোমার ন্যায়, দিবে সে উৎসাহ হায়!
ভারতীয় নারীগণে সাহিত্য-চর্চ্চায়?
কে আর পরের তরে, তোমার মতন করে,
খাটিবে আপন স্বার্থে বলি দিয়ে হায়!

(১২)

উমেশ তোমার নাম, শিবময় অবিরাম,
অশিব সে পরিহরি মঙ্গল সাধিয়া—
মিলিতে উমার পাশে, গেলে কি কৈলাস-বাসে?
উমা তব অপেক্ষায় আছেন বলিয়া।

(১৩)

মৃত তোমা কেবা কয়? উমেশ যে মৃত্যুঞ্জয়,
সুকীর্ত্তিতে তুমি চির অজর অমর;
আমরা অবোধ যত, না বুঝিয়া অবিরত,
মৃত তোমা ভাবি শোকে হতেছি কাতর।

শোক-সন্তপ্তা অভাগিনী লেখিকা,—
শ্রীসুশীলাসুন্দরী মিত্র।

শোকোচ্ছ্বাস।

মানবজীবন হায় পলকে মিলায়!
ভারতভূমির প্রিয়, স্নেহময়, পূজনীয়,
আদর্শ দেবতা আজি কোথা চলি যায়?
কে জানে বিধির ইচ্ছা কত লীলাময়;
বিধাতা রহস্যপ্রিয়, মিটায় বাসনা স্বীয়,
আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়া মানবহৃদয়।

সে দিন এসেছি দেখি স্নেহময় ছবি,
প্রফুল্ল দেবতা-মূর্ত্তি, সদা হাসি সদা স্ফূর্ত্তি,
সদা স্নেহপূর্ণ কথা তেজপূর্ণ রবি।

তিনি আজ স্বর্গপুরে নাহি আর ভবে,
শূন্য যেন চরাচর, শূন্য সেই বাড়ী ঘর,
তাঁহারে পোড়ায়ে ছাই করেছে মানবে।

স্বপ্ন ধরা, স্বপ্ন হায় মানবজীবন!
এত স্নেহ বিসর্জ্জিয়া,রব মোরা কি লইয়া,
জীবন কাটিবে করি অশ্রু বিসর্জ্জন।

সহসা ঝটিকাবেগে ফাটিছে হৃদয়।
সে মমতা,সেই স্নেহ,আর কি বিলাবে কেহ?
কোথায় চলিলে আজি ওহে স্নেহময়!

ঢালিয়া স্নেহের রক্ত প্রাণপণ করে
পেলেছিলে দেবোপম! স্নেহের দুহিতা সম
'বামাবোধিনী'রে তুমি পরম আদরে।

আজি যে সে অশ্রুমুখী তোমার লাগিয়া,
তোমারি সহিত হায়! বুঝি সে নিভিয়ে যায়,
মহিলার শিক্ষাদীপ নিভাইয়া দিয়া।

আর নাই উচ্চ আশা ফুরায়েছে সব,
যাও তুমি স্বর্গপুরে, শোক তাপ যাবে দূরে,
সহিবে অসহ্য শোক পাষাণ মানব।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন,
বেনারস।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী শীত ঋতুতে এডিনবরা নগরে ভারতীয় শিল্পজাতের একটী প্রদর্শনী হইবে। ঐ স্থানে বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের একটী সভা বসিবে। বারাণসী হইতে বহুবিধ উপাদেয় স্বদেশী শিল্পজাত প্রেরিত হইয়াছে।

২। আমেরিকাবাসী জে, টি, রোকি ফেলার সম্প্রতি তত্রত্য সাধারণ শিক্ষা সমিতির হস্তে ৯,৬০,০০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। কিরূপ সদুপায়ে ধনোপার্জ্জন করিতে হয়, এবং কিরূপে সেই উপার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, এই উদার অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান তাঁহার এইরূপ অর্থদানের উদ্দেশ্য।

৩। আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অদ্য আরও দুইটী স্বদেশহিতৈষী মহাত্মার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। হিতবাদী-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় এবং কলিকাতা পুলিশ কোর্টের খ্যাতনামা উকিল কালীচরণ পালিত আর ইহলোকে নাই। আমরা স্বদেশের আরও দুইটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইলাম!

৪। যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া বার্ম্মিংহাম বা মানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষা করিবেন, এরূপ ছয়টী ছাত্রের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২২৫০৲ টাকা ছাত্র-বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা উন্নত পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিল্প ও বাণিজ্যাদিবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবেন।

No. 529. Registered No. C. 134. September, 1907.



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

বর্ষ। ৮ম কল্প।
সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩১৪। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব	... ...	১২৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	... ...	১৩০
তপস্যা	... ...	১৩৪
রসায়ন	... ...	১৩৭
সদ্যোজাত শিশুর রোগ নির্ণয়	...	১৩৮
ধর্ম্মের আদর্শ	... ...	১৩৯
নিদাঘ পূর্ণিমায়	... ...	১৪১
মহিলা স্মৃতিসভা	... ...	১৪৫
নিবেদন	... ...	১৪৮
১০। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি	...	১৫০
১১। বার্ষিক	... ...	১৫৩
১২। বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব-সভা।	... ...	১৫৩
১৩। নূতন সংবাদ	... ...	১৫৬
১৪। পুস্তকাদি সমালোচনা	...	১৫৬
১৫। বামারচনা—		
শোকগাথা (সরলাসুন্দরী মিত্র)		১৫৯
শ্রাদ্ধবাসরে (সরোজিনী রায়)		১৬০
শেষ (চারুশীলা মিত্র)		১৬০

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন; পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুরূনবৎ দারুণ বেদনা, ঢোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠো থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ধুড় ধুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হি

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য মাশুল ॥০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ দূরে যাইবে, গলার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রা না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই ঘড়্ ঘড়্ করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ে অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৪নং রাজ নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

529. September, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫২৯ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩১৪। সেপ্টেম্বর, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

আজি বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। নিয়ম-পালন-রূপ কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আজি আমাদিগকে অশ্রু মুছিতে মুছিতে সমবেত হইতে হইল। যিনি বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক, বামাবোধিনীর প্রাণময় পুরুষ, বামাকুলের চির-সুহৃদ্, যাঁহার ঐকান্তিক যত্নে আজি বামাবোধিনী, বামাকুলের এত গৌরব, এত আদরের সামগ্রী, সেই যজ্ঞেশ্বর আজি আমাদিগকে অনাথ করিয়া, বামাবোধিনীকে অনাথা করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আজি এ দীনহীনের ভবন রামশূন্য অযোধ্যাগৃহ। এ দিনে, এ ভবনে, এ ঘটনায়, আজি আপনাদিগকে দেখিয়া এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের এই শুভ দিন স্মরণ করিয়া আমার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে, এবং মর্ম্মের রক্ত অশ্রুরূপে বহির্গত হইতেছে। আপনারা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা, বামাবোধিনীর প্রতি অনুরাগ ও এ দীনহীনের প্রতি করুণা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বামাবোধিনী আপনাদের প্রাণের সামগ্রী এবং ইহা আপনাদের রক্ষণীয়া সহোদরা। এক্ষণে বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব ও ইহার জীবনের আশা ভরসা আপনারাই। আমি যতদূর অবগত আছি, মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি,—স্বদেশের বামাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ সমুন্নতি আমার পিতৃদেবের ব্রহ্মসাধনার ন্যায় অদ্বৈত সাধনীয় ছিল। আপনাদের সেই চিরহিতৈষী পিতৃস্থানীয় মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা এ বামাবোধিনীর সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন বিষয়ে আপনারা কি অগ্রসর হইবেন না?

তিনি বামাকুলের দুর্গতিমোচনের জন্য পতিতপাবনের চরণে যে সকল মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি শূন্যে বিলুপ্ত হইবে? কখনই নহে। আমি যেন দিব্য-

PAGE CONTAINS TWO

চক্ষে দেখিতেছি, তাঁহার অমর আত্মা দিব্য তেজে উদ্ভাসিত হইয়া আজি আমাদের সমক্ষেই আসিয়া অভয় দিতেছেন, বলিতেছেন—"ভয় নাই! ভয় নাই! বৎসগণ! কন্যাগণ! ভগ্নীগণ! ভয় নাই! ভয় নাই! এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। আমার নশ্বর ভৌতিক দেহেরই বিলয় হইয়াছে, কিন্তু আমার অমর আত্মা আজি মঙ্গলময়ের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া তোমাদিগকে দিবার জন্য উপস্থিত; এত দিনের পর আমার সাধনা পূর্ণ হইল। তোমরা এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও ধারণ কর, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

হে সমপ্রাণা ভগ্নীগণ! আইস, আমরা অদ্বৈত-প্রেম-সূত্রে প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া আমাদের ঐ জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। ব্রহ্মকৃপায় ও ব্রহ্মময় পিতার আশীর্ব্বাদে আমাদের গন্তব্য পথ পুষ্পময়, আনন্দময়, অমৃতময় হউক। উর্দ্ধে, নিম্নে চতুর্দ্দিকেই আমাদের জন্য ব্রহ্মকৃপা বিকীর্ণ, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিতহৃদয়ে আমাদের সেই পুণ্যময় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। আমাদের সেই স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া সকলকে অনন্ত মঙ্গলের পথে পরিচালিত করুন।

"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনয়াবনত সেবক

সুকুমার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তের জন্য শোকসভা—গত ১০ই আগষ্ট, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মেট্রোপলিটান টেম্পারেন্স এণ্ড পিউরিটি সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(১) মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত যিনি এই সভার মূল পত্তন হইতে যাবজ্জীবন ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন, যাঁহার সমস্ত জীবন পবিত্রতা ও সংযমশীলতার লোকপাবন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সেই সাধু পুরুষের পরলোকগমন জন্য এই সভা হৃদয়ের গভীরতম শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। (২) এই সভা উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। (৩) এই সভার অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের বিবরণ-লিপি, স্বর্গীয় মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার দত্তের নিকটে প্রেরিত হইবে।

ভারতবর্ষে প্লেগ এবং তদ্বিষয়ে রাজসহানুভূতি—ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবর্ষবাসী প্রজাবর্গের প্লেগরোগের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন:

ভারতবাসিগণ এই একাদশ বর্ষ মহামারী প্লেগরোগে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, আমি উদ্বিগ্ন-চিত্তে এই শেষ কয়েক বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। আমার ভারতবর্ষের প্রজাদিগের কল্যাণ সর্ব্বদা আমার গভীর চিন্তার বিষয়, এবং রোগগ্রস্ত পরিবার সকল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অসহনীয় ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহা যখন স্মরণ করি, তখন আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। তুমি অবগত আছ, তুমি এবং তোমার পূর্ব্বরাজপ্রতিনিধিগণ এই মহামারীর কারণ অনুসন্ধান এবং তৎপ্রশমনের উপায় উদ্ভাবন করিতে ত্রুটি করেন নাই। অধুনা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা ভগবানের কৃপায় সফল হউক, আমার এই আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা। আমার অভিলাষ এই যে, আমার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

প্লেগ নিবারণের জন্য কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা হইবে না। সেই পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ইন্দুরবধ, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপ্রতিপালন, রোগাক্রান্ত গৃহ পরিত্যাগ এবং টীকা দেওয়া এই কয়েকটী এখনও অবলম্বিত হইবে, তবে কোন বিষয়ে বল প্রয়োগ করা হইবে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে প্লেগ অনুসন্ধানকরী সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ—বিগত ২০শে আগষ্ট সিটি কলেজ-গৃহে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কলেজ-গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আনন্দমোহনের গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডেশ্বর এবং দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার-যাত্রা—নপ্তৃক ইংলণ্ডেশ্বর যুবরাজ ও ডিউক অব্ কনট সমভিব্যাহারে নিমরড-নামক পোতের দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার-যাত্রার উৎসাহ দান করিবার জন্য কাউইস উপকূলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে সকলে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। আমাদের ইংলণ্ডেশ্বর বৈজ্ঞানিক কার্য্যের এরূপ উৎসাহদাতা শুনিলে কে না আনন্দিত হইবে?

ভারত-হিতৈষিণী আনিবেসাণ্ট দেবী—বালকেরা যাহাতে কোনও সুরার দোকানের বা কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে না পারে এবং যাহাতে বালকেরা ঐ বিষময় পদার্থের কোনও সংস্রবে না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে বিলাতের কুইনস্ হলে আনিবেসাণ্ট

দেবী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ গুরুতর অর্থব্যয় হয়, সে ব্যয়-ভার বহন করিতে অনেকেই অসমর্থ। এই ব্যয়-ভার কমাইয়া গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন, সে জন্য আনিবেসাণ্ট দেবী ইংলণ্ডের সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ঘোর আন্দোলন তুলিয়াছেন। চিরকাল ভারতে বিনা মূল্যেই উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এক্ষণে এক একটী সন্তানের শিক্ষার জন্য গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

দান—(১) দানবীর মিষ্টার কার্ণেগী 'কিংস্ হস্পিটাল ফণ্ডে' ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(২) জয়পুরের মহারাণী লেডী মিণ্টো নার্সিং এসোসিয়েসনে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৭ই আগষ্ট মহোৎসব—এই দিন বঙ্গবাসীর পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন। কলিকাতা ও বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গ-বিভাগের এই দিনের পবিত্র স্মৃতি পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মহাসমারোহের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের ব্রত সকলের মনে জাগরূক করা হইয়াছিল।

দাদাভাই নৌরোজী—মধ্যে ভারতের সুসন্তান দাদাভাই নৌরোজী বিলাতে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। মঙ্গলময় তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয়—বিগত ২৩শে আষাঢ় বর্দ্ধমানের মহারাজ অধিরাজের সভাপতিত্বে কলিকাতা ব্রহ্ম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আলবার্ট হলে এক সভার অধিবেশন হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য প্রকৃত একেশ্বরবাদিগণ এখানে মিলিত হইয়া নিজ নিজ মতের আলোচনা করিবেন—সাহায্য করিবেন যাহাতে উৎসাহী যুবকগণ এখান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া ভারতের সকল শ্রেণীর মধ্যে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে উপাসনারত করিয়া তুলিতে পারে, তাহাদের আধ্যাত্মিক ঔদাসীন্য দূর করিয়া দেয়। ৬৫ নং বিডন ষ্ট্রীটে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। ভগবান্ মহাত্মাদের সাধু ইচ্ছার সহায় হউন।

দেশলাইয়ের কারখানা—অনারেবল্ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় কলিকাতা সহরে একটী দেশলাইয়ের কারখানা খুলিয়াছেন। দুইজন বাঙ্গালী যুবক পূর্ণচন্দ্র রায় ও আনন্দ চন্দ্র ঘোষ জাপান হইতে দেশলাই নির্ম্মাণ কার্য্য শিখিয়া আসিয়া এই কারখানা চালাইতেছেন। মঙ্গলময় স্বদেশের এই স্থায়ী শুভ কার্য্যের সহায় হউন।

মহিলাসভা—যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাঠাকুরাণীকে সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাকে এক খানি

অভিনন্দন পত্র দিবার জন্য গত ২১শে শ্রাবণ কলিকাতার ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাটীতে এক মহিলাসভা হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বঙ্গ-মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহাকে একখানি রৌপ্য-আধারে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। তিনি প্রথমতঃ রৌপ্যপাত্রটী গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, অবশেষে সকলের উপরোধে উহা গ্রহণ করেন।

শোকসংবাদ—অহো আমাদের কি দুর্দ্দিন! বারম্বার শোকের উপর শোক-শল্যের আঘাত! বঙ্গজননীর আর একটী পুত্ররত্ন আজি অপহৃত হইল। যাঁহার লেখনীর নিকট বঙ্গভাষা চির-ঋণে আবদ্ধ, যিনি সুদীর্ঘকালব্যাপী অবিচলিত সাধনাবলে মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথ কৃত টীকা, সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও টিপ্পনী সমেত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই স্বনামখ্যাত মহাত্মা দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম, আর, এ, এস, আজি আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে প্রস্থান করিলেন।

লোকসংহারের অদ্ভুত উপায়—সম্প্রতি সভ্যতম ফ্রান্স দেশে একটী অদ্ভুত ব্যোমযানের সৃষ্টি হইয়াছে এবং জার্ম্মণী দেশেও ঐরূপ আর একটীর সৃষ্টি হইতেছে। উহা এরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত ও পরিচালিত যে, উহা রাশি রাশি ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র লইয়া ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইবে। অধৃষ্য ঊর্দ্ধলোক হইতে অগ্নি বর্ষণ করিয়া শত্রুরাজ্য ভস্মসাৎ করিবে। এই ব্যোমযান-যুদ্ধ প্রচলিত হইলে দুর্গ, পরিখা, প্রাকার, কামান, বন্দুক, রণতরী প্রভৃতি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইবে এবং অনায়াসে অল্প সময়েই অগণ্য মহাপ্রাণীর সহিত এক একটী জনপদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই ভাবী সর্ব্বনাশ নিবারণের জন্য হেগ নামক স্থানের প্রসিদ্ধ মধ্যস্থ-সভায় প্রস্তাব উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই সর্ব্বনাশের ব্যাপারের অভ্যন্তরে জগদীশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়, কেননা যখন এই সাংঘাতিক উপায়ে এক একটী দেশ মহাদেশের ধ্বংস হইতে থাকিবে, তখন অগত্যা সকলকেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সমবেত চেষ্টায় বিশ্বজনীন শান্তি স্থাপন করিতেই হইবে। তখন 'যুদ্ধ' এই কথাটী অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত হইবে। এই সর্ব্বনাশকর প্রলয়-কাণ্ডের মধ্যে মঙ্গলময়ের করুণা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

দেখিতে দেখিতে কালের বক্ষে নিজ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া একটী বৎসর চলিয়া গেল। এই এক বৎসরের মধ্যে কোথাও সুখের গৃহে শোকের বজ্র পড়িয়াছে, কোথাও দুঃখের আঁধারে আশার আলো দেখা দিয়াছে; কোথাও গুণ-গৌরবে বঙ্গ-বাসীর পদোন্নতি, কোথাও রাজ-বিদ্রোহ-অপরাধে লালা লাজপৎ রায় নির্ব্বাসিত; কোথাও আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথাও বিষাদের হাহাকার; এই সব সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু, উন্নতি অবনতি এবং জীবন মৃত্যু বুকে বহিয়া এক বৎসর চলিয়া গেল; আমরা হিসাব করিয়া বুঝিলাম, অনন্ত পথের অভিমুখে খানিকটা অগ্রসর হইলাম।

এ বৎসরে আমার এক প্রধান ঘটনা এই যে,—মামার বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি আমি বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। পীড়া ম্যালেরিয়া জ্বর। দিন কতক এখানে ওখানে চিকিৎসা করাইয়া কোন ফল না পাওয়াতে এখন কলিকাতায় আসিয়াছি। একজন বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে চিকিৎসা করিতে-ছেন। এইখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, আমার মামার বাড়ীর সেই মণিদিদি প্রধানতঃ গঙ্গাস্নান করিবার লোভে আমার একজন প্রধান শুশ্রূষা-কারিণী হইয়া আছেন। তিনি আমার চিকিৎসকের দূরসম্পর্কীয়া মাসতুতো ভগিনী। বহুকালের পরে তিনি এই আত্মী-য়ের অনুসন্ধান পাইয়া আমার উপরে বড় "খুসী" হইয়াছেন। বলা বাহুল্য আমি আমার চিকিৎসক সুরেশ বাবুকে কোনও দিন চাহিয়াদেখি নাই, আমার লজ্জা করে।

আমাদের বাসার খুব কাছে একজন ভদ্র লোকের বাস। আমার শয়নঘরের জানালা খুলিলেই তাঁহাদের সহিত দেখা শুনা হয়। আমাদের পল্লীগ্রাম হইলে এত দিন তাঁহাদের মেয়েদের সহিত আলাপ পরিচয় সহ একটা আত্মীয় সম্বন্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু কলিকাতার রীতি সে রকম নহে; অনেক স্থলে এক বাড়ীতে বাস করিয়া কেহ কাহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না, আমিও সেই নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিলাম না, মণি দিদিকেও মানা করিয়া দিলাম।

আজি সকালে ঘরের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে জানালার জালের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম—আমার শয়ন ঘরের ঠিক্ সম্মুখে ওবাড়ীর যে ঘর, সেই ঘরে খোলা জানালার কাছে একজন রমণী বসিয়া। সে দুই বাহুর ভিতরে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুক্ত কেশকলাপ পৃষ্ঠ, বাহু আবৃত করিয়া ভূতল চুম্বন করিতেছে, সুগোল

হাতে সুন্দর শাঁখা কাঁপিতেছে, অঞ্চল শিথিল হইয়া পড়িয়া আছে।

এই রোরুদ্যমানা রমণীকে দেখিয়া আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল; ইচ্ছা হইল, ডাকিয়া দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আজন্ম-অপরিচিতাকে, এই রকম রোদনের সময়ে কি কথা বলিব, প্রথম আলাপটা কি রকম হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

সহসা কি একটা শব্দ শুনিয়া রমণী চমকিয়া মুখ তুলিল। তার পরে চক্ষের জল মুছিয়া, চুল বাঁধিয়া মাথায় কাপড় দিল। সে মুখ দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিস্মিতা হইলাম, আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল—"তুমি কে গো?"

সুন্দরী আমার প্রতি চাহিয়া সস্মিত-মুখে উত্তর দিল, "আমার নাম সুষমা"।

এ যে সেই সুষমা! আমি ভূতের বাড়ীতে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, আজি এক বৎসর ধরিয়া যাহাদিগের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছি, অথচ যাহা প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বলিতে পারি না, যাহা-দিগকে আত্মজীবন তুল্য ভালবাসি অথচ যাহারা চির-অপরিচিত, এ যে সেই সুষমা!

সুষমা কি ভাবিল জানি না। বুঝি আমার সঙ্গে কথা কহিতে তাহার সাধ হইয়াছিল, কিন্তু আমাকে নীরব নিঃস্পন্দ দেখিয়া একটু মধুর হাসি "উপহার" দিয়া চলিয়া গেল। আমার তখন চেতনা হইল, সেই হাসি-টুকু মনশ্চক্ষে ভাসিতে লাগিল। সে দিন আর তাহাদের কোন খোঁজ খবর পাইলাম না।

(৫)

রাত্রিতে যখন শয়ন করিব, সেই সময়ে সুষমাদের বাড়ীতে—সেই ঘরে সুষমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম, সুষমা বলিতেছে, "আমরা এ জীবন কি করিয়া কাটাইব, তাহা বলিতেছি শুন, এমনতর গোপনে দেখা করিয়া কোন ফল নাই—"।

সহসা পুরুষকণ্ঠে উত্তর শুনিলাম "তুমি তো ব্রহ্মচারিণী, তবে এ হতভাগাকে এ ক্ষুদ্র সুখটুকু হইতে বঞ্চিত করিবে কেন সুষমা?"

সুষমা কাতরস্বরে বলিল,—"দেখ, স্বামি-সন্দর্শন হইতে স্ত্রীলোকের অধিক সুখ কি আছে জানি না; কিন্তু এ জীবনে আমি কি সে সুখ গ্রহণ করিতে পারি? তুমি কি বুঝিতেছ না, আমার সহিত এইরূপ গোপনে দেখা করিলে আমাদের একটা কলঙ্ক হইবে। আর বাবা যদি শোনেন তাহা হইলে হয়তো সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন বাবা কি বাঁচিবেন?"

পুরুষ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"তুমি তো কলঙ্কিত নহ সুষমা, কলঙ্কের ভয়ে স্বামী ত্যাগ করিবে কেন?"

সুষমা কাঁদিয়া কহিল,—"স্বামী আমার অত্যাজ্য, তবে অদৃষ্টক্রমে অগ্রহণীয়। বিধাতা জানেন কলঙ্কের ভয়ে আমি কাতরা নহি। কিন্তু বাবার কি হইবে?"

পু। তুমি কি বলিতেছিলে?

সু। বলিতেছিলাম, আমাদের বিবাহ নহে, ইহা ব্রতাচরণ; আমাদের ভালবাসা নহে তপস্যা; আমাদের কর্ত্তব্য—আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন নহে, লোকহিত; তাই বলি, এস দুজনে কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করি। তুমি কি বল?"

পু। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহা প্রাণপণে করিব নিশ্চিত জানিও। কিন্তু পতিযুক্তার সন্ন্যাস নাই সুষমা? শাস্ত্রে পতিযুক্তা অর্থাৎ সধবার পক্ষে কি ব্যবস্থা আছে তাহা তুমি অবশ্য জান"।

সুষমা গদগদ কণ্ঠে বলিল "শাস্ত্রের ব্যবস্থা কি তাহা আমার মনে নাই; আমার হৃদয়, আমার বুদ্ধি, আমার অন্তরাত্মা বলিয়া দিয়াছে, রমণীর সকল পুণ্য স্বামিসেবা, রমণীর সকল ধর্ম্ম স্বামিপূজা, রমণীর প্রত্যক্ষ দেবতা তাহার স্বামী; যে সেই স্বামি-সৌভাগ্যে বঞ্চিতা, যে আপন-ধনে আপনি চোর, তাহার মত হতভাগিনী ইহ জগতে আর নাই।"

দুজনেই মুক্ত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

হায় ভালবাসা! প্রেমিককে কাঁদাইবার জন্যই বুঝি তোমার উৎপত্তি।

অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া দুজনে থামিল। সুষমার স্বামী বলিল,—"আজ তবে আসি সুষমা, এখনই তোমার মাসীমা তোমাকে ডাকিবেন। তোমার সে রচনাটী কি শেষ হইয়াছে?"

সুষমা উত্তর করিল "না হয় নাই; আমি জানি তোমার কাগজ এই মাসের আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে; কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি মন যে কি অনায়ত্ত হইয়া গিয়াছে, লেখা পড়ায় মনঃসংযোগ করিতে পারি না। কেবল কখন তোমার গাড়ীর শব্দ হইবে, সেই আশয়ে কাণ পাতিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। পশ্চিমে গিয়া কেমন করিয়া থাকিব, তাই ভাবিতেছি"।

পুরুষ খুব জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিও না সুষমা; তুমি আমার সরস্বতী, তুমি ঠিক্ বলিয়াছ আমাদের বিবাহ নহে ব্রতাচরণ, আমাদের ভালবাসা নহে তপস্যা; আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম লোকহিত; আমি এই মন্ত্র জপ করিয়া বুঝি বাকী দিন কাটাইতে পারিব।"

ইহার পরে আর কোন কথা শুনিলাম না। যখন ও বাড়ীর সিঁড়ীতে জুতার শব্দ শুনিলাম, তখন মণি দিদিকে ডাকিয়া আমি বারাণ্ডায় দাঁড়াইলাম। যখন ফুট-পাতের উপরে জুড়িতে উঠিবার জন্য একজন পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমি মণি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ লোকটী কে দিদিমণি?"

দিদিমণি নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন "এতো তোমার ডাক্তার, আমার সুরেশ দাদা; উনি কোথায় ছিলেন?"

আমি আর কিছু বলিলাম না। আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। সুষমা সুরেশ বাবুর স্ত্রী! ভূতের বাড়ীতে সুরেশ ডাক্তারকে দেখিয়া ছিলাম? কলিকাতায় তাঁহারই চিকিৎসাধীনে রহিয়াছি?

"অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"!

(ক্রমশঃ)

রসায়ন।

কোল্ গ্যাস।

প্রস্তুত-প্রণালী—ইংরাজেরা তামাক খাইবার জন্য যে প্রকার নল ব্যবহার করেন, তাহার কলিকার মুখে কোল্ চূর্ণ স্থাপন করিয়া, উপরিভাগ আঁটাল মাটী দ্বারা আবৃত কর; পরে ঐ মাটী শুষ্ক হইলে কলিকাটী উত্তপ্ত করিতে থাক; কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে যে, নলের মুখ দিয়া পীতবর্ণ ধূম নির্গত হইতেছে; এই পীতবর্ণ ধূমটীই কোল্ গ্যাস্। অনন্তর উহা জলযন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করিতে হয়।

কলিকাতা নগরীতে আলোক দিবার জন্য যে কোল্ গ্যাস্ ব্যবহৃত হয়, তাহা তামাক খাইবার নলের পরিবর্ত্তে বৃহৎ বৃহৎ তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত পাত্রে করিয়া রাশি রাশি পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

কোল্ একটীমাত্র যৌগিক পদার্থ নহে; উহাতে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে; অবিশুদ্ধ কোলগ্যাসে নিম্নলিখিত পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকে; যথা জল, আলকাতরা, এমোনিয়া, সাল্‌ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন (H_2S), কার্ব্বলিক এসিড, সায়নোজেন, কার্ব্বণ বাইসাল্-ফাইড (CS_2), কার্ব্বণ মনক্সাইড (CO), সাল্‌ফর ডায়ক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন, মার্শগ্যাস ও ওলিফায়াণ্ট গ্যাস।

কোল্‌গ্যাস শীতল করিলে আলকাতরা বা কোল্ তার জমিয়া পৃথক্ হয়। হাইড্রেটেড্ ফেরিক্ অক্সাইড ও ক্লোরেট লাইমের (Hydrated Feric Oxide and Slaked lime) ভিতর দিয়া কোল্‌গ্যাস চালাইলে সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন, কার্ব্বনিক এসিড, সায়নোজেন, কার্ব্বন বাইসালফাইড্ পৃথক্ হয়।

ধর্ম্ম—ইহা মিশ্র পদার্থ। মার্শগ্যাস, ওলিফায়াণ্ট গ্যাস, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বলিক এসিড দ্বারাই এই গ্যাস বিনির্ম্মিত। ১০০ ভাগ বিশোধিত কোলগ্যাসে নিম্নলিখিত পদার্থ গুলি আছে—

হাইড্রোজেন বা উদজান ...	৪৭·৬
মার্শগ্যাস বা পূতিবায়ু	৩১·৩
ওলিফায়াণ্ট গ্যাস বা গুরু উদাঙ্গার	৩·০৫
কার্ব্বণ মনক্সাইড বা একাম্ল অঙ্গার	৭·৮২।

বিশুদ্ধ কোল্‌গ্যাস বর্ণহীন ও বায়ু অপেক্ষা লঘু। বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিয়া ইহা দ্বারা ব্যোমযান পূর্ণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠা যায়। ইহার গন্ধ আলকাতরার ন্যায়।

কোল্‌গ্যাসের অন্তর্গত ওলিফায়াণ্ট গ্যাস দাহে ইহার আলোকের ঔজ্জ্বল্য জন্মে এবং হাইড্রোজেন মার্শগ্যাস ও কার্ব্বন-মনক্সাইডের সহিত মিশ্রিত থাকাতে ওলিফায়াণ্ট গ্যাস ক্ষীণায়ত অর্থাৎ পাতলা হইয়া জ্বলিতে থাকে। একটী বাতি এক ঘণ্টায় যত পোড়ে, তাহার সহিত ঐ কালের মধ্যে যতখানি কোলগ্যাস পোড়ে, তাহার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোল-গ্যাসের আলোককে ১৩টী বাতির জ্যোতিঃসম্পন্ন বলা যাইতে পারে।

পরীক্ষা—১। ইহা লাল লিট্‌মস কাগজকে নীলবর্ণে এবং লেড্ পেপারকে কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তন করিবে না।

২। কোল্‌গ্যাসে অঙ্গার আছে। জ্বলন্ত কোল্‌গ্যাসের উজ্জ্বল শিখার উপর এক খণ্ড পরিষ্কার ধাতু ধারণ করিলে, ইহার গাত্রে অঙ্গারকণা সকল সংলগ্ন হয়।

৩। কোলগ্যাসের শিখার উপর পরিশুষ্ক শীতল কাচপাত্র ধারণ করিলে উহার গাত্রে জলবিন্দু সকল ঘর্ম্মাকারে সংলগ্ন হইবে।

ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত।

নবজাত শিশুর রোগ-নির্ণয়।

(স্বর্গীয় ডাক্তার এম্. এম্. বোস লিখিত লেক্‌চারের বঙ্গানুবাদ)।

শিশুদের উত্তাপের বিষয়—সাধারণতঃ তাপমান যন্ত্র (থারমোমেটার) ৫।৬ মিনিট কাল বগলে কিম্বা ১০।১২ মিনিট কাল মুখের ভিতর রাখিতে হয়। সচরাচর শিশুদের উত্তাপ ৯৯৪° ডিগ্রী; কিন্তু উত্তাপ ৯৭৫° ডিগ্রীর নীচে কিম্বা ১০২° ডিগ্রীর অধিক হইলে অসুখ হইয়াছে ভাবিবে। উত্তাপ ১০২°।১০৩° ডিগ্রী হইলে জ্বর তত অধিক নহে, ইহাকে (Mild fever) সামান্য জ্বর বলা যায়; কিন্তু ১০৫° ডিগ্রী উত্তাপ যদি বরাবর থাকে, তাহা হইলে গুরুতর পীড়া ভাবিবে। আর ১০৬°।১০৭° ডিগ্রী উত্তাপ হইলে বিপদ জানিবে। ১০৯°।১১০° ডিগ্রী উত্তাপ হইলে মৃত্যু হইতে পারে।

নিম্নলিখিত রোগে উত্তাপের বিষয় জানা আবশ্যক হয়; যথা (১) একলাগা জ্বর; (২) কণ্ডুজ্বর যেমন হাম, বসন্ত ইত্যাদি; (৩) ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) যেমন কাসি ইত্যাদি; (৪) বাত জ্বর এবং (৫) গুটীমালা রোগ (Tuberculosis); যক্ষ্মাকাশের আরম্ভে ফুস্‌ফুসে গুটীমালা হয়।

ভাবী ফল—উত্তাপ যদি ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে তবে ভাল লক্ষণ, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণগুলিও কমিয়া আসিবে। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ কমিয়া যাওয়া ভাল নয়, প্রাতে কমিয়া যাওয়া ভাল লক্ষণ। যদি নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও স্পন্দন বৃদ্ধি পায় এবং তৎসঙ্গে

উত্তাপ কমিয়া যায়, তবে বিপদজনক, ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে। সাধারণতঃ মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে উত্তাপ কমিয়া আইসে। নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা কম হওয়া ভাল নহে। সাধারণতঃ উত্তাপ ১° ডিগ্রী হইলে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। দুইটী রোগে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, যথা (১) ফুস্‌ফুসের প্রদাহ; (২) সান্নিপাতিক জ্বর; এই দুইটী রোগে উত্তাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়। যদি নাড়ী বৃদ্ধি পায়, উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী হয়, যদি শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায় তবে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) হইয়াছে জানিবে। সান্নিপাতিক জ্বরে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং নাড়ীর সংখ্যাও অধিক হয়। সাধারণতঃ সান্নিপাতিক জ্বর (Remittent Fever) উত্তাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে ভাবী ফল ভাল হয়, কিন্তু যদি অধিক বৃদ্ধি পায় তবে খারাপ। সান্নিপাতিক জ্বরে ১ম ২য় সপ্তাহে উত্তাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইলে ভাল চিহ্ন। বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহে (Peritonitis) উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রী হয়; এ রোগ ঠাণ্ডায় হয়।

সাধারণতঃ শিশুদের পালাজ্বরে (Intermittent Fever) অত্যন্ত কম্পন হয়, কিন্তু শিশুর দুই বৎসরের নীচে বয়স হইলে কম্পন হয় না, তবে মুখ একটু মলিন হয়; ঠোঁট বিবর্ণ হয়; আর নখের নিম্ন ভাগ নীলবর্ণ হয়।

ধর্ম্মের আদর্শ।

সেই ধর্ম্মাধিপতি ভগবান্, যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম তিলার্দ্ধকালও তিষ্ঠিতে পারে না, তিনিই স্বয়ং মানবাত্মায় ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে হৃদয় যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরোন্মুখীন হয়, সেই হৃদয় সেই মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের আভাস লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হয়। মানবহৃদয়ই সেই অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ দেবতার সর্ব্বোচ্চ আসন,—মানবাত্মাই তাঁহার একমাত্র প্রিয় নিকেতন। ভারতগৌরব ঋষি বলিয়াছেন,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥"

'যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন'। সাধু দেবাত্মারা নিসর্গ ও প্রকৃতির মধ্যেও সেই পরমদেবের আরাধনায় ডুবিতে ও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও সেই চরম সাধনের সহায় ও অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মাতে পরমাত্মার

সম্ভোগ ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও পূর্ণ পরিতৃপ্তির একমাত্র হেতু।—অন্তরে ও বাহিরে সেই সর্ব্বব্যাপী অরূপ রূপময় অমৃতময় বিরাটের জীবন্ত জাগ্রত সত্তা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে সমর্থ হইলে জীব জীবন্মুক্ত অবস্থালাভে কৃতার্থ হইয়া ধর্ম্মের ঊর্দ্ধতম স্থানে উপনীত হন।

তিনিই ধর্ম্মের সার, ধর্ম্মের আদর্শ ও আধার। তাই তিনি ব্যতীত ধর্ম্ম-সাধন হয় না। একজন আত্মপ্রীতি বা অপরের তৃপ্তির জন্য শত সহস্র সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে, অসংখ্যবার দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম সাধিত হয় না। ঐ সকল সুকৃতি তাঁহার হৃদয়কে মহৎ ও উন্নত করিয়া, পুণ্য প্রেমকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের মোহন মধুর পথে সযত্নে তুলিয়া দেয় মাত্র।

কিন্তু মানব যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য কার্য্যও তাঁহারই—সেই প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা, জীবনের জীবন জীবন-সর্ব্বস্ব-ধনের প্রীতি সাধনোদ্দেশে সম্পন্ন করেন, তাহাই প্রকৃত ও পরম ধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়।

তাঁহার প্রতি প্রেমসাধনই প্রকৃত ধর্ম্ম, তদপেক্ষা আর উচ্চতর ধর্ম্ম নাই। এই জন্যই যিনি যে পরিমাণে ভগবৎপ্রেমিক বা ভক্ত, সেই প্রাণারাম হৃদয়-দেবতার আরধ্য ও বরণীয় প্রেমে যিনি যত বিহ্বল ও মুগ্ধ থাকেন, ততই অনায়াসে ও সুচারুরূপে তাঁহার ধর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। এই নিমিত্ত ভক্ত ভক্তিতে আর্দ্র হইয়া গাহিয়াছেন "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"। সেই নিরঞ্জন নির্ব্বিকার পুরুষই ধর্ম্মসাধনের একমাত্র পথ ও লক্ষ্যস্থল। তাঁহার প্রতি প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইলেই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তাহা স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হয় এবং শাণিত ক্ষুরধারসম ধর্ম্মের জটিল দুরারোহ পথও অতি সহজ, সুগম ও সুখময় বলিয়া প্রতীত হয়। ভক্তির প্রবল একটানা স্রোতে পাপতাপরূপ রাশি রাশি আবর্জ্জনা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি যে সকল বিরুদ্ধাচরণ মর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেও যে সকল কামনাঙ্কুর উন্মূলিত হইবে বলিয়া মনে হয় না, সেই সকল চিরপোষিত পাপবাসনাও সেই প্রেমসূর্য্যের পবিত্র প্রকাশে কুজ্ঝটিকার মত কোথায় অপসারিত হইয়া যায়। অরুণোদয়ে ধরিত্রী যেরূপ অন্ধকারপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ প্রভাতের নবীনালোকে হাসিতে থাকে, মোহাভিভূত জীবাত্মাও তদ্রূপ ব্রহ্ম-সবিতার সঞ্জীবনী কৃপাকণিকার আবির্ভাবে বিগতপাপ ও বিগতস্পৃহ হইয়া চিদানন্দ-সাগরে চিরদিনের মত আত্মহারা হইয়া থাকে। তখন তাঁহার যাবতীয় ভোগলিপ্সা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর সুখৈশ্বর্য্য, স্বর্গের আনন্দ শান্তি এমন কি বরাভয়প্রদায়িনী মুক্তিরও আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

ভক্ত উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়াছেন,—

"নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্ল্লভ জনম হতে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণ গান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ।"

ভক্ত যখন ভগবানের সহিত এইরূপ ভাবে নিত্যযুক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীতেই বাস করুন বা কোন উন্নততর লোকেই বাস করুন, তিনি ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন, স্বর্গই তাঁহার জন্য লালায়িত হয়—জ্ঞান অনন্তধারায় তাঁহার মস্তকে নিপতিত হয়, আজন্ম অতৃপ্ত আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, মন শাশ্বত শান্তিলাভে কৃতার্থ হয়।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেয়াগিয়া সর্ব্বধর্ম্ম আর
লহ এক আমারই শরণ,
হরিব সকল পাপভার
করিও না শোক অকারণ।"

অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ, কেবল অনন্যগতি ও অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণই সর্ব্বধর্ম্মের সার। তাঁহার পবিত্র পদারবিন্দে রতি জন্মিলে, তাঁহার প্রতি সুনির্ম্মল প্রেম বা ভক্তি স্ফুরিত হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম আপনিই সুসম্পন্ন হইবে, ইন্দ্রিয়ের নিগড় স্বেচ্ছায় খসিয়া পড়িবে, আত্মবিসর্জ্জন ও সেবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া সাধককে বরণ করিবে এবং পুণ্য ও পবিত্রতা নিত্যসঙ্গী হইবে। ক্রমে ক্রমে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং—এর একমাত্র করুণার বলে সেই নিরুপম স্পর্শমণির পূত সহবাসের ফলে সাধক অপূর্ব্ব জীবন লইয়া অনন্ত উন্নতির পথে ধাবিত হইয়া অনাদি ভূমা ব্রহ্মাণ্ডপতির পরিচয়ের পর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অথচ তাঁহার মহিমার বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, যুগপৎ হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এক অননুভূত, অপার্থিব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, আবেগপূর্ণ মুগ্ধ হৃদয়ে বলিয়া উঠিবেন,—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি।"

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

*ভগবান হইতে ভক্তের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া।

নিদাঘ পূর্ণিমায়।

(স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে দু'একটী কথা)

আজ প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিনাভি গিয়াছিলাম। ভক্তিভাজন সাধু উমেশচন্দ্র তখন কর্ম্ম হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, হরিনাভিতে গিয়া তিনি বর্ত্তমান লেখককে তাঁহার নিকট গিয়া দুই চারি দিন থাকিবার নিমিত্ত স্নেহ-নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছিলেন;

সেই সস্নেহ নিমন্ত্রণ শিরোধার্য্য করিয়া ৩রা জ্যৈষ্ঠ হরিনাভিতে যাই।

সেদিন স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন। স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্রের সে কথা স্মরণ ছিল। হরিনাভি ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে মহর্ষিদেবের ভস্ম-রক্ষার নিমিত্ত একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেখিলাম সেদিন সেই ভস্ম-বেদিকা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়াছে। সেই ভস্মবেদিকার গাত্রে এক লিপি-ফলক সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহর্ষি তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, তিনিও মহর্ষির প্রতি তেমনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। মহর্ষির জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলিও তিনি এমন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া-ছিলেন ও সেগুলিকে এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিতেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহর্ষির বচনগুলি, মহর্ষির ব্যাখ্যাগুলি যেন তাঁহার আত্মার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন ভক্তি-আর্দ্র কণ্ঠে সেগুলি পাঠ করিতেন তখন শ্রোতৃ-বর্গের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ কাটিল। সেদিন সন্ধ্যায় বারুইপুর হইতে একটী প্রাচীন ব্রাহ্ম আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সেদিনকার সমস্ত চিন্তা যেন মহর্ষির জন্ম-দিনের সহিত বিজড়িত ছিল। অনেক কথার মধ্যেই সে ভাব বেশ স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যূষে নিদ্রা ভাঙ্গিল। শুনিলাম ভক্তিভাজন সাধু উমেশ চন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া সঙ্গীত করিতেছেন। তিনি উঠিয়া ছেলেদের জাগাইলেন। তাহাদের সহিত সঙ্গীত করিলেন। তখনও অন্ধকার ছিল। মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষতলে একটী বৃত্তাকার বেদী আছে। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় সেই বেদীর উপর একখানি কম্বল পাতিয়া স্তিমিত নয়নে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখে বোধ হয় একখানি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ছিল। তখনও প্রভাত হয় নাই। পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে। দূরে দু'একটা পাখী ডাকিলেও ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণ একেবারে নিস্তব্ধ ছিল। প্রভাতের শান্ত মুহূর্ত্তে তরুতলে বেদিকার উপর উপবিষ্ট সেই ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। কতক্ষণ সেই সৌম্য, সেই পুষ্পাবিষ্ট মধুপের ন্যায় ব্রহ্মে লীন আত্মার নীরব আনন্দ দেখি-লাম তবু দৃষ্টির সে পিপাসা মিটিল না। তাঁহার ভক্তিরসোদ্দীপ্ত মুখে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আভা প্রতিফলিত হইত, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

প্রভাতের প্রথমাংশ ধ্যানধারণা ও উপাসনায় অতিবাহিত করিয়া ছেলেদের পড়াশুনা কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

তাহার পর কিছুক্ষণ লেখা পড়া করিলেন। প্রায় নয়টার সময় গ্রামের লোকের মঙ্গল সমাচার লইবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার করিলেন। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই কেমন শৃঙ্খলা—কেমন নিষ্ঠার ভাব! আজন্ম তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু এ কয়দিন তাঁহার পারিবারিক জীবনের গভীর নিষ্ঠার ভাব খুব ভাল করিয়া দেখি-বার অবকাশ পইয়াছিলাম।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি ছিল। ইচ্ছা ছিল সেই দিনই কলিকাতায় ফিরিব, কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"আজ পূর্ণিমা; পূর্ণিমার রাত্রিটা এখানে কাটাইয়া যাও।"

দ্বিপ্রহরে যখন জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্র-তাপে চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল তখন বর্ত্তমান লেখকের বিশ্রামের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া-ছিলেন এবং সস্নেহে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি নিজের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বারুইপুরের জনৈক যুবককে তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন; নিদাঘের দ্বিপ্রহরে তিনি সমাগত যুবকের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্ত-মান লেখকের বেশ স্মরণ আছে যে, আরমষ্ট্রঙের God and the Soul নামক গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছিল। উক্ত যুবকটীর নাম ধাম সকলি স্মরণ আছে, কিন্তু বাহুল্যবোধে তাঁহার নাম এখানে উল্লেখ করিলাম না। বহুক্ষণ তাঁহারা আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। সেই আলোচনায় স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের একাগ্রতা, উৎসাহ ও আনন্দ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আলো-চনান্তে তিনি "বামাবোধিনীর" প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। স্বেদ-সিক্ত কলেবরে তিনি একাগ্রচিত্তে আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। লজ্জার বিষয় এই যে, বর্ত্তমান লেখক তরুণবয়স্ক হইলেও এই অবকাশে গ্রীষ্ম-কালসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে যখন দেখিলাম তিনি নিবিষ্টচিত্তে সরলভাবে উপবিষ্ট হইয়া আপনার কাজ করিতেছেন, তখন লজ্জিত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া-ছিলাম। এমন নীরব কর্ম্মপ্রিয়তা ও অক্লান্ত শ্রমশক্তি প্রাচীনদিগের মধ্যে আজকাল বিরল—যুবকদিগের মধ্যেও সুলভ নহে।

অপরাহ্নে স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের সহিত হরিনাভির কোন সম্পন্ন ব্যক্তির বাটীতে বেড়াইতে যাই। গৃহকর্ত্তারা বহির্বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর বাঁধন ঘাটে বসিয়া নানা প্রকার গল্প গুজব করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সকলে আসন ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহাদের কথার স্রোত ফিরিয়া গেল। সকলেই আগ্রহের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিলাম তাঁহাদের সুখ দুঃখের সহিত দত্ত মহাশয়ের হৃদয়খানি এতদূর জড়িত

যে,বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিলেন এবং তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের সর্ব্ববিধ কুশল সংবাদ লইতে লাগিলেন। সে দিন সন্ধ্যায় সেই ঘাটে বসিয়া তিনি সঙ্গীত করিলেন। তাঁহার একান্ত ভক্তির ভাব সেই সঙ্গীতে এমন একটু মাধুর্য্যের ভাব আনিয়া দিতেছিল যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

অনেকেই অবগত আছেন যে, হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা লইয়া এক সময়ে তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উন্নত উদার চরিত্র এ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উঠিবার পক্ষে একমাত্র সহায় হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে তাঁহার কতদূর অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সেদিন পাইয়াছিলাম। যে বাড়ীতে আমরা বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে বাড়ীর মহিলাগণ আমাদের জন্য জলযোগের আয়োজন করিয়াছিলেন। যখন আমরা অন্তঃপুরে আহূত হইলাম, তখন গৃহকর্ত্তা আমাদের পথ প্রদর্শক হইলেন। আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে দত্ত মহাশয় গৃহকর্ত্তাকেও উপবেশন করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—'আপনার আহারান্তে আমি 'প্রসাদ গ্রহণ করিব।' প্রকৃত পক্ষে দেখিলামও তাই। আমাদের জল যোগান্তে তিনি স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের ভুক্তাবশেষ হইতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া ভক্ষণ করিলেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও প্রকাশ্যে একজন ব্রাহ্মের ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে হইলে কতটুকু ভক্তি থাকা প্রয়োজন তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

সন্ধ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিয়াছিলাম। ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিল। চারিদিকে এক জ্যোৎস্নার খেলা! সুপ্তিবিজড়িত প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব ছবি আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার মধ্যে এক খানি আসন পাড়িয়া দত্ত মহাশয় নীরবে বসিয়াছিলেন। তারপর "তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন" এই গানটী তাঁহার কণ্ঠে শুনিতে পাইলাম। বহুক্ষণ এই সঙ্গীতটী গাইলেন তবু যেন তৃপ্তি হইল না। লেখককে ডাকিয়া বলিলেন,—ঈশ্বরকে "সুন্দর" স্বরূপে প্রকটিত করিয়াছে এমন একটী সঙ্গীত কর। রবীন্দ্রনাথের "আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর" এই সঙ্গীতটা গাহিলাম। সঙ্গীত শেষ হইলে বলিলেন,—"আর একটী ঐ ভাবের সঙ্গীত কর।" তখন "হে হরি সুন্দর" এই সঙ্গীতটী গাহিলাম। সঙ্গীতান্তে চাহিয়া দেখি দত্ত মহাশয় স্তিমিত লোচনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই স্থির নিশ্চল উদাত্ত ভাব দেখিয়া মনে হইল যুগযুগান্ত পূর্ব্বে যাঁহারা "শৃণ্বন্তু বিশে অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলিয়া আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদেরই সন্তান, ইনি তাঁহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত—তাঁহাদেরই দীক্ষায় দীক্ষিত। সেই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল—ধীর, সৌম্যশান্ত, সমাহিত মূর্ত্তি আজ এই মানসপটে যেন উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইতেছি এবং সেই ঋষিকল্প মূর্ত্তির সম্মুখে ক্ষুদ্র আপনাকে অবস্থিত মনে করিয়া মস্তক আপনি লজ্জায় ও বিনয়ে অবনত হইতেছে। কোন চিত্রকরের সাধ্য নাই যে কল্পনায় সেই চিত্র অঙ্কিত করিবে—এমন কোন ভাস্কর নাই যাহার হস্তে ভক্তের সেই ভক্তিরসার্দ্র জ্যোৎস্না-মন্দাকিনী-স্নাত মুখমণ্ডলের অবিকল সৌন্দর্য্য প্রস্তরে খোদিত হইতে পারে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে,—

মহিলা-স্মৃতি সভা।

আমাদিগের পিতৃপ্রতিম পরম পূজ্যপাদ বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সন্তান-সন্ততি, স্বজন-সুহৃদ্ ও তাঁহার চির আদরের প্রাণাধিকপ্রিয় সাধের বামাবোধিনীকে এবং বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা, পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা ও সমগ্র ভারতবাসীকে শোকসমুদ্রে ভাসাইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে তাঁহার স্মরণার্থ বিগত ১৯শে জুলাই শুক্রবারে পুণ্যাত্মা স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ১৩৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে একটী মহিলা-স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সমিতিতে অনেকগুলি বিদুষী মহিলা সমবেত হইয়া পুণ্যশ্লোক বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ জন্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রথমে সকলে সমবেত হইয়া শোকসঙ্গীত ও তাঁহার আত্মার মঙ্গলার্থে উপাসনা করেন। পরে মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু একটী হৃদয়গ্রাহী শোকোচ্ছ্বাস কবিতা পাঠ করেন। পরিশেষে মৃত মহাত্মার প্রবর্ত্তিত এই বামাবোধিনী পত্রিকার যাহাতে স্থায়ী উন্নতি হয় এতৎসম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু, পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের শিষ্যা। ইনি গুরুর স্মরণার্থ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া স্বীয় ভবনে এই মহিলা-স্মৃতিসভা আহ্বান করিয়াছিলেন, এ নিমিত্ত ইনি আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। ইনি যদিও সম্প্রতি পতিশোকবিধুরা, তথাপি গুরুর

স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে শিষ্যার কর্ত্তব্য পালন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যাহাতে গুরুদেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়, তন্নিমিত্ত ইনি ঐকান্তিক যত্নবতী। ইহার সাদর অভ্যর্থনায় সভায় আহূত মহিলা মাত্রেই অত্যন্ত প্রীত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন। এতাদৃশ মহিলা-স্মৃতি-সভা ভারতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বপল্লীতে হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা মৃত মহাত্মা ভারতের সকল ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উন্নতি সাধনার্থ অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। কিসে এদেশীয় মহিলাগণ সকল বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইতে পারেন এবং প্রাচীন আর্য্যরমণীকুলের ন্যায় স্বদেশের গৌরব-রক্ষা এবং উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তিনি অনুদিন অনুক্ষণ আজীবন নিঃস্বার্থ-ভাবে এই মহত্তর কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহবিদ্যতে" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি নারীদিগকে সেই পবিত্র অনাবিল জ্ঞানরত্নে ভূষিত করাইবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন। যখন এদেশে বাঙ্গালা মাসিক পত্রের অভাব ছিল, সেই দুঃসময়ে অশিক্ষিতা অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলাগণের দুর্দ্দশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহাদিগের হৃদয়ে সমুজ্জ্বল জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করাইয়া সকল বিষয়ে জগতের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করাইবার নিমিত্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে এই বামাবোধিনী পত্রিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল নবীনা লেখিকা, প্রবন্ধ কবিতাদি অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশ করিতে পাঠাইয়া সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া হতাশ হইতেন, তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার সেই কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশের বাসনায় মহাত্মা বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের সকাশে প্রেরণ করিতেন, তিনি সেই রচনাগুলি যথোচিত সংশোধনপূর্ব্বক সাদরে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিয়া সেই সকল মহিলাকে উৎসাহ দিতেন। তিনি বলিতেন, সকল মানবেরই ক্রমশঃ করিয়া উন্নতি হইয়া থাকে। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, মহিলাকুল বিদুষী হইলে, পুনরায় ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। তিনি বিস্তর গবেষণাপূর্ব্বক বহুবিধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, অজ্ঞতাই মানবজাতির উন্নতির মহান্ অন্তরায়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই বিদ্যাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

তিনি জানিতেন,—এই মাতৃজাতি রমণীকুল বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও উন্নতহৃদয়া না হইলে, সন্তানগণের উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত বিঘ্ন হয় এবং গৃহস্থের সুখ শান্তির উচ্ছেদ হয়। এই নিমিত্ত তিনি যে সকল রমণীর রচনা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিতেন, তাহা সংশোধন করিয়া বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতেন;

কেন না সংশোধনের দ্বারাই যে জগতের যাবতীয় পদার্থের উন্নতি হইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি কখনও কাহাকেও কোন বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। সেই মহান্ বিবেক-সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে যে কত রমণী উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার নিকটে আমরা প্রত্যেক বঙ্গরমণী অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ। তাঁহার পরলোকগমন উপলক্ষে ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এবম্প্রকার স্মৃতি-সভা আহ্বান করিয়া, তাঁহার স্মৃতি-নিদর্শন স্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি যে কেবল রমণীগণেরই হিতসাধন করিয়াছেন এবং নারীদিগকেই সম্মান করিতেন তাহা নহে, দেশীয় নরনারী সকলকেই তিনি বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারই পরম হিতৈষী ছিলেন। দেশবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট মহাঋণী। দেশের মঙ্গলার্থ মূকবধির বিদ্যালয়, ব্রহ্মবিদ্যালয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটিকলেজ, সুরাপান-নিবারিণীসমিতি ইত্যাদি আরও বিবিধ দেশহিতকর কর্ম্ম তিনি ও তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, উভয়ে নিঃস্বার্থভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি যে বহুবিধ সাধুকর্ম্ম সাধন করিয়া এই বিশ্বের বক্ষে অসীম অক্ষয় পুণ্য-কীর্ত্তি খোদিত করিয়া গিয়াছেন, যদিও আজ তাঁহার নশ্বর দেহের বিনাশ হইয়াছে, কিন্তু সেই অপরিমেয় যশঃকীর্ত্তিপ্রভাবে তিনি চিরদিন এই জগতে অমর থাকিবেন। শাস্ত্রে বলে, "স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" তিনি উভয় বলেই পৃথিবীতে চিরঞ্জীব রহিবেন। আমরা এতদিন তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আজ তাঁহার অভাবে বুঝিতে পারিতেছি, তিনি একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশকে ধন্য করেন ও সেই কুলকে পবিত্র করেন এবং সেই জাতিকে উন্নত করেন, তিনিও এই দেশে জন্মিয়া মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, দেশ, কুল ও জাতিকে ধন্য, পবিত্র এবং উন্নত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বদেশবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপাত করিয়া যে অমিত পরিশ্রম করিয়াছেন, আজ তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে আমরা তাঁহার নিমিত্ত কি করিতে পারিলাম? যদি তিনি এদেশে না জন্মিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণ প্রভৃতি কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আজ সেই পুণ্যশ্লোক অজেয় কর্ম্মবীরের পরলোক গমন হেতু কত স্মৃতিস্তম্ভ, কত প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। আজ তাঁহার স্মৃতিফণ্ড কত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ হইত। আসুন বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা, ভ্রাতা ভগ্নীগণ! আমরা প্রাণে প্রাণে সংবদ্ধ হইয়া, এই মহিলা-স্মৃতি সভার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ, সেই

পিতৃপ্রতিম দেবকল্প স্বর্গীয় মহাত্মা সম্পাদক মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা সংকল্পে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু অর্থ তাঁহার স্মৃতি-ফণ্ডে প্রদান করিয়া ভক্তি-কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অন্তরে তাঁহার পূজা করি। যাহাতে তাঁহার স্নেহের বামাবোধিনীর স্থায়িত্ব হয় তজ্জন্যও সকলের অবস্থানুসারে কিছু প্রদান করা সর্ব্বাতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় মহাত্মা আমাদের সকলেরই পিতৃ-স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে আমরা যথার্থই পিতৃশোক অনুভব করিতেছি। আমরা সকলে তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার মঙ্গলার্থ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা রাজ-রাজেশ্বর দেবাদিদেবের চরণে প্রার্থনা করি, যেন সেই পুণ্যাত্মার অনন্ত মোক্ষ-লাভ হয়।

শোকসন্তপ্তা,—

শ্রীসুশীলা সুন্দরী মিত্র।

শোভাবাজার, রাজবাটী।

নিবেদন।

সাধু মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নারীসমাজ অসহায়, ধর্ম্মসমাজ দুর্ব্বল, জন্মভূমি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই সাধু পুরুষ সুদীর্ঘকাল প্রাণপাত পরিশ্রম ও উচ্চ সাধনা বলে কি ধর্ম্মসমাজ, কি নারীসমাজ, কি পর-হিতৈষণা কি রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সকল-কেই ধর্ম্ম সাধারণের অঙ্গ জানিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিয়া, সফলকাম হইয়া গিয়াছেন ভারতের প্রত্যেক পুত্র কন্যার তাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া, ঐ আদর্শ মহান্ পুরুষের অনুকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিগত ১৯শে জুলাই আমরা কতক গুলি মহিলা ১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ভবনে তাহার স্মৃতিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলাম। "উমেশচন্দ্র দত্ত ধনভাণ্ডার" নামে একটী স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের জন্য অর্থ-সংগ্রহ আমাদের প্রথম চেষ্টা। এই স্থায়ী ফণ্ডের আয় হইতে দুঃস্থ বালিকা এবং স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। স্বর্গগত মহাত্মা যেমন জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন আমরাও ঠিক্ সেইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিব।

দত্ত মহাশয় সুদীর্ঘ কাল দুহিতৃসমান যত্নে আমরণ পর্য্যন্ত "বামাবোধিনী পত্রিকাকে" লালন পালন করিয়াছেন। তিনি ইহাকে "দুহিতৃরত্ন" মনে করিতেন, নারী জাতির উন্নতিকল্পে পরিচালিত এই পত্রিকার উন্নতি জন্য চেষ্টা করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আহ্লাদের বিষয়, স্মৃতি সভা আহ্বান করিয়া আমরা আশাতীত ফল লাভ করিয়াছি। নিম্ন লিখিত চাঁদার তালিকায় তাহা সপ্রমাণ হইবে। এতদর্থে ন্যূন কল্পে তিন হাজার টাকা প্রয়োজন। স্বর্গগত মহাত্মার অনুরক্ত পুরুষ ও মহিলাগণ যথাসাধ্য এই স্মৃতিভাণ্ডারে দান করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন এই বিনীত প্রার্থনা। উক্ত ফণ্ডের সাহায্যার্থ অর্থাদি ৯৩ নং আপার সারকুলার রোডে সম্পাদিকার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

"উমেশ চন্দ্র দত্ত ধন ভাণ্ডার" সম্পাদিকা।

চাঁদার তালিকা।

শ্রীমতী অবলা বসু	১০০৲	শ্রীমতী অন্নদায়িনী সরকার	৫৲
„ স্বর্ণপ্রভা বসু	১০০৲	„ সরোজিনী সরকার	১০৲
„ নির্ম্মলা সরকার	৫০৲	„ গিরিবালা সরকার	১০৲
„ বনলতা দাস	৫০৲	„ ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র	২৲
„ প্রতিভা দেবী	২৫৲	„ ক্ষীরোদবাসিনী সরকার	৫৲
„ লীলাবতী মিত্র	২৫৲	„ শিশিরকুমারী দত্ত	২৫৲
„ মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲	„ হেমন্তশশী দাস	৫৲
„ কমলিনী রায়	১০৲	„ বিধু মুখার্জ্জি	১০৲
„ সুবর্ণপ্রভা বসু	১০৲	„ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী	৫৲
„ লাবণ্যপ্রভা সরকার	৫৲	„ হেমলতা সরকার	২৲
„ হেমপ্রভা বসু	১০৲	„ অবন্তী ভট্টাচার্য্য	১৲
„ সুশীলাসুন্দরী মিত্র	২০৲	„ সুশীলা ঘোষাল	১৲
„ কুমুদিনী দাস	১০৲	„ ইন্দুবালা ঘোষাল	১৲
„ সুরবালা ঘোষ	৫৲	„ সরোজিনী ঘোষাল	১৲
„ সুবালা সরকার	৫৲	„ বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য	১৲
„ নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲	„ নির্ঝরিণী ঘোষ	১৲
„ শান্তশীলা মজুমদার	৫৲	„ কুমুদিনী বসু	১৲
„ প্রফুল্লবালা দাস	৫৲	„ রমলা বসু	৫৲
„ শকুন্তলা সেন	৫৲		
„ রাজলক্ষ্মী সেন	৫৲		

(ক্রমশঃ)

স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি।

স্ব শব্দের অর্থ আপন, সুতরাং স্বদেশ বলিলে নিজের দেশ বলিয়া বুঝি। যাঁহার যতটুকু "স্ব" জ্ঞান, তিনি সেই পরিমাণে স্বদেশের অর্থটুকু লইতে পারেন। অতি ছোট শিশুর হাতে একটী মিষ্টান্ন দিয়া জিজ্ঞাসা করুন—আমাকে একটু দিবে? সে বলিবে "না"—"এ আমার, দিব না"—তাহার "স্ব" জ্ঞান সে ভিন্ন অপর কাহার প্রতি হয় নাই। তাহার পর সেই শিশু যখন একটু বড় হয়, সে সেই মিষ্টান্নের অংশ তাহার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে না দিয়া একাকী ভক্ষণ করিতে পারে না। তখন বুঝিতে হইবে তাহার "স্ব" জ্ঞান কিছু প্রসারিত হইয়াছে। ক্রমে যখন তদপেক্ষা বড় হয়, তখন সে তাহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ আত্মীয় স্বজনকে ভাগ দিয়া সুখানুভব করে; সেইরূপ জন সাধারণ পূর্ব্বে স্বদেশ বলিতে নিজের জন্মস্থান বুঝিতেন, ক্রমশঃ শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন একটু একটু করিয়া প্রসারিত হইতেছে। স্বদেশ বলিলে এখন আমরা কি বুঝি? ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম এখন আর তাহা বুঝি না। স্বদেশ বলিলে হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আমাদের এখন স্বদেশ বলিয়া মনে হয়, কারণ আমাদের সুখ, দুঃখ, শিক্ষা, লক্ষ্য, চিন্তা, ভাব, আশা সমস্তই এক, সুতরাং সমগ্র ভারতবাসীকে ভাই বলিয়া জ্ঞান করি। বরিশালে দুর্ভিক্ষ হইলে কেন সেই পঞ্চনদবাসী আকুল হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভ্রাতাদিগের সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন?—তাহার কারণ শিক্ষার সহিত হৃদয়ের বিস্তৃতি। তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রাতৃস্বরূপ মনে করেন, আমারাও তাঁহাদিগকে সেই চক্ষে দেখি। ঐ যে এক "মহাপুরুষ" নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সমগ্র বঙ্গবাসী তাঁহার জন্য কেন নিশিদিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন?—তিনি যে দুঃখিনী ভারতজননীর সুসন্তান, তাই ভারতবাসী আজ এত মলিন, এত উদ্বিগ্ন, এত ম্রিয়মাণ। শিক্ষা প্রেমপ্রসূ। শিক্ষা হইতেই ভালবাসা ও সহানুভূতি জন্মে। শিক্ষার গুণে আজ আমরা সেই পুরুষরত্নকে ভাই বলিয়া ডাকিয়া এক অভিনব সুখাস্বাদন করিতেছি। এখন স্বজাতি বলিলে কেবল বাঙ্গালী জাতি বুঝি না, সমগ্র ভারতবাসীই আমাদের স্ব-জাতি। এই স্বজাতির উন্নতির জন্য আজ বঙ্গবাসী—বঙ্গবাসী বা বলি কেন ভারত—এত উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, ব্যস্ত। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিব, তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্প ও বাণিজ্যের

উৎকর্ষ সাধন না করিলে আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। এই শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য জাপান, ইংরাজ, জর্ম্মনী এত উন্নত ও এত অর্থশালী, কিন্তু ইহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না। দেশীয় দ্রব্য গ্রহণের অর্থই বিদেশীয় দ্রব্যের বর্জ্জন। দেশীয় দ্রব্যের প্রচলন হইলেই বিদেশীয় বণিক্‌দের স্বার্থহানি হইবে, সুতরাং আমাদের শিল্প বাণিজ্যের প্রসারণে নানারূপ বিভীষিকা উপস্থিত হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু আমাদের তাহাতে ভীত বা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইলে চলিবে না, কারণ এই মাতৃভূমিপূজা সামান্য যজ্ঞ নহে। ইহা জাতীয় মহাযজ্ঞ, এই পবিত্র রাজসূয় যজ্ঞ সমাধান করিতে আমাদিগকে কতশত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। এই যজ্ঞের আহুতি "বিদেশী বর্জ্জন" ও দক্ষিণা "স্বার্থত্যাগ"। এই আহুতি ও দক্ষিণার প্রভাব সামান্য নহে। জাপান আজ এই দক্ষিণার বলেই এত বলীয়ান্। যদি আমাদের অর্থশালী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অর্থ দ্বারা এক একটী ব্যবসায়ের উন্নতি বিষয়ে উদ্যোগী হন, তবে "মা"র মলিন মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিবে। যদি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়া জননী জন্মভূমির দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করেন, স্বদেশের পুনরুত্থানের জন্য কৃতসংকল্প হন, তবে অচিরেই আবার শ্মশান ভারত ত্রিদিবের নন্দনকাননে পরিণত হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ব্যায়ামশিক্ষা করিতে হইবে, কারণ শারীরিক বলাধান ব্যতীত মানসিক তেজস্বিতা পরিদৃষ্ট হয় না। ক্ষীণকায় ব্যক্তি স্বভাবতই দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরু হইয়া থাকে। তাহাদের হইতে সমাজের উন্নতির আশা কোথায়? আমরা ক্রমশঃ আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেছি। আমাদের সে আত্মোন্নতির চেষ্টা কোথায়? আমাদের সে স্বার্থত্যাগ কোথায়? আমাদের সে সহানুভূতি ও স্বদেশপ্রেম কোথায়—যে আত্মমর্য্যাদা, যে সহানুভূতি, যে ভালবাসা, যে স্বার্থত্যাগে জাপান আজ জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে। যে জাতি ছোট থাকিয়া সন্তুষ্ট, কে তাহাকে বড় করিবে? যদি নিজ স্বার্থের জন্য আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দাও, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। কবি সত্যই গাহিয়াছিলেন।

"ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে
রক্ষা চ শাকোটকে,
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে,
কাকে চ নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা
কর্পূরকার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণে
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥"

যে দেশের লোকে চন্দন গাছ, আম্রগাছ, চম্পক গাছ কাটিয়া সজিনা গাছ রাখিয়া দেয়, কোকিল, হংস, ময়ূর মারিয়া দাঁড়কাক পোষে, হাতি দিয়া গাধা

ক্রয় করে এবং কর্পূর ও কার্পাসের বিভিন্নতা চিনিতে পারে না, দূর হইতে সেই দেশকে নমস্কার করি।

তাই বলি, হে ভারতবাসী! যদি দেশের উন্নতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে মৌলিক শিক্ষার বিস্তৃতির চেষ্টা কর, স্বার্থ পরিহার কর; আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইও না; নয় চিরকালের জন্য একবারে রসাতলে যাও। হে মাতৃ-স্বরূপিণী মহাবলবিধায়িনী ভারত-রমণীগণ, আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে বিলাতী পণ্য আর কখনও স্পর্শ করিবেন না, স্বদেশজাত দ্রব্য সাদরে গ্রহণ করিবেন, তবেই আবার ভারতে শিল্পোন্নতির আশা। আমাদের বিশ্বাস, আপনারা চেষ্টা করিলে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। জলন্ত দৃষ্টান্ত "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।" আমাদের পিতা যদি কুৎসিত হ'ন, তাঁহাকে কি আমরা পিতা বলিব না? অপর আর এক সুশ্রী ব্যক্তিকে কি পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব? ভারতীয় পণ্য আমাদের পিতার স্বরূপ আর বিদেশীয় পণ্যকে নীচ কুলোদ্ভব সুন্দর ব্যক্তি বলিয়া সকলে মনে করিবেন।

আপনাদের স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, আত্মীয় দিবানিশি কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা কি বিদেশীয় বণিকের করে অকাতরে অর্পণ করিবেন, আর আজ আপনার স্বদেশের শত শত নর নারী অন্নাভাবে কঙ্কালসার, সে দৃশ্য দেখিয়াও কি দেখিবেন না। আপনারা দুঃখিনী জননী জন্ম-ভূমির দুঃখ বিমোচনের জন্য, আত্মীয় স্বজনের ভবিষ্যতের সুখের জন্য, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, এই পুণ্য যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ বিদেশীয় বর্জ্জন করুন, আপনাদের কীর্ত্তিগাথা সুবর্ণ অক্ষরে ভারতীয় ইতি-হাস-গগনে "ধ্রুবতারার" ন্যায় জাজ্বল্য-মান থাকিবে। সকলে একতা ও আত্ম-নির্ভরতা শিখুন।

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানই জাতীয় সমুন্নতির মূল। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান হইতেই পুরুষকার এবং পুরুষকার বা পৌরুষ দ্বারাই দেশ বা সমাজ সমুন্নত হয়।

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং বিচিন্বন্তি ত্রয়ো জনাঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥

এই ধরণী স্বর্ণপুষ্প-প্রসবিণী কল্পলতা; যিনি 'শূর' অর্থাৎ কর্ম্মবীর, কৃতবিদ্য অর্থাৎ ধর্ম্মবীর, এবং যিনি পদার্থ সকলের ব্যবহার জানেন, তিনিই এই কল্পলতার স্বর্ণপুষ্পচয়নে অধিকারী।

শ্রীকালীন্দ্র নাথ দত্ত
মজিলপুর।

বার্ষিক।

(১)

সকলি কি গেছ ল'য়ে, চির তরে মুছিয়া।
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া?
শ্মশানেতে হ'লে ছাই, কিছুই কি চিহ্ন নাই
জাহ্নবী কি ল'য়ে গেছে সব চিহ্ন মুছিয়া।
এ অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥

(২)

সকলি কি ল'য়ে গেছ, চিরতরে মুছিয়া?
অভাগীর তরে কিছু, যাও নাই রাখিয়া॥
মিশিয়াছ শশ্মানেতে, ধ্বংস কি গো পঞ্চভূতে
জাহ্নবী কি সব চিহ্ন ফেলিয়াছে মুছিয়া?
অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া?

(৩)

সকলি কি ল'য়ে গেছ, আমায় না বলিয়া।
অশ্রুত বহিছে সদা এ কপোল বহিয়া॥
হৃদি ভরা অন্ধকার, প্রাণে ভরা হাহাকার।
"বিদায় বিদায়" ধ্বনি কাণে যায় পশিয়া॥
তুমি কি গো যেতে পার আমায় না বলিয়া॥

(৪)

সকলি কি গেছ ল'য়ে আমায় না বলিয়া?
শৈশব হইতে কভু নাহি যেতে চলিয়া॥
শেষ দিনে ভোলো নাই, আমায় ডাকিলে তাই!
"বিদায় বিদায়" রবে কণ্ঠ গেল রুধিয়া।
তুমি কি গো যেতে পারো আমায় না বলিয়া॥

(৫)

সকলি কি ল'য়ে গেছ চির তরে মুছিয়া।
এ অভাগীর তরে কিছু যাও নাই রাখিয়া॥
কার ধর্ম্ম কার প্রেম, বল দেয় অনুপম।
অশান্ত পরাণ রাখে তুফানেতে বাঁধিয়া।
কিছুইত লও নাই সব গেছো রাখিয়া॥

(৬)

কেন গো লুটায় সদা এ অবিশ্বাসী হিয়া।
তোমার সৌরভ ভরা তবু পড়ে ভাঙ্গিয়া॥
আমার হৃদয়াসনে, পরিবার পরিজনে,
তোমার ও শুভ্রালোক রহিয়াছে ঘেরিয়া।
সকলি ত রেখে গেছ কিছু যাওনি লইয়া।

২০ শে আগষ্ট।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব সভা।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ সাম্বৎ-সরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই ভাদ্র ২৫শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্নে স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ৯নং আণ্টনী বাগান লেন ভবনে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা হয়। অনেক-গুলি নারীহিতৈষী পুরুষ ও নিম্নলিখিত

মহিলাগণ এই সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন—

শ্রীমতী হেমলতা রায়
,, লীলাবতী মিত্র
,, কুমুদিনী মিত্র বি, এ,
,, বাসন্তী মিত্র বি, এ,
,, নিস্তারিণী দেবী
,, শান্তশীলা মজুমদার
,, বিরাজমোহিনী দেব
,, বসন্তবালা দেব
,, প্রেমলতা দেব
,, নৃত্য কুমারী সরকার
,, শ্যাম কুমারী চট্টোপাধ্যায়
,, সরোজ বাসিনী মিত্র
,, রাধারাণী মিত্র
,, শরৎশশী চট্টোপাধ্যায়
,, বিভু বালা দেব
,, ঊষা প্রভা দত্ত
,, প্রফুল্ল বালা দেব

প্রভৃতি

কয়েকটী বালিকা সঙ্গীত করিলে, সভাপতি মহাশয় এই শুভদিনে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিলেন যাঁহার অশেষ চেষ্টায় ও যত্নে বামাবোধিনী এই দীর্ঘকাল তাহার জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এই শুভদিনে আমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কত উৎসাহদান করিয়াছেন, সেই মহাত্মা স্বর্গীয় বামাবোধিনী-সম্পাদক-মহাশয়ের পুণ্যময় চরিত্রের বিষয় সভাপতি মহাশয় গলদশ্রুলোচনে আলোচনা করিয়া সভা আরম্ভ করেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল তাহা তিনি অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় সুন্দর রূপে বর্ণনা করেন। যখন বঙ্গসমাজ ঘোর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে তাঁহাদিগের বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী, এবং বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকের চরিত্র দূষিত হয়, এই রূপ অমূলক ধারণা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, সেই সময় হইতে যে সকল মহাত্মারা সেই ঘোর কুসংস্কার দূর করিয়া অল্পে অল্পে অন্তঃপুরে নারীজাতির কোমল বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, মহাত্মা উমেশ চন্দ্র মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। তিনি এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে কিরূপে অল্পে অল্পে সেই কুসংস্কাররূপ ঘোর অন্ধকার দূর করিয়া নারীজাতিকে জ্ঞানালোকে ভূষিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ কত নারী তাঁহাদের প্রতিভাবলে পুরুষদের সমকক্ষ হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ তালিকায় তাঁহাদের নাম স্থান লাভ করিয়াছে, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ দৃষ্টান্ত আদৌ ছিল না।

সেই মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং অদ্য এই স্থানে সকলের সমবেত হইবার

প্রধান উদ্দেশ্য সেই কর্ত্তব্য পালন করা। তাঁহার কীর্ত্তি চিরজীবিত করিয়া রাখাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রধান উপায়। এই অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তিনি অশ্রান্ত যত্নে এই স্ত্রীশিক্ষার মুখপত্র বামাবোধিনীকে জীবিত রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহা নিজ কর্ত্তব্য পালনে বিরত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত না হয়।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু ও মানকুমারী বসু যাঁহারা বহুদিন হইতে বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে স্বতঃপরতঃ যত্নবতী আছেন, তাঁহারা ইহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তাহা এই স্থলে পঠিত হয়। নিম্নলিখিত মহাত্মারা ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহ ও তত্ত্বাবধান এবং প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার } তত্ত্বাবধায়ক।
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী }
,, বিপ্রচরণ বসু ... কার্য্যাধ্যক্ষ।
,, সুকুমার দত্ত ... প্রকাশক ও তত্ত্বাবধায়ক

বামাগণের প্রবন্ধনির্ব্বাচক।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীলেখক)
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বামাবোধিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও ইহাকে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকারূপে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি বিদুষী মহিলা ও কয়েকটী নারীহিতৈষী পুরুষদিগকে লইয়া একটী অধ্যক্ষসভা গঠিত হয়, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ইহার সম্বন্ধে কোনো নূতন কর্ত্তব্যপ্রণালীর বিষয় চিন্তা করার ভার ও ইহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। স্থিরীকৃত হয়, এই পত্রিকাতে সাধারণ হিতকর প্রবন্ধসকল স্থান প্রাপ্ত হইবে। ইহা জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইয়া বিশ্বজনীনভাবে পরিচালিত হইবে। ইহাতে বামারচিত উপাদেয় প্রবন্ধ সকলের প্রাধান্য রক্ষিত হইবে।

স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা বিষয়ে শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসুর প্রস্তাব, আয়োজন ও উদ্যোগ জন্য এবং বামাবোধিনীর উন্নতি বিষয়ে তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুরাগের জন্য সভাপতি মহাশয় তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনন্তর সমবেত নরনারীগণ সভাপতির প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করেন। অনন্তর সকলে স্বর্গীয় মহাত্মার পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত দুটী কবিতা সভায় পঠিত হয়। কবিতা দুটী আগামীবারে প্রকাশ হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বেদমহাসি—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। বালক বালিকাদিগের জন্য উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে ছাপা উত্তম বাঁধান পুস্তক। ইহাতে গদ্যে পদ্যে ১৭টী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি কৌতুকজনক ও শিক্ষাপ্রদ। ইহাতে হাস্যোদ্দীপক কতকগুলি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

২। খোকার মার গান—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। ইহাতে ২৩টী গান আছে, সকলগুলি খোকাকে ঘুম পড়াইবার বা আদর করিবার। বাঙ্গালী মেয়েদের এ গুলি শিখিলে উপকার আছে।

৩। বালিকা হিতপাঠ দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। বালিকাদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে। বালিকা-বিদ্যালয়ে এরূপ পুস্তক পাঠ্য হইবার যোগ্য।

৪। রেণুকণা—শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। একটী শিশু কন্যার জীবনে যেরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সকল ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাকে স্বর্গের দূত বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকর্ত্রী সেরূপ ভাবে ইহার ক্ষুদ্র জীবনটী বর্ণনা করিয়াছেন, হৃদয়ের ভাষা গদ্য ও পদ্যছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে সহৃদয়গণ ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন।

৫। গল্প—শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত। লেখিকা প্রীতি ও পূজা, ভাব ও ভক্তি প্রভৃতি সুন্দরগ্রন্থে আপনার কাব্যরচনা শক্তির পরিচয় দিয়া, উপন্যাস গ্রন্থরচনায় আপনার স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। লিপিচাতুর্য্যে, কল্পনাবৈচিত্রে এবং ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার গল্পগুলি প্রশংসনীয়। তাঁহার শক্তি আরও বিকসিত ও সুনিয়মিত হইলে সাহিত্যজগতে তিনি কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকিবেন।

নূতন সংবাদ।

স্বর্গীয় মহাত্মা বামাবোধিনীসম্পাদক মহাশয়ের স্বর্গারোহণে আমরা বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা অনেকের নিকট হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতিসূচক পত্র পাইয়াছি, কিন্তু সকলকে পত্রোত্তর দিবার সুবিধা না হওয়ায় আশা করি, তাঁহারা ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মহিলাদিগের সাহিত্য সভা—কিঞ্চিদধিক দুই মাস হইল বাঙ্গালোরে

মহিলাদিগের একটী সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পদিন মধ্যেই সভার উন্নতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মহিলারা শ্রীনিবাস ধর্ম্মমন্দিরে সমবেত হইয়া বিবিধ গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র পাঠ এবং সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন—গত অধিবেশনে এই সভায় ৮৭ জন মহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। অনেকে পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইয়াও অনর্গল বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। জাপানী ও ভারতবাসীর বিবাহ বন্ধন—ঢাকা নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মল্লিকের কন্যা কুমারী হরিপ্রিয়া মল্লিকের সহিত বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরীর জাপানী কারিগর শ্রীযুক্ত ওমেল তাকদারের পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে সম্পন্ন হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে একটী ভয়ানক কুপ্রথা আছে। বালিকাদিগকে হিন্দু দেবতাদিগের সহিত কৃত্রিম বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে ব্যভিচারিণী করা হয়। তত্রত্য ডাক্তার ভাণ্ডারকার প্রমুখ বহুতর ভদ্র ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপকসভার অভিমতানুসারে আবেদনের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন। প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় করিতে অক্ষম। তাহাদিগের শিক্ষা ও তদীয় পিতা ও অভিভাবকদিগের সুশিক্ষা দানই এই দুর্নীতি নিবারণের একমাত্র উপায়। অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগের উদ্ধারের ভার গবর্ণমেণ্ট লইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল কুমারীর শিক্ষা ও রক্ষণের জন্য স্থানাদির প্রয়োজন। অতএব তদ্বিষয়ে আবেদনকারীদিগের অভিমত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

সিংহলদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। পাঠিকারা মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন যে ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে যে পকষ্ট্রেট নামে একটী প্রণালী আছে, তন্মধ্য দিয়া ২২ মাইল দীর্ঘ একটী বালুকাময় সেতু আছে, যাহা সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধ এবং অধুনাতন ইংরাজগণ যাহাকে আদমেরসেতু (Adam's bridge) বলিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে, কাঠ বিড়ালী সেতু নির্ম্মাণকরিয়াছিল। এখন মান্দ্রাজ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবং সিংহল গবর্ণমেণ্ট সেই সেতু পুনর্নির্ম্মাণ করিবেন।

আমেরিকার একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মনুষ্যের মৃত দেহ ওজন করিয়া বলিয়াছেন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে দেহের পরিমাণ ½ আউন্স হইতে ১½ আউন্স পর্য্যন্ত হ্রাস হয়, সুতরাং দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হওয়াই ইহার কারণ। অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই মতের অনুমোদন করেন নাই। কেহ কেহ কুকুরের দেহ ওজন

করিয়া কোন হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পান নাই। কুকুরের আত্মা নাই!

এই বৎসর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অত্যন্ত নিকট হইবে, সেই জন্য কতকগুলি জ্যোতির্ব্বিৎ আমেরিকায় গমন করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে এই দৃশ্য সুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হইবে। ১৫ বৎসর মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর এরূপ নিকটবর্ত্তী হয় নাই। জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহারা তথায় দর্শন করিবেন। এণ্ডিস পর্ব্বতশিখরে টড সাহেব দর্শন করিবেন, সেখানে বায়ুমণ্ডল প্রশান্ত। ধন্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায়।

অনেক দিন আলোচনা ও চিন্তার পর বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় একটী সমাজহিতকর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোন বিদ্যালয়, ছাত্রনিবাস, ভদ্রপল্লী, উপাসনালয় প্রভৃতি স্থানে কোন ব্যক্তি বেশ্যালয় অথবা দুর্নীতির পোষকতা উদ্দেশে হোটেল প্রভৃতি রাখিতে পারিবে না। কোন বেশ্যা উপরিউক্ত স্থানসমূহে বাস করিতে পারিবে না।

বিগত বর্ষে ২০৮৪ জন লোক বন্য জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এবং ২২৮৫৩ ব্যক্তি সর্প দংশনে মৃত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, মান্দ্রাজ বম্বাই ও ব্রহ্মদেশে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অনেক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কটক্ প্রদেশে বন্য হস্তী দ্বারা অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে সূর্য্যনারায়ণ সেন নামক একজন বি, এ, উত্তীর্ণ ছাত্রকে মাসিক ৩২৲ টাকা বৃত্তি দিয়াছেন। ইনি ডফ কলেজ হইতে বি, এ, অনার পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বৃত্তিধারীকে কোন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয় কোন নূতন তত্ত্বের অনুশীলন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন বন্ধু দাদাভাই নাওরোজী পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ আছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে স্বদেশের হিত ব্রতে সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবং সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী ইংলণ্ডে সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের সর্ব্বাঙ্গীণ সাহায্যের জন্য আনিবেশান্তের চেষ্টায় লণ্ডনে ৮ই জুলাই একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিলাতের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছেন।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর তাঁহার জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণীর নামে নিজ রাজধানীতে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই মিথিলাভূমি পূর্ব্বকালে সংস্কৃতচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রদেশেই জগতের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদ্‌সকল বিরচিত হইয়াছিল।

বামারচনা।

শোকগাথা।

হারালে মা বঙ্গভূমি! কি অমূল্য ধনে।
স্নেহের তনয় তব উমেশচরতনে।
শারদ সুধাংশু সম, সকলেরি প্রিয়তম,
মনস্বী উমেশচন্দ্র ছিলেন ধরায়;
কাঙ্গালিনী হলে মাগো হারায়ে তাঁহায়।

চির জীবনের মত কালের বাত্যায়—
বঙ্গের উজ্জ্বল দীপ নিবিলরে হায়!
মাতৃভূমি জননীর, কেবা আর অশ্রুনীর,
মুছাবে যতনে হায় করি প্রাণপণ?
হারালে মা বঙ্গভূমি! কি অমূল্য ধন!

কর্ত্তব্যে বিনয়ে পূর্ণ হৃদয় উদার,
তেজস্বী উমেশচন্দ্র ছিল মা! তোমার।
সর্ব্বগুণে বিভূষিত, উচ্চ সে মহান্ চিত,
জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত ছিল সে হৃদয়;
আর কি মা! পাবে অঙ্কে এ হেন তনয়?

বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে নির্ম্মল তপন,
কাল রাহুগ্রাসে আজি তিমিরে মগন।
বিষাদিনী বঙ্গভূমি, চিরতরে কাঁদ তুমি,
ভবিষ্য তোমার দেখি কেবলি আঁধার;
জানিনা মা! তব ভালে কিবা আছে আর।

দেশসেবাব্রতে ছিল নিয়োজিত প্রাণ;
অনাথ হইল কত সৎ অনুষ্ঠান।
কর্ম্ম যজ্ঞে সমর্পণ, করেছিলে প্রাণ মন
সেই মহা পুণ্য বলে ওহে মহাপ্রাণ!
বৈজয়ন্ত ধামে আজি করিলে প্রয়াণ।

কি দুর্দ্দিন আজি হায় বঙ্গ-মহিলার!
হিতৈষী বান্ধব হেন পাইব কি আর?
কত না যতন করে, বঙ্গ-ললনার তরে,
অক্লান্ত করিলে শ্রম সেকি ভোলা যায়?
আমাদের ভাগ্যদোষে গেলে দেব হায়!

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজি ভক্তিপুষ্প-হার—
গাঁথিয়া উদ্দেশে পূজি চরণ তোমার।
নিজকৃত পুণ্য-বলে পশিয়াছ সেই স্থলে,
সে স্থান হইতে কর আশীষ বর্ষণ।
স্বদেশের যাহে হয় কল্যাণ সাধন।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

শ্রাদ্ধবাসরে।

কেন এ উৎসব আজি শোকের মাঝারে,
সাধি সংসারের কাজ
পরিশ্রান্ত হয়ে আজ
দেবতা গেছেন চলি দয়াময়ী-ক্রোড়ে
হাতে লয়ে ফুলডালা
যত সব দেববালা

বরণ করিছে তাঁরে প্রফুল্ল অন্তরে
"কৈলাসকামিনী" মাতা
সঙ্গে লয়ে "বিন্দু" সুতা
আসিছেন নন্দানন্দে দেবে পূজিবারে,
অষ্টদিনে পেয়েছেন আরাধ্য দেবেরে॥

তাই এই শোক-মাঝে আনন্দ অপার,
রোগে শোকে জীর্ণ দেহ
ছাড়িয়া প্রবাস গেহ
পেয়েছেন আজি তিনি গৃহ আপনার।
পূত কলেবর ধরি
নিজধামে গেছে হরি,
রোগ শোক যত কষ্ট চলে গেছে তাঁর।
প্রাণেতে শান্তির ভাতি
নয়নে স্বর্গের জ্যোতি
উথলিছে আজি তাঁর সুখ-পারাবার;
তাই স্মরি আজি হেথা উৎসবব্যাপার॥

সন্তানগণের এই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি
লও তুমি স্বর্গে থাকি
তাদের অন্তর দেখি
ব্যথিত হৃদয় দেব! তোলা বিনা অতি;
কর দেব! আশীর্ব্বাদ
ঘুচে যাক্ পরমাদ
সংসারে ফুটুক আজি তব পুণ্য-জ্যোতি;
তব উপদেশ স্মরি
যেন সব কাজ করি
পরম পিতার পদে রাখি সদা মতি,
যাও আজি প্রাণে বল অপতির গতি!

সরোজিনী রায়।

শেষ।

কনক বরণ রাশি বাসন্তী উষায়,
এসেছিলা ধরাতলে দিনমণি প্রায়।
নীরিদ তিমির নাশি, বিতরি কিরণ রাশি
উজলিলা ধরাতল বিমল বিভায়।
সুসৌরভ যশোরাশি রেখেছিল তার;
চারি নিজ মন প্রাণ, আর্ঘে দিয়া বলিদান
সাধিলেন পরহিত করি প্রাণপণ;
আজ—বালাকুল পিতৃহীন, হইল অনাথ দীন,
কে সাধিবে নারীহিত করি প্রাণপণ;
অবলার জ্ঞান আশা চ'ল নির্ব্বাপণ;
কি কথা শুনিনু হায়! অতি বিদরিয়া যায়,
দেব! তুমি দেবধামে করেছ গমন;
না পাব দেখিতে আর রাজীব চরণ।
যাবৎ এ প্রাণ রবে, তাবৎ আমরা সবে
উদ্দেশে ঢালিব পদে ভক্তি অশ্রুধার;
ছাড়িনী বঙ্গের বালা কিছু নাই আর।
(অবলার আশা শেষ চ'ল এই বার)

কোনও ছাত্রিনী
বঙ্গমহিলা

কলিকাতা।
২৩।১ নং নবীন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীযুক্তকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আন্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

কেশরঞ্জন বঙ্গললনারই জন্য!

সমগ্র ভারতের রমণীকুলের কেশরাজির ও বেণীরচনার পারিপাট্য তুলনায় বঙ্গরমণী যে বিধাতৃ-প্রসাদে অতুলনীয়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেকালে কেশের উন্নতিসাধনকল্পে নানাবিধ সুগন্ধি তৈল প্রচলিত ছিল। আমাদের কুল-মহিলারা সেইগুলির সহায়তায় কেশবিন্যাস করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সে সমস্ত নিয়মগুলি ব্যবহারাভাবে লোপ পাইয়াছে। এইজন্য যাঁহারা আমাদের "কেশরঞ্জন তৈলের" নাম জানেন না, তাঁহারা কেশবিন্যাসের সময় একটা বিড়ম্বনা-ভোগ করিয়া থাকেন। আমরা প্রত্যেক বঙ্গপল্লীর সম্ভ্রান্ত ও গৃহস্থ মহোদয়কে জানাইতেছি, আমাদের মহাসুগন্ধি "কেশরঞ্জন তৈল" মহিলাকুলের কেশকলাপের সৌন্দর্য্যসাধন বৃদ্ধিকরণে, কুঞ্চিত করণে,—কেশরাজিকে ভ্রমরকৃষ্ণকরণে অদ্বিতীয়। শুধু সমগ্র ভারতে নহে—এইজন্য ভারতীয় উপনিবেশে ও অন্যান্য সুদূরবর্ত্তী স্থানের প্রবাসীগণ, মহাসমাদরে আমাদের কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করেন। আপনি যদি অন্যবিধ বিলাতী ও বাজে কেশতৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহা বন্ধ করিয়া দিন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত আমাদের কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করুন।

একশিশির মূল্য ... ১৲ এক টাকা। মাশুলাদি ... ।৵০ আনা।
তিনশিশির মূল্য ... ২৷৷০ আড়াই টাকা। মাশুলাদি ... ৷৷৶০ আনা।

কোমল মুখখানি।

যে মুখে ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি নাই, যাহার চামড়া ফাটিয়া কর্কশ হয় না, সেই মুখই—কোমল মুখখানি। কিশোর কিশোরীর কোমল মুখখানি প্রায়ই ঐ সকল রোগে কুশ্রী হইয়া যায়। আমাদের "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহারে ঐ সকল রোগ শীঘ্র নষ্ট হইয়া, মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠে।

হিমাংশু-দ্রব—মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকল্পে সহায়তা ব্যতীত ঘামাচি, ছুলি ও চুলকানি প্রভৃতির নিবারণ ও উপকার করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যসময়ে ঘামাচির যন্ত্রণা যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা সকলেই জানেন। এই সময়ে একাধারে বিলাসদ্রব্য এবং ঔষধস্বরূপ আমাদের এই "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহার করিলে, এই সমুদায় যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে।

যুবক ও যুবতীদের—মধ্যে যাঁহারা প্রতিদিন বিলাতি এসেন্স্ বা ব্রণ মেচেতার অন্য বিলাতি ঔষধের অন্যান্য প্রকরণ ব্যবহার করেন, আমরা তাঁহাদের অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আমাদের এই বহুপরীক্ষিত "হিমাংশুদ্রব" ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ ও অমনোযোগী না হন। ইহার সুগন্ধে তাঁহাদের মন ভুলিবে,—ব্যবহারে মুখমণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত হইবে।

এক শিশি হিমাংশু-দ্রবের মূল্য ৷৷৶০ আনা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৵০ আনা।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

প্রসূতারিষ্ট।

"প্রসূতারিষ্ট" সূতিকারোগের মহৌষধ। প্রসবের পর যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে সূতিকারোগ বলে। সূতিকারোগমাত্রই নিতান্ত দুঃসাধ্য ও কষ্টজনক। এই ঔষধ অল্পদিন সেবন করিলেই মৃতবৎসাদোষ, জ্বর, উদরাময়, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি যাবতীয় দুরারোগ্য সূতিকা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। প্রসবের পূর্ব্ব হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রসব হয় এবং সূতিকারোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। গর্ভের প্রথম অবস্থা হইতে এই ঔষধ সেবন করিলে, গর্ভকালীন বমন, অরুচি, গ্লানি প্রভৃতি সকল প্রকার উপসর্গ নিবারিত হইয়া থাকে। এরূপ নির্দ্দোষ মহোপকারী ঔষধ প্রত্যেক গৃহস্থেরই সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৶০ আনা।

হিষ্টিরিয়া রোগ—অসাধ্য নহে।

আমাদের গবেষণা-উদ্ভাবিত মূর্চ্ছান্তক তৈল যোগাপস্মার বা হিষ্টিরিয়া এবং মৃগী বা অপস্মারের অব্যর্থ ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতদ্ব্যতীত এতদ্দ্বারা সর্ব্বদা মন হু হু করা, মনের চাঞ্চল্য, উন্মাদ, শিরোঘূর্ণন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়জনিত পীড়াসকল, মদাত্যয়, বায়ুজন্য অষ্ঠীলা, ঘর্ম্ম, গ্রহণী, এবং উত্তপ্ত শোণিত জন্য অকারণ ক্রোধ, ভয়, হাস্য, রোদন, কম্প, প্রভৃতি বিবিধ পীড়া আশু নিবারিত হয়। ইহা বায়ুরোগমাত্রেরই উৎকৃষ্ট ঔষধ। আপনার হয়ত মনে সন্দেহ-প্রশ্ন উঠিতে পারে—একটি তৈলের এতগুলি গুণ একাধারে থাকা কিরূপে সম্ভবে? তাহার উত্তরে আমরা নিজে কিছু বলিতে চাহি না,—পরীক্ষা দ্বারা এই সকল গুণের জীবন্ত অস্তিত্ব অনুভব করিলেই আপনি অনর্থক সন্দেহের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন।

এক পোয়া মূর্চ্ছান্তক তৈলের মূল্য ... ৪৲ চারি টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং ... ৷৵০ আনা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী, ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মূল্য প্রতি কৌটা ... ১৷০ এক টাকা চারি আনা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ তিন আনা।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১৷৹ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

রেণুকা।

মনোজবা ও সতীলীলা রচয়িত্রী—
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী প্রণীত।
মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সরল কৃত্তিবাস।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা, কৃত্তিবাসের জীবনী এবং তাঁহার জন্মভূমির ফটো সম্বলিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত প্রণেতা
শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, বি, এ, সম্পাদিত।

বালক বালিকাদিগের এবং মহিলাগণের পাঠের উপযোগী করিয়া এই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি, যজ্ঞে নারায়ণের আবির্ভাব হইতে কুশ লবের রামায়ণ শিক্ষা পর্য্যন্ত বিবিধ ঘটনাবলীর এবং পঞ্চবটী, বাল্মীকির আশ্রম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বিবিধ স্থানের সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ খানি হাফটোন চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্রগুলি বহু যত্নে ও বহু ব্যয়ে সংগৃহীত এবং অত্যুৎকৃষ্ট আর্টপেপারে নানা রঙে মুদ্রিত। এরূপ চিত্র এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। পিতা মাতার পক্ষে পুত্র কন্যাকে, শ্বশুর শাশুড়ীর পক্ষে বধূ ও জামাতাকে, ভ্রাতার পক্ষে ভগ্নীকে, স্বামীর পক্ষে সহধর্ম্মিণীকে, শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রকে, সাধারণতঃ হিন্দুসন্তানের পক্ষে প্রিয় জনকে উপহার দিবার জন্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক আর নাই। ছাপা, মলাট, কাগজ অতি সুন্দর। বঙ্গের গৃহে গৃহে ইহা বিরাজিত হউক এই আমরা ইচ্ছা করি। মূল্য ১৷৷০, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৸০, ডাকমাশুল ।০।

প্রকাশক—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল।

মস্তক ও কেশের জগদ্বিখ্যাত তৈল।

জবাকুসুম তৈলের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন উৎকৃষ্ট তৈল এতাবৎ কাল পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির জন্য যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই আদরের সহিত প্রত্যহ আমাদের মহৌষধ জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়—জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ, জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি। যাঁহারা বহুদিবস হইতে শিরোরোগ এবং কেশসম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন এবং বহুবিধ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করুন, নিশ্চয় আরোগ্য হইবেন।

প্রতি শিশি এক টাকা, ভিঃ পিতে ১।৵০ আনা।
তিন শিশির মূল্য ২।০ টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০ আনা।
ছয় শিশির মূল্য ৫৲ টাকা, ডাকমাশুল এক টাকা।
ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ টাকা, ডাকমাশুল ১৷৷০ টাকা।

হিজ্ হাইনেস শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর ইন্দোরাধিপতি শিবাজি রাও হোলকার কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের অভিমত—* * জবাকুসুম তৈল স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট। ইহা অতি মনোরম ও ক্লান্তিনাশক। আমি প্রত্যহ ব্যবহার করি।

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বরদাধিপতি গায়কোয়াড় কে, জি, সি, এস্, আই, বাহাদুরের এডিকং কুমার শিবরাজ সিং বাহাদুর বলেন—* * আপনার জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা অতি স্নিগ্ধকর ও বিশেষ ক্লান্তিনাশক। ইহার গন্ধ বহুক্ষণস্থায়ী ও বিশেষ প্রীতিপ্রদ।

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ চন্দ্রসমসের জং বাহাদুর রাণা জি, সি, এস, আই, পি, জি, ডি, পি, জি, পি, বাহাদুর অব্ নেপাল—* * জবাকুসুম তৈল অতি উপাদেয়, গন্ধ অতি মনোহর। স্নানের পরও ইহার সুগন্ধের ব্যাঘাত হয় না।

হিজ্ হাইনেস্ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ ঝান্সী প্রদেশাধিপতি মহারাজা কে, জি, সি, এস, আই, বাহাদুরের অভিমত—জবাকুসুম তৈল যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সমস্ত শরীরের স্নিগ্ধতাকারক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ,
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণের মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়,

৮০নং হারিসন রোড ও পোষ্ট, কলিকাতা।

যাঁহার যেরূপ পীড়া, সহজ বা দুরারোগ্য, পীড়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ লিখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিয়া ঔষধ ব্যবহার করুন, কেহই নিষ্ফল হইবেন না। দূষিত রক্ত, অম্লশূল, শরীরের অথবা হস্ত পদের দাহ, পুরাতন জ্বর, ও শরীর দুর্ব্বল থাকিলে অনন্তমূল ও গুলঞ্চের সিরাপ ব্যবহার করুন, আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। মূল্য ১ এক মাসের যোগ্য প্রত্যেক ৸০ আনা করিয়া ১৷৷০; আজকাল এই সিরাপদ্বয় সকলেই ব্যবহার করিতেছেন। ইহার প্রশংসাপত্রও বিস্তর, তন্মধ্যে এক-খানি দেখুন।

দেবকল্প বিদেহাত্ম তৈলঙ্গ স্বামীর প্রিয়তম শিষ্য, পরিব্রাজক, শাস্ত্রবিশারদ, জ্ঞানী বহুদর্শী শ্রীরামানন্দ সরস্বতী এম্ এ, বি এল স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অবিকল অনুলিপি—শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ রায় মহাশয়, আপনার গুলঞ্চ ও অনন্তমূলের সিরাপ খাইয়া আমার ৭ বৎসরের জ্বর ও রক্ত দোষ (যাহা ক্যালমেল খাইয়া হয়) আরোগ্য হইয়াছে। ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা এতাবৎ কাল কোনও উপকার পাই নাই, কিন্তু মহাশয়ের উপরোক্ত ঔষধি দ্বারা শারীরিক সর্ব্বরোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। গায়ের দাগ পর্য্যন্ত সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। বলিতে পারি, জগতে এই ঔষধ সর্ব্বপ্রধান। ইহার তুল্য জগতে আর ঔষধ নাই। ১লা আশ্বিন, ১৩০৭। শ্রীরামানন্দ সরস্বতী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে অশোকাদি সিরাপ অমোঘ ঔষধ, মূল্য ৸০। অশোকাদি সিরাপে অশোকাদি ঘৃত বা অরিষ্ট অপেক্ষা বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার করিবার অতি সহজ উপায়, অতি সুখসেব্য ও সুস্বাদু। আহারান্তে দুগ্ধসহ ২ বার খাইতে হয় মাত্র। কিন্তু এ স্থানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যেখানে অধিক রক্তস্রাব ও গর্ভধারণের শক্তির অভাব হইয়াছে (বন্ধ্যাদোষ) অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার ও পাত হয়, এমত স্থলে প্রাতে সিলাযত্বাদি সিরাপ ও রাত্রে আহারান্তে অশোকাদি সিরাপ ব্যবহার করিলে বন্ধ্যাদোষ ও গর্ভপাতের কোন আশঙ্কা থাকে না, এবং গর্ভে সন্তান বলিষ্ঠ হয়। উক্ত ঔষধের কোন অনিষ্টকর ফল নাই। বিশেষতঃ রীতিমত ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি ও বর্ণ পরিষ্কার হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয়। আমাদের ধাত্রীখণ্ড তুল্য পেটের পীড়ার ঔষধ আর নাই। মূল্য ৸০। সিলাযত্বাদি সিরাপ মূল্য ১৲। পত্র সমস্ত গোপনে রাখা হয়।

ম্যানেজার—শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হারিসন রোড ও পোষ্ট, কলিকাতা।

PAGE CONTAINS TWO COLOU

কিনিতে বলি না, দেখিতে বলি।

অন্য বাজে দোকানের জঘন্য কেমিকেল স্বর্ণের গহনা ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে প্রশংসিত আসল কেমিকেল স্বর্ণের গহনা দেখিতে অনুরোধ করি। পত্র লিখিলে নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং গহনার সচিত্র ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি। আমাদিগের গহনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতবর্ষীয় শিল্পপ্রদর্শনীর সভা হইতে ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পাইয়াছি। সত্য, মিথ্যা দোকানে আসিয়া দেখিতে পারেন। কে, স্মিথ এণ্ড কোং।

ষ্টিরিয়স্‌কোপ বা চিত্রদর্শন যন্ত্র।

এই চিত্রদর্শন যন্ত্রে পৃথিবীর সকল স্থানের সঠিক নক্সা দেখিতে পাইবেন। ক্ষুদ্র কার্ডে ছবি বৃহৎ আকারের দেখা যায়। দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন, যেন সজীব—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ নদী, সমুদ্র, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর বাগান, ইত্যাদি ছবি অনেক প্রকার; ইউরোপ, আমেরিকা, বিলাত, জার্ম্মণী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশের ফটো চিত্র দেখিতে পাইবেন; লুকিং ম্যাজিক গ্লাস আঁটা বাক্স, প্রত্যেকটীর মূল্য ৪৲ টাকা। ফটোকার্ড ছবি, ডিমাই সাইজ, ১ ডজন ১৷৷০, অতিরিক্ত লইলে প্রত্যেক ছবি ৵০ হিঃ পড়িবে। যেরূপে ছবি দেখিতে হয়, তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া যায়। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

কে, স্মিথ এণ্ড কোং, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

হাওয়ার বন্দুক, মূল্য কমিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে ১ নং বন্দুক ৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা ৬৲ টাকা মূল্যে দিতেছি, শীঘ্র না লইলে পরে এ দরে পাইবেন না। এই বন্দুক ছুড়িতে পুলিসে পাস করিতে হয় না, কারণ বারুদ লাগে না, হাওয়ার বলে গুলি ছোটে, ছোট বড় জন্তু এবং সর্ব্বপ্রকার পক্ষী শিকার করা যায়। মানুষকে মারিলে প্রাণের হানি হয় না, তবে সাংঘাতিকরূপে জখম করা যায়। ডাকখরচ দরুণ ১৲ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায় না। ছুড়িবার নিয়মাবলী ও ১ কৌটা ছররা গুলি সঙ্গে দেওয়া যায়। অতিরিক্ত গুলি লইলে ১ পাউণ্ড ।৵০ আনা হিঃ পড়ে। পি, সি, দাস, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।



কটিগত বাত, সন্ধি বাত, ঝিন ঝিনে বাত, শিবামুণ্ডি বাত, বাত-ব্যাধি, পক্ষাঘাত, শিরাগত বাত (Sciatica) এবং সর্ব্বপ্রকার পেশীগত (Muscular) বেদনায় বিশেষ পরীক্ষিত। কলিকাতার কয়েকজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও কবিরাজ এই ঔষধটী সর্ব্বদা ব্যবস্থা করিয়া সুফল পাইতেছেন। মূল্য এক শিশি ২৲ টাকা। নমুনার শিশি ১৲ টাকা; প্যাকিং ৵০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন হাইকোর্টের উকীল, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত ডাক্তার অবুল, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম্ এ, মহাশয় বলেন,—"আমার একটী আত্মীয় পক্ষাঘাত রোগে চলৎশক্তিরহিত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। মহাশয়ের এণ্টিরিউমেটিকা ব্যবহার করিয়া তিনি এক মাসের মধ্যে ধর্ম্মতলা হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫৪ বৎসরের বৃদ্ধ এত শীঘ্র এরূপ আরোগ্য লাভ করায়, সকলেই বিশেষ চমৎকৃত হইয়াছেন।"

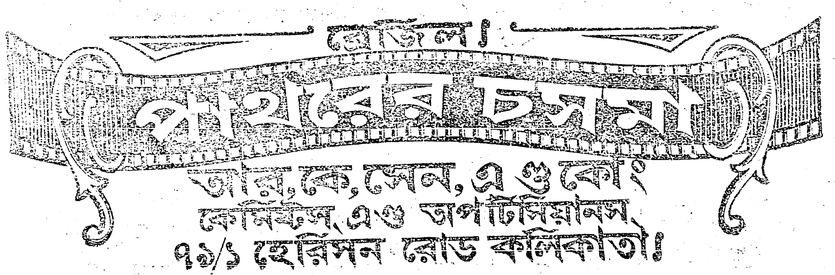

ষ্টিল ফ্রেম—৪৲; নিকেল ফ্রেম—৬৲; নিকেল উৎকৃষ্ট ফ্রেম—৮৲; সোণার ফ্রেম—২৫৲ হইতে ৪৫৲। বয়স ও কতদূর হইতে ছাপার লেখা পড়িতে পারেন, লিখিলে চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান হয়।

হোলসেল ও রিটেল এলোপ্যাথিক ও পেটেণ্ট ঔষধ ঠিক দরে বিক্রয় হয় এবং মফঃস্বলের অর্ডার সত্বর পাঠান হয়।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

বামাসুন্দরী রচনা পারিতোষিক।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু তাঁহার মাতৃদেবীর স্মরণার্থ বার্ষিক ৫৲ টাকা পারিতোষিক দিয়া থাকেন। এ বৎসর বামাবোধিনীর গ্রাহিকাদিগের মধ্যে "সুমাতা" সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিবেন, তিনি এই পারিতোষিক পাইবেন। আগামী মাঘমাসে ইহা বিতরিত হইবে। পৌষের পূর্ব্বে প্রবন্ধ সকল বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য।

আনন্দমোহন পুরস্কার।

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দ মোহন বসুর জীবনী সম্বন্ধে যে মহিলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া তাঁহাকে ১০৲ টাকা ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ১০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার দিবেন।

বামাবোধিনী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ৺ উমেশচন্দ্র পুরস্কার।

বামাবোধিনীর পাঠিকা গণের মধ্যে যিনি "সাধুজীবন" বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তিনি ঐ পুরস্কার ১০৲ দশ টাকা প্রাপ্ত হইবেন। প্রবন্ধগুলি আগামী ২০শে কার্ত্তিক মধ্যে বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে পৌছা আবশ্যক।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

খোকা ... ১৲ টাকা; প্রীতি ও পূজা ... ॥০।

নূতন উপন্যাস—দুইটী কথা ... ॥০, প্রভাতী ... ।০ আনা।

ভাব ও ভক্তি ... ১৲। গল্পের বহি (যন্ত্রস্থ)।

গ্রাহকগণের প্রতি।

বং কৃপায় "বামাবোধিনী পত্রিকা" আজি ৪৫ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই পত্রিকা যাঁহার অক্লান্ত ম ও চিরজীবনের অধ্যবসায়ের ফলে এই দীর্ঘকাল সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, সে মহাত্মার তিরোভাবে তাঁহার এই কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্থায়িনী হয়, সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর তারাকুমার কবিরত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু, কাব্যকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসু ও সাহিত্যসেবী মহাত্মা ও বিদুষী মহিলার আন্তরিক যত্ন ও সমবেত সাহায্যে স্বর্গীয় সম্পাদক য়ের কৃতবিদ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এই পত্রিকা পরিচালনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া ক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে যত্নবান্ আছেন। স্ত্রীশিক্ষানুরাগী গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের ও সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয়।

সমাগত। ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত পত্রিকা বাহির হইল। গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের লক বা অগ্রিম মূল্য প্রাপ্য আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা পাঠাইয়া কার্য্যের া করিবেন। অনুমতি করিলে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে পত্রিকা পাঠাইতে পারি।

বামাবোধিনীর" জন্য প্রবন্ধাদি ও পত্রিকার মূল্য বামাবোধিনী কার্য্যালয়, ৯নং আন্টনিবাগান লেন নায় শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্তের নামে পাঠাইবেন।

বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৶০, যাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, এক ার নমুনার মূল্য ।০ আনা। চারি আনা পাঠাইলে নমুনাস্বরূপ এক সংখ্যা প্রেরিত হয়।

৯, আন্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৭।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু,
বামাবোধিনী কার্য্যাধ্যক্ষ।

মূল্য প্রাপ্তিস্বীকার।

অগ্রিম।

সতী	ভবতারিণী বসু, চেতলা	২৷৶০
সতী	সুশীলা মজুমদার, কলিকাতা	১৷৵০
কুমার	দেবেন্দ্রনাথ রায়, রায় বাহাদুর কলিকাতা	২৲
"	রাজেন্দ্রনাথ মিত্র,	ঐ ১৷৶০
শ্রীমতী	সারদামঞ্জরী দত্ত, শিলং	২৷৶০
	নারেবল্ জষ্টিস্ প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লাহোর	২৷৶০
বাবু	বিপিনবিহারী দত্ত, বানারীপাড়া	২৷৶০
মিষ্টার,	এম্ গুপ্ত, হোসেঙ্গাবাদ	ঐ
বাবু	সারচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দোর	"
শ্রীমতী	হেমলতা ব্রহ্ম, কলিকাতা	"
মহারাজা	সার সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বাহাদুর, মুক্তাগাছা	"

সাবেক।

মিষ্টার	হীরালাল সাস গুপ্ত, মুরাদপুর	৫৷৹
বাবু	বিধনাথ সিংহ, কটক্	২৲
বাবু	হরিশ্চন্দ্র দত্ত হুগলী	৯৲
বাবু	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পুর্ণিয়া	২৲
শ্রীমতী	রাসরঙ্গিনী ঘোষ, বাগুটিয়া	২৷৶০
শ্রীমতী	পঙ্কজিনী দাসী, ভবানীপুর	"
মিষ্টার	এম্, হাফেজ, নড়াইল	১৷৵০
বাবু	অদ্বৈতচরণ মল্লিক, কলিকাতা	৷৷০
রায়	কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, কুচবেহার	৩৷০
বাবু	কালীপদ বসু, ঢাকা	৯৷৵০
বাবু	প্রকাশচন্দ্র সিংহ, গৌহাটী	৬৲
শ্রীমতী	সতী দেবী, কান্দা	৬৲
"	শ্যামসুন্দরী দেবী, কলুবিয়ানগর	৩৷৵০

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

আমাদের প্রস্তুত

এসেন্স—দেলখোস

ও অন্যান্য বহুবিধ এসেন্স

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনীতে

বহুদর্শী সুযোগ্য বিশেষজ্ঞের দ্বারা

পরীক্ষিত হইয়া ভারতীয়

এসেন্সসমূহের মধ্যে

প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং

সুবর্ণ পদক

প্রাপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুলভ এসেন্স

পরিত্যাগ করিয়া আপনি

অন্য এসেন্স কেন

ক্রয় করিবেন ?

এইচ্ বসু,

ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

No. 536. Registered No. C. 134. October, 1907.



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩০ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩১৪। অক্টোবর, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১৬১
২। আমিষ ও নিরামিষ আহার ... ১৬৩
৩। শুভদৃষ্টি (শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু) ১৬৯
৪। বল্লুজী চম্পাবৎ ১৬৯
৫। পত্নীহারা। (শ্রীবিপ্রচরণ বসু)। ... ১৭২
৬। প্রেমের জয় বা সিদ্ধিলাভের গুঢ়তত্ত্ব (শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী) ... ১৭৫
৭। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে (শ্রীচন্দ্রনাথ দাস) ১৭৭
৮। তপস্যা (শ্রীমতী মানকুমারী বসু) ১৭৮
৯। জন্মদিনে ১৮০
১০। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত (ডাঃ নবীনচন্দ্র দত্ত) ... ১৮৩
১১। বঙ্গমহিলার হিমালয়-ভ্রমণ (শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু)। ... ১৮৪
১২। বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব (শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী)... ১৮৭
১৩। নূতন সংবাদ ১৮৯
১৪। পুস্তকাদি সমালোচনা ... ১৯০
১৫। বামারচনা—দুর্ভিক্ষ চিত্র ... ১৯১

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

PAGE CONTAINS TWO COLOUR.

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি বিবিধ প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হইবে, অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ধুড় ধুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৸০, মাশুল ।০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটকাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৸০ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা; মোট ১৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৬নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

সন ১২৮২ সালে স্থাপিত

মতিলাল বসু এণ্ড কোংর

জগদ্বিখ্যাত ও ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত সেই

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে, হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণে এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। মানসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। লক্ষ্মীবিলাস কেশ বৃদ্ধি করিতে একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸০, বোতল ২৲; প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

স্বদেশী সেণ্ট বা পুষ্পসার।

বিলাতি সেণ্ট বা পুষ্পসার হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং শত গুণে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং স্বদেশজাত দেশীয় ফুলের মিষ্ট মধুময় সৌগন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী ফুলের কঠোর গন্ধের দিকে কেন প্রধাবিত হয়েন? আমাদের বেলা, সেফালিকা, চম্পক, মালতী, জেসমিন, লিলি এবং পুষ্পসার ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতি শিশি ১৲। তিন শিশির সুন্দর বাক্স ২৷৷০। উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার, মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০।

সুধাসিন্ধু রস।

ইহা নিয়মিতরূপ সেবনে ম্যালেরিয়া, পাণ্ডু, প্লীহা ও যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর, ম্যালেরিয়া ও পুরাতন জ্বর, পালা, দ্বিকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। কুইনাইন-বর্জ্জিত ও গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে বাত, গেঁটে-বাত, কোমরের বাত, চলতি বাত, ঝিনঝিনে বাত, চৌরঙ্গি বাত প্রভৃতি সকল প্রকার বাত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৲, ছোট শিশি ৷৷০ আনা, ডজন—বড় শিশি ১০৷৷০ টাকা, ছোট ৫।০ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং,

ড্রগিষ্টস্ এণ্ড জেনারল মার্চ্চেণ্টস্,

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

৵০

মণ্ডল ফ্লুট।

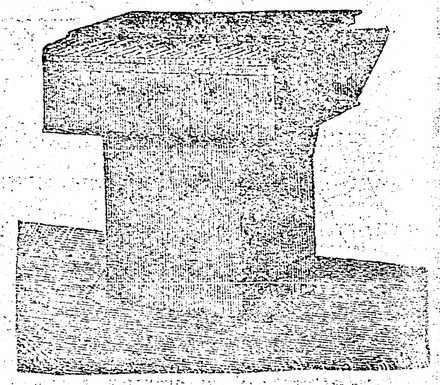

দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ড মাষ্টার, প্রফেসার প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানি সুরে গান এবং গত বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহুপ্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারাণ্টী সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্মপ্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩ অক্টেভ ৩ ষ্টপ্ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড্ড ৪ ষ্টপ্ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং, ৩ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—(১) বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা; (৪) বাঁকীপুর শাখা, বাঁকীপুর; (৫) পাটনা শাখা, পাটনা; (৬)-মথুরা শাখা, মথুরা (যুক্ত প্রদেশ)।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্ম্মামিটার, ষ্টীথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী বা বাঙ্গালা ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসা, মূল্য ৸০—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতি তরল ও সুন্দর।

আদি ও অকৃত্রিম

মোহন ফ্লুট-হার্ম্মোনিয়ম।

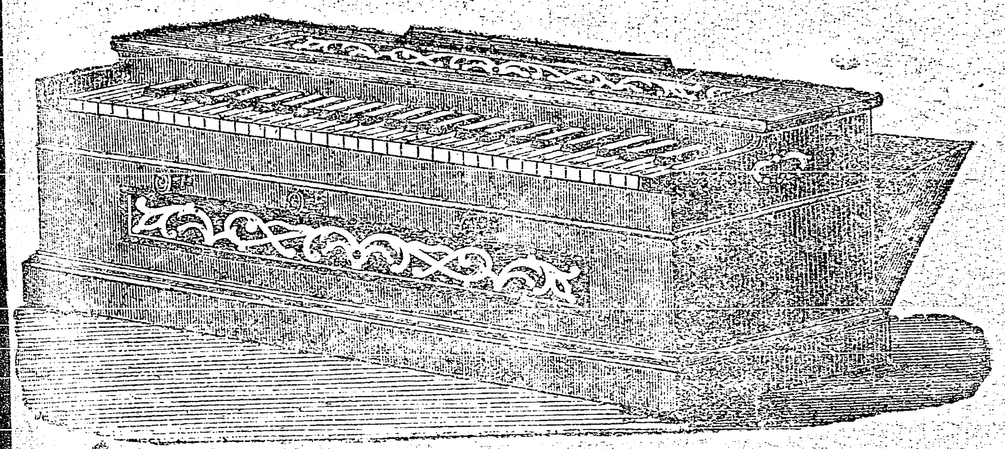

দেশীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের এই জগদ্বিখ্যাত মোহন ফ্লুট-হার্ম্মোনিয়ম যেরূপ উপযোগী, আর কোন যন্ত্রই সেরূপ নহে। ইহার মনোমুগ্ধকারী স্বর, গঠনের দৃঢ়তা, কলকব্জার কারুকৌশল, সহজ বেলো সঞ্চালন এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য বিবেচনায় ইহা জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয়। ইহার উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে, বাজারে ইহার নানাবিধ নকল হইয়াছে। অতএব সানুনয় নিবেদন যে, ক্রয়কালে ইহার উপর আমাদের রেজেষ্টারী করা ট্রেড মার্ক "মোহন" কথাটী ও বেলোর পৃষ্ঠে জ্বলন্ত স্বর্ণাক্ষরে আমাদের নাম দেখিয়া লইবেন, নতুবা ঠকিবেন। মফঃস্বলে ভি, পি, তে পাঠাইয়া থাকি। যন্ত্রে কোন দোষ থাকিলে বা পছন্দ না হইলে ফেরত লওয়া হয়। মূল্য ৩৫৲, ৪৮৲, ৪৫৲ ও উর্দ্ধ। পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে সচিত্র মূল্য-তালিকা প্রেরিত হয়।

একমাত্র নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা—

পাল এণ্ড সন্স্, মোহন মিউজিক্যাল ডিপো, ২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড (দ্বিতলের উপর), কলিকাতা। গ্যারাণ্টি ৩ বৎসর।

নূতন পুস্তক

বীরকুমার-বধ-কাব্য।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত। বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরে ইহা অভিনব, অতুলনীয় মহাকাব্য। অতি সুন্দররূপে ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বটকৃষ্ণ পালের



ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের
এমন আশু শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১।০, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ৸০, ঐ ৸৵০ আনা।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

এডওয়ার্ডস

লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট

অর্থাৎ

প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।

প্লীহা ও যকৃৎ নির্দ্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্ টনিক
বা য়্যাণ্টি-ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত
মলম পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা
আবশ্যক। ঔষধ সেবনের সহিত এই মলম
মর্দ্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা ।৵০ ছয় আনা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে।

সোল্ এজেণ্টস্—**বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং,**
কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্,
৭ ও ১২ নং বন্‌ফিল্ড লেন, (চীনাবাজার) কলিকাতা।

থাইসিস্ ইন্‌হেলেশন্।

ক্ষয়কাশের অতি আশ্চর্য্য ঔষধ।

যদ্যপি তোমার ক্ষয়কাশ হইয়া থাকে, কিম্বা ঐ রোগ জন্মিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে, যদ্যপি তোমার পিতা কিম্বা মাতার জর-কাশে মৃত্যু হইয়া থাকে, যদ্যপি কখনও তোমার রক্ত উঠিয়া থাকে, অথবা অনেক দিন হইতে তোমার কাশি হইয়া থাকে, এবং তৎসঙ্গে বৈকালে জ্বর, হাত পা ও চক্ষু জ্বালা বোধ হয়, রাত্রে ঘর্ম্ম অরুচি ও ক্রমশঃ কাহিল ভাব ও দুর্ব্বলতা অনুভব হয়, তাহা হইলে ডাক্তার এস্, সি, পালের থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন তুমি কেন না ব্যবহার করিতেছ?

থাইসিস ইনহেলেসন খাইবার ঔষধ নয়। এই ঔষধের কেবল মাত্র আঘ্রাণ লইতে হয়। হাজার হাজার ক্ষয়-কাশ-রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধের আঘ্রাণ লইলে কাশ-রোগ-উৎপাদক কীটাণু সকল (জড়) ধ্বংস হইয়া যায় ও ফুস্‌ফুস যন্ত্র আর নষ্ট হইতে পারে না। ক্ষয়-কাশ রোগের প্রথমাবস্থা হইতে ডাক্তার পালের "থাইসিস্ ইনহেলেসন্" ব্যবহার করিলে অতি সত্বরই রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে। অধিক দিনের পীড়া হইলে এই ঔষধ আঘ্রাণে পীড়া আর কোন মতেই বাড়িতে পারে না ও রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ক্ষয়কাশ রোগ আরোগ্য হইতে এক শিশি ঔষধের বেশী আবশ্যক হয় না। মূল্য ১ শিশি ৫৲ টাকা, প্যাকিং খরচ ৵০ আনা। ডাক-মাশুল ও ভিঃ পিঃ খরচা ৵০ আনা।

প্রশংসাপত্র।

ডাক্তার এ, এন্, রায় চৌধুরী, এম্ বি, কলিকাতা, লিখিয়াছেন:—ক্ষয়কাশ রোগের প্রথমাবস্থায় আপনার "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইয়াছি। ক্ষয়কাশ-রোগীকে আপনার ইন্‌হেলেসন্ ব্যবহার করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমি ব্যবস্থা দিয়া থাকি। পত্রবাহকের ভাই ৫ মাস কাল ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, উহাকে এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" দিয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার ইদাল্‌জী কাওয়াসজী, এল্ এম্ এস, সার জামসেৎজীর সানিটেরিয়াম, থাণ্ডালা, বম্বে প্রেসিডেন্সি, লিখিয়াছেন:—আপনার "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" খুব উপকারী ঔষধ; সর্ব্বদাই আমার রোগীকে আমি উহা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমার স্ত্রীর ক্ষয়কাশের এই প্রথমাবস্থা। অনুগ্রহ করিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে তাঁহার জন্য এক বোতল "থাইসিস্ ইন্‌হেলেসন্" পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম, এস্,
১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

বঙ্গ মহিলার প্রতি নিবেদন।

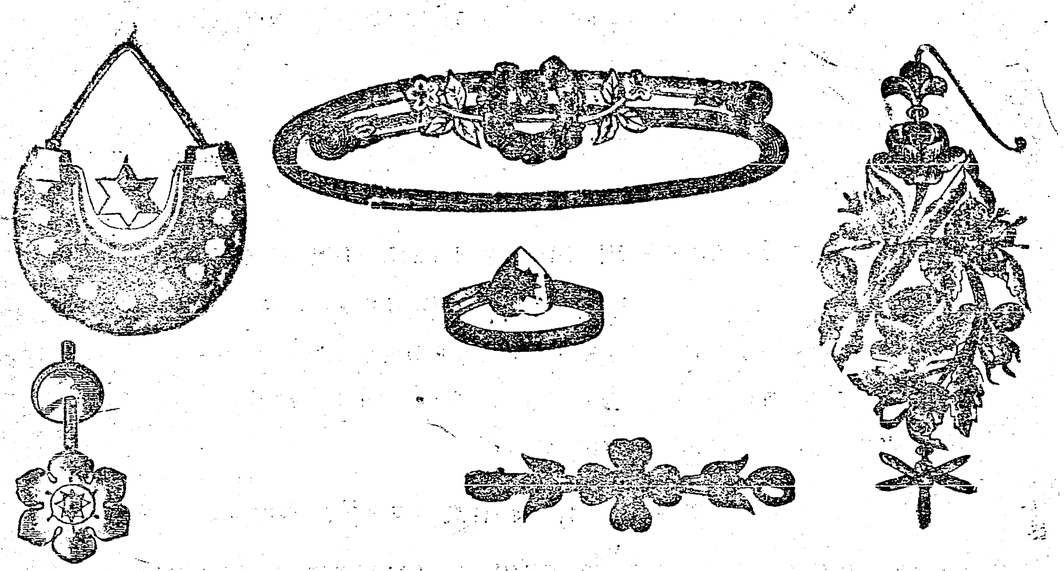

সাধ্যানুসারে বিলাতি জিনিষ ক্রয় করিবনা বলিয়া আপনারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছি। আমরাও সাধ্যানুসারে দেশী সোণায় দেশী কারিকর দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ অলঙ্কারে দোকান সাজাইয়াছি। অর্ডার দিলে আপনাদের পছন্দমত যে কোন নমুনার অলঙ্কার খুব সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া দিই। পান ইত্যাদির জন্য আমরা দায়ী থাকি। উপরে অঙ্কিত ইহুদী মাকড়ী গিনি সোণার জোড়া ২৫ হইতে ৩০ টাকা, কর্ণফুল ১২, ১৩, ব্রোস নানারূপ ১৪, ১৬, ১৮, ও উর্দ্ধ, আংটী ১৫, ১৬, ও উর্দ্ধ, ব্রেসলেট নেকলেস ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত আছে। সকল রকম ঘড়ি ও চশমাও আমরা বিক্রয় করি। ৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান যায়।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স,

৭৪ নং হেরিসন রোড, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 530. October, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩০ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৪। অক্টোবর, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—(১) স্বর্গীয় কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের বিধবা পত্নী রাণী শ্রীমতী কস্তুরী মঞ্জরী ৩৬০০০৲ ছত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতা আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন।

(২) প্রসিদ্ধ পার্শী ধনকুবের শ্রীযুক্ত জাকব সাসুন বোম্বাই এল্‌ফিনষ্টন কলেজের বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন।

সমবেদনা—স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ভারতের নানা প্রদেশে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সভা হইতেছে। ভগবান্ পাল মহাশয়ের এই ভীষণ পরীক্ষায় সহায় হউন।

জাতীয় শিক্ষা মহাসমিতি—বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর উক্ত মহাসমিতির নবম অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে অনেকগুলি গণ্য মান্য বদান্য পণ্ডিত মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। সভা শিল্পাদিশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। আশা করি ধর্ম্মের মূল সত্যগুলি জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে সমাদৃত হইবে।

মহিলার উচ্চপদ লাভ—(১) আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মিস্ সারা দাস বি, এ, এবং মিস্ শশীবালা ব্যানার্জী বি, এ, বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী স্কুল-পরিদর্শিকার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পদ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

(২) সুবিখ্যাত মহিলা ব্যারিষ্টার মিস্ কর্ণেলিয়া সোরাবজী বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুরের অনুমোদনে কলিকাতার

বেথুন কলেজ কমিটির সদস্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী অভেদানন্দ বহুদিন আমেরিকায় থাকিয়া তথাকার মহিলাগণের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আমেরিকার মহিলাগণ যেরূপ শিক্ষিতা, জগতে কোথাও আর তদ্রূপ নাই। পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের আদর্শ। তথায় ৩০।৪০ বৎসর বয়স্কা কুমারী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন এবং কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারেন।

দাদাভাই নৌরজি—দাদাভাই নৌরজি এক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তিনি আগামী অক্টোবর কিম্বা নবেম্বর মাসে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন।

স্বদেশী ব্যাঙ্ক—৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী স্বদেশী ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, ময়মনসিংহের মহারাজা, রাজা শ্রীনাথ রায়, শ্রীযুত জানকী নাথ রায়, নন্দলাল রায়, গিরিধারী লাল রায়, মুরলী ধর রায়, মিঃ আর, এন, মুখার্জি, শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ সাহু, প্রসাদ দাস বড়াল, ও মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এই স্বদেশী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হইয়াছেন।

গিরিডির অত্যাচার—গিরিডিতে স্বদেশী বক্তৃতা করার অপরাধে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটী সম্ভ্রান্ত মহিলার নামেও পরওয়ানা জারি হয়, কিন্তু তাহাতে ঘোর অশান্তির আশঙ্কায় তত্রত্য সবডিবিসনাল অফিসার সেই হুকুম রদ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ অবমাননায় সকলেরই প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে।

পীড়া—শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় ৪ মাস কাল কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া এক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। যদিও এখনও সম্পূর্ণ সবল হইতে পারেন নাই, কিন্তু আশঙ্কার কারণ নাই। ভগবান্ তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে নীরোগ করিয়া দীর্ঘ জীবন দান করুন।

জলপ্লাবন—উড়িষ্যা প্রদেশে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়া কেন্দ্রাপাড়া, জাজপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ জলমগ্ন হইয়াছে। মান্দ্রাজে কালিকট অঞ্চলেও জলপ্লাবন হইয়াছে। প্রায় দুই লক্ষ লোক গৃহ ও সম্পত্তি শূন্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট খাদ্য ও পরিধেয় বিতরণ করিতেছেন। স্থানীয় লোকেরাও যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—আমরা দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস এস, কে, রেটক্লিফ তাঁহার স্বামীর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

রেটক্লিফ সাহেব ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার একজন সম্পাদক ছিলেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে উক্ত পত্রিকা এক সুযোগ্য সহকারী হারাইলেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী ভারতের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আশ্চর্য্য পরিত্রাণ—সুইট্‌জারলণ্ডের একজন ধনী বণিকের স্ত্রী একদা পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ এক গিরিগুহাতে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ গুহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তর এমনি পিচ্ছল যে তিনি আর গুহা হইতে উঠিতে পারিলেন না। কয়েক দিন তিনি এরূপ চিৎকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বরভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। ঐ গুহা হইতে তিনি একটী গির্জ্জা দেখিতে পাইতেন এবং কাতরে ঐ গির্জ্জার চূড়াস্থিত মেরি ও খ্রীষ্টের নিকট স্বীয় কারাগার হইতে প্রতিদিন উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি অনাহারে দিনযাপন করিতেন, কেবল নির্ঝরবারি পান এবং শৈবাল ভক্ষণ দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতেন। অবশেষে স্বীয় পাদুকার চর্ম্ম পর্য্যন্ত আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্ষুধাতে তাঁহার চৈতন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন। অবশেষে একজন কৃষক তাঁহার অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া নিকটবর্ত্তী চিকিৎসালয়ে লইয়া যায়। চিকিৎসা ও সুশ্রূষার পর তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হয়।

কালনিদ্রা—আফ্রিকা দেশে এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহাকে স্লিপিং সিক্‌নেস্ বলে। উহা এক প্রকার মস্তিষ্কের ব্যাধি। কোন কীট মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতেই নর নারীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। সম্প্রতি ভবানীপুরস্থ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের চিকিৎসালয়ে একজন জাপানী মহিলার ঐ রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। আবার আর একটী মৃত্যু ঘটনা হইয়াছে।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরের বর্দ্ধন, রক্ষণ ও পোষণের জন্য প্রত্যহ নিয়মিত পরিমাণে উপযুক্ত আহারের আবশ্যক। আহার ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব, কারণ, মনুষ্যদেহ নানাবিধ ক্ষয়শীল উপাদানে নির্ম্মিত। অনুক্ষণ ইহাদের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ করিতে হইলে যাদৃশ পদার্থের যে পরি-

মাণ আবশ্যক, তাদৃশ পদার্থ বা তদুৎপাদক দ্রব্য সেই পরিমাণে আমাদের আহরি করা উচিত।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জল ব্যতীত মানবের অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা; (১) এলবুমিনেট্‌স্ (albuminates) বা অণ্ডলালাত্মক দ্রব্য; (২) কার্ব্বোহাইড্রেট্‌স্ (carbohydrates) বা শ্বেতসারাত্মক দ্রব্য; (৩) ফ্যাট্‌স্ (fats) বা তৈলজাতীয় দ্রব্য, এবং (৪) মিনারাল (mineral) বা ধাতব পদার্থ। সুস্থভাবে জীবন ধারণ করিতে হইলে আমরা এই চারি প্রকার খাদ্যদ্রব্যের কোনটীই বাদ দিতে পারি না।

সকলের পক্ষে ঐ গুলির প্রত্যেকটীর পরিমাণ সমভাবে নির্দ্ধারিত করা সম্ভব না হইলেও, সাধারণতঃ কোন জাতীয় পদার্থ কি পরিমাণে প্রত্যহ আমাদের আহার করা উচিত তাহা নির্ণীত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমাদের সকলেরই আহারের সুবন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য, এবং এই বিংশ শতাব্দীতেও যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন আহার বিজ্ঞানানুমোদিত উপায় অবলম্বনে নিয়মিত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের সুসভ্য বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার থাকে না। মনুষ্যের দৈনিক আহারের আদর্শ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার পদার্থের উপযুক্ত সংমিশ্রণ আবশ্যক হয়। যদি আমরা উহার কোন একটী একেবারে গ্রহণ না করি বা অত্যন্ত অধিক বা অত্যল্প পরিমাণে গ্রহণ করি, তাহা হইলে ক্ষতি হয়; অতএব কোন এক শ্রেণীবিশেষের অভাব, অল্পতা কিম্বা আধিক্য হইলে তাহা অবলম্বনীয় আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যদ্যপি আমরা কেবলমাত্র অণ্ডলালাত্মক দ্রব্য, যথা,—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ছোলা, ডাল ইত্যাদি আহার করি, তাহা হইলে শরীরপোষণোপযোগী আবশ্যক পরিমাণ শ্বেতসার ও তৈলময় পদার্থের অভাব অনুভূত হইবে। আবার যদি আমরা কেবল শ্বেতসারাত্মক পদার্থ, যথা,—চাউল, ময়দা, বার্লি, আলু ইত্যাদি খাইয়া থাকি, তাহা হইলে অণ্ডলালাত্মক পদার্থের অভাব হইয়া পড়িবে। তেমনি কেবল তৈলময় খাদ্য, যথা, ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি খাইয়া থাকিলে অণ্ডলালাত্মক ও শ্বেতসারাত্মক পদার্থের অভাবে দেহের ক্ষতি হইবে। বলা বাহুল্য যে, কেবলমাত্র ধাতবপদার্থ খাইয়া জীবন ধারণ চলে না। দেশ ও পাত্র ভেদে ঐ চারিপ্রকার খাদ্যের পরিমাণের কম বেশী হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশের লোকেরা অধিক অণ্ডলালাত্মক ও তৈলময় পদার্থ ভোজন করেন, এবং আমাদের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা অধিক পরিমাণে শ্বেতসারাত্মক পদার্থ আহার করেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত কয়েকজাতীয় খাদ্যের প্রত্যেকটীরই উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং সে জন্য দৈনিক আহার্য্য বস্তুর তালিকা এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যেন প্রয়োজন মত প্রত্যেকটীই তাহাতে স্থান পায়।

ঐ চারি প্রকার আহার্য্যের মধ্যে প্রথমজাতীয় বা অণ্ডলালাত্মক পদার্থ আমরা প্রধানতঃ প্রাণিদেহ হইতে পাইয়া থাকি; যেমন,—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু তাহা উদ্ভিদ্ হইতেও পাওয়া যায়; যেমন,—ছোলা, ডাল, কলাই ইত্যাদি। দ্বিতীয়টী বা শ্বেতসারাত্মক পদার্থ প্রায়ই উদ্ভিজ্জ, যথা—চাউল, ময়দা, বার্লি, আলু, ফল, মূল ইত্যাদি। কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে থাকিলেও এই পদার্থ প্রাণিদেহ হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। তেমনি তৈলময় ও ধাতব পদার্থগুলিও যেমন প্রাণিদেহ হইতে পাওয়া যায়, তেমনি উদ্ভিজ্জ হইতেও পাওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক, যেমন কেবল মাত্র প্রাণিদেহ হইতে আমরা ঐ চারি প্রকার আহার্য্যই সংগ্রহ করিতে পারি, তেমনি আবার কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভর করিয়াও ঐ সকলগুলি পাইতে পারি। ইহাতেই বহুকাল হইতে আমাদের দেশে দুই প্রকার আহার্য্য প্রচলিত আছে। প্রথমটী আমিষ বা প্রাণিদেহ হইতে প্রাপ্ত এবং দ্বিতীয়টী নিরামিষ বা উদ্ভিদ্ হইতে প্রাপ্ত। আমরা এই প্রবন্ধে ঐ দুই প্রকারের আহারের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করিব।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, নিরামিষ বা উদ্ভিজ্জ খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা আমিষ দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে গিয়া শীঘ্র পরিপাক পায়। এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জন্মিতে পারে, কিন্তু যদ্যপি আমিষ দ্রব্যাদি ঘৃত ও মসলাদি সংযোগে বিকৃত ও গুরুপাক করিয়া এবং অধিক পরিমাণে ভক্ষণ না করি, তাহা হইলে বাস্তবিক সেগুলি শীঘ্র পরিপাক হইতে দেখা যায়। এ কথা সত্য যে, কোন কোন ব্যক্তি মাংসাদি হজম করিতে পারেন না, কিন্তু তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতীব বিরল। যে সকল নিরামিষ খাদ্য হইতে আমরা অণ্ডলালা পদার্থ পাইতে পারি সে গুলি (যেমন ছোলা, ডাল, কলাই ইত্যাদি) হজম হইতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং তাহাদের সহিত নানাবিধ অন্যান্য দুষ্পাচ্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকায় পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। দেখা গিয়াছে যে, আমিষ দ্রব্যের শতকরা ৩ ভাগ অণ্ডলালা দেহ হইতে বিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া যায় এবং নিরামিষ দ্রব্য হইতে শতকরা ১৭ ভাগ ঐরূপে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য আবশ্যক পরিমাণে অণ্ডলালার জন্য আমাদের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নিরামিষ দ্রব্য আহার করিতে হয়। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, আমিষভোজী প্রাণীদের অপেক্ষা কেবলমাত্র নিরামিষাশী প্রাণীদের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ঐ দীর্ঘ অন্ত্রের মধ্যে নিরামিষ আহারগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক কাল থাকায়

তাহাদের অণ্ডলালা অংশ যত দূর সম্ভব রক্তের সহিত মিশিয়া যাইবে।

কেবল মাত্র নিরামিষ আহারে আমাদের শীঘ্র তৃপ্তি বোধ হয় না, এবং সে জন্য ঐরূপ আহার্য্যের পরিমাণ বেশী হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নিরামিষ আহার হইতে দেহের প্রয়োজনীয় অণ্ডলালা উপযুক্ত পরিমাণে পাইবার জন্য অধিক পরিমাণে ভোজন আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন সেই অধিক পরিমাণে আহার পরিপাক করিতে দীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়। ইহাতে আমাদের ক্ষতি হইয়া থাকে, এবং যে শক্তিটুকু অন্য দিকে ব্যয় করা যাইত, সেটুকু খাদ্য পরিপাকেই ব্যয়িত হইয়া যায়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মানবদেহ একটী ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাকের কলবিশেষ নহে, তাহার অন্যান্য অনেক কার্য্য আছে; অতএব যাহাতে ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাকের জন্য অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় না হয়, তাহাই করা বিধেয়। আমিষ আহারে শীঘ্র আমাদের তৃপ্তি বোধ হয় এবং ইহাতে সারাংশ অধিক থাকায় পরিমিত পরিমাণ আহার হইতেই আবশ্যক পরিমাণ অণ্ডলালা আমরা পাইতে পারি। এই পরিমিত পরিমাণ আমিষ আহার পরিপাক করিতে দেহের অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় হয় না।

আমিষ ভোজনে রক্তের ফাইব্রিন্ (fibrin) নামক অংশ বৃদ্ধি পায় ও রক্তকণিকাগুলি অধিকতর পুষ্ট হয় এবং দেহের ধাতব অংশ বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত আমিষ-আহারে দেহের মাংসপেশীগুলি অধিকতর পুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং দেহের অনাবশ্যক মেদের হ্রাস হয়। অত্যধিক নিরামিষ আহারে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি পায় ও মাংসপেশীগুলি শিথিল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক যে সকল প্রাণী ঘাস, খড়, ইত্যাদি খাইয়া থাকে (যেমন গোরু, মেষ ইত্যাদি) তাহারা মাংসাশী প্রাণী (যথা কুক্কুর, ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদি) অপেক্ষা মোটা হইয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যেও যে জাতি নিরামিষাহারী, তাহার মধ্যে স্থূলকায় লোকের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। ইহাও দেখা গিয়াছে যে মাংসাশী পশুকে কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ খাওয়াইলে সে মোটা হইয়া পড়ে।

আমিষ আহারে প্রস্রাবের সহিত ইউরিয়া (urea) নামক পদার্থ বেশী পরিমাণে বাহির হয় ও ঐ প্রস্রাব অম্লপ্রধান (acid) হয়, কিন্তু নিরামিষ-আহারে তাহা ক্ষারপ্রধান (alkaline) হইয়া পড়ে। আমিষ আহার দেহের পক্ষে অতিশয় উত্তেজক এবং ইহা হইতে সহজে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ও অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। আমিষ-আহারে দেহের ক্রোধ, দ্বন্দ্বপ্রিয়তা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং দেখা গিয়াছে যে, পিঞ্জরাবদ্ধ ভল্লুককে কেবলমাত্র রুটী খাওয়াইয়া রাখিলে তাহার স্বভাব শান্ত ও মৃদু হইয়া আইসে, কিন্তু মাংস দিলে সে বড়ই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। যাহা হউক, মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি নিরামিষ আহারও আছে, যেমন ছোলা, ডাল ইত্যাদি, সে গুলি হইতেও মনের ঐরূপ বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইতে পারে।

এ কথা সত্য যে, আমিষ আহারের জন্য আমাদের প্রাণিজগতের উপর বড়ই নিষ্ঠুরতা করিতে হয় এবং সে জন্য কেহ কেহ উহার প্রচলনের বিরোধী। এতদ্ব্যতীত আমিষ-আহার নিরামিষ অপেক্ষা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। আমাদের দেশে আমিষ আহার বিষয়ে বহুকাল হইতে নানা কারণে আপত্তি চলিয়া আসিয়াছে; তন্মধ্যে প্রাণিহিংসা-নিবারণই তাহার প্রধান কারণ বলা যায়। আমাদের দেশের লোকের প্রকৃতি সাধারণতঃ নিরীহ এবং দেশের জলবায়ুও অধিক মাংসাদি ভোজনের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে কেবলমাত্র নিরামিষ আহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে,—দুগ্ধ, মাখন, ঘৃতাদি জৈবিক আহার নিরামিষ আহারের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না, এবং দুগ্ধ ঘৃত বাদ দিয়া নিরামিষ আহারে বোধ হয় সকলেই আপত্তি করেন। কিন্তু দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি গ্রহণ করিলে তাহাকে নিরামিষাশী বলা যাইতে পারে না। কোন কোন "নিরামিষাশী" ডিম্ব অবধি গ্রহণে আপত্তি করেন না; তাঁহাদের মত আপত্তি মৎস্য ও মাংসে, কিন্তু ইহাদের ঠিক নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ দ্রব্য আহারে দেহের কার্য্যকারিতা হ্রাস পায় এবং মানসিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক গুবলার বলিয়াছেন যে—কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে দেহের শিরা ও ধমনীগুলিতে এক প্রকার বিকৃতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, দন্তের গোড়ায় অধিক পরিমাণে টারটার (tartar) নামক ময়লা জমে, এবং দেহের অন্যান্য প্রকার ক্ষতি হয়। যেমন কেবলমাত্র নিরামিষ-আহারে ক্ষতি হয়, তেমনি কেবলমাত্র আমিষ-আহারেও ক্ষতি হয়। যাঁহারা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মাংস, মৎস্য, ডিম্ব ইত্যাদি ভোজন করেন, তাঁহারা প্রায়ই বাতরোগ প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় বড় কষ্ট পান। কাহারও কাহারও মতে অধিক আমিষ-আহারে দেহে কখন কখনও কেনসার (cancer) উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের শরীর ধারণের জন্য আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার আহারের উপযুক্ত সংমিশ্রণই বাঞ্ছনীয়। দেশের জলবায়ু, দৈনিক পরিশ্রমের পরিমাণ এবং দেহস্থ যন্ত্রাদির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ভক্ষ্য দ্রব্য নিরূপণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দেশে নিরামিষ আহার

প্রচলনই উচিত, কিন্তু যদি নিরামিষ আহারের তালিকা হইতে দুগ্ধ মাখন ইত্যাদি বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ মত কখনই সমীচীন বলা যায় না। কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ডাল বা ছোলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ গ্রহণ করিলে মাংস বা মৎস্যের আবশ্যক না হইতে পারে। আমিষ আহার সংগ্রহে প্রাণি-হিংসা করিতে হয় বলিয়া যাহাদের তাহাতে অত্যন্ত আপত্তি আছে, আমরা তাহাদিগকে ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতে উপদেশ দিতে পারি। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ আপত্তি নাই, তাহাদের পক্ষে আমিষ ও নিরামিষ আহারের সংমিশ্রণই অধিক বাঞ্ছনীয় বলিতে হইবে। বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক আমাদের আহারের জন্য ঐ দুই প্রকার খাদ্যদ্রব্যই ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। যখন দুগ্ধ, মাখন ইত্যাদি গুলিও আমিষ আহার, তখন আমাদের দেশেও প্রকৃতপক্ষে নিরামিষাশীর সংখ্যা অত্যন্ত বিরল বলিতে হইবে।

মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিলে ও বিশেষতঃ তাহার অন্ত্র-গুলির গঠন ও দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ গুলি আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার আহার পরিপাক করিবার উপযোগী হইতে পারে এই রূপে গঠিত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, কেবলমাত্র নিরামিষ আহার বা কেবলমাত্র আমিষ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ দুইটার সংমিশ্রণে দেহের যেমন পুষ্টি হয় একটীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে তেমন হয় না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেমন লোকের আমিষ আহারের প্রতি, তেমনি আমাদের দেশে লোকের নিরামিষ আহারের প্রতি প্রবণতা অধিক, কিন্তু এই দুইএর কোনটীই সমীচীন বলিয়া বৈজ্ঞা-নিকেরা মনে করেন না। পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৈনিক আহারের পরিমাণের মধ্যে এক চতুর্থাংশের অধিক আমিষ রাখা উচিত নহে এবং উহার অধিক হইলে দেহের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যাখাদ্যের নিয়মা-দিরও ক্রমে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তন হই-য়াছে। এক্ষণে আমাদের পৃথিবীর নানা-জাতির সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মতে খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করিয়া ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য। অতএব সকলকেই আমরা উপরোক্ত বিষয়টী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীহরিধন দত্ত।

শুভদৃষ্টি।

আজি—

আসিয়াছে সেই দিন যেই শুভক্ষণে।
"শুভদৃষ্টি" হ'য়ে ছিল এ অভাগীর প্রাণে॥
বুকেতে আসিল বল —ভরসা পরাণে।
স্বরগ-সুভাব রাশি উদিল জীবনে॥
ভাসিল শৈশব প্রাণে কত উচ্চ আশা।
বিধির আশীষ পেয়ে মিটিল পিপাসা॥
অমরার সুধাস্রোত মরতে বহিল।
অই "শুভদৃষ্টি" প্রাণে কি আশা জাগা'ল॥
ভুলিব কি "শুভদৃষ্টি" থাকিতে জীবন।
বিচূর্ণ পরাণে জাগে সে মাহেন্দ্র ক্ষণ॥
ধ্রুব তারা সম প্রাণে আলোক বিতরে।
তাই আজো আছি বেঁচে এ ঘোর তিমিরে॥
সেই "শুভদৃষ্টি" ভাঙ্গা প্রাণে দেয় বল।
এ ঘোর শ্মশানে আছি হইয়া বিহ্বল॥
শত যুগ যুগান্তর, যায় যাক্ চলি।
ঐ "শুভদৃষ্টি" সদা হেরিব কেবলি॥
সকলি লভেছি ভবে "শুভদৃষ্টি" ফলে।
এখনও রয়েছি বেঁচে অই দৃষ্টি-বলে॥
ভুলিব না ভুলিব না থাকিতে জীবন।
"শুভদৃষ্টি" আনি দিল যে মাহেন্দ্রক্ষণ॥
সেই "শুভদৃষ্টি" হ'য়ে অধমে পতিত।
এতকাল রাখিয়াছে সংসারে জীবিত॥
"শুভদৃষ্টি" চির তরে এ ত নয় ভুল।
তারি বলে হেরিতেছি একূল ওকূল॥
"শুভদৃষ্টি" প্রাণে দেয় অসীম সান্ত্বনা।
ভুলে যাই যমের সে অসহ্য তাড়না॥
অই "শুভদৃষ্টি" মানি বিধির প্রসাদ।
নিত্য ভগ্ন প্রাণে আনে নব আশীর্ব্বাদ॥

২০শে শ্রাবণ

বল্লুজী চম্পাবৎ।

সে ১৬৯০ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা। গ্রীষ্মকালের প্রখর রবি-তাপে যোধপুর নগর যেন পড়িয়া হাঁপাই-তেছিল; তাহার চতুঃপার্শ্বস্থিত বিস্তীর্ণ বালুকাভূমির উপরে উষ্ণ বায়ুর কম্পন যেন নয়ন গোচর হইতেছিল। এই সময়ে সেই নগরের প্রহরীরক্ষিত তোরণদ্বার হইতে একজন অশ্বারোহী একাকী বহি-র্গত হইলেন। তাঁহার সেই সংযতরশ্মি অশ্বটী কৃষ্ণবর্ণ; তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ কৃষ্ণবর্ণ, কেবল তাঁহার ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র সেই কালো জমিনের উপরে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল পর্য্যায়-ক্রমে করুণশ্রী এবং রোষদীপ্ত হইতেছিল; তাঁহার নেত্রযুগল একবার ক্রোধে রক্ত-বর্ণ হইতেছিল, পরক্ষণেই আবার করুণায় আর্দ্র হইতেছিল। ধীরে-ধীরে তিনি পূর্ব্ব মুখে চলিলেন, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন না।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সেই তোরণদ্বার দিয়া

আর একজন অশ্বারোহী নির্গত হইলেন। তিনি রাজপুতজাতীয় বীরবেশে সুসজ্জিত, তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র ঝক্ ঝক্ করিতেছিল; তাঁহার অঙ্গভঙ্গী বীরত্বব্যঞ্জক; সেই দীপ্ত রবিকর সম্মুখে করিয়া তিনি প্রসন্ন মুখে চলিলেন। রৌদ্রের তেজ হইতে তাঁহার চক্ষু ঢাকিয়া তিনি চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং প্রায় দুই মাইল দূরে প্রদীপ্ত বালুকারাশির উপর মসীবিন্দুর ন্যায় সেই অঙ্গারকৃষ্ণ অশ্বটীকে আস্তে আস্তে যাইতে দেখিলেন।

পুলকিতচিত্তে একটু হাসিয়া তিনি অশ্বের রশ্মি নাড়িবামাত্র, সেই অমিততেজাঃ তুরঙ্গ তীরবেগে ছুটিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের নিকটে আসিয়া থামিল।

"কুমারজী! আমি আপনাকে অভিবাদন করি।"

ইহা বলা মাত্রই তাঁহার পানে উগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া, কুমারজী উত্তেজিত ও রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কেন আসিলেন?"

"কেন কুমার! আপনার সঙ্গী হইতে। একাকী ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া ত কষ্টকর।"

"যাহাকে পিতা, বন্ধু, দেশ সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে, সে ত একাকীই যাইবে।"

"কখনই নয়—প্রভু!—যতদিন রাজপুতের হৃদয় এবং রাজপুতের হস্ত নির্ব্বাসিতের সহিত সত্যবদ্ধ থাকিবে, যতদিন আপনার এই দুর্দ্দিন রহিবে, ততদিন আমিও আপনার সঙ্গী থাকিব।

"তবে আসুন—আমার দুরদৃষ্টের ভাগী হউন।"

সেই দুই জন চলিলেন। উভয়েই যুবক, উভয়েই বীর, উভয়েরই হৃদয় কোনও বীরত্বপ্রকাশের সুযোগ ঘটিবে বলিয়া আশান্বিত; তাই তাঁহাদের কথাবার্ত্তাও আমোদজনক হইল এবং মরুভূমির উপরিস্থ তাঁহাদের সেই গন্তব্য পথ হাস্যের কলধ্বনিতে মুখরিত হইল।

সেই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী কুমার অমর সিংহ। তিনি যোধপুরাধিপতি মহারাজ গজসিংহের পুত্র এবং তাঁহার রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। তিনি যুদ্ধে সাহসী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একজন রাজপুতকুমারের পক্ষে যুদ্ধে বীরত্ব বড় বেশী প্রশংসার কথা নহে; কারণ রাজপুত-রমণীর সতীত্বের ন্যায় রাজপুত যোদ্ধার সাহস স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয় পাপপূর্ণ ছিল; তাই তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সহোদর ভ্রাতা, জ্ঞাতি, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং রাজ্যের সমস্ত নৃপতি, সকলের সঙ্গেই বিবাদ করিতেন। তাহার ফলে সমস্ত মাড়বারদেশ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিল। মহারাজের হৃদয় বিষাদপূর্ণ হইল, কিন্তু তিনি কি করিবেন? যখন তাঁহার

প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিল, তখন তিনি প্রকাশ্য দরবারে রাজপুত-প্রথানুসারে পুত্রের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড দান করিলেন। আদেশ হইল, রাজকুমার কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, একটী কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকে আরোহণ করিয়া তাঁহার পিতৃভূমি মাড়বার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিবেন। রাজকুমার এই রাজাদেশ নীরবে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া একাকী অশ্বারোহণে মরুদেশে প্রস্থান করিলেন।

একদল যুবক যোদ্ধৃপুরুষ সেই দরবার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহার নির্ব্বাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—"এই দেখ! অদৃষ্টের বিধান কি কঠোর! আমাদের সময়ও বড় মন্দ। সুখের সময়ে রাজকুমারের যে সব বন্ধু আসিয়া জুটিয়াছিল, আজ তাঁহার দুঃখের দিনে তাহাদের একজনও তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেছে না!"

বিখ্যাত চম্পাবৎ বংশের বংশধর বল্লুজী নামক একটী যুবক সেখানে ছিলেন, তিনি এ কথা শুনিলেন। তিনি অমর-সিংহকে ভাল বাসিতেন না; অমর সিংহকে প্রভু বলিয়া মানিতে কোন প্রকারে বাধ্য ছিলেন না; কিন্তু তবুও এরূপ একটী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নির্ম্মম সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে একাকী গমন করিবেন এই চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একটীমাত্র বাক্যব্যয় না করিয়া তড়িদ্বেগে তাঁহার যুদ্ধের ঘোটক সজ্জিত করিয়া আনিলেন এবং কেশ বাঁধিয়া বর্ম্ম ও ঢাল গ্রহণ করিয়া ও কটিদেশে তরবারি ঝুলাইয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই নির্ব্বাসিত রাজকুমারের অনুগমন করিলেন।

কিন্তু তৎকালে যে সব লোক আত্মীয় স্বজনদিগের সহিত বিরোধ করিয়া নিজ নিজ ক্ষমতাবলে প্রভুত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিত, তাহাদের একটী আশ্রয়ের স্থান ছিল। তাহা কি? না মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীর দরবার। অমর-সিংহ সেখানে গমন করিলেন। বল্লুজীও তাঁহার সঙ্গে গেলেন; কিন্তু ইহা তাঁহার বাঞ্ছিত ছিল না, কারণ, রাজপুতদিগের মধ্যে থাকাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। অমর সিংহ মোগলসৈন্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তিনি এরূপ শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন যে, সম্রাট্ সাহজাহান তাঁহাকে রাও উপাধিতে ভূষিত করিয়া ৬০০ গ্রামবিশিষ্ট নাগর রাজ্য অর্পণ করিলেন। এই নাগর রাজ্য এখন মাড়বারের অন্তর্গত; পূর্ব্বে ইহা দিল্লীর অধীনে একটী পৃথক্ সামন্তরাজ্য ছিল। অমর সিংহ সেখানে বল্লুজী ও অন্যান্য যে সকল পুরাতন ভৃত্য পরে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন। সেখানে তিনি বল্লুজীকে ভূমি সম্পত্তি প্রদান করিয়া তাঁহার শরীররক্ষক সেনার অধিনায়কপদে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু অমর সিংহের অন্তঃকরণ একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ক্ষমতা লাভ করিয়াই তিনি আবার তাঁহার অসংযত চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি পশুদিগের যুদ্ধ ক্রীড়া দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন; তাই কৌতুক দেখিবার জন্য একপাল বলবান্ ছাগল পুষিতেন এবং তাহাদের লড়াই বাধাইয়া দিতেন। তাঁহার আবাসস্থলের চতুঃপার্শ্বের বনে অনেক বাঘ থাকিত। ছাগপাল চরিতে গেলে, বাঘেরা ছাগল মারিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে রাওজী কিছু বিরক্ত হইয়া তাঁহার শরীররক্ষক সৈন্যদিগের এক এক জনকে পালাক্রমে সেই ছাগল রক্ষা করিবার জন্য যাইতে আদেশ দিলেন। বল্লুজীর নিকট হুকুম আসিল, "রাওজী তাঁহার ছাগলদিগকে ঘাস খাইবার সময় রক্ষা করিতে আপনাকে আদেশ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র সেই যোদ্ধার মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। "কি? আমি সূর্য্যবংশের সন্তান! আমি স্বয়ং মহারাণার মিত্ররাজ! রাও যদি আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন, তবে তাহা এখনই করিব। কিন্তু আমি রাখাল নহি, যে, আমি তাঁহার ছাগলের পাল চরাইতে মাঠে লইয়া যাইব। আমি কখনই এ কাজ করিব না।" (ক্রমশঃ)

পত্নীহারা। *

(সহধর্ম্মিণী বিরাজ মোহিনীর উদ্দেশে)

"ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ"

১

দেবি! বলিব কি হায়!—
এখনো এ দগ্ধ প্রাণ,
হয়নিকো অবসান,
একাকী রয়েছি এবে এ মরু ধরায়!
এখনো রয়েছি আমি,
তোমার অভাগা স্বামী,
হৃদি-পিণ্ড ফেলেছে যে শ্মশানে চিতায়।

২

দেবি! বলিব কি হায়!—
ভাবিতাম তোমা বিনা
মুহূর্ত্ত বাঁচিব কিনা,
যুগল পরাণ গাঁথা একই সূতায়—
আহা সে সকলি মিছা,
বুকে দংশে সাপ বিছা,
সহি এ অসহ্য জ্বালা মরা নাহি যায়।

* এই কবিতাটী বামাবোধিনীর সহৃদয় কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিপ্রচরণ বসু মহাশয়ের অশেষ গুণবতী সহধর্ম্মিণীর অকাল বিয়োগ উপলক্ষ্যে লিখিত। এই মহিলারত্নের স্বামীর ভবিষ্যতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশের বাসনা রহিল।

৩

দেবি! বলিব কি হায়!—
তোমার সংসার খানি,
আঁধার করিয়া রাণি,
কেমনে জন্মের মত মাগিলে বিদায়?
পতি, পুত্র, কন্যা প্রতি,
কেন না চাহিলে সতি,
তুমি যে করুণাময়ী, পূর্ণ মমতায়!

৪

দেবি! কি কব তোমায়?—
একমাত্র প্রিয় ছেলে,
কোন প্রাণে ফেলি গেলে,
কাঁদে সে "প্রমথ" কত হারায়ে তোমায়,
বৎস যথা গাভীহীন,
ঝরে আঁখি রাতি দিন,
এত ব্যথা কচি বুকে, একি সহা যায়?

৫

দেবি! বলিব কি হায়!—
সে দুটী বিধবা মেয়ে,
আছে তব মুখ চেয়ে,
লুকায়েছে স্নেহ-নীড়ে আরাম আশায়,
বাছাদের কি বলিব,
কেমনে সান্ত্বনা দিব,
আমারে করিলে দেবি, এত নিরুপায়!

৬

দেবি! বলিব কি হায়!—
চারু (১) যে শ্বশুর-বাসে,
দিন গণে কত আশে,
কবে আসি তব কোলে জুড়াবে হিয়ায়,
তুমি নাই শুনি কাণে
কি বজ্র বাজিবে প্রাণে,
লুটায়ে পড়িবে বাছা ছিন্ন লতা প্রায়!

৭

দেবি! বলিব কি হায়!—
শিশু বালা সুকুমারী (২)
তারে যে ভুলাতে নারি,
যার লাগি কেঁদেছিলে অন্তিম-শয্যায়!
ভেঙেছে সকল বুক,
কে চায় কাহার মুখ,
সারা গৃহে অন্ধকার করে "হায়! হায়!"

৮

দেবি! বলিব কি হায়!—
সে শিশু নাতিনী, নাতি,
কাঁদিছে যে দিবা রাতি,
প্রতি ঘরে খোঁজে তারা প্রিয় "দিদিমায়"
এই সব "মণি রত্ন"
কে করে আদর, যত্ন,
আঁচলে মুছায়ে, হাত কে বুলাবে গায়?

৯

দেবি! বলিব কি হায়!—
বুঝিছ কি, পতিরতা
অভাগা পতির ব্যথা,
তুমি যার ভাই, বন্ধু, মন্ত্রী এ ধরায়?
যাহার কল্যাণ তরে,
সরবস্ব অকাতরে
তেয়াগিতে, মরতের ধূলিকণা প্রায়!

১০

দেবি! বলিব কি হায়!—
এবে পুনঃ শ্রান্ত দেহে,

(১) তৃতীয়া কন্যা চারুবালা। (২) কনিষ্ঠা কন্যা সুকুমারী

যখন ফিরিব গেহে,
কে মুছাবে সযতনে স্বেদ-সিক্ত কায়,
তালবৃন্ত করে ধরি,
মৃদুল ব্যজন করি,
কে জুড়াবে, প্রেমভরা সেবা শুশ্রূষায় ?

১১

দেবি ! বলিব কি হায় !—
প্রাণের আনন্দ, আশা,
অনাহতা ভালবাসা,
মঙ্গল, কল্যাণ, সুখ, শান্তি সমুদায়,
সে দিন জাহ্নবী-কূলে,
দিয়াছি চিতায় তুলে,
ও চাঁদ মুখের সাথে করেছি বিদায় !

১২

দেবি ! বলিব কি হায় !—
সীমন্তে সিন্দূর ভরা,
রাঙা চারু চেলি পরা,
বিভূষিত বর বপুঃ কুসুম-মালায় ;
অলক্তে চিত্রিত পদ,
যেন যুগ কোকনদ,
ধ্যানরতা, বিরাজিতা মহা মহিমায় ;
নীরবে শায়িতা খাটে,
পবিত্রা গঙ্গার ঘাটে,
অভ্রভেদী হরিধ্বনি, চিতাশয্যা তায় !
মিশিয়া মিলিয়া সবি,
কি ভীম গম্ভীর ছবি,
ঢলিয়া পড়িল রবি জলধি বেলায় !
কি কঠিন মম প্রাণ,
অনলে করিনু দান,
জীবনসর্ব্বস্বধন প্রাণপ্রতিমায় !

১৩

দেবি ! বলিব কি হায় !—
তাই শুধু জাগে মনে,
প্রজ্বলিত হুতাশনে,
সোণার প্রতিমা মোর, ভস্ম হয়ে যায় !
উহু ! সে দারুণ দৃশ্য
দেখি আজি সারা বিশ্ব,
সেই বহ্নি জ্বলে মম ধমনী শিরায় !!

১৪

দেবি ! বলিব কি হায় !—
সত্যধর্ম্মপরায়ণা,
ভক্তি-প্রীতি-নিমগনা,
পরের মঙ্গলে রতা তপস্বিনী প্রায়,
চির আত্ম-বিসর্জ্জন,
সতত সন্তুষ্ট মন,
দীনে দয়াময়ী, তৃপ্তা বিপন্ন-সেবায় ;
এ দরিদ্র গৃহে রমা,
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,
জীবনে জীবনী মম আশা নিরাশায় ;
তোমারে বিদায় দিয়ে,
আছি আজি কি যে নিয়ে,
অন্তরযামিনী তাহা দেখ সমুদায় ;
আর কি বলিব সতি,
যাও তবে ভাগ্যবতি,
জগতজননী-কোলে চির-স্নেহ-ছায়।
যাও গিয়ে, দেবদেশে,
এ অভাগা আয়ুশেষে,
মিলিবে তোমারি পুণ্যে সেথা পুনরায়,
রহিলাম এই আশে হারায়ে তোমায়।

শ্রীবিপ্রচরণ বসু।

প্রেমের জয় বা সিদ্ধি লাভের গূঢ়তত্ত্ব।

ইংলণ্ডের জনৈক রাজমন্ত্রী টমাস্ এ বেকেটের পিতার নাম জিলবার্ট এ বেকেট ছিল। তিনি বিখ্যাত * ক্রুসেড নামক ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক সেরাসেনবংশীয়া যুবতী তাঁহার প্রেমে আকৃষ্টা হন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যদি জিলবার্ট অধিক দিন তথায় থাকিতে অনুমতি পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত সেখানেই উভয়ে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। কিন্তু দৈব-প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা হইতে পারে নাই। অকস্মাৎ জিলবার্টকে পেলেষ্টাইন পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিতে হইল। এমন কি তিনি যাত্রার পূর্ব্ব-ক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পান নাই, তাই তাঁহার প্রাণোপমা প্রণয়িনীকে কিছু বলিতে সুযোগ পান নাই। জিলবার্ট চলিয়া যাইলে পর, সেরাসেন যুবতী আশান্বিত হৃদয়ে প্রত্যহ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু যখন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অথচ তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রেমাস্পদ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রমণী অধীরা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রেম-শৃঙ্খল শিথিল হইয়াছে একথা তিনি কল্পনাপথেও আনিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার কোন বিপদ ঘটিয়াছে ইহা আশঙ্কা করিয়াই অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইলেন। অবশেষে যখন শুনিতে পাইলেন যে, জিলবার্ট আর সে দেশে নাই, তাঁহাকে শোকের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন তিনি পাগলিনীর মত হইলেন, তথাপি আশা তাঁহার হৃদয় চিরদিনের তরে পরিত্যাগ করে নাই। "বিপদি ধৈর্য্যং" তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন, তাই জিলবার্টকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দুইটী মাত্র ইংরেজি কথা শিখিয়াছিলেন, তাহার একটি "লণ্ডন", অপরটি "জিলবার্ট"। তিনি পাগলিনীর ন্যায় প্যালেষ্টাইনের রাজপথে পুনঃ পুনঃ লণ্ডন কথা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেরূপেই হউক লণ্ডননগরে যাত্রাকারী কোন এক অর্ণবপোতের অধ্যক্ষ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া লইলেন। দৃঢ়ব্রতা মহিলা তখন "লণ্ডন" কথা উচ্চারণ পরিত্যাগ করিয়া "জিলবার্ট" কথা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে জাহাজ লণ্ডনে পঁহুছিল।

* যিশু খৃষ্টের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন তুরুস্ক-বাসিদিগের অধিকার হইতে খৃষ্টানদিগের কর্ত্তৃক গ্রহণার্থ যুদ্ধ।

যাত্রিগণ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনে পদার্পণ করিলেন। সেরাসেন যুবতীও তাঁহার জপমন্ত্র জিলবার্ট কথা উচ্চৈঃস্বরে জপিতে জপিতে লণ্ডনে রাজপথসমূহে বেড়াইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অপরিচিত লণ্ডনের কোন স্থলে তাঁহার প্রেমাস্পদ বাস করিতেছেন তাহা তিনি কিছুই জানেন না। তথাপি নৈরাশ্য নাই, আশায় বুক বাঁধিয়া মন্ত্রের সাধনে নিযুক্তা রহিয়াছেন, ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়! ধন্য তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা! এরূপ ব্রতের ফলপ্রাপ্তি ধ্রুব। কিয়দ্দিন চলিয়া যাইলে পর, মহিলা তাঁহার প্রাণপ্রতিম প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করিলেন। উভয়ে লণ্ডনে পরিণীতা হইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন, এবং কিয়দ্দিন পর টমাস্ এ বেকেট জন্ম গ্রহণ করেন।

এই সেরাসেন যুবতীর জীবনের ঈদৃশ অলৌকিক ঘটনা হইতে অনেক শিক্ষিতব্য বিষয় রহিয়াছে। পৃথিবীর অনেক নরনারী প্রতিকূল ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে নিরাশ হইয়া থাকেন। কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাঁহারা কার্য্যে হস্ত প্রদান করেন সত্য, যখন কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন আশায় তাঁহাদের বুক ভরা থাকে, কিন্তু যদি বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর তাঁহাদের আশা উদ্যম থাকে না। সেরাসেন যুবতীর চরিত্র অন্য উপাদানে গঠিত ছিল, তাই বিপত্তির বিভীষিকা তাঁহাকে শঙ্কিত করিতে পারে নাই। তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে আশার বুক বাঁধিয়া সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, তাই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থা হয়েন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে উপায়ের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, তাই কিছুতেই উহা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রখরা বুদ্ধির সাহায্যে এ উপায় আবিষ্কার করিয়া লয়েন নাই, কারণ, লণ্ডন ও জিলবার্ট কথা উচ্চারণ জিলবার্ট-লাভের সহায় হইতে পারে, সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি একথা বলিবে না, প্রত্যুত উহা বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিবে, অথচ তাঁহার বুদ্ধির অভাবনীয় এক অলক্ষ্য শক্তি যেন অন্তরের গূঢ় স্থান হইতে বলিয়া দিতে ছিল,—সাধ্বি! তোমার প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার এই পথ, তুমি এ পথ ধরিয়া থাক, কাজে সিদ্ধি লাভ করিবে।" যাঁহারা জগৎকে আলোড়িত করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপে বুদ্ধিশক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া অচিন্তনীয় সেই মহাশক্তির বাণী শ্রবণেই আশ্বস্তচিত্তে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে অতি সামান্য বস্তুও অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিতে পারে। সমালোচনাপ্রিয় মানবগণ যখন এবম্বিধ ব্যক্তির কার্য্যের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন, তখন কত উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, যখন কার্য্যের অভাবনীয় ফল প্রত্যক্ষ করেন, তখন বিস্মিত হইয়া নিজেদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের মূল্যহীনতা অনুভব করেন। এই মহাশক্তির সেবক সেবিকাই কেবল উপায়ের উপযোগিতা সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে অসমর্থ হইলেও উপায়ের প্রতি সন্দিহান হয়েন না, প্রত্যুত অটল বিশ্বাসের সহিত উপায় অবলম্বনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়েন ও পরিণামে সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

হে বামাবোধিনি! আজ
বন্ধুহীন হলে তুমি,
শান্ত শিষ্ট সুসন্তান
হারাইলা বঙ্গভূমি।
জ্ঞানদাতা গুরু হয়ে
সিটিকলেজের কাজে
জীবন সঁপিয়ে যিনি
ধন্য আজ ধরামাঝে।
এ হেন হিতৈষী জনে
হারাইয়া ছাত্রগণ,
পিতৃহীন হয়ে আজ
শোকনীরে নিগমন!
হৃদয় দহিছে শোকে
বিষাদে ভাঙ্গিছে প্রাণ,
ঘরে ঘরে বঙ্গবাসী
নরনারী ম্রিয়মাণ!
নীরবে দেশের হিত
সাধিয়াছ প্রাণপণে,
বাহ্য-আড়ম্বর-হীন
কে না বাধ্য তব গুণে?
স্বভাবে প্রশান্ত ভাব
প্রকৃতি মধুর অতি,
কি উদার শিষ্টাচার
মিষ্টভাষী—হৃষ্টমতি।
প্রবীণ গভীর ধীর
সুবিনয়ী ক্ষমাশীল,
অভিমানশূন্য প্রাণ
অহঙ্কার নাহি তিল।
ধর্ম্মবীর—কর্ম্মবীর
সত্যপ্রিয় ন্যায়বান্,
শুদ্ধাচারী পুণ্যব্রত
সাধুভক্ত নিষ্ঠাবান্।
এমন সুপুত্র মা'র
গিয়াছে অমরধামে,
ধন্য আজ বঙ্গদেশ!
ধন্য মোরা তাঁর নামে।
ধর্ম্মের মুকুট পরি
শিরে লয়ে দেবাশীষ,
করেছেন শুভ যাত্রা
আলো করি দশ দিশ।

সাধন সম্বল করি
মুখে লয়ে হরিনাম,
ছুটিছে অনন্ত পথে
পায় ঠেলি স্বার্থকাম।
পালিয়ে নিষ্কাম ব্রত
চিরশান্তি নিকেতনে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত সুখ
চিরকাল শান্তমনে।
যাও যাও যাও দেব!
কাটি মায়া-মোহ-পাশ
স্বর্গসুখে সুখী হয়ে
কর সুখে স্বর্গবাস।
বঙ্গমাতা ধন্যা আজ
তোমারে গরভে ধরি,
বঙ্গবাসী ধন্য আজ
ও নাম স্মরণ করি।
"সত্যমেব জয়তে"
এই মূল মন্ত্র সার—
দেখালে উমেশচন্দ্র
জীবনে করি প্রচার॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

তপস্যা।

(৬)

পর দিন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে আমি সমস্ত প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, সুষমাদের বাড়ীর দিকের একটা জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা যদি সুষমাকে একটীবার দেখিতে পাই!

"নবীন তপস্বিনী"র জলধর বলিয়াছিল,—"আশা কোচ্চি মালতীর, আর আস্‌চে কিনা বিদ্যাভূষণ!" আমারও তাই হইল। দেখি খোলা ছাতের উপরে এক জন সদ্যঃস্নাতা প্রাচীনা স্ত্রীলোক, গায়ে নামাবলী, কপালে গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা, হাতে জপমালা; মালা জপ করিতেছেন। আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তিনিও আমার উপরে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই কথা আমাদের দেশের প্রাচীনা মহিলাদিগের সম্বন্ধে অনেকস্থলে প্রয়োজ্য। তুমি আমি যাহার সহিত কথা বলিতে কত ইতস্ততঃ করি, কত সঙ্কোচ মনে করি, কল্পনায় কত আশঙ্কার বিষয় সৃষ্টি করি, প্রাচীনা মহিলাগণ অবাধে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারেন। যাঁহাদের বর্ষীয়সী "ঠাকুর মা" অথবা "দিদি মা" আছেন, তাঁহারা এ কথার সত্যতা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন।

অতএব সেই প্রাচীনা রমণী মালা জপ বন্ধ রাখিয়া সস্নেহে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এ বাসায় কত দিন এসেছ, বাছা?"

আমি বিনীত ভাবে উত্তর করিলাম—

"আজি প্রায় এক মাস হইবে, আমরা এখানে আছি।"

তখন তিনি আমার নাম, ধাম, জাতি, পিতৃকুল, পতিকুল বিষয়ক কত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি নম্র ভাবে সমস্ত উত্তর করিতে লাগিলাম। শেষে আমি পীড়িতা জানিয়া বড়ই সহানুভূতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে চিকিৎসা করিতেছে?" আমি ধীরে অথচ সাগ্রহে বলিলাম,—"সুরেশ ডাক্তার।"

প্রা। সুরেশ ডাক্তার? সুরেশ খুব ভাল ছেলে। সুশীলের সঙ্গে ক'দিন আমায় দেখ্‌তে এসেছিল; আমি তেঁতুলের আচার দিলুম, খেয়ে কত সুখ্যাতি কোল্লে! বেশ ছেলেটী, যেমন রূপে তেম্‌নি গুণে; বড় ভাল ছেলে! তা আমি তো ডাক্তারি-অষুধ খাই না বাছা, কবিরাজী অষুধ খেয়ে ভাল হয়েছি।

আমি। আপনারা এখানে কে কে আছেন?

প্রা। আমি, আমার বোনঝি, আর বোনঝির খুড়তুতো ভাই সুশীল। তুমি আমার সুষিকে দেখেছ কি বাছা?

আমি একটী মেয়েকে দেখে ছিলাম। তাঁর নাম সুষমা।

প্রা। ঐ আমার সুষি! আহা! বাছা আমার লক্ষ্মী! যেমন লেখা পড়া শিখেছেন, তেমনি ঘর কন্নার কাজ জানেন। আহা! বাছার কপালে কেন এমন হলো! বুঝি জন্মান্তরে কাকে বঞ্চিত করে এসেছে, তাই এ জন্মে সকল সুখে বঞ্চিতা হয়েছে! ও হরি! দীনবন্ধো!

দেখিলাম প্রাচীনা নামাবলীর অঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

আমি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে বলিলাম, "আপনার বোনঝির হাতে শাঁখা, সীঁথিতে সিন্দুর দেখিয়াছি; ওঁর স্বামী কোথায় থাকেন?

প্রাচীনা ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন,—"ও কথা বলো না মা, ও কথা বলো না। আমরা মনে করি যে সুষির আমার বে হয় নাই—সুষি আমার আই বুড় আছে! বাছা জন্মান্তরে কাকে বঞ্চিত করে এসেছে, তাই এ জন্মে এই দশা হয়েছে। ওর মা ভাগ্যবতী; তাই সধবা রাণী চলে গেল; আর অভাগিনী আমি, মেয়ের এই জ্বালা সইবার জন্য বেঁচে রইলুম! হা! গোবিন্দ মধুসূদন!"

আমি বিস্ময়ের উপরে বিস্মিত হইলাম! সুষমার বিবাহের ব্যাপার কি কিছুই তো বুঝিতে পারি না! যাহা হউক, ও কথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম,

"আপনার বোনঝির ভাই বোন কয়টী?

প্রাচীনা উত্তর করিলেন "আঃ! ওর কি ভাই বোন আছে—তা'রা সবাই চলে গিয়াছে! ওর মা সতী লক্ষ্মী, আমার চাইতে পনর বছরের ছোট সহোদরা; সেও আজি তিন বছর গত হয়েছে। এখন বাপের সবে ধন নীলমণি ঐ সুষি। ওর বাপ আগে পশ্চিমে চাকরি কত্তেন, অনেক টাকা মাইনে পেতেন; এখন পেন্‌সন পাচ্ছেন। তিনি পশ্চিমেই

আছেন—খুব পশ্চিম নয়, এখন দেওঘরে বাড়ী করে আছেন। তা' সেখানে অসুখ হ'য়ে ছিল, তাই ভাল হ'তে এখানে এসেছি। মেয়েটীকে বেশী দিন না দেখ্‌লে তিনি তো থাক্‌তে পারেন না, তাই এরই ভিতরে আবার সেখানে যাবার চিঠি দিয়েছেন। আমি তো ভাব্‌ছি এই মাঘ মাস-টা ফঙ্গা নেয়ে ফাগুন মাসে যাব।—ফঙ্গা কি তা বুঝেছ বাছা? ঐ মা জাহ্নবী। ফঙ্গা আমার শ্বাশুড়ীর নাম, তাই আমি বল্‌তে পারি না—

এই অশ্রান্ত বাগ্মিতা আরও অনেক-ক্ষণ শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না। চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া উষার প্রথম কিরণ-সম্পাতের মত সুষমা সেখানে প্রবেশ করিল। আমার মন যেন সূর্য্যমুখীর মত মনে মনে তাহার অভ্যর্থনা করিল। এ জগতে ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হয় না; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম,—আমাকে দেখিয়া সুষমার পদ্মপত্র-তুল্য চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রাচীনা ব্যস্ততা সহকারে সুষমাকে বলিতে লাগিলেন,—"ওটী ও বাড়ীর মেয়ে। ওঁর সঙ্গে আজ আলাপ কল্লুম। আহা, মেয়েটী বড় তো ভাল; ওঁর নাম বিনয়।"

সুষমা হাসিল; আমিও হাসিলাম;—বলিলাম,—"আমার নাম বিনীতা"

প্রা। ঐ গো ঐ! বিনীতাই বটে। এখন কত রকমের নাম হয়েছে, আমাদের অত মনেও থাকে না। সে দিন যে আমার ভাশুরঝির মেয়ে এসে ছিল, তার নাম কি বোল্লে সুষি?—সেই যে কামিনী না কমি—কি বোল্লে সুষি?

সুষমা মৃদু-হাসিয়া বলিল,—"তাঁর নাম কমনীয়া।"

প্রা। ঐ শোন বাছা, কি বিদ্‌ঘুটে নাম।

সহসা এই সমিতি ভাঙ্গিয়া গেল; মণি দিদি দূর হইতে উচ্চরবে ডাকিল,—"বিনীতা! শীঘ্র এসো, বড় শুভসংবাদ," আমি সুষমাদের নিকটে বিদায় লইলাম।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিনে।

(বামাবোধিনীর উক্তি)

১

অভাগীর জন্ম দিন,
সকলে আসিলা অই,
জীবন-জনম-দাতা
কই পিতঃ! তুমি কই?—

২

স্নেহ দয়া শুভাশীষ
আনিয়াছে কত বুক,
কোথা তুমি স্নেহময়,
কই সে প্রসন্ন মুখ!

৩

ঋষির কুমারী আমি
পিতৃ-স্নেহ-তপোবনে,
লুকায়িত ছিনু এক
শান্তিময় নিরজনে।

৪

লাগেনি আমার গায়ে
সংসারের কুবাতাস,
হিংসা দ্বেষ, কপটতা,
ব্যঙ্গ কিবা উপহাস।

৫

গোলাপ, কমল ফুটি
লভে জগতের স্তুতি,
পিতৃস্নেহে ফুটেছিনু
আমি এক ক্ষুদ্র যূথি।

৬

জগতে নগণ্যা হেন
সে ক্ষোভে কাঁদেনি প্রাণ,
তব বুকে ছিল পিতঃ!
আমার আরাম-স্থান।

৭

গড়িলে মানসী মেয়ে
আপন মনের মত,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম
শিখাইলে অবিরত।

৮

কত দিন অনশনে
কত বা যামিনী জাগি,
কত আশা আশঙ্কায়
খেটেছ আমারি লাগি;

৯

শ্রান্তি ক্লান্তি অবসাদ
আসেনি ও দেব-দেহে,
পালিয়াছ তুষিয়াছ
সমুদ্র-সমান স্নেহে!

১০

স্বদেশ বিদেশ হ'তে
কত ফুল তুলে আনি,
সাজায়েছ তাপসীরে
করিয়া কুসুমরাণী!

১১

যখন ছাড়িলে ধরা—
বজ্রাহত পরিজন,
তখনো আমারি চিন্তা
হায়! হায়! কি বেদন!

১২

দাসীর কি দোষে পিতঃ!
আজি এই দুই মাস,
চলি গেছ কোন দেশে
করি হেন সর্ব্বনাশ?

১৩

সে আদর, সে যতন
সে মমতা প্রাণ-ভরা,
সহসা হারায়ে ফেলে
হয়েছি জীবনে মরা!

১৪

সেই বাড়ী সেই ঘর
সকলি রয়েছে তাই,
তবুও আঁধার সবি
কেন পিতঃ! তুমি নাই?

১৫

তব সেই রাজাসন,
পড়ি আছে শূন্যময়,
সে আনন্দধামে আজি
নিরানন্দ সমুদায়!

১৬

ক'ব কি মনের কথা—
জানেন অন্তরযামী,
তুমি যে আমারি পিতঃ!
তোমারি কেবল আমি;

১৭

তোমার অভাব হেন
আর যে সহেনা হিয়ে,
তব এ "বামাবোধিনী"
ভবে রবে কিবা নিয়ে?

১৮

আজি আমি অনাথিনী,
আরাম-আশ্রয়-হীনা,
তোমার সাধের মেয়ে
আজি যে দুখিনী ক্ষীণা!

১৯

অথবা কিসের ভয়,
কেন করি হাহাকার,
আমি যে তনয়া, এক
মরতের দেবতার!

২০

তোমার সে আশীর্ব্বাদ
তাও কি বিফল হয়?—
অপূর্ণা তোমার আশা?—
কভু নয়, কভু নয়।

২১

ভাই বুঝি দয়াসিক্ত
এত মধুময় প্রাণ,
এসেছেন অভাগীরে
করিতে করুণা দান,

২২

তাই বুঝি হেরি মোরে
জনক-জননী-হারা,
স্নেহার্দ্র নয়ন কত
ঝরিছে নিঝরধারা;

২৩

তাই বুঝি এ দীনার
ক্ষুদ্র প্রাণ-প্রয়োজন,
কুসুম-কোমল বক্ষ
করিছে এ দৃঢ় পণ!

২৪

তোমারি আশীষ পিতঃ!
তোমারি পবিত্র সাধ,
রক্ষিবে এ তুচ্ছ প্রাণ
ক্ষমি ত্রুটি অপরাধ।

২৫

তোমার মঙ্গল ইচ্ছা,
পূরাবেন জগদীশ;
করিতে তোমার কাজ
দাও বল, শুভাশীষ।

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

আমি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের নিকট এক সময়ে পরিচিত ছিলাম—সে অনেক দিনের কথা। তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পাদমূলে বসিয়া বহুসংখ্যক বঙ্গীয় যুবক আপনাপন ভবিষ্য জীবনের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। আমি সে সময়ে অনেক বার তাঁহার দরবারে ৺ উমেশচন্দ্রের নিকটে বসিয়া ধন্য হইয়াছি। তাহার পর কখন কখন তাঁহাকে দেখিয়াছি। তখন তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের অত্যুন্নত সোপানে আরোহণ করিয়া বিশ্বসেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তখন তিনি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের দূর হইতে মাত্র নমস্য ও দ্রষ্টব্য ছিলেন। তাহার পর বহুবৎসর আমি তাঁহাকে "চর্ম্মচক্ষে" দেখি নাই, কিন্তু তিনি আজীবন আমার অন্তশ্চক্ষুর গোচর ছিলেন। কেননা, যে সকল মানবদেবতার পূজা করিয়া আপন জীবনের হীনতা, সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে আপনাকে উত্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ৺ উমেশচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। তিনি বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেও আমার অন্তর্জগতে পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

মানব উমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে দেবতা উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয় নাই। তথাপি আমি একান্ত কাতর ও শোকাকুল হৃদয়ে আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। এই দেশপরিব্যাপী স্ত্রী ও পুরুষের আর্ত্তনাদের মধ্যে স্থির থাকা আমার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্তের সাধ্য নহে। আক্ষেপ, বিলাপ, শোকোচ্ছ্বাস, শোকগাথা, শোক-স্মৃতি ও কাতর প্রার্থনা পরিপূর্ণ শ্রাবণ মাসের বামাবোধিনীখানা হস্তে লইয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন—লিখিত ধর্ম্মবীর উমেশচন্দ্রের উচ্চ আদর্শের প্রকৃত ও সুন্দর চিত্রটী দেখিয়া কাহার হৃদয় ভক্তিতে নমিত ও আকাঙ্ক্ষায় উন্নীত না হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি বহুকাল তাঁহাকে দেখি নাই, আজ বামাবোধিনীর শোকাবিষ্ট মসীচিত্রিত আঁধার ক্রোড়ে তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পত্রিকাকে মসীতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও বোধ হয় এই প্রতিমূর্ত্তির সৌম্য, শান্ত, ধীর, স্থির, প্রেমময় ভাবের মধুর জ্যোতি সে নিবিড় কালিমা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইত। যৌবনের সেই ঈষৎ প্রদীপ্ত একাগ্রতা, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম, সেই ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর-শীলতা ও আত্ম-বিসর্জ্জন, সেই পরসেবা-ব্রতানুধাবনে জীবন সমর্পণের অব্যক্ত ব্যাকুলতা ও চিন্তাব্যঞ্জক মুখের ভাব যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বার্দ্ধক্যে কি মধুর, কি সুন্দর কি প্রশান্তভাবে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। যোগী পুরুষের যোগারম্ভের একাগ্রতা, উদ্যম, ব্যাকুলতা, চিন্তা,

সাধন—সময়ের আয়াস, পরিশ্রম অধ্যবসায়, ধৈর্য্য তিতিক্ষা কি সুন্দর রূপে সিদ্ধির শম, দম, শান্তি, পরিতৃপ্তি ও নৈষ্কর্ম্মে পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া এই হতভাগ্য দেশের উচ্চ আদর্শ সমুদায় তিরোহিত হইতেছে, এক একটী করিয়া পথ প্রদর্শক মানব-দেবতা অন্তর্হিত হইতেছেন। আমরা অধিকাংশ অক্ষম, অযোগ্য অকর্ম্মণ্য হতভাগ্যগুলি মাতার অঙ্ককে ভারাক্রান্ত করিয়া পড়িয়া আছি। যাঁহাদের যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতা আছে, তাঁহারা যে অনেকে জীবন-ক্ষেত্রে পথহারা বা বিপথগামী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কে পথ দেখাইয়া দিবে? আজ যে ভারতভূমির বড়ই দুঃসময়—আজযে বাঙ্গালার বড়ই কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

কস্যচিৎ অরণ্যবাসিনঃ।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ।

বঙ্গ মহিলার হিমালয়-ভ্রমণ।

(৫২৭ সংখ্যা—৮৭ পৃষ্ঠার পর)

২৮এ নবেম্বর, শনিবার।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমরা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। ভুটিয়া স্ত্রীলোকটী ভুট্টার রুটী ও কতকগুলি আলু সিদ্ধ সঙ্গে দিল। আমরা তাহাকে ৫টী টাকা দিয়া ও কৃতজ্ঞতাসূচক অনেক কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। স্ত্রীলোকটীর সদাশয়তার কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। ভুটীয়া-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ভদ্রবংশীয়া মহিলাদের যে সদ্গুণ থাকা উচিত, ইহাতে তাহার অভাব দেখিলাম না। ভুটীয়া স্ত্রীলোকটী সেই অজ্ঞাত রাজ্যে পথ দেখাইবার জন্য অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে চলিল। পাহাড়ের নীচে অনেক চমরী গাভী দেখিলাম। পূর্ব্ব দিনের পথশ্রমে যথেষ্ট ক্লান্ত আছি, এমন কি, পার ব্যথায় চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আশা, হয়ত একটু ভাল পথ পাইব। ভাল পথ পাওয়া দূরে থাকুক, এমন স্থান দিয়া চলিতে হইতেছে যে পূর্ব্ব দিনের কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হইল। গভীর গর্ত্তে নামিয়া অগ্রসর হইতেছি, ঝরনার জল পড়িয়া তাহা কর্দ্দমপূর্ণ ও পিছল হইয়াছে। সঙ্গিনী একটী মহিলা দুই একবার পড়িয়া যাইয়া আর হাঁটিবেন না স্থির করিলেন। আমরা মহা বিপদে পড়িলাম, কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময়ে সেই ভুটীয়া স্ত্রীলোকের আত্মীয়া একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে পিঠে বহন করিতে সম্মত হইল। এ দুর্গম পথে একজন মানুষ পিঠে করিয়া চলিতে পারিবে, কোন মতেই বিশ্বাস হইল না। কিন্তু সে

আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সঙ্গিনীকে পিঠে বাঁধিয়া এমন দ্রুতবেগে চলিয়া গেল যে, আমরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। কত হাসিলাম, বলিতে পারি না। বহুদূর হইতে ঘোর তুফানের মত শব্দ শুনিতে শুনিতে পর্ব্বতবাহিনী এক ভীমস্রোতা নদীর তটে পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডে বাধা পাইয়া ফেনরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে কি ভীম রবে ছুটিতেছে! শব্দে কর্ণ বধির হইয়া গেল। স্রোতের বেগ দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যায়। নদীগর্ত্তে পাষাণস্তূপ পড়িয়া আছে। একটা শিলাখণ্ডে বসিয়া নদীর নির্ম্মল জলে হাত মুখ ধৌত করিলাম, পথশ্রান্তি যেন একবারে দূর হইল। পর্ব্বতের মূলদেশ হইতে উপরের শোভা কি রমণীয় দেখাইতে লাগিল! পারাপারের জন্য দুই বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড একত্রে বাঁধা রহিয়াছে। সন্তরণে অপটু বলিয়া জলে আমার বিশেষ ভয়। বৃক্ষকাণ্ডের উপর দিয়া কেমন করিয়া এ ভীমস্রোতা নদী পার হইব ভাবিয়া অত্যন্ত ভয় হইল। ঘোড়াগুলি সাঁতার দিয়া স্বচ্ছন্দে পার হইয়া গেল, দেখিয়া কিঞ্চিৎ সাহস জন্মিল, ধীরে ধীরে চলিয়া নিরাপদে অপর পারে পৌঁছিলাম। এ পারের পথের কথা বলিবার নহে। যাঁহারা সেই পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহার দুর্গমতা উপলব্ধি করা দুষ্কর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের শিকড় অবলম্বন করিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছি, আবার হামাগুড়ি দিয়া নামিতেছি। একবার নামা উঠাতেও দুর্গম পথ শেষ হইল না। ৫৬টা উচ্চ পর্ব্বত এই প্রকার কষ্টে অতিক্রম করিলাম। এবার কোথায় একটু ভাল পথ, দেখিয়া আশা জন্মিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড ঝরণার মুখে যাইয়া পড়িলাম। ডাণ্ডিওয়ালাদের নিকট শুনিলাম,—এই ঝরণা ধরিয়া উপরে উঠা ভিন্ন পথ নাই। শরীরে যত টুকু বল অবশিষ্ট ছিল, এ কথা শুনিয়া তাহাও যেন ছাড়িয়া গেল। সমস্ত দিন প্রায় আহার ঘটে নাই বলিলেই হয়। তাহার উপর ঘোর পরিশ্রম। একটু বিশ্রাম লাভের জন্য আমরা ৪ জন যাত্রী পর্ব্বততলে বসিলাম। সেই ভুট্টার রুটী আহার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এত কদর্য্য যে, তত ক্ষুধার সময়েও তাহা মুখে দিতে পারিলাম না। মরুয়া বীজের কিছু খই সম্বল ছিল, তাহা অতি উপাদেয় বলিয়া আহার করা গেল। ডাণ্ডিওয়ালাগণ এ পথে আসার একান্ত বিরোধী ছিল, এখন আমরা যত ক্লান্ত হইতেছি, তাহারাও আপনাদের অভিজ্ঞতার গর্ব্ব করিতে করিতে আমাদিগকে তত নিন্দা করিতেছে। দলের অধিনায়িকা আমাদিগকে এই পথে আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ইহাদের অধিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কষ্টের সময়ে লোকগুলির নিন্দাবাদ শুনিয়া আরো বিরক্ত হইতেছি, কিন্তু তাহাদের আলাপ যেন কিছুই বুঝিতে পারি না, এই ভাণ করিতেছি। সঙ্গী ভদ্রলোক পাথরের উপর গড়াইয়া পড়ি-

লেন। ডাণ্ডিওয়ালাগণ যদি তাঁহাকে পিঠে বহিয়া চলে, ভাল, নতুবা তিনি কদাচ উঠিতে পারিবেন না। জন্মস্থান ও দূরস্থ পিতা মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ-ধ্বনিতে সেই কষ্টের মধ্যেও তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমরা হাসিতে হাসিতে অস্থির। আমরা এত ক্লান্তির ভাব প্রকাশ করিলে দুর্ব্বলা স্ত্রীলোক বলিয়া কতই উপহাসের ভাগী হইতাম। এই ভদ্র লোকটী সঙ্গী না হইলে এত হাসিবার সুযোগ ঘটিত না, পথশ্রান্তি দ্বিগুণ কষ্টকর হইত, এজন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। তিনিও এমন শান্তপ্রকৃতি যে, সকলকে এত হাসিতে দেখিয়া একদিনও ধৈর্য্যহারা হন নাই, বরং এতগুলি শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন ভাবিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। যাহা হউক, এতক্ষণ বিশ্রামের পর, ঝরণা-অধিরোহণ-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলগা পাষাণস্তূপ বহিয়া ভয়ঙ্করবেগে জলস্রোত নামিতেছে, তাহার উপর চলা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার; সহজেই কল্পনা করা যায়। আমাদের বস্ত্রাদি ও জুতা একেবারে ভিজিয়া গেল। দুইটী ঘোড়া উলটিয়া নীচে পড়িতেছিল, আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইল। ৬টী ঝরণা অতিক্রম করিয়া প্রায় সূর্য্যাস্তের সময়ে ঘোর জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী একটী জনশূন্য ভগ্ন গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। সকল দিকের দরজা বন্ধ, অগত্যা শাশি ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইল। গৃহটী দুই অংশে বিভক্ত, কিন্তু একবারে গৃহসজ্জা-শূন্য; তথাপি যে আশ্রয় পাইলাম ইহা ভাবিয়া আমরা কতই কৃতজ্ঞ। আহার সামগ্রী একবারে নিঃশেষ হইয়াছে, সুতরাং কিছু সংগ্রহ না করিলে পরদিন পথ চলা দুষ্কর। ৬মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ৩টী টাকা দিয়া লোক পাঠাইলাম। অনেক রাত্রিতে সে ২সের চাউল মাত্র লইয়া ফিরিল। এমন মোটা চাউল কখনও দেখি নাই, কিন্তু ক্ষুধার সময়ে তাহাই কত উপাদেয় বোধ হইল। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিশ্রাম করিতে গেলাম। অত মোটা চাউলের অন্ন আহার করার ফলে সহযাত্রী বালিকাটী নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। এমন স্থানে তাহাকে পীড়িত দেখিয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সঙ্গে যে ঔষধ ছিল, তাহা সেবন করিয়া অনেক সুস্থ বোধ করিল। রাত্রিশেষে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে, পীড়িত বালিকাকে লইয়া যাত্রা করা উচিত কিনা, চিন্তা করিতে লাগিলাম। আজ এ বাঙ্গালায় থাকিলেও আহারীয় দ্রব্য মিলিবেনা। অগত্যা যাওয়াই স্থির হইল।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

মনুষ্যজীবনে আশা ও নিরাশাসকল হৃদয়বৃত্তির মধ্যে পরিচালকস্বরূপ। আমরা ইহা দ্বারা সময়ে সময়ে হত ও আহত হইয়াও পড়ি, জীবনের বলও সংগ্রহ করি। ভগবানের কৃপায় অদ্য আমারও বহু দিনের আশা সফল হইল। আমাদের চিরপ্রিয় বামাবোধিনীর জন্মোৎসবে আমরা উপস্থিত হইয়া যোগদান করিবার অবসর পাইলাম। কিন্তু সে সুখ সম্মিলনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলাম না। এ জগতে অভাব ও অপূর্ণতা অপরিহার্য্য। গৃহ সংসারে সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টতা সাধন করিতে পারিনা। কোনও না কোন অভাব বা শূন্যতা রহিয়াই যায়। এ বিশ্ব-মন্দিরকে যত করিয়া সাজাইতে যাই, ততই দেখি,—একটা না একটা খুঁত আছে। বিধাতা আমাদের হস্তে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাই বুঝি সম্পূর্ণতা এখানে ঘটে না।

অদ্য আমরা পবিত্র ভবনে সম্মিলিত হইয়া অনেকগুলি বামাবোধিনীর হিতৈষী ভ্রাতা ভগ্নীকে সমুপস্থিত দেখিলাম, এবং শীর্ষস্থানীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম—অবশ্য যথা সময়ে উপস্থিত না হইতে পারায় পরিচিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে পারি নাই ও সেই দিনের আলোচ্য বিষয়ও সকল জ্ঞাত হইতে পারি নাই, তথাপি যতগুলি মন্তব্য শ্রবণ করিলাম, তাহাতে সকলি সন্তোষকর আপত্তিহীন বলিয়া জ্ঞান হইল—কিন্তু সে স্থানে উপনীত হইয়াই সেই ৺ পুণ্যাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শত শত স্মৃতি অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাঁহার অভাব তীব্র ভাবে জাগিয়া উঠিল, স্ত্রীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা যে ঘটিল না তাহাও বলিতে পারি না। অশ্রুজলে সেই ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরের পূজা করিলাম। যদিও তিনি এ নশ্বর ভবন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তত্রাচ তাঁহারই স্নেহ ও সদ্ব্যবহারের প্রভাবে আজ আমরা এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের চিরাদরের বামাবোধিনীর সম্মান করিতে তাঁহারই আদর্শে শিখিয়াছি। হিতকারিণী বামাবোধিনী আজ পিতৃহীনা। এক্ষণে পরিচালক মহোদয়গণ ও হিতৈষিণী কৃতজ্ঞা ভগ্নীগণের উপর ইহার জীবন-ভিত্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু ইহার শ্রেষ্ঠ সহায়। যোগ্য ব্যক্তি যে সেই আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন ইহাই বামাকুলের পরম লাভ। এখানে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার একটা কথা স্মরণ হইল, "সুমিত্রা-চরিত্র" লিখিবার সময় একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—কবিরত্ন মহাশয় বলেন,—"মেয়েরা যদি আমার

তাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক প্রমাণ করিতে না পারায় তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। বন্দে মাতরং পত্রিকার প্রিণ্টারের তিন মাস জেল হইয়াছে।

৮। বর্ত্তমান অক্টোবর মাসের ২রা তারিখে বিডন স্কোয়ারে একটী সভা হইতেছিল। পুলিশের লোকজন আসিয়া সেই সভা ভঙ্গ করিয়া দেয়। পর দিনও ঐ অঞ্চলের ভদ্রলোক ও দোকানদারদিগের উপর ঘোর অত্যাচার হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নতন কর্ম্মচারীদের এইরূপ ব্যবহারের প্রতি পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষগণের তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৯। স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে যিনি ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে "নীরব কর্ম্মী উমেশচন্দ্র দত্ত" এই বিষয়ে তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যগুলি উল্লেখ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ দশ টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

(১) গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস; (২) মানস-সরোবর। এই দুই গ্রন্থ শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক প্রণীত, এবং তদীয় ঋষিকল্প পিতৃদেব, বঙ্গের সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী রায় বাহাদুর মহোদয়ের চরণে উৎসর্গীকৃত। উপযুক্ত বস্তু উপযুক্ত পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। ভাবসৌন্দর্য্যে ও ভাষা মাধুর্য্যে এবং আধ্যাত্মিক মহিমায় গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গসাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। এই ধর্ম্মপ্রাণ ভাবুক গ্রন্থকারের নিকট আমরা অনেক আশা করি। মানসসরোবরের মূল্য ॥০, এবং গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মূল্য ।/০ আনা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মেডিকেল লাইব্রেরী প্রভৃতিতে প্রাপ্য।

(৩) স্বদেশরেণু—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, সিটীবুক সোসাইটীতে প্রাপ্য। মূল্য ৵০ আনা। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন;—"বঙ্গদেশে শিশুদের জন্য যে সকল ছড়া প্রচলিত আছে, সে সকল প্রায়ই "জুজুবুড়ী" ও "ছেলে ধরা" প্রভৃতির কথায় পূর্ণ। এ সকল ছড়া অনেক সময়ে শিশুহৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। যাহাতে কোমলমতি শিশুগণের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারিত হয়, আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, স্বদেশ-ভক্তি জাগরিত হয় ও স্বজাতিপ্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়, এইরূপ সদ্ভাবউদ্দীপক কয়েকটী ছড়া প্রকাশ করিলাম।"—গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের মহদুদ্দেশ্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। শিশু-বদনে স্তন্যদানের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল উপাদেয় গাথা শিশু-কর্ণে প্রদত্ত হইলে, সময়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া অমৃত ফল প্রসব করিবে। এই সকল গাথায় বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নিশ্চয় গঠিত ও পরিপুষ্ট হইবে।

বামা-রচনা।

দুর্ভিক্ষ-চিত্র।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)।

১

কি দিবি দেনা মা, খে'তে, মরিযে [illegible]!
খোকা কেঁদে হ'ল সারা, কেন মা দিস্ [illegible]
সাড়া।
দারুণ ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে যায়,
মোদেরে উপসী থুয়ে, কি সুখে [illegible]
শুয়ে।
কখন রাঁধিবি ভাত? আয় উঠে আয়!

২

থাকিতে পারিয়া আর, পেট জ্বলে যায়,
তুই না পারিস্ দে'না রাঁধিতে আমায়;
তেল, নুন ঘরে নাই? না থাকুক পোড়া ছাই,
ফেনে, ফেনে দুটী ভাত দে মা দুজনায়!
চাইনা মা মাছ দুধ, রেঁধে দে মা শুধু খুদ,
আর কিছু না থাকে মা, ক্ষতি নাহি তায়,
যা' হয়, দে'না মা খেতে, মরি যে ক্ষুধায়।

৩

কি দিবি, দেনা, মা, খেতে মরি যে ক্ষুধায়,
সেই যে পরশুরেতে, দিয়ে ছিলি দুটী খেতে,
তার পর আর কিছু দিস্‌নি আমায়!
খোকা ত কোলের কাছে, চুপ করে পড়ে
আছে,
আমার মা, হল একি, সব অন্ধকার দেখি,
ঘুরিয়া আসিছে মাথা অবসন্ন কায়।
শরীরে নাহিক জোর, ওঠ্‌না মা আজ তোর
কি হয়েছে? আমরা যে বাঁচিনা ক্ষুধায়;
ওঠ্‌না মা, খেতে দেনা পেট জ্বলে যায়।

৪

ওঠ্‌না মা শুয়ে কেন? খেতে দিবি চল্,
দুই তিন দিন ধ'রে, বাবা ত আসেনা, ঘরে,
আমরা কাহার কাছে যাই তবে বল?
"খাবার আনিগে," ব'লে, সেই বাবা গেছে
চলে,
আর ত এলনা ফিরে, চোকে আসে জল,
যদি মোরা দুটী ভাই, অনাহারে মরে যাই,
খাবার আনিয়ে তবে কি হইবে ফল?
ওঠ্‌না মা, শুয়ে কেন, খেতে দিবি চল।

৫

ওঠ্‌না মা, শু'য়ে কেন বেলা আর নাই,
না দিস্ না দিলি ভাত, আসিছে আঁধার
রাত,

শুধু দুটী মুড়ি দে মা খেয়ে শুতে যাই!
থাকিস্ না চুপ করে, মাটিতে অমন পড়ে,
যা হয় দেনা মা দুটী, দুই ভাইয়ে খাই।
ওঠ্না মা, শুয়ে কেন, বেলা আর নাই।
কি দিবি দেনা মা, খেতে আমা দুজনায়।
কত যে খাবার তরে, ডাক্‌তিস্ স্নেহভরে
আজ যে ক্ষুধায় মাগো! পেট জ্বলে যায়॥
তবু কি দিবিনা খেতে, দুই দিন দিনে রেতে
না খেয়ে রয়েছি, আর সওয়া নাহি যায়।
কি দিবি দেনা মা খেতে, মরি যে ক্ষুধায়!

৬

[illegible] মা, শুয়ে [illegible] খেতে দিবি চল,
ওঠ্না [illegible]
কেন মা! আকুল প্রাণে, দেখিছিস্
মুখ পানে,
বল্ না মা, কেন তোর দুই চোকে জল?
কি কথা বলিস্ ছাই, ঘরে যে কিছুই নাই,
না খেয়ে মরিব তবে? তাই তুই বল!
কি বলিলি?—"খোকা আর জাগিবেনা?
ঘুম তার,
ভাঙ্গিবেনা, সব জ্বালা হয়েছে শীতল!"
আমারো কি এই ভাবে, না খেয়ে পরাণ
যাবে,
বাবা আর আসিবে না? ফুরাল সকল?
কি হবে উপায় তবে, বল্ মা, বল্ বল।*

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
দাকুপী, খুলনা।

* ইহা একটী নিদারুণ সত্য ঘটনা। গৃহে [illegible] পত্নী ও সন্তানদ্বয়কে উপবাসী রাখিয়া কোন কৃষক বহু কষ্টে একটী টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক ব[illegible]জারে গিয়া ৸৵০ আনা মূল্যে /৫ সের চাউল ক্রয় করিয়া তাহা এক দোকানে রাখে, বাকী ৵০/০ আ[illegible] আনায় আহারের অপরাপর উপকরণ সংগ্রহ জন্য হাটের অপর অংশে গমন করে। কিয়ৎকাল অন্তে প্রঙ্গদেশে [illegible]ত্যাগত হইয়া হতভাগ্য দেখিতে পায়, যে, তাহার চাউলের পুঁটলিটী চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে! ঘরে গেলে পুত্র দুইটী "বাবা কি এনেছ" বলিয়া কাছে গেলে সে তাহাদিগকে কি দিয়া প্রবোধ দিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতভাগ্য সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশপূর্ব্বক উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কৃষকের একটী পুত্র অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার পর কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির যত্নে কৃষকপত্নী ও তাহার ৭ বৎসর বয়সের অপর পুত্রটী আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায়! চাউলচোর ধরা পড়িয়াছিল ও কঠোর কারাদণ্ডে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি এই ঘটনাটী প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

২৯।৩ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 531. Registered No. C. 134. November, 1907.

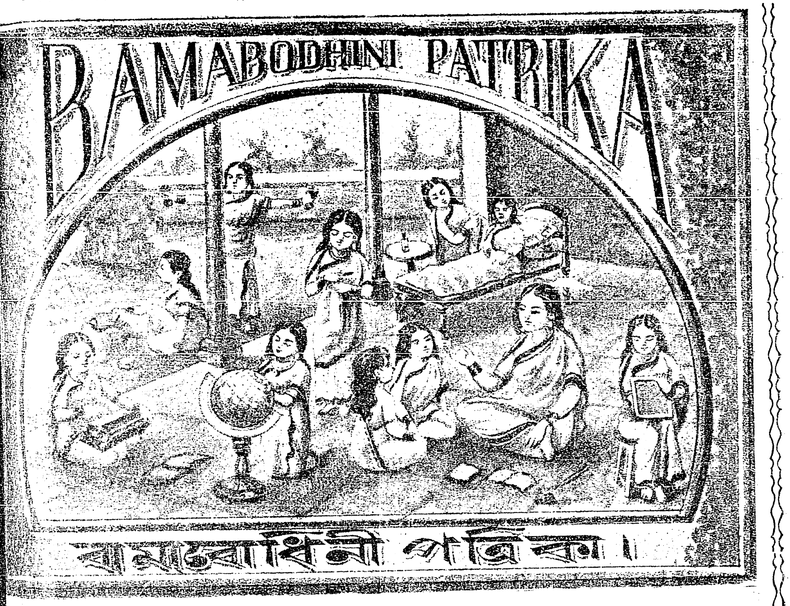
BAMABODHINI PATRIKA
বামাবোধিনী পত্রিকা।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৩১ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩১৪। নবেম্বর, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

সাময়িক প্রসঙ্গ ১৯৩
বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষে (শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু) ... ১৯৫
বল্লুকী চম্পাবৎ (শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ) ১৬৯
রামায়ণের কথা (শ্রীজ্ঞান চন্দ্র চৌধুরী) ২০০
একটী ছাত্রের পত্র (শ্রীরজনীকান্ত সেন) [illegible]
আর্য্যদিগের রন্ধনশাস্ত্র ২০২
বিশেষ (শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী) ... ২০৫
সদ্যোজাত শিশুদিগের রোগ নির্ণয় (ডাঃ সত্যপ্রিয় দত্ত)... ২০৭
বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ (শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু) ... ২০৮
১০। অমলা (শ্রীযুক্ত করালীচরণ হাজরা) ২১১
১১। সতী যাত্রা (শ্রীযুক্তা সুশীলাসুন্দরী মিত্র) ২১৪
১২। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু) ... ২১৬
১৩। নূতন সংবাদ ২২০
১৪। পুস্তকাদি সমালোচনা ২২১
১৫। বামারচনা—
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রতি (শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী) ২২১
১৬। English ২২৩

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১।/০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি [illegible] প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সে[illegible] পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, [illegible] চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ [illegible] থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাই[illegible] ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হ[illegible] অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক দুড় দুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্র[illegible] রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ [illegible] [illegible]শু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতক[illegible]

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য [illegible] মাশুল ॥০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ [illegible] দূরে যাইবে, গলার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হ[illegible] না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা [illegible] পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই [illegible] ঘড়্ ঘড়্ করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্ত[illegible] আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের [illegible] অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সু[illegible] লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা; [illegible] ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৪নং রাজ নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 531. November, 1907.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩১ সংখ্যা। { কার্ত্তিক, ১৩১৪। নবেম্বর, ১৯০৭। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিঃ হার্ডি—গত ১৩ই অক্টোবর, রবিবার, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মিঃ কেয়ার হার্ডি প্রেসিডেন্সি জেল দেখিবার সময় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

মৃত্যু—বিগত ১৫ই আশ্বিন কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপী মোহন রায় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে কলিকাতাবাসীরা একজন বহুদর্শী সুযোগ্য চিকিৎসক হারাইলেন।

কংগ্রেস—এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন নাগপুরে হইবার কথা ছিল; কিন্তু সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ হওয়াতে তথায় অধিবেশন বন্ধ হইবার কথা হইতেছে। যদি নাগপুরে কংগ্রেস না হয়, তবে মান্দ্রাজের অধিবাসিগণ কংগ্রেস করিতে প্রস্তুত আছেন।

বৃত্তি—মহীসুর গবর্ণমেণ্ট হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার জন্য কতকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

মূক ও বধির বিদ্যালয়—বিগত আদম সুমারির রিপোর্টে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশের সকল জেলা অপেক্ষা বীরভূম জেলায় মূক ও বধিরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সেই জন্য তত্রত্য জেলার সহৃদয় জজ মিঃ কেদার নাথ রায় ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফষ্টার মহোদয়দ্বয় একটী সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া ঐরূপ একটী স্কুল স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সভার ইতিমধ্যেই অনেক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

দান—অনাথ নিরাশ্রয় হিন্দু বালকবালিকাদিগের নিমিত্ত একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য দেরাদুনে [illegible] "বাসী [illegible] র তোকে ঘিরে আছে দেখ এতগুলি ভগিনী

মিঃ তাহের বি, এ,—ইনি আমেরিকা হইতে চর্ম্ম-পরিষ্কার-করণ-প্রণালী শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দেশের একটী অভাব ইহাঁ দ্বারা পূর্ণ হইবে, আশা করা যায়।

জাতীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত আর, এল, দত্ত, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত কে, পি, গুপ্ত, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, ডাক্তার জে, এন, মিত্র, ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন, ডাক্তার কে, এন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রমেশ চন্দ্র রায়, প্রভৃতি কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ মিলিত হইয়া একটী ন্যাসন্যাল মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় সভাবন্ধ—কলিকাতার প্রকাণ্ড স্থলে সাধারণ সভায় বক্তারা তাঁহাদের বক্তৃতা দ্বারা জন সাধারণকে উত্তেজিত করেন এবং তাহার ফলে সহরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট একটী সার্কিউলার বাহির করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রধান প্রধান প্রকাণ্ড স্থানে দুই মাসের মধ্যে কোন সভা হইতে পারিবে না।

বঙ্গ-বিভাগ-স্মরণোৎসব—গত ৩০শে আশ্বিন অখণ্ড বঙ্গ বিভাগের দিন স্মরণার্থ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বঙ্গবাসীরা অরন্ধন ও [illegible] সকলের হৃদয়ের [illegible]র অপেক্ষা এ বৎসর অধিকতর সমারোহে কলিকাতা সহরে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

স্বদেশী পোর্সিলেন—আমরা অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, জাপান হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুত সত্যসুন্দর দেব দেড় বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম করিয়া মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি মহোদয়গণের সাহায্যে কলিকাতা সহরে ৪৫ নং টাঙ্করা রোড, বেলেঘাটায়, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনা মাটীর বাসন নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার কারখানায় নির্ম্মিত চার পেয়ালা, ডিস, পুতুল, বাটী প্রভৃতি দেখিলে তাহাদিগকে কোন অংশে বিলাতী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। এই উদ্যমশীল যুবকের ঐকান্তিক যত্নে ভারতবর্ষে এইরূপ কারখানা এই প্রথম স্থাপিত হইয়াছে।

শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা কঠিনরোগে ভুগিতেছিলেন, গত ২৩শে আশ্বিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। দয়াময় শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিদান করুন।

প্রসিদ্ধ 'সন্ধ্যা' কাগজের সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় অন্তর্বৃদ্ধি রোগে অস্ত্রচিকিৎসায় ক্যাম্পবেল হাঁসপাতালে ১০ই কার্ত্তিক দেহত্যাগ করাতে এ সময় দেশের বিশেষ ক্ষতি হইল। স্বদেশিমাত্রেই এই দুর্ঘটনায় শোকার্ত্ত।

বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে।

১

পিতৃহীনা তুই আজ কাঁদি "বামাবোধিনী",
আজি তোর জন্মোৎসব কোথায় হায় তিনি।
অতুল স্নেহের ভরে, তোর ঐ কলেবরে,
কতই ভূষণ দান করেছেন যিনি,
কোথায় কোথায় আজ সে স্নেহের মণি।

২

পিতৃহীনা তোর দুঃখে কাঁদি "বামাবোধিনী,"
আজি তোর জন্মোৎসব হায় কোথায় তিনি।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি, আনিতেন হাত ভরি
সুন্দর বসন কত ধর্ম্ম আভরণ,
দেবসম সেই পিতা কোথায় এখন।

৩

পিতৃহীনা তুই আজ ওলো "বামাবোধিনী,"
কোথায় তিনি যার এত ছিলি আদরিণী।
যিনি প্রাণপাত করে, তব দেহ অকাতরে,
সাজাতেন, হায় তিনি শ্মশানে শায়িত!
আমরা বিহ্বলে কাঁদি শোকাকুলচিত।

৪

পিতৃহীনা তোর তরে কাঁদি "বামাবোধিনী",
কোথায় আজ লুকালেন সে জ্ঞানের খনি।
"নারীরা" পুরুষ সম, নহে কিছু খর্ব্বতম,
তাহারা যে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,
এই শুভ সমাচার বলেছেন তিনি।

৫

পিতৃহীনা তোর তরে কাঁদি "বামাবোধিনী,"
সেই মহা উদারতা ঢেকেছে এ ধরণী।
"দুহিতৃ"-রতন বলে, রাখিয়া স্নেহের কোলে,
এত কাল তোকে দিয়া জ্ঞানের ভূষণ,
করেছেন দেবদেশে দেবতা প্রয়াণ।

৬

আয়লো দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী"
আদরে পালিব তোকে এতগুলি ভগিনী।
স্বরগ হইতে তিনি, দিবেন আশীষ-বাণী,
নবীন জীবনী তোকে তাঁরি বলে দিব,
মরিতে দিব না তোকে যতনে রাখিব।

৭

আয়লো দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী"
আমরা দিতে যে চাহি তোকে নব-জীবনী।
পিতৃহীনা হয়েছিস্, বিধাতার শুভাশীষ,
আসিতেছে শিরে তব, কেঁদনা দুখিনী,
দিতে চাহি মোরা তোকে নবীন জীবনী।

৮

কেঁদোনা দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী,"
দেখ তোর জন্য কাঁদে এতগুলি ভগিনী।
আমরা অতীব ধন্যা, দেবের নন্দন-কন্যা,
তোকে কি লো অনাদরে ফেলিয়া রাখিব,
অকালে নিঠুর হাতে মরিতে কি দিব?

৯

আয়লো দুখিনী পিতৃহীনা "বামাবোধিনী,"
তোকে ঘিরে আছে দেখ এতগুলি ভগিনী

জ্ঞানের ভূষণ ল'য়ে সমাদৃত হ'য়ে
নারীর প্রতিভা তুই করলো প্রচার,
দেখিয়ে ঘুচুক মোর সব "হাহাকার"।

১০

ভুলিব না দেবতার সেই যে শেষ বাণী
বলিলেন তোর তরে ওলো "বামাবোধিনী"

যত দিন ভবে রব, কিসে তোকে সাজাইব,
এই চিন্তা লক্ষ্য মম শোনলো দুঃখিনী,
কি দিব আমি তোকে ওলো "বামা-
বোধিনী"।

স্বর্ণপ্রভা বসু।

বল্লুজী চম্পাবৎ।

(৫৩০ সংখ্যা—১৭২ পৃষ্ঠার পর)

ইহা শুনিয়া রাও অমর সিংহ বল্লুজীকে ডাকিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন—"দেখুন! এখন আমার কোন যুদ্ধের কাজ উপস্থিত নাই, কারণ দিল্লীর সম্রাটের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। এখন আমার পার্শ্বে যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমার ছাগলের পাহারা দিতে হইবে।"

"বটে! যত দিন আপনার বিপদ থাকিবে ততদিন আমি আপনার সহিত থাকিব বলিয়া সত্যবদ্ধ হইয়াছিলাম। আপনি এখন সমৃদ্ধিশালী হইয়াছেন, মানুষ ও ছাগলের শাসন করিতেছেন, এখন আর আমার সহায়তার আপনার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আপনি সুখে থাকুন।"

ইহা বলিয়া বল্লুজী বিকানীর গমন করিলেন। সেখানকার শাসনকর্ত্তা কর্ণ সিংহ তাঁহার ন্যায় একজন সুযোগ্য পারিষদ পাইয়া সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ভূসম্পত্তি প্রদান করিলেন। কিন্তু বিকানীরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার আগমনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং কি প্রকারে তাঁহাকে বিতাড়িত করিবে তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। এক দিন মহারাজা তাঁহার প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহাকে "মাতিরো" নামক একটী উৎকৃষ্ট ফল উপহার প্রেরণ করেন। ইহাতে একজন বন্ধুবেশী ব্যক্তি বল্লুজীর কাণে কাণে বলিল—

"দেখুন, আমাদের এখানে এই ফলটীকে "মৎরহো" বলে; ইহার অর্থ কি জানেন ত? "মৎ—রহো"—আসিও না। মহারাজার এই ফলটী প্রেরণের উদ্দেশ্য তিনি আপনাকে প্রকারান্তরে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন, কারণ প্রকাশ্যে তিনি এরূপ বলিতে ইচ্ছা করেন না।

অভিমানী বল্লুজী এই কথা বিশ্বাস

করিয়া সহসা ঘোড়ায় চড়িয়া বিকানীর ছাড়িয়া গেলেন। মহারাজা তাঁহার এই আকস্মিক গমনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তিনি যে বিদায়ও লইয়া যান নাই এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

বল্লুজী উদয়পুরে গমন করিলেন। সেখানে আবার মহারাণার সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সেখানেও আবার অন্যে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। একদিন তিনি মহারাণার সহিত সিংহশিকারে গমন করিলেন। একজন সভাসদ্ মহারাণার কাণে কাণে বলিল,—"এই যে চম্পাবৎকে দেখিতেছেন, ইনি ইঁহার বীরত্বের বড়ই গর্ব্ব করেন। ইনি শুধু একখানি কুঠারি হস্তে একাকী একটী সিংহের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করেন।"

"বটে? ইহা যোদ্ধার উপযুক্ত খেয়াল। তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, করুন।"

রাণার কথা শুনিয়া সভাসদ্ বল্লুজীর নিকটে গিয়া হাসিমুখে বলিলেন,

"মহারাণা আপনাকে একটী প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় সাহসের কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি কেবল একখানি মাত্র কুঠারি লইয়া একটী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে বধ করুন।"

বল্লুজী অবিচলিত-চিত্তে বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

তিনি একাকী একটী জঙ্গলের পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটী সিংহ বন হইতে তাড়িত হইয়া সেই পথে আসিল। সে যখনই দেখিল একটী রাজপুত তাহার পথ আগুলিয়া রহিয়াছে, অমনি সে গর্জ্জন করিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, সেই শিকারের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া বসিয়া লম্ফ প্রদান করিল। বল্লুজী খুব সতর্ক ছিলেন; তিনি অমনি সরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং যখনই সেই সিংহ তাঁহার পার্শ্বে মাটিতে পড়িল, অমনি তিনি তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই মৃত পশুকে সেখানে রাখিয়া তিনি মহারাণার নিকটে গিয়া বলিলেন,—

"মহাশয়! আমি এই সাহস ও যুদ্ধ-কৌশলের যে পরীক্ষা দিলাম, ইহাতে আপনার কি লাভ হইল? যদি সিংহ আমাকে মারিয়া ফেলিত, তবে আমিই মরিতাম, অথচ তাহাতে আপনার কিছুই লাভ হইত না। যে সব বর্ব্বর রাজা একজন রাজপুতের জীবন ও একটী মোরগের জীবন সমান মূল্যবান্ জ্ঞান করে, এ সব খেলা তাহাদেরই সাজে। কিন্তু আপনি হইতেছেন আর্য্য-কুল-রবি—একজন রাজপুতের জীবনের মূল্য কি তাহা আপনার বুঝা উচিত। আমাদের জীবন আপনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—আপনার সিংহাসন রক্ষার জন্য বিনষ্ট হওয়াই সঙ্গত,—কিন্তু আপনার ক্রীড়াকৌতুকের জন্য নহে।"

গর্ব্বিত রাণা ইহার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি যে মনে করিয়াছিলেন,

বল্লুজী নিজেই তাঁহার সমরকৌশল ও সাহস প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ইহাতে বল্লুজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি রাজপুত রাজাদিগের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই নিজের ভাবী উন্নতি কামনায় দিল্লীর মোগল সম্রাটের নিকট গমন করিলেন।

দিল্লীতে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। সেখানে তিনি পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক হইয়া কিছুকাল বাস করিলেন। তাঁহার দিল্লীতে অবসর ভোগ করিবার সময়, একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী উদয়পুরে আসিল। তাহার সঙ্গে যে সব অশ্ব ছিল, তাহাদের মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণের ঘোটক বড়ই উৎকৃষ্ট—সেরূপ ঘোটক সচরাচর দেখা যায় না। মহারাণা অন্যান্য ঘোটকের সঙ্গে সেটীকেও কিনিলেন।

মহারাণা তাঁহার সামন্তদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বলুন দেখি, এই সর্ব্বোত্তম ঘোটকটীতে আরোহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কে?"

সামন্তগণের মধ্যে কেহ একজনের নাম করিলেন; আর একজন অন্য ব্যক্তির নাম করিলেন।

মহারাণা বলিলেন "না—আপনারা কেহই ঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। এক বল্লুজী চম্পাবৎ ভিন্ন কেহই এই অশ্বে আরোহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।"

ইহা বলিয়া তিনি বল্লুজীর নিকট একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিয়া সেই ঘোটক প্রেরণ করিলেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—"হে বল্লুজী! আপনি ভিন্ন এই অশ্বের উপযুক্ত আরোহী আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আপনি আমার প্রীতি উপহার স্বরূপ এই অশ্বটীকে গ্রহণ করুন।"

ইতিমধ্যে আগরাতে অনেক কুকার্য্য ঘটিয়াছিল। নাগোরের অমর সিংহ ও বিকানীরের মহারাজার মধ্যে তাঁহাদের রাজ্যের সীমা লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। তাহাতে উভয়পক্ষ মোগল সম্রাটের নিকট সেই বিবাদমীমাংসার জন্য প্রার্থী হইলেন। সম্রাট্ সলামত খাঁকে সালিস নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইনি বিকানীরের অনুকূলে বিচার নিষ্পত্তি করিয়া অমর সিংহের অর্থ দণ্ড করেন। পরে একদিন দরবারের সময় সলামৎ খাঁ অমর সিংহকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সেই জরিমানার টাকা আদায় হয় নাই। ইহাতে অমর সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমি কেবল ঢাল ও তরবারী দ্বারা তাহা শোধ করিব।"

সলামৎ খাঁ নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অমর সিংহকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিলেন। অমর সিংহ তরবারী নিষ্কাসিত করিয়া তখনই সম্রাটের সিংহাসনের পার্শ্বে,

তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। ইহাতে সাহজাহান অমর সিংহকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। ক্রোধোন্মত্ত অমর সিংহ অমনি তাঁহার শোণিতসিক্ত অসি সাহজাহানের প্রতি উঠাইলেন। সম্রাট্ সরিয়া পড়িলেন; তাঁহার পারিষদ্ সামন্তগণ অমরসিংহকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিলেন না। অমরসিংহ তাঁহাদের দিকে মুখ করিয়া তরবারি চালনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন এবং একে একে তাঁহাদের পাঁচজনকে সলামৎ খাঁর সঙ্গে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তিনি নিরাপদে তোরণদ্বারে পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁহার শরীররক্ষক সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাদিগকে লইয়া দুর্গের দিকে পদব্রজে গমন করিলেন।

তাহার নিকটে তাঁহার শিবির ছিল। যে সকল লোক তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে তাঁহার শ্যালক অর্জ্জুন গোদা ছিল। এ লোকটী নিতান্ত দুর্জ্জন ও বিশ্বাসঘাতক। দুর্গদ্বারে পৌঁছিয়া অমর সিংহ দেখিলেন, তাহার একটী ক্ষুদ্র দ্বার মাত্র খোলা আছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কেবল তাঁহার নিজ পক্ষের লোকই তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিয়াছে। তাই তিনি দুর্গপ্রহরীকে ডাকিবার জন্য সেই ক্ষুদ্র দ্বারে মস্তক প্রবেশ করাইয়া দিলেন। এই সময়ে সেই অর্জ্জুন গোদা তাঁহার পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহার মতলব ছিল, এইরূপ করিয়া সে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিবে; কিন্তু তাহার সেই আঘাতে যে তাহার নিজ সহোদরা বিধবা হইলেন, এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না।

এই হত্যার সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার ছয় জন অনুচর সেই মৃত ব্যক্তির হস্তে নিহত হইয়াছে শুনিয়া তিনি হুকুম দিলেন—"অমর সিংহের মৃত দেহ এই দুর্গের মধ্যে থাকুক; কাক ও শকুনির পাল আসিয়া তাহা ভক্ষণ করুক; উহার অগ্নি-সৎকার করা হইবে না।" "অমর সিংহের বিধবা পত্নী রাণী হাণ্ডীর নিকট তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিলে, তিনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ভাঁজী কুম্পাবতের নিকট আদেশ পাঠাইলেন,—"যে প্রকারেই হউক, আমার স্বামীর মৃতদেহ আমার নিকট আনয়ন কর; আমি সহমৃতা হইয়া তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হইব।"

ইহা শুনিয়া ভাঁজী পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন। আগরা দুর্গ সুরক্ষিত ও দুর্জ্জয় জানিয়া তিনি বল্লুজীর নিকট এইরূপ লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন,—"হে মহাপ্রাণ রাজপুত! বলুন দেখি, যতক্ষণ ঈশ্বর আপনাকে ও আমাকে এই পৃথিবীতে জীবিত রাখিয়াছেন, ততক্ষণ মৃত মহাত্মার সহিত যুদ্ধপরায়ণ সম্রাটের নিষ্ঠুর আজ্ঞায় অমর সিংহের মৃত—দেহ শুদ্ধিসৎকারবিহীন

হইয়া যে শকুনির আহারের জন্য পরিত্যক্ত হইবে, ইহা কি নিতান্ত লজ্জার বিষয় নহে? আমাদের রাণী মহীয়সী হাণ্ডীজী তাঁহার স্বামীর সহিত স্বর্গারোহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমি একাকী, তাই আপনার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, এ জন্য কিছু মনে করিবেন না।"

(ক্রমশঃ)

রামায়ণের কথা।

সেপ্টেম্বর মাসের Fortnightly Review নামক পাক্ষিক পত্রে কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বালিকাবস্থায় তাঁহার মাতা শয়ন করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভারতবর্ষীয় গল্প শুনাইতেন। গল্প প্রায় রামায়ণের কথা লইয়া হইত। বিলাতী ওক, এলম্ ও উইলো বৃক্ষের পরিবর্ত্তে এদেশীয় নিম্ব, অশ্বত্থ, শাল, তাল, আম্র ও কদলীর কথা পাড়িতেন। ক্রমে বন, উপবন ও তপোবনের বর্ণনা হইত। বাল্মীকির আশ্রমে ইতর প্রাণিগণের মধ্যে সদ্ভাবের কথা বলিতেন। ঋষিকে সকলে সম্মান করিত। না দেখিয়া ঋষি পাছে সর্পের উপর কিম্বা বিষাক্ত লতার উপর পদ বিক্ষেপ করেন, এই আশঙ্কায় খদ্যোত-পুঞ্জ নিজ নিজ ক্ষুদ্রালোক প্রদান করিত। প্রাণিহিংসা করি বলিয়া ঋষি আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন এই ভাবিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু তাঁহার দৃষ্টির অগোচরে থাকিত। তাঁহার পদসঞ্চার শুনিয়া কুসুমিতা লতাগুলি প্রেম-ভরে তাঁহার কুশল সংবাদ লইত। মৃদু হিল্লোলে আকম্পিতা কোন বন-লতা তাঁহাকে যেন এই বলিয়া সম্ভাষণ করিত,—"ঋষি ঠাকুর! আজ তোমাকে পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, তোমার ত কোন অসুখ করে নাই? আমার এই পুষ্প গ্রহণ কর, ইহার সুস্নিগ্ধ সৌরভে তোমার শ্রমাপনোদন হইবে।" মাতা বলিতেন, ঋষির আশ্রম শান্তিময়। আশ্রমের চেতন অচেতন সকল পদার্থ হইতে এক অপূর্ব্ব প্রেম উচ্ছসিত হইত। আশ্রমবাসীরা সিংহ, ব্যাঘ্র ও বৃষের দুর্দ্দান্ত ভাব বিস্মৃত হইয়া তাহাদের পরাক্রমের ব্যাখ্যা করিতেন ও তাহাদের সহিত বীর-পুরুষদিগের উপমা দিতেন। নরসিংহ, নরশার্দ্দূল, নরর্ষভ এই সকল শব্দ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতেন। অবিবেকিতা বশতঃ কিম্বা নিষ্ঠুরতাপরতন্ত্র হইয়া কোন জীবের প্রাণসংহার না করা কিম্বা তাহাকে শারীরিক কোন কষ্ট না দেওয়া—ইহাই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে দশরথ-পুত্র সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রই সর্ব্বজীবের বন্ধু বলিয়া খ্যাত; ইতর প্রাণিদিগকেও তিনি সোদর তুল্য দয়া করিতেন। কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে অনেক দয়ার্দ্রচিত্ত গুণশালী আছে—এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেক বিক্রমশালী বীরও আছে। সীতার উদ্ধারের জন্য জটায়ু প্রাণদান করিলে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "পরদুঃখে দুঃখী এই পক্ষী নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করিবে।" এইরূপ সর্ব্বজীববন্ধু রামচন্দ্রের কত কথা কহিয়া মাতা আমাদিগকে ঘুম পাড়াইতেন।

ধন্য ইংরাজমহিলা! ঘরে অন্ন থাকিতে আজ আমরা ভিখারী, কয়জন বঙ্গমহিলা স্তন্যের সহিত তাঁহাদিগের শিশু সন্তানদিগকে রামায়ণের পাবনী কথা শিখাইয়া সাধু চরিত্রের বীজ বপন করেন?

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

একটী ছাত্রের পত্র।

পরম পূজ্যপাদ সাধক-প্রবর *

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীচরণেষু—

টোড়ি ভৈরব—জলদ একতালা।

তুমি হাতে ধ'রে লয়ে যাবে
তাঁর কুশল-সন্নিধানে,—
দেব, বড় আশা ছিল প্রাণে!
দারুণ পিপাসা লইয়া বক্ষে,
মঙ্গল চরণ হেরিতে চক্ষে,
ফিরে গেনু আজি দুয়ারে আসিয়া
বড় দুখে, অভিমানে।

পবিত্র এই মন্দিরে তব, করিনু রাত্রিবাস হে;
বুঝিলাম ধ্রুব, তাঁহারি প্রেরিত, নিয়তির পরিহাস হে;
হ'ল না তোমার চরণকিরণে, প্রাণের আঁধার নাশ হে;

* লেখক একজন কৃতবিদ্য উকিল। ইহাঁর লিখিত অনেকগুলি সুন্দর সঙ্গীত-পুস্তক আছে। ইনি কোন সময়ে মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন; কিন্তু স্বর্গগত সম্পাদক মহাশয় তখন অন্যত্র যাওয়াতে তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া এই পত্রখানি লিখিয়া রাখিয়া যান। বা, বো, স।

অন্ধ বলিয়া হাত ধরে কেহ নিলনা তাঁহার পানে।
ব্যাকুল হইয়া এসেছিনু দেব, করিতে সাধুসঙ্গ,
ধর্ম্ম-কথায় জুড়াতে আমার তাপিত হৃদয়, অঙ্গ,
প্রাণের দেবতা পাঠাইয়া দিল দারুণ ভরসা-ভঙ্গ,
নারিনু জুড়াতে এ আকুল হিয়া উপদেশ-সুধা-পানে।
তুমি নাকি তাঁরে পেয়েছ, শুনিয়া,
এসেছিনু তব দ্বারে,
তুমি নাকি পার অন্ধ দীনে লয়ে যেতে পর পারে;

মলিন প্রাণের তীব্র বেদনা জানাইব দেব! কারে?
কাটাইনু আজি আঁধার যামিনী, শুধু, বিভু-গুণ-গানে।
রাখিয়া গেলাম তোমার চরণে ব্যাকুল প্রাণের চিত্র;
কায়মনে দেব, করি নাই তব মন্দির অপবিত্র;
পার্শ্বে বসিয়া দ্বিজেন বালক, আজি সে পরম মিত্র;
উদ্দেশে বিদায় লইলাম, দেব, অশ্রুভরা নয়নে!

একান্ত দর্শনপিপাসী ছাত্র
শ্রীরজনীকান্ত সেন।

আর্য্যদিগের রন্ধন-শাস্ত্র।

কোন প্রাচীন সভ্য জাতির বিষয় আলোচনা করিতে হইলে যে যে বিষয় অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের খাদ্যবস্তু ও রন্ধনপ্রণালী একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। যে যে দেশের লোকেরা অর্দ্ধপক্ক, অর্দ্ধদগ্ধ, দুর্গন্ধ, শুষ্ক ও পর্য্যুসিত মাংসাদি ভক্ষণ করিত, তাহারা যে প্রাচীনকালে ঘোরতর অসভ্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল জাতির মধ্যে ঐরূপ খাদ্য ভক্ষণ-প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত সুতরাং উৎকৃষ্টভাবে রসনার পরিতোষকর ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহারা যে প্রাচীনকালে কত সভ্য ছিল, তাহা কি আর বলিতে হয়?

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যখন যে বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতেন, তখন তাহার চরম উন্নতি না করিয়া ছাড়িতেন না। বিবিধ দর্শন, বিবিধ সংহিতা, বিবিধ কাব্য, বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ, বহু জ্যোতিষ পুস্তক প্রভৃতি এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে মনীষাসম্পন্ন তত্ত্বানুসন্ধানবিৎ আর্য্যগণ বহু তত্ত্বানুসন্ধানে ও বহুশাস্ত্রপ্রণয়নে তৎপর ছিলেন, তাঁহারা যে মানবজাতির তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যের

উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করণ কার্য্যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে। সংসারে সকলেই প্রধানতঃ পেটের দায়ে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বিবিধ প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করে। সকলেরই ইচ্ছা রসনার তৃপ্তিকর বিবিধ প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে। কোন কোন খাদ্য সুস্বাদ না হইলেও বলকারক ও পোষণোপযোগী হইতে পারে; সুতরাং সেরূপ খাদ্যেরও উপযোগিতা না আছে এরূপ নহে। কিন্তু রুচিকর খাদ্যেই মানবগণের স্পৃহা অতি বলবতী। সভ্যজাতির বিবিধ ঐহিক সুখ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই যে উৎকৃষ্ট সুরুচিকর ভক্ষ্য পদার্থের উৎকর্ষবিধায়িকা রন্ধনবিদ্যার উন্নতীচ্ছা প্রবলা হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভগবতী অন্নপূর্ণা এ দেশের রন্ধনবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিখ্যাতা। স্ত্রীলোকদিগের যে উৎকৃষ্ট রন্ধনপ্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক এবং স্ত্রীর হস্তে পাক করা অন্ন ভক্ষণে যে স্বামীর অত্যধিক তৃপ্তি হয়, তাহার আদর্শ দেখাইবার জন্যই বুঝি ভারতীয় প্রকৃতিদেবী অন্নপ্রদান-নিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী অন্নপূর্ণামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শিবকে অন্ন দিয়াছিলেন। দেবী সেই অন্নদারূপে অবতীর্ণ হইয়া আপন সন্তান জগদ্বাসী জীবদিগকে অন্ন প্রদান করিয়া জগদম্বা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কালের অলঙ্ঘনীয় পরিবর্ত্তনের সহিত বর্ত্তমান ভারতের সভ্যনামবিশিষ্টা প্রকৃতি, সেই প্রকৃতিদেবী অন্নপূর্ণার আদর্শ গ্রহণ করিতে আর প্রস্তুত নহেন। এক্ষণে রন্ধনবিদ্যা জঘন্য পাচকবৃত্তি বলিয়া অধিকাংশ ভদ্ররমণীদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। পল্লীগ্রামেও সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থদিগের গৃহ হইতে স্ত্রীলোকদিগের পাক-করা-প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। যে দিন হইতে হিন্দু রমণীগণের নিকট হইতে রন্ধনবিদ্যা হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে এতদ্দেশীয়দিগের দেহপুষ্টি, নীরোগিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তিরোহিত হইয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে।

আমাদের প্রাচীন সংহিতাকারক বলেন—

"পিতুরন্তঃপুরে দদ্যাৎ মাতুর্দদ্যাৎ মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ পিতৃতুল্য ভক্তিবিশ্বাসভাজনের হস্তে অন্তঃপুররক্ষার ভার দিবে; মাতৃতুল্যা স্নেহময়ীর হস্তে রন্ধনশালার ভার দিবে; গোসেবায় আত্মতুল্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে এবং কৃষি বা বিষয় কর্ম্ম স্বহস্তেই সম্পন্ন করিবে। যাহার উপর সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য, জীবন ও পরিতৃপ্তি নির্ভর করে, সেই কার্য্যটী যে কিরূপ পবিত্র, মঙ্গলকর ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পাককার্য্যে ভূরি ভূরি বহুমূল্য মসলা প্রদান করিলেও তাহা পবিত্র, স্বাস্থ্যকর ও তৃপ্তিজনক হয় না। পাকের সর্ব্বপ্রধান নিগূঢ় মসলা হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ। জননী বা জননীতুল্যা স্নেহময়ীর হস্ত ভিন্ন অন্য কাহারও

নিকট এ নিত্য মঙ্গলাটির আশা করা যায় না।

পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্নে এবং পাচক ভৃত্যের কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্নে অনেক ইতর বিশেষ আছে। ভৃত্যের সম্বন্ধ ভৃতির সহিত, আর পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধ জীবনের সহিত। স্বামী, পুত্র, আত্মীয় প্রভৃতির কিরূপ খাদ্য রুচিজনক, পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ হয়, তৎপক্ষে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ যত্ন থাকিতে পারে, অশিক্ষিত ও বেতনমাত্রলক্ষ্য পাচক পাচিকা বা ভৃত্যের তাহা থাকিবে কেন? কোন রূপে পাক করিয়া দিয়া দিন কাটিয়া গেলে, ক্রমশঃ মাস কাটিয়া গেলে বেতন পাইলেই তাহাদিগের হইল। প্রস্তুত করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি অসংসংস্পৃষ্ট হইলে, বিড়াল কুক্কুরাদিতে উচ্ছিষ্ট বা নষ্ট করিলে বর্ত্তমান পাচক মহাশয়গণ, প্রভু-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবার ভয়ে তাহা প্রকাশ করে না। একে কুৎসিতরূপে প্রস্তুত, আবার স্থলবিশেষে দ্রব্যান্তর-সংসর্গে দূষিত সেই অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিলে পীড়ার আক্রমণ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। পাচকদিগের অপকৃষ্ট রন্ধনে গৃহস্থের রন্ধনোপকরণ ব্যয় অনর্থক হয়, পাচকদিগের বেতনে ও খোরাকে ব্যয় হয় অথচ অসংস্কৃত ও অবিশুদ্ধ অন্নাদি ভক্ষণজনিত ব্যাধির চিকিৎসাতেও ব্যয় হয়। যে সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থের গৃহিণীরা রন্ধন করিতে জানেন না, অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এক দিন পাচক মহাশয় কৃপা না করিলে, চেষ্টা ও সাধ্যসাধনা করিয়া আফিসে ও বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যাইবার পূর্ব্বে ঠিকা ঠাকুর পাকের জন্য পাওয়া না গেলে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে দোকানের সেই চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতে প্রস্তুত ও পর্য্যুসিত লুচি, কচুরী প্রভৃতি খাইতে হয়। এইরূপ খাদ্য ভক্ষণে শরীরের বল, স্বাস্থ্য সুতরাং সুখও যে নষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

আমি এরূপ বলিতেছি না যে, পূর্ব্বকালের রন্ধনশাস্ত্র পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না, এবং সূপকারগণ রন্ধন করিতেন না। রন্ধনবিদ্যা অতি আদরণীয় বিষয় বলিয়া বিখ্যাত নৃপবংশীয় পুরুষগণের মধ্যে অনেকে ঐ শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। তৎকালে গুণবান্ পাচক ও সূপকারগণ বিখ্যাত নৃপালয়সমূহে রন্ধন করিতেন। ইঁহারা পরিষ্কৃত দেহ, চিকিৎসাবিদ্যানিপুণ, ও পবিত্রাচারসম্পন্ন ছিলেন। নৃপালয় ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ভবনে পাচক ছিল কি না, তাহার ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুণবান্ পাচককে বেতন দিয়া রাখা ব্যয়সাধ্য বলিয়াই হউক, পাচক ভৃত্য প্রাপ্তির সুবিধা সর্ব্বত্র থাকিত না বলিয়াই হউক, আত্মীয়-স্ত্রীলোকদিগের পাক-করা অন্ন প্রীতিকর ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক বলিয়া পাচকদিগের প্রতি অনাস্থাবশতই হউক, প্রাচীন হিন্দু-সমাজে ঘরে ঘরে এরূপ পাচকের বাড়াবাড়ি ছিল না। কেবল নৃপালয়েই পাচকের হিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজভবনে গুণসম্পন্ন কতকগুলি পাচক পাক করিতেন, সর্ব্বোপরি এক জন সূপাধ্যক্ষ থাকিয়া সম্ভবতঃ সেইগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইহা ভিন্ন পরিবেশক পুরুষ ও পরিবেশিকা স্ত্রীলোকও যথেষ্ট ছিলেন। উক্ত পাচকাদির লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নে কতিপয় শ্লোক প্রমাণস্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে।

ঈঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ মিষ্টপাচকঃ।
শূরশ্চ কঠিনশ্চৈব সূপকারঃ স উচ্যতে॥

(চাণক্যসংগৃহীত শ্লোকমালা।)

অনুবাদ। যিনি ইঙ্গিত ও আকারের তত্ত্ব জানেন অর্থাৎ যিনি লোক দেখিয়া বা লোকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া কিরূপ খাদ্য তাহার স্বাস্থ্যোপযোগী ও রুচিকর হয় তাহা বুঝেন এবং রন্ধনোপকরণ ও রন্ধননিষ্পন্ন অন্নাদি দেখিয়া তাহার গুণাগুণ বুঝিতে পারেন, যিনি বলবান্ অর্থাৎ রন্ধনোপযোগী শারীরিক-বলসম্পন্ন অতএব নীরোগদেহ, যিনি সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে পারেন, যিনি বীর অর্থাৎ নীচমনা ও অলস নহেন এবং যিনি সুদৃঢ়দেহ, এইরূপ সদ্‌গুণনিচয়সম্পন্ন মহাত্মা সূপকার বলিয়া কথিত হন।

অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাম্বরঃ।
সূদশাস্ত্রবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ স উচ্যতে॥

(মৎস্যপুরাণম্।)

অনুবাদ। অনাহার্য্য (যাঁহাকে শত্রুগণ পরামর্শ দ্বারা বিগড়াইতে না পারে অথবা যাঁহাকে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে,) পবিত্র, স্বকার্য্যে দক্ষ, চিকিৎসাবিদ্যাবিৎ, পাকশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি সূদাধ্যক্ষ অর্থাৎ পাকশালাধ্যক্ষ বলিয়া কথিত হন।

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষ।

রে বর্ষ!
আজি তোর চক্র ঘুরে এল ধরা,
রবি শশী গ্রহ উপগ্রহ তারা;
আমি চেয়ে আছি সেই পথখানি,
গিয়াছে যেথায় মোর যাদুমণি।
হঠাৎ সেদিন প্রথম রাতে,
যেথায় গিয়াছ ফেলিয়া আমায়,
আজও বসে আছি সেই কিনারায়,
কত না তরঙ্গ লাগিতেছে গায়,
বালুকার কণা আঁখিতে ছড়ায়,
বেঁচে আছি দেখ সহস্র আঘাতে।
কল্পনা ঝটিকা কতই তুফান,
বিদারিয়া মোর হৃদয়বিমান,
বহিছে সঘনে সারা দিনমান,
বিষাদ-জলদে চপলার বাণ
করেছে জীবন মুমূর্ষুপ্রায়।

মাস বর্ষ তিথি ঘুরে ফিরে এলে,
তোমারে কে ডাকে ভাসি আঁখিজলে,
কার হা হুতাশ পড়ে পলে পলে,
কোন প্রাণ সদা অনির্ব্বাণ জ্বলে,
দশানন চিতা রাক্ষস ধরায়।

হায়রে উন্নত অজ্ঞান হৃদয়
বলে আছ তুমি লইয়া আশয়;
পাবে কি সান্ত্বনা কর কি সংশয়?
বরষের পরে বর্ষ হবে শুধু লয়,
তোমার এ পাষাণ জীবন পরে।

নিশি দিবা মাস বর্ষ আসে ঘুরে,
অনলে অনল নিভিলে উগারে,
বিয়োগে সংযোগে সৃষ্টি বদ্ধ হেরে,
যাতায়াতে এই মহীচক্র ফিরে,
অহরহ খেলে অবনীভিতরে।

কিন্তু হায় কই সে সুন্দর চিত্র
পশে না নয়নে বড়ই বিচিত্র!
যারে ডাকিতেছি প্রতি অহোরাত্র
ইষ্ট মন্ত্র সম মরম-আগারে।

যতদিন রবে এ দেহে পরাণ,
অতীতের স্মৃতি রবে বর্ত্তমান,
সংসারের ভূমে বসি জপি নাম,
শত কোলাহলে না হয় বিরাম,
হৃদয়তন্ত্রী আপনি বাজে রে!

আহা রে বিধাতা! আহা রে বিধান!
নিঠুর হইয়া হানিলে কৃপাণ,
দিলে ঘোর শিক্ষা হলো নাক জ্ঞান,
হবেনাক কভু বুঝি পরিত্রাণ,
পড়িয়া বিঘোর আনায়-মাঝারে।

বারমাস আজি কাটিল ধরায়,
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব চলে যায়,
নয়নের নীর তবু না শুখায়,
এ বুঝি বন্ধন তোমায় আমায়,
তাই বহে স্রোত অন্তরে অন্তরে।

হে সৃষ্টিনিয়ন্তা! কর হে খণ্ডন,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে করি নিবেদন,
অকালে কলিকা করোনা ছেদন,
এ মহা কলঙ্ক যাবেনা কখন,
নিত্য কত প্রাণ কাঁদে কাতরে।

অনন্ত এ ভাষা ফুরাবে না কভু
হে অন্তরযামি! জানিতেছ প্রভু!
যাতনাপীড়িত করি উহু হু
রুধির ঝরিছে প্রতিমুহূর্ম্মুহু
খুলে দেখ বুক বিনতি তোমারে।

বরষের পরে আজি সেই দিন
দিয়া গেছে বক্ষে অশনির চিন্,
সহস্র কণ্টকে বিঁধে করে ক্ষীণ,
ধেয়াতেছি আমি তবু নিশি দিন
আমার প্রাণের নন্দন সুতেরে।

ওহে দেবদেব! ধন্য ধন্য তুমি!
তীব্র বহ্নিরূপে মম শোক-ভূমি
করিতেছ দগ্ধ ওহে বিশ্বস্বামী!
সকাতরে তাই কেঁদে কেঁদে নমি
কবে ফিরে পাব লয়েছ যাহারে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সদ্যোজাত শিশুদিগের রোগনির্ণয়।

(৫২৯ সংখ্যা—১৩৯ পৃষ্ঠার পর।)

বমি ও মল দেখিয়া রোগনির্ণয়।

সচরাচর শিশুকে অধিক দুগ্ধ খাওয়াইলে বমি হয়। এ অবস্থায় দুগ্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ দুগ্ধ ছানার মত হইয়া যায় না। সর্ব্ব প্রকার পরিপাকযন্ত্রের পীড়ায় বমি হয়। অনুপযুক্ত আহার করিলে বমি হয়। অজীর্ণ রোগে বমি হয়। মস্তিষ্কের পীড়ায় বমি হয়; মস্তিষ্কের পীড়া হইলে শিশু আহার একবার মাত্র করিতে চায়; এ রোগে বমি ক্রমাগত হইতে থাকে। ৪ বৎসর বয়স্ক শিশুর সর্ব্ব প্রকার কণ্ডুজ্বরে বমি হইতে পারে। ফুস্‌ফুসের পীড়ায় বমি হয়। ঘুংড়ি কাশীতেও বমি হইতে পারে।

মলের বিষয়।

সাধারণতঃ শিশুদিগকে অধিক দুগ্ধ খাওয়াইলে, ক্রিমি থাকিলে ও দাঁত উঠিবার সময়ে উদরাময় রোগ হইতে দেখা যায়। সচরাচর শিশুদের মল দেখিতে কাল, সবুজ ও আটাযুক্ত হয় এবং তাহাতে ঘাসের গন্ধ থাকে; অবশেষে মল পীতবর্ণ অথবা হলদির মত রং বিশিষ্ট হয় এবং তাহাতে কোন গন্ধ থাকে না।

শিশুদের পাকাশয়ের পীড়ায় মলে টক গন্ধ হয়, সবুজ রং হয় ও ফেনা থাকে। দাঁত উঠিবার সময় শ্লেষ্মাযুক্ত মল হয়। কোষ্ঠবদ্ধ প্রায় হয় না। অপিয়ম খাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়; লিভারের কার্য্য ভাল করিয়া না হইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়। অধিকাংশ স্থলে মাতার দোষে শিশুদের রোগ হয়—মাতার দুগ্ধের দোষে হয়; অম্বলের পীড়ায় হয়।

প্রস্রাবের বিষয়।

ইহা দ্বারা শিশুর রোগ নির্ণয় হয় না, কারণ প্রস্রাব পাওয়া যায় না, বিছানা ভিজিয়া যায়। জ্বর হইলে প্রস্রাব অল্প, লালবর্ণ এবং টক্‌গন্ধযুক্ত হয়। ক্রিমি থাকিলে প্রস্রাবের উত্তেজনা হয়। মস্তিষ্কের পীড়ায় প্রস্রাব সাদা হয়। খাদ্য দ্রব্য পরিপাক না হইলে কিম্বা দাঁত উঠিবার সময় প্রস্রাব মলিন হয়।

মুখের চেহারা দ্বারা শিশুর রোগনির্ণয়।

১। যদি শিশুর জ্বর হয়, উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে মুখ লালবর্ণ হইবে, কপাল কোকড়ান ও উত্তপ্ত হইবে।

২। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর পীড়া হইলে চক্ষু চাহিয়া থাকে, বা স্থির ভাবে থাকে এবং গর্ত্তে বসিয়া যায়, অর্দ্ধ-মুদ্রিত থাকে অথবা একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে; কপাল সঙ্কুচিত হয়; শরীর শীর্ণ হয়।

৩। শ্বাসযন্ত্রের বা রক্তসঞ্চালনের

পীড়ায়—ঠোঁট কাল হয়, নাসিকার ছিদ্র বড় হয়, মুখের ও চক্ষুর চারি দিকে কাল রেখার দাগ পড়ে; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ভাল হয় না।

৪। তলপেটের কোন যন্ত্রের পীড়ায় গণ্ডদেশ ফ্যাকাসে হয়, গাল বসে যায়, মুখ পিছন দিকে বেঁকে যায়, ঠোঁটের রং কটা হয়, ঠোঁট ভিতর দিকে যায়, বিশেষ নীচেকার ঠোঁট মাড়ির দিকে থাকে।

৫। (Hydrocephalus) মস্তিষ্কের পীড়ায় শিশুর মাথা বড় হয়, মুখ ছোট হয়, কপাল সম্মুখভাগে আসে।

বঙ্গমহিলার হিমালয় ভ্রমণ।

(৫৩০ সংখ্যা—১৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

২৯ শে নবেম্বর, রবিবার ৭টা।

আবার অপরিচিত পথে চলিলাম। বৃষ্টির জলে পথ কর্দ্দমময়। গর্ত্তগুলি জলপূর্ণ। কিছুদূর যাইয়াই এক প্রকাণ্ড ঝরণার মুখে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বদিন ঝরণা ধরিয়া উপরে উঠিতে হইয়াছিল, আজ নীচে অবতরণ শতগুণে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঝরণার মাঝে যে প্রকাণ্ড পাথর রহিয়াছে, লম্ফ দিয়া তাহার উপর পা রাখিতেছি। আলগা পাথর শরীরের ভারে গড়াইয়া যাইবে ভয়ে দুই পাশের জঙ্গল জড়াইয়া ধরিয়া নামিতে চেষ্টা করিলাম। কি ভয়ানক ব্যাপার! ইহা যে বিছুটীর জঙ্গল জানিতাম না। আমাদের দেশীয় বিছুটী ইহার কাছে কোথায় লাগে। দেখিতে দেখিতে দুই হাত ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইল। যে স্থানে বিছুটীর পাতা লাগিয়াছিল, তাহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া গেল। ঝরণা ধরিয়া অনেকদূর যাওয়ার পর এক নদীর ক্ষুদ্র স্রোতে পঁহুছিলাম। এবারও কাপড় ইত্যাদি ভিজিয়া গেল। অনেক দূর এভাবে চলিলাম। জুতা ও বস্ত্রের দুর্দ্দশার কথা কি বলিব? সহযাত্রী ভদ্রলোক কেবল অদৃষ্টের নিন্দায় ব্যস্ত। বরাবর পিতামাতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রায় ১২ টার সময়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত পীড়িত হইয়া নদীকূলে একটু সমভূমিতে পঁহুছিলাম। আহার ভিন্ন পথ চলা অসাধ্য ভাবিয়া, যে অল্প পরিমাণ মোটা চাউল সম্বল ছিল, তাহা দ্বারা রান্না করা গেল। কোন কোন সহযাত্রী নদীতে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। কত কৃতজ্ঞতা ও তৃপ্তির সহিত সেই অন্ন আহার করিলাম। নদী পার হইয়া আবার পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে হইল। পথে কত প্রকাণ্ড ঝরণা অতিক্রম করিলাম। পর্ব্বতের নিম্নদেশ এলাচের জঙ্গলে পূর্ণ, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবলই এলাচ গাছ দেখিলাম। সম্মুখে ভুটীয়াদের

কয়েকখানা ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্টে নিতান্ত আশ্বস্ত হইয়া তথায় পঁহুছিলাম। আশা ছিল, দার্জ্জিলিং কয় মাইল দূরবর্ত্তী, তাহারা তাহা নিশ্চয় বলিয়া দিবে। দুঃখের বিষয়, অনেক চেষ্টাতে একটী কথাও বুঝিতে কিম্বা বুঝাইতে সক্ষম হইলাম না। বিষণ্ণ হৃদয়ে আবার গন্তব্য পথে চলিতে হইল। আজ পর্ব্বতের মূলদেশে ৫।৬ টা নদী অতিক্রম করিলাম। দূরে ধানের ক্ষেত দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইল। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই ধান ক্ষেতের উপর দিয়াই চলিলাম। পাকা ধানের সুগন্ধ কি মনোহর! দুই একটী পাহাড়ীর দেখা পাইয়া জানিলাম, পুলবাজার নামক স্থান নিকটবর্ত্তী। অত্যন্ত উৎসাহে চলিলাম। কিন্তু পুলবাজারের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হইল না। আবার ঘোর জঙ্গলে পড়িতে হইল। কখন কখন দুই একজন লোক দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের কথায় নির্ভর করিয়া কেবলই নিরাশ হইতেছি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, "পুলবাজার কয় মাইল?" উত্তর "দুই মাইল।" আমরা বলি, না ১০ মাইল হইবে; তাহারাও বলে 'হাঁ ১০ মাইল।" প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন এরূপ নিরাশাজনক উত্তর পাইয়া নিতান্ত বিরক্ত হইতেছি। স্থির করিলাম, পথের দূরত্ব সম্বন্ধে কাহাকেও আর জিজ্ঞাসা করিব না। বাঁশবন ও ঝরণা অতিক্রম করিতে করিতে নিতান্ত দুর্গম স্থানে পঁহুছিলাম। আবার সহযাত্রিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতে হইল। এমন বক্রপথে একত্র চলা অসাধ্য। আমার সঙ্গী ডাণ্ডিওয়ালা ও মুটেগণ যমদূতের ন্যায়, তাহাদিগকে লইয়া চলিতে চলিতে মনে কত আশঙ্কা হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে এমন স্থানে পঁহুছিলাম, যে স্থানে এক পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পাষাণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় না। পশ্চাতে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিয়াও দেখা পাইলাম না, অগত্যা ধীরে ধীরে ভগ্ন পথে অবতরণ করিতেছি। নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিব সে আশা হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে নিরাপদে সেই ভয়ঙ্কর স্থান অতিক্রম করিলাম। সম্মুখে বিজন বনের অন্তরালে ভগ্ন পথ. সহযাত্রীদের কাহারও দেখা নাই, অথচ তাঁহাদের অপেক্ষায় এই অন্ধকার মধ্যে ডাণ্ডিওয়ালাদের সহিত বসিয়া থাকাও ভয়ানক। অন্ধকারে পথ দৃষ্ট হয় না, অতি সাবধানে চলিলাম। প্রাণের দায়ে ডাণ্ডিওয়ালাদের ধর্ম্মজ্ঞান উদ্রেক করিবার জন্য ঈশ্বর, পরকাল, পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আরম্ভ করা গেল; কিন্তু তাহাদের মনে যে কোন একটা ভাব জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম, এরূপ বোধ হয় না। ভুটিয়াদের ধর্ম্মজ্ঞান আশ্চর্য্য ধরণের। তাহাদের ভূতের ভয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। তাহারা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা কেবল ভূতের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য। আমরা চলিতেছি, পর্ব্বতের যে স্থানে প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে সেই স্থানে ভূতের বাস বলিয়া ডাণ্ডিওয়ালাগণ ভয়ে

মৃতপ্রায় হইয়া প্রাণপণে দৌড়িতেছে। আমিও সেই সুযোগে তাহাদিগকে ঈশ্বরের শক্তি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। হায়! কুসংস্কারের অধীন হইয়া জীবন্ত মনুষ্য যে কত হীনদশাগ্রস্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিলাম। এই ভীমকায় বলিষ্ঠ লোকগুলি ভূতের ভয়ে এত কাতর, যে আমি ভূত তাড়াইবার যে কোন উপায় বলিব, তাহাই করিতে প্রস্তুত। এ দিকে যত হাঁটিতেছি, দুর্গম পথ আর শেষ হয় না। রাত্রিও অধিক হইল, "পুল-বাজার" নিকটে, কেবল এ আশায় নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছি। এক জন সহযাত্রীরও দেখা পাইলাম না। একটা নিবিড় বাঁশবন ভেদ করিয়া চলিতেছি। এমন সময়ে কোন বন্যজন্তুর এমন একটা ভীষণ গর্জ্জন ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল যে, আমার শরীরের ধমনীগুলি কম্পিত হইয়া উঠিল, এমন একটা বিষম আতঙ্কের অবস্থা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। তথায় দাঁড়াইয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য বিবেচনা করিয়া প্রাণপণে দ্রুত-গতিতে চলিলাম। নদীস্রোত চলিয়াছে বলিয়া নিম্নভূমির ধান্যক্ষেত্রগুলি ভয়ানক কর্দ্দম পূর্ণ। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া চলিতে যে কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। জুতা কখন কখন কর্দ্দমে বদ্ধ হইয়া খসিয়া থাকে। আজ যে কোন লোকা-লয়ে পঁহুছা ভাগ্যে ঘটিবে, সে আশা মনে একবারও জাগিতেছে না। এমন ঘোর প্রতিকূল অবস্থায়ও যেন এক নূতন বল পাইয়া চলিতেছি। এ দিকে দুরন্ত শীতে হাত পা শরীর অসাড় করিয়া তুলিতেছে। হঠাৎ দূরে আলো দেখিয়া প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল, কতকগুলি শুষ্ক বাঁশপাতার আলো জ্বালাইয়া দ্রুতপদে চলিলাম। "ওগো তাঁহারা আসিতেছেন" আমার সহযাত্রী ভগ্নীর এই স্বর যেন সেই ঘোর শ্রান্তি ও নিরাশার মধ্যে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। যে পুলবাজারের অন্বেষণে এত ঘুরিয়াছি, এখন সেই পুলবাজার পঁহুছিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পিতাকে কত ধন্যবাদ দিলাম। দুইটী সহযাত্রী অগ্রে পঁহুছিয়া আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এত বিলম্ব দেখিয়া বিপদ আশঙ্কায় কতই উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন! আমাকে দেখিয়া মনে করিলেন, সকলেই বুঝি একত্র আসিয়াছি। আশ্রয়স্থানে পঁহুছিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। যে ৬ জন সহযাত্রী পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের কষ্ট ভাবিতে ভাবিতে মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ঘোর অন্ধকারে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাত্রির মধ্যে পঁহুছিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ হইতে লাগিল। একান্তমনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে দূরে কথা শুনিয়া আশা হইল, তাঁহারা আসিতে-ছেন। সকলকে নিরাপদে পঁহুছিতে দেখিয়া যে অসীম আনন্দ জন্মিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

দলের অধিনায়িকা আমাদের কষ্ট দেখিয়া নিজকে শত দোষী ভাবিতেন। এবার এত কষ্টের পর একত্রিত হইয়া আমাদের গলা জড়াইয়া আনন্দের আতি-শয্য বশতঃ কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রতি-কূল অবস্থা আমাদের বন্ধুতা যেন শত গুণ দৃঢ় করিয়া দিল। পরস্পরকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া গৃহাদির শৃঙ্খলায় ব্যস্ত হইলাম। "পুলবাজার" প্রকৃত পক্ষেই একটী বাজার। এখান হইতে অনেক আহারীয় দ্রব্য প্রতি সপ্তাহে দার্জ্জিলিং প্রেরিত হয়। মাড়োয়ারী মহাজনগণ বাজারের একমাত্র অধিবাসী। তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন; তাহা কদাচ ভুলিব না। এক মহাজন আমাদের রাত্রিবাসের জন্য নিজের দ্বিতল ঘর ছাড়িয়া দিলেন। পরিষ্কৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া যে আরাম অনুভব করিলাম, কোন কথায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমাদের কথা বুঝিতে পারে, এমন লোক পাইয়া, কতদূর আশ্বস্ত হইলাম, তাহা কেবল আমরাই অনুভব করিতে পারি।

সেই মহাজন গরম লুচি তরকারী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনিয়া উপহার দিলেন। আহার করিয়া বোধ হইল, এমন উপাদেয় দ্রব্য জন্মেও যেন আস্বাদন করি নাই। শুনিলাম, দার্জ্জিলিং এখান হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী, পরদিন ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে পঁহুছিতে পারিব। সকলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কিন্তু মনের আনন্দে নিদ্রা আসিল না। আজ আমাদের ভ্রমণের শেষ দিন, পথের কষ্ট ও এক এক জনের আত্মকাহিনী শুনিতে শুনিতে যে হাসির তরঙ্গ উঠিল তাহা বলিবার নহে। গৃহে ৩টী শিশুর সরল স্নেহপূর্ণ মুখ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। এত ব্যগ্রতা বোধ হইতেছে যে, এ ঘোর রাত্রিতেও যাত্রা করিতে প্রস্তুত। এক সপ্তাহের অধিক কাল পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছি। আমার সংবাদও কেহ জানেন না, আমিও কোন সংবাদ রাখি না। নানা চিন্তার তরঙ্গ হৃদয়ে খেলিতে লাগিল। হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া চমকিত হইয়া শয্যা পরিত্যাগ করিলাম। (ক্রমশঃ)

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বনচারিবাগান হইতে যখন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। গ্রামের মধ্য দিয়া গমন না করিয়া তাঁহারা গঙ্গার কিনারা দিয়া চলিতে লাগিলেন। দুর্ব্বিষহ চিন্তায় তাঁহা-দের গতি অতীব শিথিল হইল; চরণ যেন অগ্রসর হইতে রাজি নহে। অমলা অগ্রে

অগ্রে চলিতেছেন, আর অমিয় ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছেন; কাহারও মুখে বাক্য নাই; পদক্ষেপে শব্দ নাই; কোনও দিকে দৃষ্টি নাই; আছে কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আর জগদীশ্বরের নামোচ্চারণ।

প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এইরূপে পথ অতিক্রম করিবার পর অমলা অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। অমিয়ও এরূপ নিবিষ্টচিত্তে কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন যে, অমলা যে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন তাহা তিনি দেখেন নাই; সুতরাং অমিয় আসিয়া অমলার গাত্রের উপর পড়িলেন। ঝোঁক সামলাইতে না পারায় অমলা পড়িয়া গেলেন; অমিয়ও অমলার উপর পতিত হইলেন, অমলাকে অধিক আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া অমিয় শশব্যস্তে উঠিয়া "বৌদিদি! তোমায় বড় লেগেছে," বলিয়া অমলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিলে, অমলা হস্ত দ্বারা অমিয়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অমিয় ইহার কারণ কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, নিশ্চই সম্মুখে কোনও বিপদ উপস্থিত, সেই জন্য অমলা তাঁহাকে বাক্যোচ্চারণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। অমলা অমিয়ের হাত ধরিয়া বসাইলেন। দুইজনে নদীকূলে সৈকতের উপর উপবিষ্ট হইলে, অমলা সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। অমিয় দেখিলেন অদূরে এক স্থূলকায় ব্যক্তি উপবিষ্ট। এক্ষণে তাঁহাদের চৈতন্যের উদয় হইল। তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহারা নবদ্বীপ হইতে বহুদূর আগমন করিয়াছেন; চারিদিকে শ্মশান; মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই; কোথাও বা শূন্য কলসী গড়াগড়ী যাইতেছে; কোথাও বা অর্দ্ধদগ্ধ বংশ খণ্ড; কোথাও বা ছিন্ন কন্থা; আর কোথাও বা নরকঙ্কাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়া যেন পথিককে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে,—'রে অজ্ঞান! একবার আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, আমিও একদিন তোর মত ছিলাম!'

যাহা দেখিলেন তাহাতে অমিয়ের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—"বৌদিদি! এখন উপায় কি?"

"উপায় আর কি! ভগবান্‌কে ডাক্।"

"যদি ও আমাদি'কে ধরতে আসে, কি করিবে?"

"আমার বোধ হয় ও আমাদিগকে অন্ধকারে দেখতে পায়নি; এই সময় বসে বসেই আস্তে আস্তে নবদ্বীপের পানে ফিরে যাই চল্।"

"ওতো বড় বেশী দূরে নাই। যদি দেখতে পেয়ে থাকে, আর আমরা ফিরিবার সময় এসে পথ আটক করে?"

"তাও বটে; ও তোর কথাটাও বোধ হয় শুনিতে পেয়ে থাকবে। তবে এক কাজ করা যাক আয়; এই তো পাঁচ ছয় হাত দূরেই নদী; নদীর ঠিক জলের ধারটীতে বসে থাকা যাক। এখানে নদীতে বেশী জল; ও এতটা দৌড়ে আমাদের কাছে আসতে না আসতে আমরা বিপদের সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারব। এ আত্মহত্যায় পাপ নাই; স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা হলে আত্মহত্যাও ভাল; তাতে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন।"

বেশ কথা বৌদিদি! আমরা এক গলা জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিগে; তা হলে আমাদের কোন ভয়ই থাকবে না।"

"তবে আস্তে আয়" এই বলিয়া অমলা সেই স্থূলকায় পুরুষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দে পিছু হাঁটিতে লাগিলেন; অমিয়ও সেই ভাবে তাঁহার সহিত চলিতে লাগিলেন।

নদীর জল স্পর্শ করিবামাত্র দেখিলেন যে, সেই পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া অমিয় ও অমলা দ্রুতগতি দুই তিন হাত জলে নামিয়া পড়িলেন। অমিয় ও অমলা এখনি প্রাণত্যাগ করিতে পারে দেখিয়া সেই স্থূলকায় পুরুষ দূর হইতেই "অমলা দাঁড়া, আর বেশী জলে নামিস না" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিলেন।

বিস্ময় ও ভীতি উভয়ের হৃদয়কে যুগপৎ আলোড়িত করিতে লাগিল। অপরিচিত ব্যক্তি অমলাকে নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করায় তাঁহাদের ভীতির মধ্যেও কিঞ্চিৎ সাহসের উদ্রেক হইল। তাঁহারা আর অধিক জলে গমন না করিয়া একদৃষ্টে সেই পুরুষের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সেই স্থূলকায় পুরুষ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে সাবধান হইয়াও থাকিতে হইবে। তাঁহারা দেখিলেন যে সেই পুরুষ কোন দস্যু নয়, তিনি একজন সাধু পুরুষ, বয়স ৭০।৮০ বৎসর; তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অমিয় ও অমলা একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহারা ভীত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সাধু কহিলেন, "তোদের কোন ভয় নাই, জল হতে উঠে আয়।"

অমলা কহিলেন, "প্রভু! আপনি কে?"

"তোদের ছেলে।"

"আপনি এখানে কেন?"

"তোদেরি জন্য।"

"আমাদের জন্য কিরূপ? আপনি কি আমাদিগকে চিনেন?"

"হাঁ কতকটা চিনিতে পারি।"

"আপনি কি আমাদিগকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলেন?

"না।"

"তবে আমাদিগকে জানেন কিরূপে?"

আমার নাম জানলেন কেমন করে?"

"আমরা যোগবলে সব জানতে পারি।

সে কথা যাক, এখন তোরা যাবি কোথা বল্ দেখি?"

"ভগবান্ যেখানে নিয়ে যান।"

"কালীঘাট যাবি নয়?" এই কথা বলিয়া সাধুপুরুষ প্রত্যাগমনের উপক্রম করিলে, অমিয় ও অমলা নদী হইতে আসিতে লাগিলেন। যখন তাঁহারা জল হইতে তীরে উঠিলেন, তখন সাধু তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায় ৬।৭ হস্ত দূরে গমন করিয়াছেন। উভয়ে জল হইতে উঠিয়া "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়া যোড় হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধুর কৃপা হইল। তিনি কহিলেন, "যা, তোরা এখন সধবা।"

সাধুর বাক্যে তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মস্তক অবনত করিলেন। মস্তক অবনত করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী অদৃশ্য; চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন, অনেক কাতরোক্তি করিলেন, কিন্তু সাধুর আর দর্শন পাইলেন না। তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উভয়ে তথায় উপবেশন করিলেন। অমলার মানসিক অবস্থার কোনও বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইল না। অমিয় যেন আর অমিয় রহিলেন না; তিনি বালুকার উপর শয়ন করিয়া অবিরত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করা অমলার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

সতী-যাত্রা। *

১

অকালে নলিনী বালা! গেলে মা কোথায়?
শোকাতুরা জননীরে,
ক'টি ভ্রাতা ভগিনীরে
পতি আত্ম পরিজনে কাঁদায়ে সবায়!

২

কুক্ষণে ইন্দুর পত্র দিল এ সংবাদ।
নলিনী তুমি মা নাই!
চমকি উঠিনু তাই,—
বিনা মেঘে শুনি যেন ভীম বজ্রনাদ।

৩

তব মাতা বিষাদিনী পাগলিনী পারা,—
তোমা শোকে চারিধার,
হেরিছেন অন্ধকার,
বহিছে নয়নে আহা! অশ্রু শত ধারা!

৪

ফিরে এসে দেখ বাছা! দশা তব মা'র—
অনাহারে অনিদ্রায়,
সাড়হীন মৃতপ্রায়,
রোগাক্রান্ত শীর্ণ দেহে শ্বাস মাত্র সার।

* এই কবিতাটী মাননীয়া ভগ্নী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনী বালার স্বর্গারোহণ উপলক্ষ্যে লিখিত।

৫

শুনি তব রোগবার্ত্তা ব্যাকুল হৃদয়ে,
আনালেন মা তোমারে,
রোগমুক্ত করিবারে,
দূরদেশ আগ্রা হতে পাঠায়ে তনয়ে।

৬

এলে পতি ভ্রাতা সহ প্রভাতে হেথায়,
স্নেহময়ী তব মাতা,
পতি আর ভগ্নী ভ্রাতা,
হলেন নিযুক্ত সবে তব শুশ্রূষায়।

৭

হইল চিকিৎসা কত বাঁচাতে তোমায়,
ব্যর্থ করি সে সকলি,
দিয়ে মায়া জলাঞ্জলি,
চির তরে গেলে চলি মধ্যাহ্ন বেলায়।

৮

শাঁখা নোয়া, ফুলমালা সিন্দূর পরিয়া,
অলক্ত রঞ্জিয়া পায়,
রক্ত বাসে ঢাকি কায়,
সধবার বেশে কোথা গেলে মা চলিয়া?

৯

নিভিল উজ্জ্বল দীপ গৃহ আঁধারিয়া,
উঠিল ক্রন্দন রোল,
মর্ম্মভেদী হরিবোল,
ঘুষিল সতীর যাত্রা চৌদিক্ ধ্বনিয়া!

১০

হয়নি দিদির হায় গত বেশী দিন!
আনন্দমোহন স্বামী
হারায়ে দিবস যামী,
শোকদগ্ধা স্বর্ণপ্রভা বিষাদে মলিন।

১১

হৃদে তাঁর প্রজ্জ্বলিত পতি-শোকানল।
পাঁচ পুত্র, চারি মেয়ে,
তোমাদের মুখ চেয়ে,
করিতেন সম্বরণ অশ্রু অবিরল।

১২

কোথা গেলে তাঁরে তুমি কাঁদায়ে নলিনী?
ফুটি তার হৃদি-সরে,
ছিলে যে সৌন্দর্য্য-ভরে,
বিদ্যা গুণে যশো-বাসে ফুল্ল সরোজিনী।

১৩

গেলে কি করিতে সেবা তব সে পিতার?
ব্রহ্মে তিনি হয়ে লীন,
যেই স্থানে সমাসীন,
তথা কি গেলে মা! তুমি কাছেতে তাঁহার?

১৪

পিতার আদর্শে তুমি গঠিত বলিয়া,
তাই পিতৃপদমূলে,
নবীন জীবন-ফুলে,
পূজিতে নলিনীবালা! গেলে কি চলিয়া?

মর্ম্মাহত,—
শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার, রাজবাটী।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সে তর্ক করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। কার্য্যতঃ যাহাই হউক বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের অনেকেরই মত যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। এ কথাটী বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষ-দুষ্ট নহে। যাঁহাদের ঘরে কচি বিধবা মেয়ে আছে, তাঁহারা অনেকেই তাহাদের বিবাহ দিতে পারিলে যে খুব সুখী হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে বিধবা-বিবাহের উচিতমত প্রচলন হইতেছে না কেন? মাঝে মাঝে দুই এক জন লোক দেখা যায়, যাঁহারা সাহস করিয়া আপনাদের বিধবা কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু হিন্দু সমাজে এরূপ সৎসাহসী লোক বড় বিরল। কেহ কেহ উপযুক্ত পাত্রের অভাবে এ কাজে অগ্রসর হইতে চাহেন না বটে, কিন্তু মোটের উপর ধরিতে গেলে সমাজ শাসন বড় কঠোর। অনেকেরই সমাজকে উপেক্ষা করিবার সাহস কুলায় না।

বিধবা-বিবাহ হিন্দু সমাজে যে একেবারে অপ্রচলিত, তাহা বলা যায় না। বেহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর ভিতর ইহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। বাঙ্গালায় কিন্তু কোন শ্রেণীর ভিতর ইহা দেখা যায় না। এখানে কিন্তু কোন কোন জাতি বা শাখার মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক সময় বেশী পণ না দিলে বিবাহ করিবার জন্য কন্যা মিলে না। মনে হয় ইহাদের ভিতর যদি বিধবা-বিবাহ চলিত থাকিত, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হইত।

বাঙ্গালার সমাজশাসন কি বেহার ও উড়িষ্যা অপেক্ষাও দৃঢ়তর? বাঙ্গালী হিন্দুরা কি তাঁহাদের বেহারী ও উড়িয়া ভ্রাতৃগণ অপেক্ষাও সমাজভয়ে বেশী ভীত? বাঙ্গালীরা কি, অন্ততঃ কোন বিষয়ে, বেহার ও উড়িষ্যাবাসী অপেক্ষাও ভীরু? না বাঙ্গলার সমাজ-জীবন বেশী উন্নত ও অগ্রসর এবং সেই জন্য সমাজ-বন্ধন দৃঢ়তর? এ সব বড় জটিল প্রশ্ন। সমাজতত্ত্ববিদেরা ইহাদের আলোচনা করিবেন। আমার পক্ষে ইহাদের আলোচনা ক্ষমতার অতীত। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে, যতদূর জানি, বেহার ও উড়িষ্যায় যেরূপ শ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, বাঙ্গালায় সেরূপ শ্রেণীর মধ্যে ইহা অপ্রচলিত। ইহাদের মধ্যে উহা প্রচলিত থাকিলে যে অন্য শ্রেণীর মধ্যে ক্রমে চলিত হইত তাহা নয়, কিন্তু ঐ সব শ্রেণীর কতকগুলি বিধবার কিনারা হইত।

গত আদম সুমারীর বিবরণী আমার কাছে নাই। তবে শুনিতে পাই সমগ্র ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের

সংখ্যা বেশী এবং বাঙ্গলা দেশেও তাই। ইহার অনেক কারণ থাকিতে পারে। একটা কারণ এই যে, অন্যান্য দেশ হইতে নানা কার্য্যোপলক্ষে ভারতে অনেক পুরুষ আসে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পরিজনবর্গকে সঙ্গে না আনিয়া আপন আপন দেশে রাখিয়া আসে। আমাদের দেশেও উড়িষ্যা, বেহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশ হইতে অনেক পুরুষকে কাজ কর্ম্মের জন্য আসিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অনেকেই স্ত্রী সঙ্গে আনে না। সামান্য শ্রমজীবীর কাজের জন্য কিন্তু বাঙ্গলা হইতে অন্য প্রদেশে খুব কম লোকেই গিয়া থাকে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলা হইতে যাঁহারা বিদেশে যান, তাঁহাদের অধিকাংশই উচ্চতর কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে দেশ ছাড়েন, এবং অনেকেই পরিবার সঙ্গে লইয়া যান। অন্যান্য দেশ হইতে এ দেশে অনেক পুরুষ-সমাগম, বাঙ্গলার স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের আধিক্যের ইহা একটা কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইহা যে এক বিশিষ্ট কারণ, আদম সুমারীর বিবরণীর অভাবে তাহা বলিতে পারি না। (১)

হিন্দুর মধ্যে যখন জাতিবিভাগ আছে, তখন দেশে মোট পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ধরিয়া বিবাহাদি সম্বন্ধে কোন মত দিলে তাহা ভ্রমাত্মক হইবে। জাতিবিভাগ অগ্রাহ্য করিবার সময় আজও আসে নাই। আর একটী কথা মনে রাখা দরকার। ইউরোপাদি অঞ্চলে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা বিঘ্ন নাই, এবং উহার বহুল প্রচারও আছে। কিন্তু ঐ সব দেশে অনেক মহিলা ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন করেন। তাহার ফল এই হয় যে, বিবাহার্থিনী বিধবারা একটু সুবিধা পান। আমাদের সমাজে কিন্তু বিবাহ বিষয়ে কুমারীর প্রতিযোগিতা ইউরোপাদি দেশের অপেক্ষা কিছু বেশী। ব্রাহ্মণদের কোন কোন শাখার ভিতর উপযুক্ত বরের অভাবে কখন কখন কন্যাকে চিরজীবন অবিবাহিতা থাকিতে হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ধরিতে গেলে সকল কুমারীরই বিবাহ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং হইয়াও থাকে। কাজে কাজেই বিধবার পাণিগ্রহণপ্রার্থী পুরুষের সংখ্যা বেশী না হইবারই সম্ভাবনা। তাহার উপর ত আবার সমাজ-শাসন আছেই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিধবার বিবাহ হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে।

যেমন ব্রাহ্মণদের কোন কোন শাখার মধ্যে বরের অভাবে কন্যার বিবাহ কঠিন, সেইরূপ এমন-কতকগুলি শাখা আছে

(১) সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে যে যা লোকসংখ্যা গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখা যায় যে, হিন্দু জাতির সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে; ইহা অশুভ সুলক্ষণ নহে। ইহার একটী প্রধান কারণ—হিন্দু জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের অপ্রচলন। অপুত্রা বালবিধবাদের বিবাহপ্রথা বহুলরূপে প্রচলিত হইলে এ অনিষ্টের নিরাকরণ হয়—স।

যাহাতে কন্যার অভাবে কতক পুরুষকে অধিক বয়সে বিবাহ করিতে বা সারা-জীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়। তাহা ছাড়া সমাজে অনেক জাতি আছে, যাহা-দের মধ্যে বিবাহযোগ্য পুরুষের অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা কম বলিয়া মনে হয়।

সমাজ বর্দ্ধনশীল হওয়া আবশ্যক। যে সমাজ বর্দ্ধনশীল নয়, আজ হউক কাল হউক বা দশ দিন পরেই হউক তাহাকে পৃথিবী হইতে লোপ পাইতেই হইবে। সমাজের কল্যাণার্থে ইহা আবশ্যক যে তাহা যতদূর সম্ভব বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ নরনারীর সংখ্যায় পুর্ণ হয়। যে পরিমাণে সমাজ ঐরূপ নরনারীর ভার বহন করিতে সক্ষম, সেই পরিমাণে উহা উন্নত ও বর্দ্ধনশীল। অতএব যে সমাজের অন্তর্গত সকল বা অধিকাংশ নরনারীর বিবাহ হইবে এবং সকল বা অধিকাংশ দম্পতী যতগুলি সম্ভব বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ সন্তান উৎপাদন করিবে, সেই সমাজের স্থায়িত্ব ও কুশল একরূপ অনিবার্য্য হইবে। এই দিক্ হইতে দেখিলে সমগ্র হিন্দুসমাজের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ কতকটা নৈরাশ্যপূর্ণ। প্রত্যেক আদম সুমারীতে দেখা যায় যে, যে পরিমাণে হিন্দুর সংখ্যা বাড়া উচিত, তাহা হইতেছে না। মুসল-মান সমাজ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, হিন্দুসমাজ তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। হিন্দুর পক্ষে ইহা বড় ভাবনার কথা; কারণ, হিন্দুসমাজ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক—কোন হিন্দুসন্তান ইহা ইচ্ছা করিতে পারেন না। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ অনেকটা প্রচলিত আছে এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে একাধিক বিবাহও বিরল নয়। মুসলমান সমাজের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধির ইহা এক অন্যতম কারণ।

যদি হিন্দুসমাজকে বিলোপ হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে কয়েকটী কাজ আমাদিগকে করিতে হইবে—(১) সমাজের লোকদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান; (২) সমাজের অন্তর্গত সকলের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা; (৩) সমাজে যতদূর সম্ভব বলশালী ও কর্ম্মকুশল নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন। প্রথম দুইটীর সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর কিছু বলিতে চাহি না। তৃতীয়টী সম্বন্ধে গুটীকত কথা বলিতে চাই। এই উদ্দেশ্যটী সংসাধন করিতে হইলে সমাজকে দেখিতে হইবে যে, ইহাতে বহুসংখ্যক বলশালী ও কার্য্যকুশল নরনারী জন্মায় ও স্থান পায়। এরূপ জনসমষ্টি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজের কি করা আবশ্যক? তাহাকে দেখিতে হইবে যে, সন্তানোৎপাদনক্ষম সবল ও অধিক-সংখ্যক পুরুষ ও গর্ভধারণক্ষম সবল ও অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্ভব-পর হয়। বলা বাহুল্য, আমি যে সন্তানের কথা বলিতেছি, তাহা সুস্থ ও সবল, ম্যালেরিয়াভোগী পিলে রোগা সন্তান নয়। বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার আবশ্যক হইবে, কারণ উহা সমাজের বলনাশক। উহাতে

সাধারণতঃ পিতামাতার শরীর শীঘ্র ভগ্ন হয়, এবং সবল সন্তানোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। যেমন একদিকে বাল্যবিবাহ সমাজের মহা অপকারী, সেইরূপ স্ত্রী পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহও উহার বিষম ক্ষতিকারক। কারণ, ইহাতে সমাজের সন্তানসমষ্টি কম হইবার সম্ভা-বনা। অতএব ইহা একরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমাজ যদি আপনাকে রক্ষা করিতে চায়, আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে ইহার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে, ইহার অন্তর্ভুক্ত সবল সন্তানোৎপাদনসক্ষম পুরুষের ও গর্ভধারণ-ক্ষমা স্ত্রীলোকের যতদূর সম্ভব উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয়। যে পরিমাণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, সেই পরিমাণে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। হিন্দু-সমাজে দেখিতে পাই যে, কতকগুলি সন্তানোৎপাদনক্ষম পুরুষের হয় মোটে বিবাহ হয় না, অথবা অধিক বয়সে বিবাহ হয়, এবং অনেকগুলি গর্ভধারণ-ক্ষমা বিধবাকে গর্ভধারণকার্য্যে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়। ইহা সমাজের কত দূর অনিষ্টের কারণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমার মনে হয় বিধবাবিবাহের আলোচনায় আমাদের গুটিকতক কথা স্মরণ রাখা দরকার—(১) হিন্দুসমাজ জাতিভেদরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত; (২) ইহাতে সাধারণতঃ কোন স্ত্রীলোক চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিতে পারেন না; (৩) ইহাতে কোন কোন শাখা ও জাতি কন্যাবহুল, এবং কোন কোন শাখা ও জাতি পুত্রবহুল। জাতিভেদ থাকার জন্য এক শাখা বা জাতির কন্যাবহুলত্ব দোষ অন্য শাখা বা জাতির পুত্রবাহুল্য দোষ দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। কাজে কাজেই স্বভাবতঃ মনে হয় যে, সামাজিক হিতের জন্য যে সব শাখা ও জাতির মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক, তাহাদের ভিতর বিধবা-বিবাহ অগ্রে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমার মতে অন্য শাখা ও জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই। বিধবা-বিবাহের প্রতি বিরাগ ও আপত্তি সমাজের সকল বিভাগ হইতে দূর হওয়া উচিত। এখানে আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, সমাজের মঙ্গলার্থে ইহার যে সকল বিভাগে বিবাহযোগ্যা কন্যার অপেক্ষাকৃত অভাব, সেই সকল বিভাগে বিধবাবিবাহ অগ্রে প্রচলিত হইলে বড় ভাল হয়। মনে হয় যে, সমাজের নেতৃ-বর্গ (যদি বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে এরূপ কেহ থাকেন) মনোযোগপূর্ব্বক এই কথা যদি একটু ভাবেন, এবং এ সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। কুমারী কন্যার যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দিতে না পারিলে তাহার পিতৃপুরুষ নিরয়গামী হইবেন এ বিশ্বাস লোকের মনোমধ্যে যত দিন পর্য্যন্ত থাকিবে, কিম্বা মন

হইতে অপসারিত হইলেও সমাজের ভয়ে লোককে এই বিশ্বাসের বাহ্যিক ভান করিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কন্যা-বহুল শাখা বা জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে বিধবাবিবাহ হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সব শাখা বা জাতির ভিতর কন্যা কিছু বিরল, ভাল করিয়া চেষ্টা করিলে এবং ঐ চেষ্টা কিছুকালব্যাপী হইলে উহাদের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মন হইতে বিধবাবিবাহের প্রতি বিরাগভাব ক্রমে ক্রমে অপনীত হইতে পারে। স্বজাতি-রক্ষা ও আত্মসুখ অনুসন্ধান প্রবৃত্তি এই ব্যাপারে সাহায্য করিবে বলিয়া অনুমান হয়। উক্ত লোকদের মন যদি বিধবা-বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ক্রমে অন্যান্য শাখা বা জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকদের মনের উপর যে তাহার কোন ফল হইবে না, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মনে যে কয়টী কথা উদয় হইয়াছে, বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাহা ব্যক্ত করিলাম। উহাদের ঔচিত্য অনৌচিত্যের ও কার্য্য-কারিতার বিচারভার তাঁহাদের উপর। এ প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের সামাজিক দিকেরই কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করা হইয়াছে, উহার ব্যক্তিগত দিক্ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ,

নূতন সংবাদ।

১। বামাবোধিনী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করাতে আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, স্বর্গগত সম্পাদক মহাশয়, তাঁহার স্বর্গারোহণের ৩।৪ মাস পূর্ব্বে, বঙ্গমহিলাদি গকে যে ভাবে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিতা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ যতদূর সম্ভব কতকগুলি রন্ধন, পাঠ, সুশ্রূষা, ব্যায়াম, পূজা ইত্যাদি চিত্রে সম্বলিত করিয়া একখানি চিত্র অঙ্কিত করান এবং উহা বামাবোধিনীর প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার শুভ জন্মমাস ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হইবে এরূপ স্থির করেন। তাঁহার সেই শুভ ইচ্ছানুসারে ভাদ্রমাস হইতে সেই চিত্র সন্নিবেশিত হইতেছে।

২। কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে গত ৪ঠা নবেম্বর কাশীম-বাজার রাজভবনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সম্মিলনীতে বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে অনেক সাহিত্যসেবী একত্র সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য কি কি পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে সে বিষয় আলোচনা করেন। এই সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন রাজসাহিতে হইবে স্থিরীকৃত হয়। অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন ও ইহার সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য মহারাজ বাহাদুর ধন্য বাদার্হ, তাঁহার অমায়িক আদর, যত্ন ও অভ্যর্থনায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছেন।

৩। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটী কন্যা প্রসব করিয়া গত বুধবার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভগবান্ শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তিদান করুন।

৪। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মোৎসব উপলক্ষে লালা লজপৎরায় ও অজিত সিংহের নির্ব্বাসন-দণ্ড রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত উমেশানন্দ দত্ত ওঝা বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার পদ পাইয়া সদনুষ্ঠানে মনোযোগী হইয়াছেন। তিনি তত্রত্য রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ আশ্রমের জন্য ভূতপূর্ব্ব প্রধান পাণ্ডার দেয় চাঁদার টাকা বহুকালাবধি উক্ত আশ্রমে দেওয়া হয় নাই। তিনি এক্ষণে সে সমস্ত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সূত্রধর তত্ত্ব—শ্রীবিহারি লাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দেখাইয়া সূত্রধর জাতির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক সূত্রধরগণের ব্যবসায় বা আচার কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে। উহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য ও ভক্তিমান্। উহাদিগকে অপকৃষ্ট বর্ণমধ্যে গণ্য করা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

২। প্রফুল্ল নির্ম্মাল্য—শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। ইহার ভূমিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রফুল্ল একটী স্বর্গীয় পারিজাত, মর্ত্ত্যে আসিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমায় ও সৌরভে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। এই স্বল্পদিনে সকলের হৃদয়ে যে একটু দিব্য জ্যোতিঃ রাখিয়া গেল, তাহার ধ্বংস নাই।" এ গ্রন্থ গ্রন্থকারের প্রাণময়ী ভাষা। ইহা সমালোচনার অতীত।

বামারচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রতি।

এলিরে এলিরে তুই ফিরে ঘরে আজ।
দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ,
আমার কথাটি রাখ,
তোর এ দুখিনী বোন বুকে সহে বাজ।

আঁখি মেলে চাহ ধীরে ভগিনীসমাজ।
ফোটা ফুল ঝরে গেছে,
জ্যোৎস্নাটুকু নিভায়েছে,
অসৌরভ অন্ধকার উদাসীর সাজ।
আছে সে আনত মুখে পেয়ে ভয় লাজ।
পুড়ে গেছে হৃদি মর্ম্ম,
জানে নাক কর্ম্মাকর্ম্ম,
মোহান্ধ অজ্ঞান তলে ভুলি নিজ কাজ।
তাই কি ব্যথিত হয়ে উদিলিরি আজ?
মুছাতে শোকাশ্রু-নীর
হইয়ে অতি অধীর,
পূরব গগনে যেন নব রবি সাজ।

এলিরে আবার ফিরে ঘরে তুই আজ।
ভাঙ্গা প্রাণ জোড়া দিতে,
হত শক্তি সঞ্চারিতে,
নির্ধনেরে ধন দিতে দীন ঘরে আজ।
জাগারে মুমূর্ষু প্রাণে জীবন্ত প্রভুরা।
জড়তা হউক দূর,
প্রাণে কর ভরপুর,
সঞ্জীবনী সুধারস স্বর্গীয় স্বভাব।
সারাবর্ষ কেঁদে কেটে হয়েছে নিরাশ।
ধন রত্ন ছিল যাহা
হরেছে তস্কর তাহা,
দরিদ্র ভিখারী সম বুকে দীর্ঘশ্বাস।
তাই কি দেখিতে তুই এলি তার পাশ।
এঘোর পরীক্ষানলে দহে দিবা রাত।
ভুলে আছ দেবসেবা,
কর্ত্তব্য বা আছে কিবা,
তোর ও পূজার তরে কাঁপে দুই হাত।
যেন কত অপরাধি সহি প্রতিঘাত।

তার তরে তুমি আজি খুলিয়া ভাণ্ডার।
ডাকিতেছ বাহু তুলে,
কতনা স্নেহের বোলে,
বিলাতে অপ্রাপ্য ধন মরত আগার।
শুভ মুহূর্ত্তের মাঝে দামিনী ঝলকে।
প্রকাশি পবিত্র চিত্র,
বাঁধিলে একতা সূত্র,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে মধুর আলোকে।
বিধাতার দুই বাহু পুত্র কন্যা সম।
সাধিতে অবনী কাজ,
শ্রেষ্ঠ মানব সমাজ,
অবতীর্ণ ধর্ম্ম কর্ম্ম চিত্র অনুপম।
এক তরু দুটি ফুল সৌরভে সমান।
দুর্গন্ধ করিবে দূর,
মকরন্দ সুপ্রচুর
ঢালিবে অজস্রধারে জগত বিতান।
অটল অচল হয়ে পালিবে বিধান।
সুখে শান্তি দুঃখে দৈন্য
পাপ তাপ ধর্ম্ম পুণ্য
পথভ্রষ্ট নহে কদা ধীর মতিমান্।
উড়ায়ে সুকীর্ত্তি ধ্বজা ইঙ্গিতে আবার।
প্রকাশি মহিমা তব,
শিখাতেছে নব নব,
অশেষ সরল মনে কত সদাচার।
এসেছ দুখীর ঘরে দয়ার আধার
বোস বোস এ আঁধারে
উজলিয়া চারি ধারে,
পবিত্র প্রভাবে ব্যথা ভুলি একবার।
তুলিয়ে কোমল কর মোছ অশ্রুধার।
নমামি ও পুণ্যপদে ভাইদ্বিতীয়ার।
স্বদেশ স্বজন মাঝে হও হে প্রচার। শ্রীনিঃ

Bamabodhini Patrika.

In the issue of June last we published one of a series of letters written by the late Mr. A. M. Bose to his wife to show that he was a model husband. More now is given another of the series. We intend to publish in future some of his letters to his wife, friends and relatives—which, we hope, will give an insight into his noble character and public spirit.

WILSLIGDEN.
22nd June, 1894.

My Dear Wife,

Yours of the 29th May reaches me this week. I am glad to learn you had all anxiety by this time being relieved by news of my safe arrival in London. God comfort you and bless you under all circumstances. Never be anxious on my account. I am, I venture to believe, under His loving protection.

He, in his boundless mercy, take me back, and mind and body, I pray, strengthened in body and mind.

Do you know you will have a great deal—a very great deal of work to do when I come back, and you had better prepare yourself well for it from now. Time unfortunately does not permit of all that I think about the future. That future as yet seems somewhat perplexed. I feel *how happy* I should feel if I could devote my future entirely to work for my country, my God and my beloved ones. But for some years yet to come, circumstances will perhaps compel me to work for my profession also, inorder that I my be able to leave my dear [illegible] without any [illegible] connection

সাময়িক প্রসঙ্গ
পুরাতন
আমরা
অমলা
নিবে
চা

বাণ্মাসিক ১৷৵, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩, টাকা মাত্র

or otherwise and to read a large number of good books, English and Bengalee. (2) I want you to practise writing poetry. You will perhaps at once profess your inability. But don't mind that. Try. There is no harm in trying. I shall require you when I come back to compose songs for our services &c. Who knows if the spirit of God may not lead you to sing them too in public meetings some day. Songs are of great importance. They often preach better than sermons, and find their way into the heart. Writing to you from Germany I may tell you that national songs and hymns have done more to unite this country and place it in the proud position it occupies today than its armies. In fact its armies have been the result of the spirit which these songs aroused in the whole community. (3) I want you to write novels or little stories. Do you remember that long ago I told you to write or to try to write a novel. Those little stories that Rabindranath writes in the বান্ধব, ভারতী &c. I have often found very touching. In order to help me in my work, you will have to write little stories. So qualify yourself for it from now. What a *revolution* that one book Uncle Tom's Cabin produced in America! It stirred up people's hearts to their deepest depths and awakened the conscience of the manhood of America to deadly struggle against the gigantic slave-power. True, all have not the genius of Mrs. Stowe. But each one can put forth what little is consecrated in the service of God. Do you know how much He increases it, and blesses it to fru[illegible]e, the fulness? Look at the daughters, [illegible]o was in General Booth, eldest the Marech[illegible]eland in (Mrs. Booth Clebborn) in Franc[illegible]epart- 2nd (Mrs. Booth-Tucker) w[illegible]king the 3rd India but now working in En[illegible]king in charge of the Foreign Work [illegible], Women's ment of the Salvation Army, [illegible], h[illegible] Miss Miss Eva Booth also wo[illegible]f India England in charge of [illegible] all the Training Home, and the 4[illegible] one Lucy Booth, Col. Ruhani o[illegible]s nor whom you know, and these are [illegible]t the daughters of General Booth. N[illegible]y had can say that they were genius[illegible] service have they received anything b[illegible] simply most ordinary education. If th[illegible]irls or not devoted themselves to the [illegible]housands of God, they would have been [illegible] born no- average middle class English [illegible]. But now women such as there are in th[illegible]ers they of English families, and of w[illegible]ources of body have taken any note. [illegible], notice what wonderful po[illegible], are displaying, and what [illegible] unspeakable blessing they are pro[illegible] to thousands of suffering men and women in various lands. Yes, it is *wonderful* what interest—double and treble and hundredfold interest—God returns to any little human capital which may be invested in His service.

Yours
A. M. Bose.

No. 533. Registered No. C. 134. January 1908.



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫ বর্ষ। ৩ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩১৪। জানুয়ারী, ১৯০৮।	৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	২৫৭	৮। মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্তের পরলোকগমনে	২৭২
২।	পুরাতন বিদায় নবীন আবাহন (শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু) ...	২৫৮	৯। শ্বেতকেতুর উপাখ্যান	২৭৬
৩।	আমরা কি চাই	২৫৯	১০। পল্লনা (শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত) ...	২৭৯
৪।	অমলা	২৬৩	১১। পাচন ও মুষ্টিযোগ	২৮৪
৫।	নিবেদন পত্র (শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু)	২৬৫	১২। নূতন গ্রন্থের সমালোচনা	২৮৫
৬।	চা পান (শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, এম্, এ)	২৬৭	১৩। নূতন সংবাদ	২৯৫
৭।	গীতা	২৭০	১৪। বলিদান (শ্রীযুক্তা সরলাসুন্দরী মিত্র)	২৮৬
			১৫। English	২৮৮

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অ[illegible] ইহা ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি বি[illegible] প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি[illegible] সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেব[illegible] পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্ব[illegible], না[illegible] চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, [illegible] চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ মা[illegible] থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাই[illegible] ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হই[illegible] অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ধুড় ধুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্র[illegible] রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন [illegible] মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বে[illegible] আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১ মাশুল ॥০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি রোগের ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ [illegible] দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হই[illegible] না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ সাঁটিয়া ধরা বা বা[illegible] পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুড়া কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্তম[illegible] আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের উঠে অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুফল লাভ করিবেন।

১৮ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা; [illegible] ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৯নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 533. January, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৩ সংখ্যা। { পৌষ, ১৩১৪। | জানুয়ারি, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিধবা বিবাহ—জষ্টিস চন্দাবরকার ও তাঁহার পত্নীর চেষ্টায় গত মাসে শ্রীযুক্ত রামরাও নামক একটী শিক্ষিত যুবকের সহিত দাক্ষিণাত্যের ম্যাঙ্গালোরের এক-সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালবিধবা কন্যা শ্রীমতী কাবেরীবাঈয়ের শুভ বিবাহ হই[illegible] য়াছে। বিবাহে অনেক গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-বাসীগণ সমাজ সংস্কারে অনেক অগ্রসর হইতেছেন।

স্ত্রীজাতির অধিকার—ইংলণ্ডে এক-দল রমণী সকল বিষয়ে পুরুষদিগের তুল্য অধিকার লাভ করিবার জন্য অনেক দিন হইতে তুমুল আন্দোলন করিয়া আসিতে-ছেন। সম্প্রতি তাঁহারা পুরুষদিগের প্রণীত আইনদ্বারা স্ত্রীলোকের বিচার অবৈধ বলিয়া সকল আদালতে আন্দোলন করিতেছেন। অনেকে ইঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইঁহাদের ন্যায্য অধিকার দেওয়াইবার জন্য যত্নবান আছেন।

বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু—সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের গত ১৮ই ডিসেম্বর মৃত্যু হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে তিনি অনেক নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছেন।

সম্মান—উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস, তাঁহার কন্যা মিস্ দাস ও কণিকার রাজা লণ্ডনের এসিয়াটীক সোসাইটীর সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্তের কন্যা এই সভ্যপদ লাভ করিয়াছেন।

পীড়া—শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু দুই মাস যাবৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ি-য়াছেন। তিনি শীঘ্রই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে যাইতেছেন। তিনি এই অসুস্থ অবস্থায়ও বামাবোধিনী এবং ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতিফণ্ডের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের

আবাস নির্ম্মাণ—যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর অভিভাবকতায় বিলাতে একটী ভারতীয় মেলা বসিবে! এই মেলার সংগৃহীত অর্থদ্বারা এডিনবরায় ভারতবাসী ছাত্রদিগের নিমিত্ত একটী বাটী নির্ম্মিত হইবে। অনেক সম্ভ্রান্তমহিলা মেলায় দোকান খুলিতে স্বীকার করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সমিতি—ভারতীয় সমগ্র মুসলমানজাতির শিক্ষা ও সম্মিলনের সভা এবার করাচিতে বসিয়াছে। এই সভায় হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপনের প্রস্তাবটী দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয় তাঁহার "স্বদেশীর প্রাতঃকৃত্য" পুস্তকে লিখিয়াছেন;—

"কোরাণবেদ্যাদিতো জগদীশ একো-
জীবশ্চ মৃত্যুরপি বঃ সমসূত্র বদ্ধঃ।
অদ্বৈধরক্তরসহিন্দুমহম্মদীয়াঃ!
সৌদর্য্যসংহতিবলং প্রকটীকুরুধ্বম্॥

—বেদে বা কোরাণে সেই একই ঈশ্বর,
এক রক্ত-রস-ধাতু দোঁহারি ভিতর;
ভারতের হিন্দু আর মুসলমানগণে
এক সূত্রে গাঁথা দোঁহে জীবনে মরণে;
এস হিন্দু! মুসলমান! প্রাণের সোদর!
সৌদর্য্য-একতা-শক্তি দেখাও সত্বর।"

এহেন হিন্দু মুসলমানে যাঁহারা বিচ্ছেদ ঘটাইতেছেন, তাঁহাদের ন্যায় পাপিষ্ঠ আর কে আছে, জানি না।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার চেষ্টা—ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এলেন সাহেব কলিকাতায় আসিবার সময় গোয়ালন্দে কে তাঁহাকে গুলি করে। তিনি সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইয়াছেন এবং চিকিৎসাধীন আছেন। আসামী এখনও ধৃত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

যক্ষ্মারোগীর সাস্থ্যাবাস—যক্ষ্মারোগী-দিগের চিকিৎসার্থ হিমালয় অধিত্যকা আলমোরায় একটী গৃহনির্ম্মাণের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভূমি ও ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কুমারী ডাক্তার মেরী পেল্‌ফ্রোপ এই স্বাস্থ্যবাসের ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের নিকট অবশিষ্ট ছয় হাজার টাকার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু কার্য্যে সাধ্যের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনীয়।

পুরাতন বিদায় নবীন আবাহন।

ভূতরূপ সাগরেতে পুরান ডুবিল,
বিরহির প্রাণে তার আঘাত রহিল;
জীবনের কত জ্যোতি তুইরে হরিলি,
কত আনন্দের গেহে ঢালিলি কুহেলি।
পুরাতন! বন্ধু বলি করিয়ে যতন,
এতকাল দি'ছি তোরে প্রিয় সম্ভাষণ।
যাদের আলোকে ধরা ছিল হর্ষ ভরা,
সৌরভ দিতেন যারা কোথা হায়তারা।

প্রার্থনা।

ওহে শক্তিধারী প্রভু! এই পুণ্য মাসে,
কেমনে ডাকিব তোমা' কাঁপে প্রাণ ত্রাসে।
আমি যে স্বর্গের জীব কিবা চিহ্ন তার,
নিশি দিন কাটে সুধু করি হাহাকার,
মরণের পারে যেই অমৃত সাগর,
তাহাতে ডুবায়ে প্রাণ শুদ্ধ শান্ত কর।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।

আমরা কি চাই।

(১)

"আমরা" কথাটী বড় বিস্তৃত। "আমরা" কারা? জগতের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু কি? না কেবলমাত্র এই পৃথিবীর প্রাণিজগৎ? এত বিস্তীর্ণ অর্থে কথাটী এখানে ব্যবহার করিতেছি না। এ প্রবন্ধের "আমরা" কেবল বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীরা। বাঙ্গলা এখানে ভারতের সেই অংশটুকু যেখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। এ "আমরার" বর্ণভেদ বা ধর্ম্মভেদ নাই। ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম জাতি পর্য্যন্ত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, আবাল বৃদ্ধ বণিতা যাঁহারা সচরাচর বাঙ্গলাভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই এই "আমরার" ভিতর। যদি বাঙ্গালি-জাতি বলিয়া কিছু থাকে তাহার সকল লোকই এই "আমরার" অন্তর্ভূত।

এখন কথা হইতেছে আমরা কি চাই। বেশী কিছু চাইনা। কেবল সকল জীবের যে প্রাথমিক সংস্কার তাহার বশবর্ত্তী বলিয়া আমরাও বাঁচিতে চাই। ইহাতে কি আমাদের বেশী দোষ দেওয়া যাইতে পারে? বলিতে পারি না। মনে হয় যদি আমাদিগকে জীব বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে আমাদের সাধারণ জীবধর্ম্মের বশ-বর্ত্তিতাকে দোষ বলিয়া ধরা না যাইলেও যাইতে পারে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—তোমাদের বাঁচিবার অধিকার কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি কি জানি না। এই মাত্র বলিতে পারি যখন দুর্ভাগ্যক্রমে জন্মিয়াছি তখন বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

বাঁচিবার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে খুব প্রবল। কিন্তু এ পোড়া জগতে মনে করিলেই বাঁচা যায় না। তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? কবি ঠিকই বলিয়াছেন "জীবন রাখিতে জীবনান্ত।" উহা রাখিতে গেলে ঢের কাঠ খড়ের আবশ্যক। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব আর বাঁচিয়া থাকিব তাহা হয় না। বিস্তর চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও অনেক সময় বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। এ অবস্থায় আমরা

যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাই আমাদের কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন হইবে। সমস্ত জিনিষগুলির তালিকা প্রস্তুত করন আমার বিদ্যা বুদ্ধির বাহিরে, তবে মোটা-মুটি দুই চারিটির নাম করিতে পারি। তাহা হইতেছে (১) আহার (২) স্বাস্থ্য (৩) শিক্ষা (৪) ধন। জীবন হইতেছে সংগ্রাম বিশেষ। এ সব সরঞ্জামের বন্দোবস্ত না হইলে দেহ ও আত্মা একত্রে রাখা মানুষের সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। এখন ইহাদের সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলিতে চাই।

১। আহার। ইহার আবশ্যকীয়তা বুঝাইতে বেশী প্রয়াস পাইতে হয় না। জীবের প্রধান কাজ আহার অন্বেষণ। এ চেষ্টা তার সঙ্গের সাথী। জন্মাইবার পরক্ষণ হইতে আমরা আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, এবং জীবন ত্যাগের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাতে নিযুক্ত থাকি। এ আহার আমাদের প্রচুর আছে কি? প্রচুর থাকা ত দূরের কথা, দেশের কত লোককে যে অর্দ্ধাশন করিয়া থাকিতে হয় তাহার কোন হিসাব আছে কি? কয় জন পুরা আহার পায়? দুই এক কথা বলিলেই বিষয়টা সহজে বুঝা যাইতে পারে। উপর দিক হইতে দেখা যাউক। দেশের মধ্যবিত্ত ও গৃহস্থ যাঁহাদের বলি তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ? ইঁহাদের অধিকাংশরই মাসে ২৫।৩০ টাকার বেশী আয় নয়। ইঁহারা অনেকেই ভদ্র নামে আখ্যাত। ইঁহাদিগকে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হয়। ইঁহাদের অনেকেরই পোষ্যের সংখ্যা পাঁচ সাতটির কম নয়। ৩০ টাকায় পাঁচ ছয়টি লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে হইলে গড় পড়তা পড়ে ৬ টাকা কি ৫ টাকা। আজ কালকার কথা ছাড়িয়া দিই, সুজন্মার বৎসরেও এখন অনেক স্থানে মোটা চাউলের দর ৩৷৩৷৷০ টাকার কম নামে না। বামাবোধিনীতে স্থানাভাব, বেশী কথা বলিতে চাই না। পাঠক পাঠিকারা অবস্থাটা কি সঙ্কট একবার ভাবিয়া দেখুন। মধ্যবিত্ত লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার চাষাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালার চাষাদের অবস্থা বড় ভাল। প্রজাসত্ত্ব আইনের কল্যাণে এবং অন্য দুই এক কারণে ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার কৃষকদের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু মোটের উপর তাহা যে বিশেষ ভাল তাহা নয়। সম্পন্ন কৃষক যে, দেশে নাই এ কথা বলিতে চাই না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে চাই ইহাদের পরিমাণ কত? দেশের কয়জন চাষার অবস্থা স্বচ্ছল? কয়জন ঋণজালে জড়িত নয়? কয়জন নিজের বা পরিবারের কাহারও ব্যারাম হইলে ২।১০ টাকা খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে? যে বৎসর ফসল ভাল হয় ইহারা দিন কয়েক একটু স্বচ্ছলে কাটায় বটে, কিন্তু অজন্মা হইলে ইহাদের অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়া উঠে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

এখন একবার দেশের শিল্পজীবিদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ইংরাজেরা পর্য্যন্তও বলিতেছেন যে, বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় দেশের শিল্প এক প্রকার ধ্বংস পাইয়াছে, এবং শিল্পিশ্রেণী অগত্যোপায় হইয়া প্রায় সাধারণ শ্রমজীবীতে পরিণত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া কেহ যেন ভ্রমে পতিত না হন। কাপড়ের কথা ছাড়িয়া দিই, অনেক সামান্য লোহা ও পিতলের জিনিষ ও আজকাল বিদেশ হইতে আসিতেছে। একটা কথা বলিলেই সহজে অবস্থাটা বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে যখন সহর ও গণ্ডগ্রাম অঞ্চলে গন্ধকের দেশলাই চলিতে ছিল, তখন দেশের নিদান জনকয়েক লোক ও উহা তৈয়ারি করিয়া একরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখন বিদেশী দেশলাইএর আগমনে তাহাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পোড়ানর তেলটুকু পর্য্যন্ত আর দেশে হয় না; বিদেশ হইতে কেরোসিন আসিয়া তার স্থান অধিকার করিয়াছে। সুদূর পল্লিগ্রামে ও এখন পিতল কাঁসার বাসনের স্থানে অনেকটা বিদেশী এনামেলের বাসন প্রচলিত হইয়াছে। এ সব কি দেশীয় শিল্পজীবিদের অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক? যদি পুরাতন শিল্পের স্থানে নূতন শিল্প প্রচলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন তাহা হইয়াছে। এখন একবার সামান্য শ্রমজীবিদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। স্থানবিশেষে ইহাদের কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণত ইহারা প্রত্যেক রোজ ৩।৪ আনার বেশী কিছুতেই উপায় করিতে পারে না। যদি কাজের অভাব না হয়, এবং কখন কখন কাজে অপারগ না হয় তাহা হইলে ইহাদের প্রত্যেকের মাসিক আয় ৭৷৷০ টাকার বেশী হইতে পারে না। ইহাদের সকলেরই প্রায় দুই চারিটী করিয়া পোষ্য আছে। কোন কোন স্থানে ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ও ছোট ছেলেরা কাজ পাইলে কিছু কিছু উপার্জ্জন করে বটে; কিন্তু খুব কম স্থানেই এরূপ সুবিধা জুটে, এবং জুটিলেও সকল অবস্থায় তাহা উহারা গ্রহণ করিতে পারে না। ঐ সুবিধা হইলেও তাহা হইতে আর ৫।৭ টাকা উপায় না হয় হইল। তাহাতেও এক পরিবারের মোট আয় ১২।১৪ টাকার বেশী হয় না। যদি চার পাঁচটি প্রাণীর এই আয়ের উপর নির্ভর হয় তাহা হইলে প্রত্যেকের ভাগে মাসে পড়ে কত? বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই; ব্যাপারটা কিরূপ সঙ্গিন সহজেই উপলব্ধি হইবে। যদি কাহারও মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাঁহাকে তাঁর ঝি চাকরদের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখিতে পরামর্শ দিই। খাওয়া পরা ছাড়া মাসিক ৩।৪ টাকা মাহিনার অধিক তাহারা কেহ কি পাইয়া থাকে? উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থার

আভাস কতকটা পাওয়া যাইতে পারে।

আর এক কথা বলিবার আছে। আহার প্রচুর হইলেই হইল না। জীবন রক্ষার জন্য তাহা পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। কেহ যদি পেট ভরিয়া দুই বেলা ভাত ও তাহার উপর একটু লবণ ও ডাইল বা একটা তরকারী পাইল তাহা যে তার পক্ষে যথেষ্ট হইল ইহা মনে করা ভুল। মাংস আমাদের দেশে সেরূপ প্রচলিত নাই; এবং উহার আবশ্যকতা এখানে বেশী না হইতে পারে। দুধ ও মাছ আমাদের মধ্যে পুষ্টিকর আহার বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিজেদের কথা দূরে থাকুক দেশে কয়জন পিতা মাতা আছে যাহারা আজ কাল তাদের নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকেও উপযুক্ত পরিমাণে দুধ দিতে পারে? কিছু দিন পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে অনেক গৃহস্থের দুই একটি গাভী থাকিত, কিন্তু নানা কারণে আজ কাল এ প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। মাছের অবস্থা তথৈব। দেশে মাছ বিশেষরূপ কমিয়া গিয়াছে। কোন খানেই আর পূর্ব্বের ন্যায় মাছের জোগান নাই। পূর্ব্ববঙ্গ চিরকালই মৎস্যবহুল প্রদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সে অঞ্চলেও আজ কাল পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায় না। আমাদের উপযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না।

২। স্বাস্থ্য। দেশের মধ্যে ভাল স্বাস্থ্য কয় জনের আছে? একেত বাঙ্গলা দেশের জল বায়ু স্বভাবতঃই ভাল নয়, তাহার উপর আজ কাল খুব কম জেলাই আছে, যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই; জোর দুই পাঁচটি জেলার অবস্থা একটু ভাল বলিয়া মনে হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখুন কতগুলি সুস্থ ও সবলকায় বালক বালিকা দেখিতে পান। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সবলদেহ যুবক যুবতী দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন যে তাহা আর দেখা যায় না, তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। খুঁজিয়া দেখিলে এখন কয়খান গ্রামে ৭০।৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ নরনারী নয়নে পড়ে? যে দুই এক জন আছে তাঁহারা রোগে ও শোকে একরূপ জীবন্মৃত। আনন্দময় বৃদ্ধ-মুখ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে কত গ্রাম যে একেবারে উজাড় হইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। একটা পুরাতন নগরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় চারিদিকে নিরানন্দ-পূর্ণ; পোড়ো বাড়ীর সংখ্যা বড় বেশী। ওলাউঠা, বসন্ত এবং আজ কাল প্লেগেও মানুষ বেশ মরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনায় ইহারা সকলে একত্রে ও গণনার মধ্যে আসে না। সরকারী বিজ্ঞাপনী সব সময় ঠিক নয়, কিন্তু ইহা হইতেও বুঝা যায় ম্যালেরিয়ায় আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে। মফস্বল ছাড়িয়া যদি সহরের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে কোথাও কি আশাপ্রদ দৃশ্য চকে পড়ে? অধিকাংশ সহরেরই

স্বাস্থ্য খারাপ। বসতী বড় ঘন; পানীয় জল ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব সর্ব্বত্রই। দুই একটা সহরে কেবল কলের জলের ব্যবস্থা আছে। এই কথা শুনিয়া সহরবাসীরা যেন মনে না করেন যে, মফস্বলে জল কষ্ট নাই। যে সব স্থান নদীতীরস্থ সেখানে উহা অপেক্ষাকৃত কম বটে, কিন্তু আর সব স্থানে খুব বেশী। আর নদীও অনেক মজিয়া যাইতেছে। সহরাদির অবস্থা যদি ভালই হয় তাহাতেই বা বিশেষ আসে যায় কি? দেশের কয়জন লোক সহরে বাস করে? সহরে সুবিধার মধ্যে এই, রোগ হইলে চিকিৎসক মিলিতে পারে; মফস্বলে অনেক স্থানে মোটে মিলে না। ফল এই দাঁড়াইয়াছে—যাঁহারা সহরের ব্যয় বহন করিতে সক্ষম সুবিধা পাইলেই তাঁহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া যান। অধিকাংশ লোকে অবশ্য তাহা পারে না, তাঁদের "গয়া গঙ্গা গদাধর।"

(ক্রমশঃ)

অমলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অমলার যত্নে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অমিয় যেন রোষভরে কহিলেন, "বৌদিদি! তিনি কি নিষ্ঠুর! এত দিনের মধ্যে একটা সংবাদ দিতেও কি তাঁর এত কষ্ট বোধ হয়! তিনি সুখে থাকুন; আমি তাঁর সুখের কণ্টক হ'তে ইচ্ছা করি না।"

অমলা কহিলেন, "অমিয়! সম্ভবতঃ তিনি এমন কোন বিপদে পড়েছেন যে, পত্র লিখিবারও উপায় নাই। অকারণে তাঁকে দোষ দিও না।"

অমলার কথা অমিয়র মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। তাঁহার রোষ, অভিমান বিজলীর ন্যায়, বর্ষণোন্মুখ বারিদ-প্রতিম মুখমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল। অমিয় শিশুর ন্যায় রোদন করিয়া অধীরা হইলেন। অশ্রু তাঁহার গণ্ড ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া স্ফটিকসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মাণ হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পোপরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"বৌদিদি! তবে হয় তো আমারই জন্য তাঁর এই বিপদ উপস্থিত। আমি নিজেকে বিধবা জ্ঞানে এতদিন মাথায় সিন্দুরটী পর্য্যন্ত দিইনি, হাতের লৌহবলয় পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছি। এতেই হয় তো তাঁর বিপদ হয়েছে।"

অমিয়র আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুখে বাক্য উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। মুখে যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়া ছিলেন, নীরব অশ্রু ও দীর্ঘ নিশ্বাস তাহা বলিয়া দিল। আহা! অমিয়র এই রোষ, অভিমান ও অশ্রুর মধ্যে কত মাধুর্য্য! বিশুদ্ধ প্রেম যেথানে, ক্রোধ ও অভিমান সেই খানেই বর্ত্তমান। এই প্রেম ও ভালবাসার কথা ভাবিতে গেলে গৌরাঙ্গের ভগবানের উপর ক্রোধ ও অভিমানের কথা মনে পড়ে। অমিয়র ক্রোধ ও অভিমান রামপ্রসাদের "মা মা

বলে আর ডাকবনা" রই অনুরূপ। আবার নিমেষ মধ্যেই ধ্রুব ও শ্রীরাধার ব্যাকুলতা। ক্ষণকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর, অমলা কহিলেন,—"অমিয়! কাঁদিলে কি হবে বোন্! এখন শোক, দুঃখ সব চেপে রেখে সাহসের সহিত কার্য্য করতে হবে।"

অমিয়।" বৌদিদি! দাদা ও তিনি যে কোথায় আছেন সে কথা তো সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করা হলো না।"

অমলা। "এখনও আমাদের ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে, সেই জন্য এ কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন। তবে আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে এমন সাধুপুরুষের দর্শন লাভ হলো।"

অমিয়। দর্শন লাভেও তো বিশেষ কোন ফল হলো না।

অমলা। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আমাদের আশা পূর্ণ হবে। তবে আমাদি'কে অনেক কষ্ট ভোগও করতে হবে; কারণ, তা না হলে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

অমিয়। বৌদিদি! আমি তো কোন পাপ করিনি। তুমিও তো দেখতে বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করতাম, সময়ে কিছু আহার করতাম, আর মনে মনে সর্ব্বদা ভগবানকে নিজের দুঃখ জানাতাম। এতে কি এমন পাপ হলো যে ভগবান্ আমায় এত কষ্ট দেবেন। বৌদিদি! তুমি কি কোন পাপ করেছ?

অমলা। করেছি বৈকি; পাপ না করলে এত কষ্ট ভোগ করতে হবে কেন। শুধু যে এজন্মে পাপ করলে তার ফল ভোগ করতে হয়, তা নয়; পূর্ব্বজন্মে পাপ করলেও এ জন্মে তার দণ্ড ভোগ করতে হয়। নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে হয় তো কারো মনে খুব কষ্ট দিয়েছিলুম, আজ তারই ফল ভোগ হচ্ছে।

অমিয়। এ কথা ঠিক বটে, বৌদিদি! আমিও তাহলে পূর্ব্বজন্মে কারো মনে কষ্ট দিয়েছি, আজ তাই এত মনকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে। যা হবার তাতো হয়ে গেছে, এখন কি করবে বল। এখানেই থাকবে, না অন্য কোন খানে যাবে?

অমলা। আমি বলি কি, যে কোন উপায়ে হ'ক কালীঘাটে যেতে হবে। ছেলে বেলায় আমাদের যখন অসুখ হতো মা কালীদেবীকে মানসিক করতেন; তাতেই অনেক সময় আমাদের অসুখ সেরে যেতো। সেখানে গিয়ে বেশ করে দেবীকে মনের দুঃখ জানাব। তারপর যা হয় করা যাবে। বুঝতে তো পারছিস, ভগবান্ ভিন্ন তো আমাদের কোন উপায় নাই। তিনিই যা করবেন তাই হবে।

অমিয়। তা হলে, বৌদিদি! কাল সকালেই যাওয়া যাবে। এখন চল তবে নবদ্বীপেই থাকা যাক্।

যুক্তি স্থির হইল; উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন রজনী ঘোরা; সৈকতভূমি ঝিল্লিরবে পরিপূর্ণ; তাঁহারা সন্ন্যাসীর বাক্যে হৃদয়ে সহস্রগুণ বল পাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা—নবদ্বীপে যান ফিরি স্মরি জগদীশে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

নিবেদন পত্র।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা * * * বসু

মহাশয়া-সমীপেষু।

১

আমি আজ জানি দেবি, "নলিনী *"
কোথায়—
সেই যে রুচিরা মেয়ে
ললিতা ফুলের চেয়ে,
উষার সোণার ছটা আঁধার ধরায়!
আমি যে দেখেছি সেই,
দ্বাদশ বরষ এই,
তথাপি সে চাঁদ মুখ ভোলা নাহি যায়!

২

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
সরম সঙ্কোচ মাখা,
পল্লবে গোলাপ ঢাকা,
হাসিতে জোছনা ভাসে অমৃত কথায়!
যেন সে বিশ্বের রাণী,
রূপে লক্ষ্মী গুণে বাণী,
সে যেন এ মরু দেশে বারি-ধারা প্রায়!

৩

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
মা বাপের পুণ্য দিয়া,
তনুখানি নিরমিয়া,
স্বরগ সৌরভে মাখি চাঁদের আভায়,
তারে পাঠাইলা বিধি,
তাই সে অমূল্য নিধি,
তাই তার সম আর মিলে না হেথায়!
আমি জানি দেবি, সেই "নলিনী" কোথায়।

৪

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
মা বাপ যতন করে,
দিলা তারে যোগ্যবরে,
মিলাইলা হরগৌরী—মাণিক সোণায়!
সুখের প্রবাহ ছোটে,
আনন্দ ফেণায়ে ওঠে,
উল্লাস-তুফানে বুঝি বিশ্ব ডুবি যায়!

৫

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
হা সৌভাগ্য!—শুভাদৃষ্ট!
কেন তুমি এত মিষ্ট,
যদি হেন খেলা ভাঙ্গি যাহ পুনরায়;
কেন লোকে তোমা তরে,
আজন্ম তপস্যা করে,
নির্ম্মম তামাসা তুমি—জল-বিম্ব প্রায়!

* নলিনী—স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু মহাশয়ের স্বর্গবাসিনী জ্যেষ্ঠা কন্যা।

৬

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
এ যে কি শুনিনু কাণে,
বজ্র হানি তব প্রাণে,
ভাঙা বুক ভেঙে দিয়ে—বলিব কি হায়,
নলিনী গিয়াছে ঝরি!—
তা'কি হয়?—হরি! হরি!
সে মেয়ে কি পারে কভু কাঁদাইতে মা'য়?

৭

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
সে মেয়ে যে দেববালা,
করুণা মমতা ঢালা,
আপনার ভাই বোনে সে কভু কাঁদায়?—
সে যে পতিপ্রাণা সতী,
আকুল করিয়া পতি,
সোণার সংসার ফেলি, সে কভু পলায়?

৮

আমি জানি স্নেহময়ি, "নলিনী" কোথায়—
ভীষণ শ্মশান-মাঝে,
তার কি শয়ন সাজে,
গঙ্গা কি গিলিতে পারে কচি কমলায়?—
ননীর পুতলী সে তো,
অগ্নি কি নিঠুর এত,
তাহারে করিবে গ্রাস—রাক্ষসী ক্ষুধায়??

৯

তাহা নহে—স্নেহময়ি! নিবেদি তোমায়,
যে দেশ মরণহীন,
সুখময় চিরদিন,
রোগ শোক দুঃখ যথা পশিতে না পায়;
যথা মন্দাকিনী-জলে,
অমিয় লহরী চলে,
নন্দনে মন্দার ফোটে অনন্ত শোভায়;
নাহি পাপ নাহি তাপ;
নাহি দৈন্য, অভিশাপ,
বিষাদের অশ্রুকণা ঝরেনা যথায়;
পূরে সদা শুভ আশা,
স্বার্থহীন ভালবাসা,
আরাম অমৃত মাখা যথা সমুদায়,
সে দেশে পিতার কাছে,
নলিনী আনন্দে আছে,
দেব-কোলে দেব-বালা পরাণ জুড়ায়।

১০

দেবি! তব স্নেহরাশি "সঞ্জীবন" প্রায়,
সোণার নলিনী আজি সঞ্জীবিতা তায়;
দেখ তব কন্যারত্নে,
জগত রক্ষিছে যত্নে,
তার শুভ প্রীতি চিহ্ন মাখিয়াছে গা'য়;
তারি শোভা ফুলে ফুলে,
সাদরে রেখেছে তুলে,
তারি মধুরতা-মাখা প্রভাতের বা'য়;
চাঁদে মিশি চন্দ্রানন,
করে সুধা বিতরণ,
বিহগের কলকণ্ঠ তারি গীতি গায়;
সে নীল নয়ন দুটি,
ইন্দীবরে রহে ফুটি,
নদী সরোবর ভরা তারি স্নিগ্ধতায়;
মানবের সাধ আশা,
পূর্ণ তারি ভালবাসা,
উন্নতি মঙ্গল জাগে তারি মহিমায়;
এরূপে সে বহু বেশে,
বিরাজিছে মর দেশে,
অরূপে সে দেবী হয়ে আছে অমরায়,
আমি তারে নিত্য পূজি নীরব নিশায়।

আপনারই
শ্রীম—

চা-পান।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে চা ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চারল্‌সকে দুই পাউণ্ড চা উপঢৌকন দেন। সে সময়ে চার মূল্য ১৫৲ টাকা পাউণ্ড ছিল, ওঃরাজ-সভার বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই চা-পান করিতে সক্ষম ছিলেন। এখন সেই চা চারি আনা মূল্যের কমেও এক পাউণ্ড পাওয়া যায় এবং ইহা ইংলণ্ডে এত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে যে, সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বিষয়ে চিকিৎসকগণের বিশেষ শঙ্কা হইয়াছে।

ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিনের (Strand Magazine) অধ্যক্ষগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে ১১টী প্রশ্ন করেন। যে কয়েকটী প্রশ্ন করেন, তাহাদের মধ্যে 'চার' বিষয়ে একটী। প্রশ্নটী এই :—"আপনারা কি মনে করেন, এ দেশের লোকেরা অত্যধিক চা সেবন করে, এবং অপেক্ষাকৃত ভাল বা স্বল্পক্ষণ সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করা বিধেয় কিনা।"

সুবিখ্যাত ডাক্তার রবার্ট বেল, ডাঃ জন হ্যাডন, ডাঃ এনড্রু উইলসন (Dr. Robert Bell, Dr. John Hadden, Dr. Andrew Wilson) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিলাতে লোকে অত্যধিক পরিমাণে চা সেবন করিয়া থাকে। এই প্রথা ঘোর অনিষ্টকর। চার মধ্যে ট্যানিন (Tannin) নামক একটী পদার্থ আছে যাহা বিষম অহিতকর। চা তিন মিনিট মাত্র সিদ্ধ করিয়া পাতাগুলি ফেলিয়া দিলে উহার সুগন্ধি ও উত্তেজক শক্তিপ্রদ গুণগুলি রক্ষিত হয়। স্বল্প মাত্রায় চা সেবন করিলে অন্য আহারীয় সামগ্রীর পরিমাণ কম হইলেও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। চা যত ভাল হয় ততই ভাল।

ডাঃ সিব্‌লি (Dr. W. K. Sibley) বলেন যে, অধিক পরিমাণে চা সেবন করা অধিক মদ্যপানের ন্যায় দূষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও অশেষ ব্যাধির নিদান হইয়াছে।

Dr. Andrew wilson সাহেব বলেন যে, সর্ব্বদা চা পান করা বর্ত্তমান যুগের একটী পাপ ও এই পাপ সমাজে যতই ব্যাপ্ত হইতেছে ততই স্নায়বীয় উৎকট রোগ সকলের প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

যখন শীতপ্রধান ইংলণ্ডদেশে চা পান করিয়া লোকের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, তখন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে—যেখানে চিরকাল

নারিকেলোদকাদি শীতল পানীয় ব্যবহার্য্য—সেই দেশে তাহার স্থলে চা পানে যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। অধুনা আমাদের দেশে চা এত অধিক পরিমাণে ও দূষণীয় প্রণালীতে প্রচলিত হইতেছে যে, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে এখন হইতে বিশেষরূপে সতর্ক না হইলে পরিণামে বিষময় ফল অপরিহার্য্য। বহুদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসকের মতে উত্তম চা তিন মিনিট মাত্র সিদ্ধ করিয়া পান করাই ব্যবস্থা; অন্যথা চার যে সকল অপকারিতা, তাহা অলক্ষ্যভাবে শরীরে প্রবেশ করিবে ও ক্রমে পাকস্থলীকে বিকৃত করিবে। হাটে, ঘাটে, পথে, মাঠে, ধনীর অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যেরূপ কদর্য্য প্রণালীতে ও অতিরিক্ত মাত্রায় চা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার ভীষণ পরিণাম ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। আমাদিগের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা চা ভিন্ন আর কিছুই রুচিপূর্ব্বক আহার করেন না, এবং তাঁহাদের আহারের শক্তিও কমিয়া গিয়াছে। ক্রমাগত চা পান করিয়া তাঁহাদিগের পাকস্থলী প্রায় নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে সচরাচর দৃষ্ট হয়—একই পাকপাত্রে ক্রমাগত চা সিদ্ধ হইতেছে। পথিমধ্যে যাহারা চা ফিরি করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, তাহারা দিনে দুইবার মাত্র চা প্রস্তুত করে; এক বার প্রাতে ও এক বার বিকালে। প্রাতের প্রস্তুত চা বেলা ৬টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত থাকে; বিকালের চা বেলা চারিটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকে। সুতরাং তিন মিনিটের স্থলে ক্রমান্বয়ে তিন শত, সাড়ে তিন শত মিনিট চা সিদ্ধ হইতে থাকে। চা গরম রাখিবার কলসীর নিম্নে একটী জ্বলন্ত লোহার উনুন বসান থাকে। এক কলসী চাতে তিন পোয়া চিনি, ও এক পোয়া দুগ্ধ দেওয়া হয়। তীব্র করিবার জন্য আদা, মরীচ প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য দেওয়া হয়। এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব পাঁচন প্রস্তুত হয়, এবং তাহাই সাধারণ লোকে পান করিয়া থাকে।

একেত পিতল কাঁসা প্রভৃতি পাত্রে এ সকল দ্রব্য সিদ্ধ করিলে বিষাক্ত হয়, আবার একই পাত্রে (ধৌত না করিয়া) উপর্য্যুপরি সিদ্ধ করায় ঐ সকল পাত্র যে কিরূপ বিকৃত হয় তাহা বর্ণনাতীত। আবার যে সকল ব্যক্তির দ্বারা তাহা প্রস্তুত হয়, তাহারা প্রায়ই ইতরজাতীয় এবং তাহাদের দেহ ও পরিধেয় এরূপ অপরিষ্কৃত যে, দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঈদৃশ অশুচি ও ঘৃণিতভাবে পাক করা চা সেবন করিয়া কত শত লোক উৎকট রোগাক্রান্ত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে।

যেখানে তিন মিনিট মাত্র সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা, সেই স্থলে এই সকল ব্যবসায়ীরা পাঁচ ছয় ঘণ্টা (পাত্র পরিবর্ত্তন বা ধৌত না করিয়া) অবিচ্ছিন্নভাবে সিদ্ধ করিয়া

থাকে—কম পড়িলেই তদুপরি কেবল জল সেক হয়। নেশার কি মোহিনী শক্তি! লোকে কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া অহোরাত্র অম্লান বদনে এই বিষকে পরম হিতকর বোধে উদরস্থ করিয়া থাকে।

বাবুদের বৈটকখানাতেও চার ব্যবহার কম নয়। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে চা-পান করিবার লোভে অনেক প্রতিবাসীর সমাগম হয়। পল্লীর মধ্যে মধ্যে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকের বাটীতে দুই সন্ধ্যা (Tea Party) টিপার্টির অধিষ্ঠান হয়, ও গল্পের সহিত বারংবার চা-পান ও বিস্কুট ও পাঁউরুটির টোষ্ট ভোজন হয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকের পিয়ালা ভরিয়া চা পানেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না—তাঁহারা পিয়ালা ছাড়িয়া খোরা ধরিয়াছেন—ইহাঁদের বাটীতে হাট বাজারের কদর্য্য প্রণালীতে চা প্রস্তুত না হইলেও, সিদ্ধ করিবার সময়ের বিশেষ কোন নিয়ম থাকে না। অধিক্ষণ ধরিয়া চা সিদ্ধ করায় ও অধিক মাত্রায় চা সেবন করার যে সকল দোষ, সে গুলি শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়কেও অক্রমণ করিতেছে। ভরসা করি তাঁহারা ইংলণ্ডের সুচিকিৎসকগণের মতানুসারে ভবিষ্যতে চা ব্যবহার করিয়া দেশীয় সাধারণ জনমণ্ডলীকে সৎশিক্ষা দিবেন।

দেখিতে দেখিতে চা-পান রোগটী ম্যালেরিয়ার ন্যায় এ দেশের ইতর, ভদ্র, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। অধিক কি, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রাতে স্নান আহ্নিক পূজাদি ছাড়িয়া চা-পান ধরিয়াছেন। পিয়ালা, চামচে ও চা এই তিনটী, কোশা, কুশী ও গঙ্গোদকের স্থান অধিকার করিল! অধিকতর অনিষ্টের কথা, এই যে, —বয়স্ক ব্যক্তিরা চা-পান কালে আদর করিয়া অক্রবাগ শিশুগুলিকেও উহা পান করাইয়া থাকেন। ইহাতে শিশুদিগের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুরা জলখাবারের পয়সা লইয়া নিকটবর্ত্তী চা-পান-শালায় ছুটিতেছে। এক্ষণে কলিকাতার প্রায় প্রতি পল্লীতেই গরম গরম চা-পানের আড্ডা বসিয়াছে। বিবাহাদি উৎসবে, ক্রিয়াবাড়ীতে সর্ব্বাগ্রে চা-পানের সুব্যবস্থা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ত্রুটী হইলে তাহা গৃহস্থের পক্ষে ক্ষমাযোগ্য অপরাধ নহে। বাল্যকাল হইতেই যকৃতের পীড়া, মস্তিষ্ক রোগ প্রভৃতি উৎকট রোগের নিদান যে চা, চুরুট ও চুয়া প্রভৃতি অনিষ্টকর দ্রব্যের সেবন, ইহা আমরা বুঝিয়াও এ বিষয়ে অদ্যাপি উদাসীন আছি ইহাই আশ্চর্য্য? প্রায়ই দেখিতে পাই, শিশুরা পিতামাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নানাছলে পয়সা আদায় করে। তাহার সেই পয়সা লইয়া কি করে, সে বিষয়ে অতি অল্প কর্ত্তৃপক্ষেরই দৃষ্টি থাকে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? শুধু বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জনেই স্বদেশী ব্রত নহে, যাহাতে দেশের বালকবালিকাগণের দেহ ও মন সুস্থ ও

সমুন্নত হয়, শারীরিক ও মানসিক অনিয়ম ও অত্যাচার তিরোহিত হয়, ব্যসন ও বিলাসিতা, অপব্যয় ও অনুচিতা প্রতি পরিবার হইতে অদৃশ্য হয়, এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত স্বদেশী ব্রত।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

সীতা।

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে যে সীতা-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা, সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার হিন্দুরমণীর জীবনের অতি উচ্চ আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্রের আদর্শ পিতৃভক্তি, অনুগত-বাৎসল্য ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, সীতাতে আদর্শ পতিপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নে সৌভ্রাত্র এবং পবননন্দন হনুমানে আদর্শ প্রভুপরায়ণতা প্রভৃতির উজ্জ্বল হৃদয়গ্রাহী চিত্র মানবসমাজের চারিত্র-শিক্ষার অক্ষয় ও অমৃতময় আদর্শ। প্রত্যেক হিন্দুপরিবারের পুরুষ ও স্ত্রী, বালক ও বালিকা রামায়ণের এই চরিতাবলি আদর ও ভক্তির সহিত আপনাদিগের আদর্শ-রূপে হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। অতি শৈশব কাল হইতে হিন্দু বালিকা "সীতার মত সতী হই" "রামের মত স্বামী পাই," "লক্ষ্মণের মত দেবর পাই" এইরূপ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করে। বস্তুতঃ যতদিন এইরূপ চরিত্র হিন্দু গৃহের আদর্শ হইয়া থাকিবে ততদিন হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম-সমাজ ও হিন্দু গৃহ ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাবতীয় সুসভ্যদেশে আদৃত হইবে।

মহাকবি সীতাচরিত্রে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট গুণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে পতিভক্তি ও সহিষ্ণুতা সর্ব্বপ্রধান। সীতাতে এই দুই গুণের যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখা যায় আর কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। আধুনিক নাটকাদিতে পতির প্রতি পত্নীর অনুরাগের যে সাময়িক উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয় সীতাতে ঠিক তাহা না থাকিলেও সীতাচরিত্র হিন্দুরমণীর জীবন গঠনে যাহা করিয়াছে ও করিতেছে আর কিছুতে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম যখন চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস স্বীকারোদ্যত হইয়া বনগমনের উদ্যোগ করিলেন, সীতাও তাঁহার অনুগামিনী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কি গুরুজন, কি সমবয়স্ক, সকলেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম নিজেও তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর পতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। এতাধিক দীর্ঘকাল পতির অদর্শন অপেক্ষা পতির সহিত অরণ্যবাস তাঁহার শ্রেয় বোধ হইল। পতি বনবাসের কষ্টভোগ করিবেন, আর তিনি রাজপ্রাসাদে রাজ-

ভোগে সুখে অবস্থিতি করিবেন, পতিব্রতা স্বাধ্বীর প্রাণ ইহা অনুমোদন করিতে পারিল না। কোন অনুরোধে ও কোন নিষেধে তিনি তাঁহার সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি জটাধারণ ও বল্কল পরিধান করিয়া পতির সহিত বনবাসিনী হইয়া আপনাকে পরম সুখী ও সৌভাগ্য-বতী মনে করিলেন। পতিসহবাসে বনগমন ও বনবাসের কষ্ট তাঁহার পক্ষে সুখের কারণরূপে পরিণত হইল। রাক্ষস ও হিংস্রজন্তুপূর্ণ এবং নানা বিপদসঙ্কুল দুরারণ্য মধ্যে বাস করিয়াও পতিসহ-বাসে তিনি পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এমন কি যখন রাবণ ছদ্মবেশে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, অপরিচিত স্থানে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে কত নিগ্রহ, কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তথাপি বনবাসে পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও অনুতপ্তা হন নাই।

সীতা চরিত্রের অপর আদর্শগুণ সহিষ্ণুতা। ইহা দ্বারা তাঁহার পতিপরায়ণতা উদ্ভাসিত হইয়াছে। একদিকে যেমন তাঁহার আদর্শ পতিভক্তি অপর দিকে তেমনি তাঁহার আদর্শ সহিষ্ণুতা। কেবল যে, সীতা অম্লান বদনে বনবাসের কষ্ট ও লঙ্কায় রাক্ষসগৃহে বাসের কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাহা নহে, তাঁহার সমগ্র জীবনই সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লঙ্কায় রাক্ষসগৃহে তাঁহাকে একাকিনী বাস করিতে হইয়াছিল, এই জন্য রাবণবধের পর যখন তাঁহার উদ্ধার সাধন হয় তখন রাম তাঁহাকে লোকাপবাদ হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি পরীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। রাম তাঁহার চরিত্র ও পতিপরায়ণতায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াও তাঁহার এই কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন, এই মনে করিয়া সীতা ক্ষুব্ধা ও ব্যথিতা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রামের মর্য্যাদা রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্য তিনি কখন রামকে অনুযোগ করেন নাই। যে রাম তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব, যাঁহার জন্য তিনি সমস্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া বনচারিণী হইলেন, যাঁহার জন্য তাঁহার রাক্ষসগৃহে বাস, সেই রামই তাঁহাকে এইরূপে লাঞ্ছিত করিলেন, সীতা তাহাও সহ্য করিলেন। আবার যখন রাম অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন প্রজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাবণ গৃহে একাকিনী বাস করিবার জন্য সীতার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হয়। তাহাতে রাম স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পাছে ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায়, তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়াও গর্ভাবস্থাতেই তাঁহাকে জন্মের মত বনবাস দিলেন। অভাগিনী সীতা তাহাও সহ্য করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে যে কি দারুণ ক্লেশ হইয়াছিল তাহা অনুভব করাযাইতে পারে কিন্তু বাক্যে বলিয়া বা লেখনী দ্বারা লিখিয়া

প্রকাশ করা যায় না। তবুও তিনি কখনও ইহার জন্য রামের নিন্দা বা গ্লানি করেন নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন রামের ধ্যান, রামের কল্যাণ কামনায় ও রামের গুণকীর্ত্তনে তিনি পরমানন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার এই বনবাস ও তাহার প্রতি রামের এতাধিক নির্দ্দয় আচরণের জন্য কেবল আপনার দুরাদৃষ্টের দোষারোপ করিতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পতিভক্তি কখনও ম্লান হয় নাই। হৃদয়পটে পতিপরায়ণতার উজ্জ্বল চিত্র লইয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় হন। মহাকবি সীতা-চরিত্রে যে অলৌকিক সহিষ্ণুতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও হিন্দু নারীকুলের অত্যুচ্চ আদর্শ। রাজনন্দিনী ও রাজবধু হইয়া সীতা অকাতরে রাজপ্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া পর্ণকুটীরবাসিনী হইলেন। রাজবসন ভূষণ ছাড়িয়া বল্কলধারিণী হইয়া রাজভোগের পরিবর্ত্তে ফলমূলহারিণী হইলেন; কণ্টকাকীর্ণ বনে পতিসহচারিণী হইয়া, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেন; রাক্ষসপরিবেষ্টিত হইয়া অশোক বনে কত নিগ্রহ ও কত লাঞ্ছনা সহ্য করিলেন, তথাপি তাঁহার পতিভক্তি ও সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ রহিল, কিছুতেই তাহার তিল মাত্র ব্যত্যয় হইল না। যে পতির সহচারিণী হইবার জন্য তিনি সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিলেন, যে পতি তাঁহার জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ছিলেন, যে পতির পদসেবা তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পতি তাঁহাকে বিনা দোষে অসহায় অবস্থায় বনবাস দিয়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন। তথাপি সীতার সহিষ্ণুহৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি বাল্মিকির তপোবনে আশ্রয় লইয়া প্রসন্নচিত্তে পুত্রদ্বয়ের লালন পালন ও শিক্ষা দানে রত হইয়া চরিত্রের মাধুর্য্যে ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠায় সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতার আদর্শে হিন্দুগৃহের কত জননী, কত ভার্য্যা, কত কন্যা, কত আত্মীয়া, এই দুঃখময় সংসারকে সুখময় স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন ও করিতেছেন।

মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তের পরলোক গমনে *।

আমাদের দেশের পুরুষসিংহ, স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশ ও বিদেশে শত শত অক্ষয় কীর্ত্তি আজ তাঁহার অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও তিনি যে আমাদের দেশের কি প্রকার উচ্চ আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন, আজ তাহারই

* মজিলপুর জয়নগর হিতৈষিণী-সভায় ১৩১৪ সাল ১৫ ভাদ্র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক পঠিত।

সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার আমার ইচ্ছা আছে। পুণ্যশ্লোক উমেশচন্দ্র যে আমাদের দেশের কিরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহা ভাষা দ্বারা কিম্বা বক্তৃতা করিয়া প্রকাশ করা যায় না; এবং সেই অসামান্য প্রতিভাশালী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বর্গগত উমেশচন্দ্রের অতুলনীয় গুণরাশি বর্ণনা করা কোন ক্রমেই আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে। প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি ভিন্ন বোধ হয় কেহই সেই নির্ম্মল, নিষ্কাম এবং সংসার জীবনের উচ্চতম আদর্শ ব্যক্তিকে বুঝিতে পারিবেন না।

আমার প্রথম কথা—এই যে, হিতৈষিণী সভা, যাহার নাম বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব এক সময়ে ছিল বলিয়া কেহই ধারণা করিতে পারিতেন না, সেই বিলুপ্তপ্রায় হিতৈষিণী সভাকে উমেশচন্দ্র নিজের অদম্য উৎসাহে, অযাচিত পরিশ্রমে, এবং অকৃত্রিম স্বদেশভক্তির গুণে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেশের ও দশের সমক্ষে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এবং সেই হিতৈষিণী সভা হইতে বিগত ১৩১৩ সালের চৈত্র মাসে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বার্দ্ধক্য ও রুগ্ন অবস্থাকে তুচ্ছ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক, যে স্বদেশী কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া আমাদিগকে ও আমাদের জন্মভূমিকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহার সে অক্ষয়কীর্ত্তি মজিলপুরের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যাহা কোনও দেশের পল্লী সভা সমিতিতে কখনও হয় নাই, উমেশচন্দ্র অসাধ্য সাধন করিয়া আমাদের দেশে তাহাই করিয়া গিয়াছেন। ইহা কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে?

আমার দ্বিতীয় কথা—যখন দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া, দেশের অনাথ ও দীনহীনগণ প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, অন্নাভাবে যখন তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ, তাহা দেখিয়া আমাদের স্বদেশপ্রাণ, পরদুঃখকাতর উমেশচন্দ্রের সরল প্রাণে শেলসম বাজিয়াছিল, তাই তিনি অযাচিত এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ বিদেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত মৃতকল্প ব্যক্তির জন্য অন্নসংস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে এই হিতৈষিণী সভা হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন শত অনাথ ব্যক্তি আহার পাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত বোধ হয় মজিলপুরের জীবনে কখন ঘটে নাই, এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু আজ আমরা সেই জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষকে জন্মের মত হারাইয়াছি। আজ হিতৈষিণী সভার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। আজ হিতৈষিণী সভার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; আজ আমাদের বড়ই শোকের দিন? যে অমূল্য রত্ন মজিলপুরের ক্রোড় হইতে চিরবিসর্জ্জিত

হইয়াছে, বোধ হয় শত সহস্র বর্ষ আমাদের অসাধ্য সাধনাতেও আর তাহা মিলিবে না। আর উমেশচন্দ্রের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশভক্তকে আমরা পাইব না। তাই আমি বলিতেছিলাম উমেশচন্দ্র যে আমাদের দেশের কিরূপ হিতৈষী ছিলেন তাহা ভাষায় কিম্বা বক্তৃতায় প্রকাশ করা যায় না।

তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা বুঝিতে পারি নাই, বা বুঝিবার চেষ্টাও করি নাই, যে, তিনি আমাদের মধ্যে কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতেন, তাই আজ তাঁহাকে হারাইয়া পদে পদে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। কিন্তু এই অভাবকে আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে; এই অভাবের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সকলকেই সেই মৃত মহাত্মার অসমাপ্ত প্রত্যেক কার্য্যের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা একপ্রকার সেই মহাপুরুষের বাক্যের প্রতিধ্বনি মাত্র।

আমরা এই শোকসভায় সম্মিলিত হইবার বহুপূর্ব্বে যে দিন বারাশতে ২৪ পরগণায় (District Conference) বা জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশন দিবসে পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য যখন সেই সমিতির অসংখ্য সভ্য ও দর্শকবৃন্দ অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই সময় এই হতভাগ্য দেশের সর্ব্বজন সম্মানিত প্রিয়তম পুত্র পরলোকগত উমেশচন্দ্রের নাম সেই মহাসভাতে উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু হে আদর্শ-চরিত্র মহাপুরুষ! হে সংসার-আশ্রমে মহাযোগী! আমরা সেরূপ কল্পিত শোক দ্বারা বাহ্য জগৎকে মুগ্ধ করিবার বাসনা করি নাই। তোমার মহাপ্রস্থানে আমাদের জীবন যেরূপ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—হৃদয়ে যেরূপ ভীষণ শোকের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ভাষাদ্বারা কিম্বা কল্পনা করিয়া ব্যক্ত করা এখন পর্য্যন্তও আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। গভীর শোকার্ত্ত ব্যক্তি যেমন দরবিগলিত-নেত্রে কেবল অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না, আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। কিন্তু হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশনায়ক! হে পুণ্য-প্রাণ স্বদেশভক্ত! আমরা অকৃতজ্ঞ হইলেও তোমাকে ভুলিব না। যে মহান্ আদর্শের সমুজ্জ্বল-রেখা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছ—নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের প্রতি যে ভালবাসা দেখাইয়া গিয়াছ, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। তোমার গুণরাশি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে জলন্ত অক্ষরে খোদিত থাকিবে। শোকসভা করিয়া আমরা তোমার প্রতি কতটুকু সম্মান দেখাইতে পারিব? তুমি আমাদের হৃদয়ের বস্তু, তুমি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তোমার প্রদত্ত মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি আমরা তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে

পারি, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব এবং তাহা হইলেই তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং তাহা হইলেই আমরা তোমার শুভাশীষ লাভে সমর্থ হইব।

জীবনের শেষ সীমায় জরাজীর্ণ অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও উমেশচন্দ্র দেশের ও দশের জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, আমরা সবল ও সুস্থ দেহে তাহার এক কণা মাত্রও করিতে পারিতেছি না—কিম্বা সেরূপ করিবার আশাও আমাদিগের মধ্যে নাই। এই হিতৈষিণী সভার প্রথম উত্থানের সূত্র-পাতেই আমরা যেরূপ গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না ইহার সীমা এই পর্য্যন্ত শেষ কি না। এই সভা সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগেই এখন আমাদের অভাব, একটীও এখন সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই, এই সময় যদি আমরা সকলে সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ না হই, যাহার যতটুকু পরিমাণ সামর্থ্য আছে তাহা যদি ইহার জন্য যোজিত না করি, যদি প্রথম বিকসিত অবস্থাতেই আমাদের জীবন-প্রিয় জন্মভূমির হিতৈষিণী সভা পুনরায় বিশুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর জনসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেওয়াই ভাল। এক মাত্র সেই জ্ঞানবৃদ্ধের অভাবে যদি আমরা সকলে সমবেত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে তাঁহার কর্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমাদের কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিতৈষিণী সভাকে যদি আমরা পুনরায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারি, তাহা হইলে স্বর্গ হইতে তিনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এ কথা স্থির এবং নিশ্চয়।

যাও কর্ম্মবীর! মনুষ্যলোকে তোমার কার্য্যের শেষ হইয়াছে, তাই তুমি অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছ, যাও ধর্ম্মপ্রাণ মহা-ভাগ! তোমার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত। যথায় স্বদেশসেবী মহাত্মাদিগের জন্য পবিত্র আশ্রম নির্ম্মিত আছে, তুমি অনন্ত অনন্ত কাল সেই পুণ্যময় ধামে বাস কর। তোমার বামাবোধিনী তোমার বিজয়স্তম্ভ। যতদিন দেশে বঙ্গসাহিত্যের সমাদর থাকিবে, ততদিন তুমি অমর হইয়া প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গনরনারীর হৃদয়ে স্থান পাইবে। তোমার স্মৃতি আমরা কি দিয়া রক্ষা করিব? আমাদের কিছুই সম্বল নাই। তোমার কীর্ত্তি তুমিই অর্জ্জন করিয়া গিয়াছ। দেশ বিদেশে তোমার যে সমস্ত মহত্ত্বের চিহ্ন আছে, তাহাই চির-কাল তোমার অমরত্ব ঘোষণা করিবে। যাও দেব! তুমি স্বর্গের বস্তু, স্বর্গে যাও, যদি কখনও আমাদিগের পথভ্রান্তি ঘটে, তুমি স্বর্গ হইতে স্নেহনেত্রে আমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দিও।

শ্বেতকেতুর উপাখ্যান।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে গৃহীত)

শ্বেতকেতু নামে এক ঋষিকুমার ছিল। তাহাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রেরণ করিলেন। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ হইতে চতুর্ব্বিংশবর্ষ পর্য্যন্ত গুরুর নিকট সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যামদে অভিমানী, বেদজ্ঞ অহঙ্কৃতস্বভাব হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পিতা তাহার স্বভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, কেবল বেদার্থজ্ঞান মাত্র সার হইয়াছে। তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু! দেখিতেছি তোমার বড় পাণ্ডিত্যাভিমান হইয়াছে এবং তুমি বড় অহঙ্কৃতস্বভাব হইয়াছ, বল দেখি তুমি সেই তত্ত্ব কিছু জানিয়াছ কিনা, যদ্দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, মননের অবিষয় বস্তু মননের বিষয় হয়; অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়। তোমার গুরু এবিষয় তোমাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন?

শ্বেতকেতু উত্তর দিল, ভগবন্! সে বিষয় কি?

পিতা বলিলেন, শ্রবণ কর। সৌম্য! যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বিশিষ্ট মৃণ্ময় বস্তু সকল স্বরূপতঃ কেবল মৃত্তিকা মাত্র, যেমন একখণ্ড সুবর্ণ জানিলে সুবর্ণ নির্ম্মিত সমস্ত পদার্থই জানা হইল, সকলই নাম রূপ ভেদ মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ সকলই সুবর্ণ; যেমন একটী নখনিকৃন্তন (নরুন) অথবা লৌহপিণ্ড জানিলে লৌহনির্ম্মিত সমস্ত বস্তুই জানা যায়, সকলই নামরূপ ভেদ মাত্র, স্বরূপতঃ সকলই লৌহ; যে তত্ত্বের বিষয় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহাও সেইরূপ।

শ্বেতকেতু বলিল, আমার গুরু এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই জ্ঞাত নহেন, নতুবা আমাকে তদ্বিষয়ে অবশ্যই শিক্ষা দিতেন। ভগবন্! আপনি আমাকে তাহা বলুন। পিতা বলিলেন, সৌম্য! শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে এই জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় সত্য পুরুষ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় অসত্য ছিল এবং সেই অসত্য হইতে অর্থাৎ অসদবস্থা হইতে এই সদবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু হে সৌম্য! তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অসত্য হইতে সত্য কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? হে সৌম্য! পূর্ব্বে কেবল এক সত্য ছিলেন, দ্বিতীয় বস্তু ছিল না।

এই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সকলের প্রাণ, ইনি সত্য, ইনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা হইতে।

শ্বেত। হে ভগবন্! আমাকে আরও বিস্তারিতরূপে উপদেশ করুন।

পিতা। শ্রবণ কর। যেমন মধুকর মধুক্রম করিবার জন্য নানা স্থানের নানা বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করত তাহাদিগকে এক

মধু আকার প্রদান করে; ঐ রসসকল জানেনা যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের রস। সেইরূপ প্রাণী সকল মৃত্যুর পর যখন সত্যকে প্রাপ্ত হয় তখন তাহারা জানেনা যে তাহারা ব্যাঘ্র ছিল, কি সিংহ ছিল, কি বৃক ছিল, কি বরাহ ছিল, কি কীট ছিল, কি পতঙ্গ ছিল, কি দংশ ছিল, কি মশক ছিল।

সেই যে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি সকলের আত্মা তিনি সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা হইতে।

শ্বেত। ভগবন্! আরও আমায় উপদেশ করুন।

পিতা। শ্রবণ কর।

হে সৌম্য! এই সমস্ত নদী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হয় এবং যে সমুদ্র হইতে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছিল সেই সমুদ্রই হইয়া যায়; এবং তখন আর ইহা আমি ইহা আমি এরূপ জ্ঞান থাকে না।

সেইরূপ এই সমস্ত প্রজা সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়া জানে না যে সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা জানে না যে আমি ব্যাঘ্র, আমি সিংহ, আমি বৃক, আমি বরাহ, আমি কীট, আমি পতঙ্গ, আমি দংশ আমি মশক।

সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা সকলের আত্মা তাহাই সত্য, তাহা সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। ভগবন্ পুনর্ব্বার আমাকে উপদেশ করুন।

পিতা। সৌম্য! শ্রবণ কর। হে সৌম্য! ঐ মহাবৃক্ষের মূলে যদি কেহ আঘাত করে তাহা হইতে রস স্রবণ হয়, উহার মধ্য দেশে আঘাত করিলে তাহা হইতে রস স্রবণ হয়, উহার উপরিস্থ শাখাতে আঘাত করিলেও রস স্রবণ হয়। উহার সর্ব্বাঙ্গে জীবন আছে বলিয়া পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু যখন উহার একটী শাখা হইতে জীবন চলিয়া যায় ঐ শাখা শুষ্ক হয়, দ্বিতীয় শাখা হইতে জীবন চলিয়া গেলে তাহা শুষ্ক হয়। যখন সমস্ত বৃক্ষ হইতে জীবন চলিয়া যায়, সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হয়।

সেইরূপ জানিবে,—যখন জীবন এই শরীরকে পরিত্যাগ করে, তখন এই শরীর মৃত হয়, কিন্তু সেই জীবন কখন নষ্ট হয় না। সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা এই শরীরের আত্মা তাহাই সত্য, তাহা সকলের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। ভগবন্ আমাকে আরও উপদেশ করুন।

পিতা। সৌম্য! শ্রবণ কর।

ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ফল আনয়ন কর। শ্বেত। "এই আনিয়াছি।" পিতা। "উহাকে ভগ্ন কর।" শ্বেত। "করিয়াছি।"

পিতা। "উহার মধ্যে কি দেখিতেছ"। শ্বেত। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখিতেছি।" পিতা। উহার একটী বীজকে ভগ্ন কর। শ্বেত। ভগ্ন করিয়াছি। পিতা। কি দেখিতেছ? শ্বেত। ভগবন্! কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

পিতা। সৌম্য! তুমি কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু উহার মধ্যে অদৃষ্টভাব একটী মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে।

হে সৌম্য! অনুধাবন কর, সেই সূক্ষ্মবস্তু যিনি সকলের আত্মা তিনিই সত্য, তিনি সর্ব্বাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। ভগবন্! সেই সত্য হইতে উৎপন্ন এই জগৎ নিত্য হয় না কেন? আমাকে উপদেশ করুন। পিতা। সৌম্য! শ্রবণ কর।

এই লবণ এই জলে প্রক্ষেপ কর এবং কল্য প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও আমি তোমাকে উপদেশ করিব। শ্বেতকেতু পাত্রস্থিত জলে লবণ নিক্ষেপ করিয়া শয়ন করিতে গেল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত পিতৃসমীপে সমুপস্থিত হইলে পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্য এই জলে যে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা কোথায় দেখিতে পাইতেছ? লবণ জলে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে সুতরাং শ্বেতকেতু তাহা দেখিতে পাইল না। তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, ঐ জলের উপর হইতে একবিন্দু লইয়া আস্বাদন কর। শ্বেতকেতু আস্বাদন করিল তদনন্তর তাহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, জলের কিরূপ স্বাদ? শ্বেতকেতু উত্তর করিল লবণাক্ত। মধ্য হইতে এক বিন্দু জল লইয়া আস্বাদ কর। শ্বেতকেতু তাহা করিলে পর পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কিরূপ আস্বাদ? শ্বেতকেতু বলিল—লবণাক্ত। তদনন্তর নিম্ন হইতে একবিন্দু জল আস্বাদন করিতে বলিলেন; শ্বেতকেতু তাহা করিল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল এ জলও লবণাক্ত। তদনন্তর তাহার পিতা ঐ জল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুমি মুখপ্রক্ষালন করিয়া আইস। শ্বেতকেতু প্রত্যাগমন করিয়া তাহার পিতাকে বলিলেন, আমি ঐ জলে যে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহা আছে। যদিও আমি তাহা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছি না, রসনা দ্বারা অনুভব করিলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা তাহাকে বলিলেন, সত্য সম্বন্ধেও এইরূপ নিশ্চয় জানিবে। যদিও তাহা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু উহা আমাদের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

হে সৌম্য! সেই সূক্ষ্মবস্তু যাহা সকলের আত্মা তাহাই সত্য তাহা সর্ব্বাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেতকেতু বলিল—জলমিশ্রিত লবণ যেমন অদৃষ্ট হইয়াও রসনা কর্ত্তৃক অনুভূত হইল, সেইরূপ এই আত্মা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর না হইয়াও মন দ্বারা কিরূপে উপলব্ধ হন? ইহা না জানিয়া আমি অসুখী আছি এবং জানিলে সুখী হইব, অতএব ইহা জানিবার উপায় আমাকে বলিয়া দিন। পিতা বলিলেন—শ্রবণ কর।

হে সৌম্য! যেমন কোন ব্যক্তিকে গান্ধার দেশ হইতে বদ্ধাক্ষ করিয়া কোন দূরস্থ বিজন স্থানে লইয়া ছাড়িয়া দিলে সে পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত আমাকে বদ্ধাক্ষ করিয়া আনিয়া একাকী রাখিয়া গিয়াছ বলিয়া রোদন করিতে থাকে, এবং কোন দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন করিয়া গান্ধারের পথ দেখাইয়া দিলে সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পরিশেষে গান্ধার দেশে উপনীত হয়, তদ্রূপ উপযুক্ত আচার্য্যবান, ব্যক্তি স্বীয় পথ অবগত হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে।

হে সৌম্য! সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা সকলের আত্মা, তাহাই সত্য তাহাই সর্ব্বাত্মা হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা। শ্বেত। হে ভগবন্! কিরূপে সেই মোক্ষ লাভ হয়, আমাকে আরও দৃষ্টান্ত দিয়া উপদেশ করুন। পিতা। হে সৌম্য! শ্রবণ কর।

যেমন কোন ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন হইলে যখন তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করে—আমাকে চিনিতে পার? আমাকে চিনিতে পার? যতক্ষণ না তাহার বাক্য মনেতে, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে এবং তেজ পরম দেবতাতে সম্পদ্যমান হয়, ততক্ষণ সে সকলকে চিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পর আর পারে না।

সেই সূক্ষ্ম বস্তু যাহা সকলের আত্মা, তাহা সত্য, তাহা সকলের আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

শ্বেত। হে ভগবন্! অজ্ঞান ব্যক্তি কেন সংসারগতিকে প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞ মুক্তিলাভ করে, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে উপদেশ করুন; যদিও উভয়েই সত্যকে লাভ করে এরূপ বোধ হয়। পিতা। সৌম্য! বলিতেছি শ্রবণ কর।

যখন কোন চৌর্য্যাপরাধী ব্যক্তি বদ্ধহস্তে আনীত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যদি সে অস্বীকার করে এবং বিচারপতি তপ্তলৌহ দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করিবার আদেশ করেন, সে যদি অসত্য দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, সেই অসত্যাশ্রয়ী আপনার আত্মাকে অসত্যে আবৃত করায় সেই তপ্তলৌহ তাহাকে দগ্ধ করে, কিন্তু সে যদি চৌর না হয় এবং সত্যদ্বারা আপনাকে রক্ষা করে, সেই সত্যাশ্রয়ী দগ্ধ হয় না এবং তখন বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

সেইরূপ সত্য সত্যবানের আত্মাকে রক্ষা করে। সকলই সেই সত্যাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও তাহা।

খুল্লনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঘোর বিপন্ন অবস্থায় সদাগর সিংহলের কালীদহ নামক দহে উপস্থিত হইয়া যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিলেন তাহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূলীভূত হইল। দেবী ভগবতী

সদাগরকে ছলনা করিবার জন্য এই দৃশ্য রচনা করিয়াছিলেন। সদাগর দেখিলেন অনন্ত নীলাম্বুরাশি। তাহাতে শ্বেত পীত লোহিতাদি নানা বর্ণের কমল বিকশিত। মধ্যে হংস হংসীর সহিত কেলী করিয়া বেড়াইতেছে। সেই কমলবন মধ্যে এক অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী কামিনী কুঞ্জর কোলে লইয়া এক এক বার তাহাকে গিলিয়া ফেলিতেছেন, আবার তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্গীর্ণ করিতেছেন। এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া ধনপতি হতবুদ্ধি প্রায় ও স্তম্ভিত হইলেন। নাবিকগণকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের কেহ কিছুই দেখিতে না পাইয়া সাক্ষী হইতে স্বীকার করিল না। সদাগরের একান্ত ইচ্ছা তিনি সিংহলের রাজার নিকট কমলে কামিনী দর্শনের বিষয় বিবৃত করেন। নাবিকগণ স্বীকার করিল না। তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। ক্রমে সদাগরের মধুকর নামক জাহাজ সিংহলের রত্নমালার ঘাটে উপনীত হইল। সেকালের রীতি অনুসারে ঘাটে দগড়া দামামা থাকিত, কুলে উঠিয়া সদাগর দামামা ধ্বনি করিলেন। হঠাৎ এই শব্দে সভাসদ্ সহিত সিংহলেশ্বর রাজা শালবান্ চমকিত হইয়া কোটালকে উঠিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, "কে কোথা হইতে কখন আইসে তাহার সংবাদ রাখিস্ না—শীঘ্র গিয়া দেখিয়া আয়।"

—কোটাল—রত্নমালার—ঘাটে—আসিয়া সদাগরকে দেখিয়া অকস্মাৎ তিনি কেন দামামা ধ্বনি করিলেন জিজ্ঞাসায় সদাগর কেবলমাত্র বলিলেন, বাণিজ্যার্থ তাঁহার আগমন। বাণিজ্য করিয়া চলিয়া যাইবেন।

কোটাল তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিল—যদি দেশে চোর ডাকাইত আইসে আমি তজ্জন্য দায়ী, অতএব তুমি যে আসিয়াছ তুমি সাধু কি চোর কেমনে জানিব? আমার দায়িত্বের জন্য আমার পঞ্চাশ কাহন কড়ি প্রাপ্য তাহা দিতে হইবে।

ধনপতি সহজে ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন, তিনি কুলে উঠিয়া রাজ দরবারে যাত্রা করিলেন। তথায় রাজার দ্বারা সংকৃত হইয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে কথা প্রসঙ্গে কমলে কামিনী দর্শনের কথা তুলিলেন, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য রাজার কৌতূহল জন্মিল—কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব—সভাস্থ সকলে সদাগরকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিলে সদাগর বলিলেন—"যদি সত্য না হয়, আমার ধনসম্পত্তি হারিব আর দ্বাদশ বৎসর কারাবদ্ধ থাকিব।

রাজাও প্রতিজ্ঞা করিলেন, সত্য হইলে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিবেন। উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিত হইল। সকলেই সভা ত্যাগ করিয়া কালীদহে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার মায়ায় এই বিশ্বসংসার চলিতেছে,—পরকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে আমার পুত্র, আমার কন্যা বলিয়া মানব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া আছে—

সংসারের মোহ গর্ত্ত হইতে উঠিতে পারিতেছে না। মহামায়ার ছলনা কালীদহে কমলে কামিনী—সদাগরের সাধ্য কি যে সেই ছলনার মধ্যে প্রবিষ্ট হন বা তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া উঠেন। সকলে কালীদহে উপস্থিত হইলে—কোথায় বা কমলে কামিনী, কোথায় বা তাঁহার গজগ্রাস, কোথায়ই বা তাহার পুনরুদ্গিরণ! সদাগর সকলের নিকট বেকুব প্রতিপন্ন হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মধুকর নামে অর্ণবপোত ও তাহাতে যাহা কিছু ছিল সমস্তই রাজ সরকারে জব্দ হইল।

এখানে উজানীতে খুল্লনা পূর্ণগর্ভা হইয়া উঠিলেন। যথাকালে তিনি একটী পুত্র প্রসব করিলেন। বিহিত বিধানে নবজাত শিশুর জন্মোৎসব হইল। দৈবজ্ঞে গণনা করিয়া দেখিলেন—জাতক পরম সৌভাগ্যবান্ কৃতী পুরুষ হইবে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, বণিক্‌পুত্রের নামকরণ, অন্নাশনাদি উৎসব সমাধা হইল—চারি বৎসর চারি দিনে বিদ্যারম্ভ হইল—বিদ্যা শিক্ষায় শ্রীমন্ত অসাধারণ ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিতে লাগিল, অল্পদিন মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, কোষ অভ্যাস করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র শেষ করিল। বিদ্যার বিচারে শ্রীমন্ত সকলেরই অজেয় হইয়া উঠিল। বণিক্‌বালকের বিদ্যা ও তার্কিকতা জনার্দ্দন ওঝার সহ্য হইল না। একদিন শাস্ত্র প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। সহজ-কুপিত ব্রাহ্মণ শ্রীমন্তকে জারজ বলিয়া কটূক্তি করিলেন। "পিতার উদ্দেশ নাই, এরূপ অবস্থায় যাহার জন্ম, মাতার সাধ্বী লক্ষণ ষোল আনা—আহারে আমিষ বিচার নাই, তাহার আবার ধনমান বিদ্যার গৌরব কি?—" ইত্যাদি অনেক অশ্রোতব্য কথা অধ্যাপক ও পুরোহিত জনার্দ্দন ওঝা শ্রীমন্ত সদাগরকে শুনাইয়া দিলেন। শ্রীমন্ত ঘরে আসিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিষণ্ণ মনে শয়ন করিয়া রহিলেন। পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া খুল্লনা পাঠশালায় গেলেন, জনার্দ্দনকে পুত্রের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। জনার্দ্দন পূর্ব্ব হইতে রাগত ছিলেন, খুল্লনার মুখের উপর তাঁহাকে অনেক গ্লানিজনক কথা বলিলেন। পুত্রের অধ্যয়নার্থ গৃহের বহির্গত হওয়ায় যে লোকনিন্দা আছে তাহা বলিলেন পুত্রের অনুসন্ধানের উপলক্ষে এরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ যে বড়ই নিন্দনীয় তাহা বলিয়া পরিশেষে শ্রীমন্ত যে পাঠশালা হইতে অনেকক্ষণ বাড়ী গিয়াছে তাহাও বলিয়া দিলেন।

খুল্লনা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আসিয়া দেখিলেন—শ্রীমন্ত ঘরে আসিয়া সুদুঃখিত মনে শয়ন করিয়া আছেন। খুল্লনার সহিত কথোপকথনে সকল কথাই প্রকাশ পাইল—শ্রীমন্ত পিতার উদ্দেশ জন্য সিংহল যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন। খুল্লনা কিছু দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন, কারণ বাণিজ্যের কোন আয়োজন নাই—এক এক খানি নৌকা প্রস্তুত করিতেই এক বৎসর লাগিবে, তাহার পর বিনিময়

দ্রব্য সংগ্রহ—বাণিজ্যযাত্রা বলিবামাত্র হইবার নহে। কিন্তু শ্রীমন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। পিতৃদর্শনে তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, কিছুতেই ধৈর্য্য ধরিবার নহে। পুত্রের নির্ব্বন্ধ দেখিয়া খুল্লনা সম্মত হইলেন। বালক শ্রীমন্তর আগ্রহাতিশয্য দর্শনে দেবী ভগবতী সুপ্রসন্ন হইলেন, তিনি ডিঙ্গি নির্ম্মাণার্থ বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবশিল্পীকে মর্ত্তে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিয়া একদিনে সপ্ততরী গড়িয়া ও সাজাইয়া ঠিক করিয়া দিলেন--সাতখানি সামুদ্র পোত ভ্রমরার জলে ভাসিতে লাগিল। কয়েক দিন মধ্যে বিনিময় দ্রব্যও সংগৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীমন্ত রাজা বিক্রম কেশরীর অনুমতি প্রার্থনায় গমন করিলেন। রাজা শ্রীমন্তকে সমুচিত আদর যত্ন করিয়া কম্বলে বসিতে দিয়া পরিবারিক বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্ত সকল কথা তাঁহাকে বলিয়া পিতার উদ্দেশে সিংহল যাত্রার সংকল্প জানাইলেন। রাজা অনেক বুঝাইলেন, সিংহলে নানা বিপদের কথা বলিলেন, যাহাতে বালক শ্রীমন্ত দক্ষিণ পাঠনে যাইতে ক্ষান্ত হয়েন তাহার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বালকের অচলা পিতৃভক্তির জ্বলন্ত পরিচয় পাইয়া পরিশেষে রাজা অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন।

কোনমতে পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া খুল্লনা সাশ্রুলোচনে দেবী ভগবতীর পূজার অনুষ্ঠান করিলেন। ভ্রমরার তটে সমস্ত আয়োজন হইল—সুবর্ণঘটে খুল্লনা যথাবিধি দেবী মহামায়ার পূজা ও স্তবস্তুতি করিলে দেবী প্রসন্না হইয়া খুল্লনার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। খুল্লনা সেই সময়ে শ্রীমন্তকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাকে অভয়দান করিয়া সান্ত্বনা করিলেন। খুল্লনা শ্রীমন্তকে বলিয়া দিলেন,—"আপৎকালে মা জগদম্বাকে স্মরণ করিলে কোন বিপদ থাকিবে না। আমি তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিয়া সম্পদে সুখ ধরি নাই, বিপদেদুঃখ ধরি নাই। তুমি সেইরূপে তাঁহতে আত্মনির্ভর করিবে।" এই সময়ে তিনি শ্রীমন্তর পিতৃনিদর্শন আতপত্র ও অঙ্গুরী এবং অষ্ট তণ্ডুল ও দূর্ব্বা তাহার হাতে দিলেন। দেবী মঙ্গলচণ্ডিকার হস্তে শ্রীমন্তকে সমর্পণ করিয়া খুল্লনা পুনরায় রোরুদ্যমানা হইলে দেবী তাঁহাকে অভয়দান করিলেন। শ্রীমন্ত অতঃপর দেব দ্বিজ সকলকে প্রণাম করিয়া বিমাতৃচরণে প্রণত হইলে পাপীয়সী লহনা তাঁহার অকল্যাণ কামনায় বলিল—"তোমাকে আর যেন উজানী ফিরিতে না হয়। ইহাতে খুল্লনার মন অনেকটা ক্ষুন্ন হইল, কিন্তু দেবীর প্রসন্নতায় সে কথা মনেও ধরিল না। শ্রীমন্ত নৌকারোহণে সিংহল যাত্রা করিলেন। খুল্লনা পুত্রকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণ মনে, শূন্যহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কে বলে বাঙ্গালী চিরদিন ভীরু—বণিতার বস্ত্রাঞ্চল তাহাদের সম্বল—কে বলে বঙ্গীয়

বধূ সহজে কাতর—তাহা হইলে ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক পুত্রকে কখন সুদূরবর্ত্তী সিংহলে পাঠাইয়া খুল্লনা প্রাণ ধরিতে পারেন?

প্রকৃত প্রস্তাবে খুল্লনা-চরিত্র এইখানেই সমাপ্ত। পুত্রকে সিংহলে পাঠাইয়া তাঁহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত তিনি কেবল আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজার্চ্চনা ও শ্রীপাদপদ্ম চিন্তায় কালাতিপাত করিতেন। এ দেশের যাত্রা সম্প্রদায় যে শ্রীমন্তের মশান পালা অভিনয় করিয়া থাকেন, তাহার আরম্ভ শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা হইতে। শ্রীমন্তের মশানের সহিত খুল্লনা-চরিত্রের সংস্রব বড়ই কম। কিন্তু ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশ এস্থলে না বলিলেও কৌতূহল নিবৃত্তি পায় না। এজন্য অতি সংক্ষেপে তাহা বলিতে হইল।

শ্রীমন্ত অজয় বাহিয়া ভাগীরথীর বক্ষের উপর দিয়া সিংহলাভিমুখে বহিত্র চালাইলেন। ক্রমে গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল নিকট হইল—মগরার মোহানায় পহুছিয়া শ্রীমন্ত সামুদ্র জলের গভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন, অকাশ নিবিড় ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতে লাগিল, ক্রমে প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতে লাগিল। তাহার সহিত বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। শ্রীমন্ত চিন্তাকুল হইয়া মাতৃআজ্ঞা স্মরণ করিলেন, প্রাণ মন সংযোগে দেবী ভগবতীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেবীর অনুগ্রহে অল্পকাল মধ্যে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল—পথে আর কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিল না। কিন্তু সিংহলের কালীদহে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেই কমলে কামিনীর ছলনায় পতিত হইতে হইল। তিনিও রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কমলে কামিনীর কথা তুলিলে রাজা তাহা অপ্রত্যয় করেন, উভয় পক্ষে প্রতিজ্ঞা পত্র পূর্ব্ববৎ লিখিত হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হইল। সহর কোটাল প্রাণদণ্ডের জন্য তাঁহাকে লইয়া মশানে উপস্থিত হইলে দেবী ভগবতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীমন্তের প্রাণভিক্ষা করিলেন—কোটাল তাহাতে আপনার অসমর্থতা জানাইলে দেবী সর্ব্বসমক্ষে আপনার নাতি পরিচয় দিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। কোটাল বারম্বার শ্রীমন্তকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে তাহা রক্ষা পাইল না। ব্রাহ্মণী শ্রীমন্তকে ছাড়িলেন—ক্রমে কোটাল অস্ত্র ত্যাগেও কৃতকার্য্য হইল না—নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী অতঃপর যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন—ভূত প্রেত দানাগণ সৈন্য সেনাপতি—উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ—যুদ্ধে কোটালের পরাজয় হইল, সে গিয়া সমস্ত বিষয় রাজাকে জানাইল—রাজা স্বয়ং সজ্জিত হইলেন।

রাজা যুদ্ধস্থলে উপস্থিত, বহুসংখ্যক সৈন্য বিনষ্ট হইবার পর বুঝিলেন দেবী ভগবতী শ্রীমন্তের সহায়। অতএব যুদ্ধ

করিয়া কোন ফল হইবে না—সন্ধির প্রস্তাব হইল। রাজা শালবান্ দেবীর পাদ-পদ্ম ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, দেবীর আজ্ঞায় তাঁহার কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধনপতি সদাগরের মুক্তিলাভ, বাজেয়াপ্ত জিনিষের পুনরুদ্ধার, অচির-কাল পরেই সিংহল হইতে বরকন্যার বিদায়, ধনপতির মহাশক্তির প্রাধান্য স্বীকার—প্রত্যাগমন কালে মহামায়ার অনুকম্পায় মগরায় ধনপতির ছয়খানি জলমগ্ন তরীর উদ্ধার। দেশে আসিয়া ধনপতি পুত্রকে লইয়া রাজ-দর্শনে গমন করিলে রাজা সিংহলে কমলে কামিনীর ব্যাপার শুনিয়া তাহা অবিশ্বাস করিলেন, সদাগর নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিলে শ্রীমন্ত ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া ভ্রমরার দহে কমলে কামিনী দেখাইলে বিক্রমকেশরী আপন প্রতিজ্ঞানুসারে শ্রীমন্তকে আপন কন্যা দান করিলেন। ইহার পরেই খুল্লনা ও মালাধরের শাপের বিমোচনকাল উপস্থিত হইল—স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ আসিল। খুল্লনা শ্রীমন্ত ও দুই বধূকে লইয়া স্বামীকে অনেক বুঝাইলেন, দেবীর কৃপায় তাঁহার বংশ রক্ষা হইবে, সংসারে সুখী স্বচ্ছন্দ হইবেন, এইরূপে অনেক প্রবোধ দিয়া রথে আরোহণ করিলে বায়ু বেগে রথ অন্তরীক্ষে উড্ডীয়মান হইল। খুল্লনা স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বৃশ্চিকদংশনের ঔষধ। ভিনি-গারের ন্যায় কার্ব্বলিক্ তৈল এক ফোঁটা দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়।

২। বিচ্ছুদংশনের ঔষধ। আকন্দ গাছের কচি ডগার আটা দষ্টস্থানে মর্দ্দন করিলে এবং ঐ আটা আঙ্গুলে মাখাইয়া সেই আঙ্গুল দষ্ট ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে বারং-বার প্রবিষ্ট করাইলে, শীঘ্র অতি আশ্চর্য্য উপকার হয়।

৩। ফোঁড়ার ঔষধ। শুষ্ক কচুপাতা ফোঁড়ার উপর দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ফোঁড়া শীঘ্র সারিয়া যায়।

৪। রোগীর ভীষণ বমন ও পিপাসা নিবারণের ঔষধ। আমপাতা ১ তোলা এবং জামপাতা ১ তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধপোয়া থাকিতে নামা-ইয়া তাহাতে একটু মধু দিয়া, সেই জল অল্প অল্প সেবন করিলে অল্প সময়েই বমন ও তৃষ্ণার শান্তি হয়।

৫। রক্ত স্রাবের ঔষধ। বিশল্যকরণী অর্থাৎ আয়াপানের পাতা ৫।৭টী বাটিয়া তাহাতে চিনি মাখাইয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

১। কুমারসম্ভব কাব্য। ব্যাখ্যার সহিত সরল গদ্যে মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যের ভাবানুবাদ, শ্রীদীন নাথ সান্যাল বি, এ, এম, বি, কৃত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

সান্যাল মহাশয় প্রবীণ ডাক্তার। জীবের রসধাতু প্রভৃতি দেহতত্ত্বের বিজ্ঞানে ও বিশ্লেষণে তাঁহার সমকক্ষ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু কাব্য-দেহের রসধাতু বিজ্ঞানে ও বিশ্লেষণে এমন বিচ-ক্ষণ কয়জন আছেন, জানিনা। তিনি কুমারসম্ভব বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এই গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠা ভূমিকা অপূর্ব্ব বস্তু, ইহা সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিরূপে চির-পূজিত হইবে।

২। রেণুকণা। ৩। সতীলীলা। দুই খানি গ্রন্থই শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত। মূল্য ॥০ ও ।৵০ আনা। মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর। দুইখানিই সুনীতিগর্ভ নবন্যাস। অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের বৈচিত্র্য ইহাতে সুন্দরভাবে অঙ্কিত ও প্রস্ফুটিত। লেখা সরল ও মধুর। পাঠকালে বর্ণিত ঘটনা-গুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়। গ্রন্থকর্ত্রী বামাবোধিনীর সুপরিচিত লেখিকা, ইহার বিষয়ে আমাদের অধিক বলা ভাল দেখায় না। সহৃদয় পাঠকগণকে গ্রন্থ দুইখানি পড়িতে বারবার অনুরোধ করি।

নূতন সংবাদ।

১। যে গৃহবিচ্ছেদ মহাপাপের ফলে এই ভারতভূমি আজি দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত, সেই মহাপাপের শান্তির জন্যই—জাতীয় কংগ্রেস সভার প্রতিষ্ঠা। সুদীর্ঘ কাল মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনের পর সূর্য্যদর্শনের ন্যায় আমরা এই জাতীয় সম্মিলনীর অভ্যু-দয়কে প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিলাম। আবার এ দগ্ধ হৃদয়ে আশাবীজ অঙ্কুরিত হইল। ক্রমে তাহা পল্লবিত ও ফলোন্মুখ হইল। পাষণ্ড পিশাচ রাক্ষস আমরা, আমরাই আবার সেই আশালতার মূলে কুঠার হানিলাম! ধিক্ আমাদের জন্মে ও কর্ম্মে। আমরা যেন আর "স্বদেশ" "মাতৃভূমি" এ সকল নাম মুখেও না আনি, 'মনুষ্য' বলিয়া পরিচয় না দি।

"প্রেমাম্বুভিঃ স্বগৃহবৈরকলঙ্কপঙ্কং
প্রক্ষাল্য জন্মধরণীজননীহিতায়।
দেহাত্মজীবনধনৈর্মিলিতা যতধ্বম্
সিদ্ধিং দদাত্বখিলমঙ্গলমূলমীশঃ॥

সুপবিত্র প্রেমবারি করিয়া সেচন,
গৃহবৈর পাপপঙ্ক করহ ক্ষালন;
সবে মিলি জন্মভূমি জননীর তরে,

ধন প্রাণ দেহ আত্মা দাও অকাতরে;
সর্ব্ব মঙ্গলের মূল সর্ব্ব শক্তিমান্
ভগবান্ শক্তি সিদ্ধি করুন প্রদান॥"*

এ সকল কথা লিখিয়া কবিরত্ন মহাশয় অরণ্যে রোদন করিয়াছেন।

২। রামকৃষ্ণ মিসনের অধ্যক্ষগণ পূর্ব্বের ন্যায় এবারও দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সাহায্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, নানা স্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য এ কার্য্যে সাহায্যদান একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্যই খাঁটী স্বদেশী।

৩। বঙ্গের মহামান্য ভূম্যধিকারী সার মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর গত ২৪শে পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্মশান ঘাটে বড়লাট ও ছোটলাটের প্রতিনিধি এবং সহরের অধিকাংশ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে কেল্লা হইতে ২১ বার তোপধ্বনি হইয়াছিল। এবং কেল্লার ব্রিটিশ পতকা ১৫ দিনের জন্য অর্দ্ধ পথে অবস্থিতি করিয়াছিল। এই মহাত্মার বিয়োগে বঙ্গবাসিগণ একজন সাহিত্যবন্ধু, বিনয়ী, দয়ালু ভূম্যধিকারী হারাইলেন।

৪। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৮ মাসের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস তাঁহার স্থান লাভ করিয়াছেন।

৫। আফ্রিকায় বিটিশ গায়নার ব্রেজীলের সীমানায় ডাক্তার ইরেং বভেলিয়স নদের একটী জলপ্রপাত আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা ৩০০ ফিট উচ্চ এবং ২০০ ফিট প্রশস্ত। অধিনিবাসের (শাসনকর্ত্তার নিকট এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিবার) সময় আবিষ্কর্ত্তা শাসনকর্ত্তার নামানুসারে যাহাতে এই নূতন প্রপাতের নাম "চেম্বারলেন প্রপাত" রাখা হয় এই অনুরোধ করেন। এই প্রপাত এতকাল জনসাধারণের অগোচর ছিল এবং ইহা উচ্চতায় নায়াগ্রা প্রপাতকে পরাস্ত করিয়াছে। ঈশ্বরের এই অনন্ত বৈচিত্রময়ী সৃষ্টিতে অদ্যাবধি যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই তাহার তুলায় যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মহাসিন্ধুর একটী বিন্দুও নহে।

বলিদান। *

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

ঘন বনরাজি তলে,
আলো ও ছায়ার মাঝে,
রচিয়া কুটীর ক্ষুদ্র,
নির্ম্মল পবিত্র সাজে

* শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন কৃত স্বদেশীর প্রাতঃকৃত্য।

থাকিত বালিকা এক,
অস্ফুট কুসুম কলি;
জগতে তাহার কেহ,
ছিল না আমার বলি।
অনিল বহিয়া তারে,
দিত ফুল-পরিমল;
সুধাংশু ঢালিয়া দিত,
স্নিগ্ধ রশ্মি নিরমল।
প্রভাতে প্রদোষে আসি,
পাখীরা ধরিত তান;
বেড়িয়া কুটীর খানি,
তটিনী শুনাত গান।
কানন-সঙ্গিনী তার,
আসি কুরঙ্গিণীগণ;
করিত বালার সনে,
ফুল্ল মনে বিচরণ।
বিটপী করিত তারে,
মিষ্ট মধু ফল দান;
নিশীথে শুনাত ঝিল্লী,
মনোহর ঐকতান।
ভুবেলা আঁচল ভরি,
তুলিত প্রসূন বালা;
সাজাত কুটীরখানি,
দোলায়ে কুসুমমালা।
সংসারের আবিলতা,
কখন স্পর্শেনি তারে;
আপনি থাকিত ফুটে,
আপন সৌন্দর্য্যভারে।
এমনি সুখেতে তার,
গিয়াছিল কত দিন;
সহসা কি জানি হায়!
হলো বালা স্ফূর্ত্তিহীন।
সরলতা-মাখা মুখে,
দেখা দিল চিন্তারাশি।
লুকাল জনম মত,
অধরের চারু হাসি।
ক্রমেতে শুকাল বালা,
তাপদগ্ধ পুষ্প মত।
কি জানি কি চিন্তা বিষে,
হলো তার হৃদি ক্ষত।
একদা পূর্ণিমা-রাতে,
ছিন্ন শতদল মত;
মুক্ত বাতায়ন হতে,
পড়িয়া হইল হত!
লুটায়ে পড়েছে আহা!
মৃণাল প্রকোষ্ঠ খানি;
চম্পক-অঙ্গুলি-মাঝে,—
লিপিতে ভীষণ বাণী।
"শুধু নিমিষের ভুলে,
হয়েছিনু পথ হারা;
তাইত তোমার অঙ্ক,
যাচি আজি ভবদারা।
পৃথিবীর কুটিলতা,—
জানিনাত কোন কালে;
তবু কেন এত দুঃখ,
লিখে ছিলে মম ভালে?
শুভ্র জীবনেতে মোর,
পড়েছে কলঙ্ক-কালী।
না রাখিব ছার প্রাণ,
দিনু ও চরণে ডালি।"
হায় রে শুকাল বালা,
কুটিলের ছলনায়।

না ফুটিতে ভাল করে,
নির্ম্মমের গুপ্ত ঘায়।
সমাজ শ্মশানে হায়!
রাখিতে পবিত্র মান।
নীরবে নিষ্পাপ বালা,
দিল আত্ম বলিদান।
কিন্তু যার অত্যাচারে,
বালিকা ত্যজিল প্রাণ।
সমাজে চাহিয়া দেখ,
সেই মহা ভাগ্যবান্!

এমনি স্নেহের ধন,
নিষ্ঠুর পিশাচ করে।
প্রতিদিন শত শত,
অকালে পড়িছে ঝরে।
যদ্যপি সমাজ হায়!
চাহিত সে ম্লান মুখ।
তা হলে কি চির তরে,
বিসর্জ্জিত তারা সুখ?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

Bamabodhini Patrika.

AN APPEAL. UMESH CHANDRA DATTA MEMORIAL FUND.

By the sudden death of Babu Umeshchandra Datta India has become poorer. In him the women of India specially have lost a true and sincere friend. The example of strenuous and unwearied labour for the highest good of the country which this good man leaves behind him is worthy of imitation by every son and daughter of India. To him every good work, whether in the field of politics, reform, education or philanthropy, was part of his religious duty.

In order to consider the best means of preserving a memento of his life, which will keep his memory fresh in our midest, a few ladies met at 139 Dhurrumtola Street on the 19th July last. It was decided to raise a permanent fund in the name of the deceased, the interest of which will be ...ent to meet the educational expenses ...f poor girls. As Babu Umeshchandra Datta laboured for all classes of people irrespective of their caste or creed, help will be given to girls of every community and denomination irrespective of their caste or creed. We are gratified to announce that our efforts have been rewarded with success beyond our expecations, We require at least Rs. 3000 for the purpose. We will hope that the friends and admirers of the deceased will earn the blessings of God by contributing to the Fund according to their means.

I am seriously ill and laid up in bed. It is very gratifying to state that I have deposited more than Rs 500 in the Bank, and if all the admirers of late Mr. Dutt contribute something it will not be very long to realize the insiginficant sum of Rs 3000. Had he been born in any country except India, where it is a very regretable fact that those who have money have no heart towards good work, money would have been poured forth. Rich Indian, both ladies and gentlemen, if they could contribute even one tenth of the money they spent in luxury, the period of মৈত্রী and গার্গী would have reigned.

SWARNAPRABHA BOSE.
93 Upper Circular Road, Calcutta.

২৯।১ নং মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 534. Registered No. C. 134. February, 1908.



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৪ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩১৪। ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২৮৯
২। সংসার (শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু) ... ২৯০
৩। আমরা কি চাই ২৯১
৪। বীরনারী জিন মেরী গায়েন ... ২৯৫
৫। ভেকগাথা (শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী) ২৯৮
৬। জানদা ও প্রমোদার কথোপকথন ... ২৯৯
৭। ভগবান্ ভক্তের অধীন ৩০৫
৮। কাশ্মীর (শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত) ... ৩০৬
৯। গীতার ব্যাখ্যা (শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু) ৩০৯
১০। নিবেদন (শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী) ... ৩১০
১১। মিলন (শ্রীমতী শশীমুখী দেবী) ... ৩১২
১২। নূতন সংবাদ ৩১৮
১৩। বামারচনা—
গৌরীকুণ্ড (শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা) ৩১৯
দানের পূর্ণতা (শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু) ৩২০

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৴০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি বিবিধ প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবনের পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, বমন, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ মারিয়া থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাইলেই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হইবে। অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ধুড় ধুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যেই রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর।

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৸০ মাশুল ৷৷০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা ব্যথা, পেটফাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই ও ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের উঠে, অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৷৷০ আনা; মোট ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৪নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 534. February, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৪ সংখ্যা। { মাঘ, ১৩১৪। ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। সৎকর্ম্ম—জোড়াসাঁকোর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ কনকেন্দ্র ঠাকুরের শুভ বিবাহোপলক্ষে বেলগেছিয়ার আলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে রোগীদের শুশ্রূষার জন্য তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সাধু দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয়।

২। ট্রান্সভালে ভারতবাসী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার এখনও সমভাবেই চলিতেছে। এ বিষয় ভারতের গভর্ণরের কর্ণগোচর করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে তাহার কোন হাত নাই এইরূপ বলিয়াছেন এবং ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সেই আবেদন পত্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন।

৩। শিল্প ও বিজ্ঞান বিস্তার সমিতি—শিল্প ও বিজ্ঞান বিস্তার সমিতি হইতে প্রতিবৎসরে অনেকগুলি বঙ্গীয় যুবক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত নানা দেশে প্রেরিত হয়। এবৎসর ৮০ জন বঙ্গীয় যুবক শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জর্ম্মনি ফ্রান্স, প্রভৃতি স্থানে যাইতেছেন। এই সমিতির উদ্যোগে দেশের বহুদিনের অভাব দূর হইতেছে।

৪। অর্দ্ধোদয় যোগ ও স্বেচ্ছাসেবক দল—অর্দ্ধোদয়যোগ উপলক্ষে নানা দেশ হইতে অজস্র যাত্রী গঙ্গা স্নানোপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী যাত্রিদিগের নানারূপ অসুবিধা ও রোগের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুলোকের সমাগমে যাত্রীগণ পুলিশের নিকট প্রায়ই অত্যন্ত নিগৃহীত হয়, সেই জন্য কলিকাতাবাসিগণ বিদেশাগত যাত্রীদিগের সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল সংগঠন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট

যাত্রীদিগের রক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। স্বেচ্ছাসেবক দলের কায়মন যত্ন ও পরিশ্রমে যাত্রীরা কষ্ট পান নাই। তাঁহাদের এই সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

৫। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ—উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার্থ কটকের অনারেবল মধুসূদন দাসের কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দাস ও কলিকাতার মহিলা মিশনরী মিস্ এম, আই গিলবার্ট বিপুল অধ্যবসায় সহকারে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

৬। ডাক বিভাগে রমণী—মার্কিন আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশে রমণীরা পুরুষোচিত সকল কার্য্যেই যোগদান করিয়া থাকেন। শিক্ষা বিভাগ, ডাক বিভাগ, রেল বিভাগ প্রভৃতি সকল বিভাগেই রমণীরা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ও বড় বড় আফিসে চিঠীপত্র ছাপিবার জন্য টাইপ রাইটার স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে রেলেও ফিরিঙ্গী মহিলা টিকিট বিক্রেত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ডাক বিভাগের টেলিগ্রাম গ্রহণ ও প্রেরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ মহিলা নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন।

৭। কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়—মূক ও বধিরেরা কখনও বাক্যদ্বারা নিজেদের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না ইহা এতকাল এ দেশবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু মূক বধির বিদ্যালয় তাঁহাদের সে বিশ্বাস দূর করিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় হইতে অনেকগুলি মূক ও বধির নানারূপ শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া ও কথা বলিতে শিখিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতেছে। গত বর্ষে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় হইতে শ্রীমান্ মৌলীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৫০টী বালক বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

৮। কর্পূর তলার নূতন রাণী—কর্পূর তলার মহারাজা সম্প্রতি একটী বিদুষী হিস্পানী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহ কার্য্য শিখধর্ম্মানুমোদিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের সময় কন্যা দেশীয় ভাবে সোণার সল্মা চুম্‌কীর শাড়ী পরিয়া বিবাহ করিতে বসিয়াছিলেন।

সংসার।

রে সংসার!
তোর মুখ শুধু মম ত্রাস দেয় প্রাণে,
সংসার! হেরিনু তোকে বল্ কি কুক্ষণে?
কি বন্ধুতা তোর সনে? শুধু অবিশ্বাস,
কঠোর মূরতি সদা দেয় প্রাণে ত্রাস,
অসীম আতঙ্কে প্রাণ সদাই কম্পিত,

ও মুখ দেখিয়ে ভয়ে এ আঁখি মুদিত,
সম্পদেও ঐ মূর্ত্তি প্রাণে দিত ভয়,
এবে কার লাগি বল্ রাখি পরিচয়।
তুই যে এমন সখা হবিরে আমার,
এই কথা বাজে প্রাণে নিঠুর সংসার।
কার তরে আছি হেথা বল রে সংসার!
নিশি দিন ব্যস্ত মন যেতে ঐ পার।
সংসার! মিনতি তোরে দূরে রাখ মোরে,
একটু শকতি চাই ঊর্দ্ধে উঠিবারে।
বিভু মোরে বল দিন উড়ি অমরায়,
কঠোর সংসারে থাকি কিসের আশায়?
চাহি আমি বিশ্বাসীর মনোহর প্রাণ,
রে সংসার! কার সাধ্য করে তাহা দান?
(হে আরাধ্য!) সেই বর দাও মম পরাণ সম্বল,
যত দিন ভবে রাখ, দাও কিছু বল।
সংযম নিষ্ঠাতে শুদ্ধ হউক জীবন,
তোমার পথেতে দৃঢ় থাকে যেন মন।
অতৃপ্ত পরাণ মাঝে নিত্য দাও দেখা,
সকাতরে নিবেদন শুন প্রাণসখা!

আমরা কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩) শিক্ষা—জীবনসংগ্রাম ক্রমশই কঠোর হইয়া দাঁড়াইতেছে। যাহাকে আজ কাল "সভ্য" জগৎ বলে, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই; এবং সেই প্রতিযোগিতায় এক মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞান। যাহাতে এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় টেঁকিতে পারি এরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপায় আমাদের আছে কি? ইহা ত বড় কথা, দেশের কয়জন লোক সামান্যরূপ লিখিতে ও পড়িতে জানে? পুরুষের মধ্যে এরূপ লোক শতকরা কয় জন আছে? স্ত্রীলোকের কথা ধরিবারই দরকার নাই। কারণ, জগতের সকল সভ্য দেশেই স্ত্রীশিক্ষা অপেক্ষা পুরুষ-শিক্ষা বেশীদিন হইতে প্রচলিত এবং লিখিতে, পড়িতে জানে এমন পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের চেয়ে অধিক। আমাদের দেশে পুরুষ শিক্ষাই যৎসামান্য আছে, স্ত্রীশিক্ষা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। পুরুষ-শিক্ষা যাহা আছে তাহার অবস্থাও অতি শোচনীয়। গ্রাম্য পাঠশালা হইতে আরম্ভ করা যাউক। সেখানে পাঠার্থীদিগকে সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকায় অনেক বিষয়ের নাম আছে বটে, যথা, স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, কিন্তু ঐ সব নাম কেবল তালিকার শোভা বৃদ্ধি করে মাত্র। শিখাইবার লোক নাই, আবশ্যকীয় যন্ত্র উপকরণাদি নাই, হাতে কলমে কিছু হয় না, এবং অবস্থা বিবেচনা করিলে হইতে পারেও না। যে শাস্ত্রের আমার প্রায় কিছুই জ্ঞান নাই সে শাস্ত্র

যে আমি পড়াইতে পারি, এ কথা আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোথাও কেহ বিশ্বাস করে না, এবং কার্য্যকরী বিজ্ঞান যে যন্ত্রাদি ও পরীক্ষার সাহায্য বিনা শিখান যাইতে পারে ইহা অন্য কোন দেশে কল্পনায়ও আসে না। এদিকে যে বিজ্ঞান শিক্ষা হাতে কলমে নয়, সে শিক্ষার কোন মূল্য নাই, তাহা অন্য সর্ব্বত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। যখন পুরুষ শিক্ষায় এই অবস্থা, তখন স্ত্রীশিক্ষার বিষয় কিছু না বলাই ভাল। কোথাও কোথাও দুই একটী বালিকাবিদ্যালয় দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কি শিক্ষা দেওয়া হয় বুঝা ভার। দুই একজন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পণ্ডিত আছেন। বয়সগুণেই তাঁরা শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত। শিক্ষা দিবার উপকরণাদির অবস্থা যদি সম্ভব হয়, বালক বিদ্যালয়গুলির অপেক্ষাও হীন। গৃহকর্ম্মে আবশ্যক এরূপ দুই একটা বিষয় শিখাইবার কথা আছে বটে, কিন্তু শিখায় বা কে, এবং শিখান হয়ই বা কি প্রকারে? আর এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা? সে কথা না তুলাই ভাল। নিম্ন শিক্ষা সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাই না, পুথি বাড়িয়া যায়।

ইহার পর মধ্যশিক্ষা। যে সব বিদ্যালয়ে মধ্যশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাদের কাজ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র প্রস্তুত করা। সরকারি ও বেসরকারি এরূপ বিদ্যালয় দেশে কতকগুলি আছে বটে, কিন্তু একটী উন্নতিশীল দেশে যতগুলি থাকা উচিত তাহার চেয়ে ঢের কম। শিক্ষাপ্রাপ্তির উপযুক্ত বালকদের মধ্যে শতকরা খুব অল্প পরিমাণই এ সব বিদ্যালয়ে গিয়া থাকে। শিক্ষার ভাষা উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরাজী। শিক্ষণীয় বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। শিক্ষা যে কতদূর উচ্চ এক কথাতেই বুঝা যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে সামান্য বিজ্ঞান শিখাইবার বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ বিদ্যালয়েরই নাই এবং সেই জন্য তাহা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় বলা যাইতে পারে। যে টুকু কাজ ইহারা করিতে পারে, অর্থের, কর্ত্তৃপক্ষদের জ্ঞান ও চেষ্টার, এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে এবং অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতার নিমিত্ত তাহাও ভাল করিয়া হয় না। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের "পাশ ফেলের" তালিকা ইহার প্রমাণ। এই সব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নামে কলেজের জন্য ছাত্র তৈয়ার করা, কিন্তু কাজে ইহারা কেরাণী তৈয়ার করার যন্ত্র মাত্র।

এখন উচ্চ শিক্ষার দিকে একবার তাকান যাউক। ইহা দেওয়া হয় কলেজে। দেশে কলেজ আছে গুটিকয়েক মাত্র, এবং তাহাদের ছাত্র সংখ্যা একত্র করিলে মুষ্টিমেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালা বেহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ এই কয়টী প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। এই সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৭।৮ হাজার ছাত্র প্রবেশিকা

পরীক্ষা, ৩।৩॥০ হাজার ছাত্র মধ্য পরীক্ষা এবং দুই হাজার বা তাহার কিছু বেশী ছাত্র বি, এ, পরীক্ষা দেয়। এম, এ, পরীক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত খুব কম ছাত্রই প্রস্তুত হয়। ইহা হইতেই দেশে উচ্চ শিক্ষার কিরূপ প্রসার বুঝা যায়। ছাত্রসংখ্যার অবস্থা ত এইরূপ। শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? পৃথিবীর প্রধান পুরাতন ভাষা ও সাহিত্য, গুটিকতক নূতন ভাষা ও সাহিত্য (ইহার মধ্যে ইংরাজী প্রধান) দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। ইহা ত গেল নামে। কাজে কিন্তু অনেক গুলি বিষয় শিখাইবার দেশে কোন বন্দোবস্ত নাই, এবং অনেকগুলির যাহা আছে তাহা ছেলেখেলা মাত্র। এক কথায় সব বুঝা যাইবে। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ক্রিয়াসিদ্ধ পরীক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। এ কথা এখানে বলা উচিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মানুসারে এ বিষয়ের কিছু পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে। কাজের এখনও দেরী আছে। বর্ত্তমানে বিদ্যা যদি কিছু হয় তাহা কেবল পুথিগত। যাঁহারা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত ও আয়োজনের কোন সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রণালী প্রহসন বই আর কিছুই নয়। কথাটা হইতেছে এই—এখানে যাহাকে উচ্চ শিক্ষা বলা যায় তাহা আর যাহা হউক হইতে পারে কিন্তু "উচ্চ" একেবারে নয়। একে ত শিখান খুব কমই হয়, তাহার উপর যাহা শিখান হয় তাহা সচরাচর ভাল করিয়া হয় না। দেশীয় যে সব অধ্যাপক আছেন তাঁরা অনেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট। কাজেই তাঁদের বিদ্যা ও জ্ঞানের সীমা বহুদূর বিস্তৃত নয়। বিলাত হইতে যে সব অধ্যাপক আসেন, তাঁহারা প্রায়শঃ উচ্চ অঙ্গের লোক নন। সে প্রকার লোক বিদেশে আসিতে চান না, এবং আসা তাঁদের দরকারও হয় না। এমন কি বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারী লোক প্রায় এ দেশের শিক্ষাবিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্লার্ক, টেনি, ইলিয়ট, ম্যান্ ও বুথের মত লোক কয়জন এ দেশে আসিয়াছেন? দেশীয় ও বিদেশীয় অধ্যাপক সম্বন্ধে যাহা বলিলাম ইহার অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু মোটের উপর কথাটা যে ঠিক্ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় শিখাইবার ইচ্ছা থাকিলেও বেশী ক্ষমতা অনেকের নাই। ইচ্ছা না থাকিলে ত কথাই নাই। উচ্চ শিক্ষার এরূপ অবস্থার ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দুই চারি জন সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু দর্শন, গণিত বা বিজ্ঞানে মৌলিকতার বা গবেষণার জন্য খ্যাতি লাভ আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই বলিলেই হয়। করিবেনই বা কোথা হইতে? গবেষণা ত ছেলেখেলা

নয়। ইহার উপযুক্ত শিক্ষা কোথায়? ইহার উপায় কোথায়? ইহাতে উৎসাহই বা দেয় কে? এ সম্বন্ধে বেশী লিখিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই।

দেশের পুরুষদের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিঞ্চিৎ বিবৃত হইল। ইহা হইতে স্ত্রীলোকদের মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার অবস্থা অনেকটা অনুমিত হইতে পারে। তাঁহাদের জন্য দুই একটী স্কুল ও এক আধটী কলেজ আছে মাত্র।

ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রকৃত ব্যবহারিক শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত আমাদের দেশে নাই। শিবপুর কলেজে যান্ত্রিক স্থপতি বিদ্যা, বৈদ্যুতিক স্থপতি বিদ্যা, খনি সম্বন্ধীয় স্থপতি বিদ্যা, সাধারণ স্থপতি বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা এবং আর দুই একটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার আজকাল কত শাখা হইয়াছে যাহার নাম পর্য্যন্ত এ দেশে শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া শিবপুর কলেজে পড়িবার উপযুক্ত বিদ্যা ও অবস্থা দেশের কয়জনের আছে? শিক্ষা দেওয়া হয় ইংরাজীতে; এবং দেশের দুইচারিজন ছাত্র ঐ শিক্ষা পাইলেও তাহাতে দেশের অন্ন সংস্থানের কোন উপায় হয় না। আর একটা কথা। সরকারের অধীনে যে সব কাজ, তাহা যতই পণ্ডিত হইয়া বাহির হও না কেন, দেশীয় লোকের ভাগ্যে পড়ে না। ওখানে যাহা শিখান হয় তাহা নাকি আবার শুনিতে পাই খুব ভাল হয় না, কারণ পড়াইবার লোককই? দেশের দুই এক স্থানে দুই একটা ব্যবহারিক বিদ্যালয় নামে জিনিস আছে বটে, কিন্তু সামান্য একটু ছুতারের কামারের কাজ বা রেসম তোলা শিখান যদি ব্যবহারিক শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। মোট কথা, এদেশে ব্যবহারিক শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুল সমূহ ব্যবহারিক শিক্ষালয়ের ভিতর ফেলিব কি? ফেলিলেও আমাদের মতের কোন অন্যথা হয় না; দেখিয়া শুনিয়া ফল হয় যে মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উদ্দেশ্য লোককে উচ্চ ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া নয়, চিকিৎসা ও পূর্ত্তবিভাগে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী সৃষ্টি করা মাত্র। কথা হইতেছে এই—রীতিমত ব্যবহারিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে অজস্র টাকা খরচ করা চাই। কিন্তু আমাদের গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার্থে খুব কম টাকাই খরচ করিয়া থাকেন। জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্য শিক্ষার্থে যে টাকা ব্যয় করেন তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন কোন দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে এই বিষয়ে কম টাকা খরচ করা হয় বলিয়া সেখানকার বিদ্বজ্জনগুলী কতই না আন্দোলন করিয়া থাকেন।

(৪) বাঁচিবার অন্যতম আবশ্যক ধন। ইহা আমাদের একরূপ নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহার

অধিকাংশ জমিদারিতে আবদ্ধ। দেশের সকলেরই চেষ্টা কিছু জমি কেনা। যাহার কিছু অর্থ হয় সে অর্থ কিছু বেশী হইলে জমিদারি কিনিবার জন্য, এবং কিছু কম হইলে—জমি কিনিবার জন্য লালাইত। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় কি কুক্ষণেই দেশে জমিদারি প্রথা চলিত হইয়াছিল। অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে একজন সওদাগরের হাতে বেশী টাকা হইলে তাহা তিনি ব্যবসায়ের উন্নতিতে না লাগাইয়া অনেক সময় জমিদারি কিনিতে লাগাইয়া থাকেন। সকলেরই বিশ্বাস জমিদার হইলে যেমন মান সম্ভ্রম হয় এমন আর কিছুতে হয় না। জমিদারির নীচে হইতেছে কোম্পানীর কাগজ। যে সব ধনশালী লোক জমিদারি বুঝেন না বা উহার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চান না, তাঁহাদের টাকা প্রায় কোম্পানীর কাগজে বদ্ধ। কোম্পানীর কাগজের পর দেশের কিছু টাকা মহাজনিতে খাটে, কিন্তু ইহাতে দেশের ধন বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য হয় না; কারণ, যাঁহারা টাকা ধার লন, তাঁহাদের মধ্যে কম লোকই ঐ টাকা ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ যেন মনে না করেন, আমি বলিতেছি দেশে ব্যবসাদার নাই। সামান্য মুদী হইতে বড় সওদাগর পর্য্যন্ত সকলেই ব্যবসাদার, কিন্তু সকল ব্যবসা দেশের ধন বৃদ্ধি করে না। যে সব লোক জিনিষ তৈয়ারি বা উৎপাদনে ব্যাপৃত, কিম্বা যাঁহারা দেশের অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া তথা হইতে সস্তায় দেশের আবশ্যকীয় জিনিষ আমদানী করিতে নিযুক্ত, এবং সেই সব লোক যদি বসন্তের কোকিল না হইয়া প্রকৃত দেশবাসী হন তাহা হইলে তাঁহারাই প্রধানতঃ দেশের ধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। কথাগুলি বার্ত্তাশাস্ত্রের অনুসারে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হইল বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু আশা করি আমার উদ্দেশ্য সকলে বুঝিতে পারিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি দেশের কত টাকা ও কয় জন লোক এই রূপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত? ধন আগমের অন্য কোন উপায়ও আমাদের নাই। বহির্গমনের উপায় কিন্তু ঢের। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রভৃতিতে যে টাকা তুলেন, তাহার অধিকাংশ নানা কারণে বিদেশে চলিয়া যায়। সরকারের অধীনে চাকরি করিয়া আমরা দুই দশ জন কিছু পাই বটে, কিন্তু সকল বিভাগের বড় বড় চাকরি সাহেবদের একচেটিয়া। অনেক বিভাগে দেশীয়দের প্রবেশাধিকারই নাই। (ক্রমশঃ)

বীর নারী জিন মেরী গায়েন।

জিন মেরী, ফ্রান্সের অতি সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মাতা বিলাসিতার ক্রীড়াভূমি পারিস নগরীতে আগমন করিয়া প্রতিভাময়ী দুহিতার সুশিক্ষা বিধানের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। পারিস

নগরীতে আগমন মাত্রই সকলে মেরির দেবীনিন্দিত সৌন্দর্য্য, বিনয়নম্র চরিত্র ও আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এত অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে অজস্র প্রশংসা বিষময়ফলে পরিণত হইল। অত্যল্পদিনেই শৈশবের ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। দৈনিক প্রার্থনা পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। ১৬ বৎসর বয়সে অস্ফুট প্রতিভাময়ী বালিকার আনন্দপূর্ণ জীবনের ভীষণ কুজ্ঝটিকাপূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। কাউণ্ট গায়েন নামক অতুল ধনশালী একজন ভয়ানক দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকের সহিত তাহার পরিণয় স্থির হইয়া গেল। ধন ভিন্ন এই পাত্রের এমন একটীও গুণ ছিল না, যাহাতে প্রতিভাময়ী পরমসৌন্দর্য্যশালিনী মেরীর সম্মুখে সে দণ্ডায়মান হইতেও সমর্থ। ভাবী পত্নী হইতে সে অন্ততঃ ২২ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। যে সভ্য দেশের মহিলাকুল স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহিতা, সেই দেশেও বিবাহের মাত্র ৩ দিন পূর্ব্বে ভাবী পতি সন্দর্শন তাঁহার ভীষণ অন্ধকারপূর্ণ অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। এই পরিণয় সর্ব্ব প্রকারে মেরী গায়েনের অসহ্য ও অবর্ণনীয় ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত আত্মজীবনীই তাহার সাক্ষ্য দেয়। রূপ গুণ সকলই বৃথা গেল। বিবাহ মেরীর মহাযন্ত্রণাময়ী জীবনের সূচনা হইল বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। মেরীর পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল, অতুল ধনশালী লোক ভিন্ন কদাপি কন্যার বিবাহ দিবেন না। গায়েনেরও পবিত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,—পরম সৌন্দর্য্যশালিনী পত্নী লাভ। শ্বশুর ও জামাতার কামনা পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু এইরূপ বিবাহের অবশ্যম্ভাবী যে বিষময় ফল তাহাই ফলিল। নববিবাহিতা মেরী জীবনের নব পরিচ্ছেদ আরম্ভাবধি একটী দিনও দাম্পত্য জীবনের পবিত্র প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন নাই। বয়োজ্যেষ্ঠ গায়েন ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক বাতরোগে সর্ব্বদা শয্যাশায়ী থাকিতেন। প্রথম প্রথম মেরীর প্রতি বাহ্যিক প্রেম জানাইতে সে ব্যগ্র থাকিত। গায়েনের জননী দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি ছিলেন, পুত্রের প্রকৃতি তাঁহারই প্রকৃতির ছাঁচে গঠিত হইয়াছিল। বিবাহের মুহূর্ত্ত হইতে শ্বাশুড়ী এমন অতুল রূপগুণবতী বালিকাবধূকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ পাষাণগঠিতা, একোপনস্বভাবা স্ত্রীলোক ফ্রান্সের ন্যায় স্থানেও বাস্তবিক দর্শনযোগ্য ছিল। পুত্রের নিকট অনুক্ষণ বধূ সম্বন্ধে অমূলক ভীষণ কুৎসা কীর্ত্তন তাহার দৈনিক জীবনের একমাত্র কার্য্য ছিল। মেরী গায়েনের দুর্গতির সীমা ছিল না। তিনি নিজ দুঃখ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পিতৃগৃহে আমি যেমন সকলের নয়ন-মণি ছিলাম এখানে তেমনি আমি সকলেরই চক্ষুঃশূল। নিশি দিন আমার প্রতি অবিশ্রান্ত ধারায় সুধু তিরস্কার, অশ্রাব্য কুৎসাকীর্ত্তন ও ভীষণ লাঞ্ছনা বর্ষণ হয়। হায়! কর্ণ

বধির হইল না কেন? অন্তরের মর্ম্মস্থল, দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা দগ্ধ। কঠোর যাতনায় মন প্রাণ অধীর। মৃত্যুকে দিবানিশি ডাকিতেছি। কাতর কণ্ঠে অনুক্ষণ প্রার্থনা করি "হে প্রভো! ভীষণ ক্লেশে পেষিতা এ অধম কন্যাকে তোমার নিকট উঠাইয়া লও" কিন্তু এই কাতর ধ্বনি প্রভুর কর্ণে পঁহুছেনা। আমি নীরব ব্রত ধারণ করিয়াও লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাই না। হঠাৎ যদি অবর্ণনীয় ক্লেশে পীড়িত মুখের হৃদয় হইতে একটা কথাও বাহির হয় অমনি সকলে ভীষণ ভ্রূকুটী করিয়া বলে বিবাদ বাঁধানই আমার হীন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! যে স্বামী সংসারে স্ত্রীর একমাত্র স্নিগ্ধতাপূর্ণ ছায়া, হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার জ্বালা জুড়াইবার স্থান, আমার এমনি দুর্দ্দশা যে মৃত্যুশয্যাশায়ী স্বামী, অক্লান্তভাবে যাহার রোগে আমি দিবানিশি সেবা করিয়াছি, তিনি ভ্রমেও একটীও ভালবাসা, স্নেহ, কি সহানুভূতির কথা বলা দূরে থাকুক, সর্ব্বাগ্রে দলবলের সমক্ষে আমায় যে ভীষণভাবে নির্য্যাতন করেন তাহা যথার্থই অবর্ণনীয়। পিতা ও মাতা যেমনি উচ্চ বংশজ, স্বামী তেমনি নীচের চূড়ান্ত। যেমন বাহিরে তেমনি অভ্যন্তরে। আমায় অপমানিত করিবার জন্য ভয়ানক নীচ ও দুষ্ক্রিয়াশীল বেতনভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের সন্নিধানেই অনুক্ষণ বাস করিতে হয়। পিতা মাতাকে আমি কদাপি এই ভীষণ দুর্গতির কাহিনী জানাই নাই, তথাপি তাঁহারা লোকমুখে ইহা শুনিয়া ঐ লোকদিগকে দেখামাত্রেই আমি মান মর্য্যাদা রক্ষণে একবারেই অশক্ত ইত্যাদি বলিয়া কঠোর তিরস্কার করিয়া গেলেন। পাঠক একবার কল্পনাচক্ষে দর্শন করুন, মেরীর জীবন কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণাময় ও অন্ধকারপূর্ণ। এই সময়েও মেরী চরিত্রের যে অত্যাশ্চর্য্য বিরল মহান্ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই সুরবালারই উপযুক্ত বটে। ঐ স্বাধীনতাপ্রধান রাজ্যে বর্দ্ধিতা, ধনমর্য্যাদাশালী বংশজাতা ও আদরিণী ১৬ বৎসরের কোমলা বালা নরকসদৃশ স্বামীগৃহে নীচতম কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহপূর্ব্বক কর্ত্তব্যশীলতা ও ধীরতার যে অত্যাশ্চার্য্য দৃষ্টান্ত জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন, ভারতমহিলাকুল! বল ত, তোমরা কয়জন ঐ বীরনারীর সমস্থানীয়া? ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদে একটী ধার্ম্মিকা মহিলার সহিত এই সময়ে তিনি হঠাৎ পরিচিতা হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা বহন জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা প্রথম দর্শনেই ঐ নারী বুঝিয়া লইলেন এবং মেরীকে বলিলেন,—"ভগ্নি! বিশ্বাসবিহীন অনুষ্ঠানের সাহায্যে কি স্বর্গের বল ও শান্তিলাভ সম্ভব, তুমি অন্তরে তাঁহাকে, না পাইয়া নিরন্তর বাহিরেই অন্বেষণ করিতেছ, তাই এত অশান্তি ও নিরাশা। এখন হইতে তুমি একান্ত মনে হৃদয়ের অন্তরালে প্রভুর দর্শন যাহাতে পাও সেই মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হও। এই কথা কয়টী শুনিবামাত্র মেডেম গায়েনের জ্ঞাননেত্র খুলিয়া গেল। মোহান্ধ-

কার অপসারিত হইল। কেবল অনুষ্ঠানের সাহায্যে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টায় এতকাল ব্যস্ত থাকিয়াও কেন প্রভুর জীবন্ত সত্ত্বা উপলব্ধি জনিত অচল শান্তি অসম্ভব, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ দুর্গতিপূর্ণ জীবনের সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ঐ ধার্ম্মিকা মহিলাকে পত্র লিখিলেন, "তোমার অতি সারবান্ কয়টী কথার বলে আমার অসহ্য জীবনের সকল অন্ধকার, জ্বালা, যন্ত্রণা, অশান্তির অগ্নি সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। ভগ্নি! কি অমূল্য ধন হস্তে পাইয়াছি। যাঁহাকে পাইয়াও শুধু জ্ঞানালোকের অভাবে ধরিতে এতকাল অসমর্থ ছিলাম, তিনি ধরা দিয়া সকল যন্ত্রণায় শান্তিসুধার মহাধারা বর্ষণপূর্ব্বক মর্ম্মস্থলের অবর্ণনীয় যাতনা একবারে মুছাইয়া দিয়া হৃদয় শান্তিপূর্ণ করিয়াছেন। হে প্রভো! তুমি ত এত দুঃখে আমায় ধরিয়াই রাখিয়াছিলে। হায়! আমি তোমার অন্বেষণে এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়াছি। অথচ তুমি ত অন্তরতম স্থানে অনুক্ষণ বাস করিতেছ। আমি সুধাসাগরতীরে বসিয়াও কি দারুণ তৃষায় ব্যাকুল ছিলাম। আজ ঘোর অন্ধকারপূর্ণ জীবনে নব উষার জ্যোতি ফুটিল।

ভেক গাথা।

ভাগ্যহীন তুমি ভেকরাজ!
লোকে বলে এ জগতে নাহি তব কাজ!
অতি হেয় ঘৃণ্য দীন,
তুমি ভেক বুদ্ধিহীন,
বিল খাদ তড়াগেতে তব বাসস্থান;
কর্দ্দমাক্ত জল নাকি কর তুমি পান!
মন্দভাগ্য ভীরু অতি
তুমি ভেক, মন্দমতি,
কুসঙ্গ-কলুষে তব লোকে গায় ব্যথা;
নানা মতে নানা লোকে বলে নানা কথা।
আমি কি নয়নে ভেক! দেখি হে তোমায়,
বলিতে সরেনা মুখে—ভাষা না যুয়ায়।
তুমি ভেক, মহাযোগী,
নহ সংসারের ভোগী,
নিষ্ঠা বিষ্ঠা তুল্য তব—নাহিক বিকার;
সুখে দুখে ভেদ তাই নাহিক তোমার।
পড়ে থাক নদীকূলে,
কিম্বা কোন তরুমূলে,
শীত গ্রীষ্মে কিছুমাত্র নাহি তব ভয়;
সহিতে জনম তব, তাই এত সয়!
করিতে আশ্রয় দান,
তোমার কোমল প্রাণ,
কেঁদে কেঁদে উঠে ভেক, ধর তাই "ছাতা"
ক্ষুদ্র জীব পশে তায়—হেরি শয্যা পাতা।
লম্ফে লম্ফে গতি তব,—
রঙ্গ ভঙ্গ কত কব,
সে সবে বুঝাও জীবে যে স্বাধীন মতি,
উরগের মত কভু নহে তার গতি।

নিষ্ঠুর, ক্রীড়ার ছলে
হিংসা যদি করে বলে,
ঊর্দ্ধমুখে কর তবে শুধু ঈশ-নাম;
সে নাম লইয়া মুখে ছাড় ভবধাম।
গগনেতে ঘনঘটা
ছড়ালে বিদ্যুৎছটা
গম্ভীর নির্ঘোষে তুমি জানাও বারতা,
আনন্দ-সংবাদে হাসে তরু-গুল্ম-লতা।
মেঘ-গুরু-গুরজন,
শুনে হও প্রীতমন,
প্রতিদানে গাও তুমি হয়ে আত্মহারা;
দ্রবময়ী সে সঙ্গীতে ঝরে বারিধারা।
সে বারিতে বসুমতী,
হয় শস্যশালী অতি,
সেই শস্যে কোটি জীব পেতেছে আহার;
তবু লোকে নিন্দাবাদ করিবে তোমার।
লোকে বলে নাহি রূপ,
তুমি কদাকার-স্তূপ,
কবি বলে 'গুণী যেই—গুণে তার কাজ,
নির্গুণ শিমুল ফুল ধরে নানা সাজ।
ব্যাংএর আধুলি খানি
প্রবাদের মত মানি,
স্বত্ববান্ হয়েছিল কিন্তু প্রাণী আর,
এতেও কি ঘুচিবে না কলঙ্ক তোমার?
হায় হায় পোড়া লোক,
তোমাদের গেছে চোক,
ভাল মন্দ বিচারের নাহি কোন জ্ঞান,
বুঝনা বুঝনা ভেক কি মহৎ প্রাণ!
যে যা বলে সব্ সব,
যত দিন ভবে রব,
মনের আনন্দে গাব ভেকরাজ-গাথা;
পাগল বলিলে লোকে নাহি পাব ব্যথা।
ভেক, মম এই সাধ,
যারা করে নিন্দাবাদ,
তাহাদের শুনাইও সঙ্গীত তোমার,
যেমন তাদের কর্ম্ম—তেমন বিচার!!!

জ্ঞানদা ও প্রমোদার কথোপকথন।

প্র। তুমি না ভাই জ্ঞানদা সে দিন বলেছিলে যে, সংসার সম্বন্ধে আমার মনে যখন যে সন্দেহ হবে তোমার কাছে বলিলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিবে, আরও বলেছিলে সমাজ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বেশ পরিষ্কার হ'লে তারপর ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেবে।

জ্ঞা। তাত বলেইছিলাম, তাকি অস্বীকার কর্‌ছি? এখন আমার একটু অবসর আছে, তোমার মনে যদি কোনও সন্দেহ থাকে ত বলতে পার।

প্র। তোমার ত অবসর খুঁজেই পাই না। তবে কি ভাগ্যি আজ তোমার একটু অবসর হয়েছে। আজ কদিন থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখি, তা তোমার ত অবসর কখন হয় তা বুঝতে পারি না।

জ্ঞা। তোমার ত আর আমাদের মত সংসারের কাজ কর্ম্ম নাই। সমস্ত দিন পাঁচ রকম আমোদ প্রমোদ নিয়েই আছ। তোমার প্রমোদা নামটী বেশ সার্থক হয়েছে।

প্র। কেন মানুষের নামের আবার একটা অর্থ আছে নাকি?

জ্ঞা। তা বুঝি জাননা? অনেক সময় নামেতে ও রাশিতে এমন মিল হ'তে দেখা যায়—যে, মানুষ ঠিক্ তাহার নামের মত কাজ করিয়া থাকে। কখনও কখনও "দীনবন্ধু" নামের লোককে বাস্তবিকই "দীনবন্ধু" হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে আবার কোটিপতির পুত্রের নাম কাঙ্গালী চরণ কিম্বা দুঃখীরাম রাখা হইল। ঘটনাক্রমে দেখা গেল, সেই লোক জীবনে বাস্তবিকই যথেষ্ট দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিল। এই দেখ না কেন তোমার নাম প্রমোদা—আমি উহার কি অর্থ করি জান—প্রমোদা প্রমোদপরায়ণা অর্থাৎ যে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ প্রকার বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত করে।

প্র। কেন আমোদ প্রমোদ কি কাযের মধ্যে নহে?

জ্ঞা। দেখ প্রমোদা! তোমাকে ছোট ভগ্নীর মত স্নেহ করি ও ভালবাসি। সেই জন্য কিছু উপদেশ দিবারও অধিকার রাখি। তা না হ'লে বাস্তবিকই আমার কতটুকুই বা জ্ঞান এবং উপদেশ দিবার কি শক্তিই বা আছে? তোমার ভালর জন্য তোমাকে দুটী কথা বলিব, তাহাতে যদি অপ্রিয় বলিতে হয় অথবা তোমার মঙ্গলের জন্য নিজের যদি কিছু প্রশংসা করিতে হয়, সেজন্য কিছু মনে করো না। কার্য্যের কথা যদি বলিলে, তবে কাজ কাহাকে বলে শুন। স্বভাবের ভিতর নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতে অনেক সময় সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার কর্ম্মতত্ত্বের আভাস দিয়াছেন। এই দেখনা কেন, পশু পক্ষী প্রভৃতির ভিতরে পুরুষগুলি অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাহসের ও শক্তির ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে; স্ত্রীরা সন্তানাদি প্রতিপালন প্রভৃতি গৃহ-নিবদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। আমার মনে হয়, আমাদিগের ভিতর এইরূপ কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা স্ত্রীলোকের কার্য্য তোমার মতে কি হওয়া উচিত?

জ্ঞা। স্ত্রীলোক বলিতে যদি "স্ত্রী" বুঝ, তবে তাহার যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

প্র। তুমি দেখিতেছি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবে মনে করিতেছ।

জ্ঞা। প্রয়োজন হলে বলতে পারি। দেখ! সংসারের সুখ, দুঃখ, শান্তি অশান্তি স্ত্রীর চরিত্র ও ব্যবহারের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমার বিবেচনায় প্রত্যেক স্ত্রী অথবা গৃহকর্ত্রীর অতিপ্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।

প্র। তুমি বুঝি "ভগবানের উপাসনার' কথা বলছ?

জ্ঞা। না প্রমোদা! উপাসনা নয়, প্রার্থনা। আর উপাসনার বিষয় তুমি যাহা বুঝেছ এবং ভগবানের উপর তোমার যতদূর

ভক্তি আছে, তা এক কথাতেই বুঝতে পেরেছি। ভগবানের মহিমা বর্ণন, তাঁহার বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাওয়া, সে অনেক দূরের কথা। প্রথমতঃ সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করা উচিত।

প্র। তা প্রার্থনার কথা কি বলছিলে বল।

জ্ঞা। প্রত্যেক গৃহিণীরই প্রভাতে নিদ্রা-ভঙ্গে ভগবৎচরণে গৃহবাসী সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। যে গৃহের সকল কার্য্যের ব্যবস্থার ভার আমার উপর ন্যস্ত আছে, তাহার কঠোর দায়িত্ব আমার শক্তিতে বহন করা অসম্ভব। ইহা বিশেষরূপে অনুভব করা চাই, এবং অনুভব করিয়া সেই মহাশক্তিশালী শক্তিপ্রস্রবণের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া তাঁহার কৃপায় আমি অক্লেশে সংসারের এই গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইব।

প্র। তোমার কথায় ভাই যেন বোধ হইতেছে,—সংসার তোমার নিজের নয়; উহা অপর এক জনের, যে কেবল তোমাকে উহার দায়িত্ব বহনের ভার দিয়াছে।

জ্ঞা। দেখ প্রমোদা! এ প্রশ্নের উত্তর তুমি এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারিবে না। ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সংসারতত্ত্বের পর ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে প্রার্থনার বিষয় যাহা বলিতেছিলাম শুন।

প্র। বল! শুনিতেছি।

জ্ঞা। ষোল আনা সংসারের দায়িত্ব-বোধ না থাকিলে কেহ কখনও সুগৃহিণী হইতে পারে না। আমার শক্তির উপর, আমার বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচক্ষণতার উপর এই গৃহবাসী সকলের সুখ শান্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে এবং নিজের শক্তির উপর অত্যধিক বিশ্বাস না থাকিলে, প্রার্থনা আপনা আপনি প্রাণ হইতে বাহির হইয়া আইসে। যেমন তুফানের সময় নদীবক্ষে নৌকারোহী সন্তরণাক্ষম ব্যক্তির পক্ষে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রথমে ভগবানের চরণে সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া পরে আপনার তৎসাধনোপযোগী ইচ্ছা ও শক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। বিগত রজনীতে সকলে যে নিরাপদে তাঁহার মাতৃ ক্রোড়ে শায়িত হইয়া নিদ্রায় অচেতন থাকিয়াও এত দীর্ঘ সময় যে নিরাপদে অতিবাহিত করিলাম, তাহার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিব। তৎপরে ভক্তিভরে সেই গৃহদেবতার চরণ বন্দনা করিয়া এবং গৃহবাসী সকল গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব।

প্র। তোমার প্রার্থনা, প্রণাম, নমস্কার প্রভৃতির পালা যেরূপ লম্বা, তাহাতে এই সকল কর্ম্মেই যে বেলা ৮ টা বাজিয়া যাইবে।

জ্ঞা। তোমার মত বেলা ৭ টায় শয্যা

ত্যাগ করিলে বেলা ৮ টা কেন ১০ টা বাজিয়া যাইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু ভেবে দেখ! যদি রাত্রি ৪ টার সময় শয্যা ত্যাগ করা যায়, তবে কতক্ষণে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে! বিশেষতঃ যাহা দৈনিক অভ্যস্ত ব্যাপার, তাহা সহজভাবে স্বল্প সময়েই সমাধা হইতে পারে। আরও ভাবিয়া দেখ! এই সকল পবিত্র ক্রিয়ার পক্ষে প্রভাতের নীরবতা ও স্নিগ্ধতা অতিশয় অনুকূল।

প্র। তা ভাই! ৭ টার সময় যে উঠি, তাতে আমার অপরাধ কি? বেহারাটা তখনও চা প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারে না।

জ্ঞা। বুঝেছি। চা না খেলে তোমার বুঝি ভাল ক'রে ঘুম ভাঙ্গেনা, আর প্রার্থনা করা ত একেবারেই অসম্ভব। আজ কাল চা এর সঙ্গে উপাসনার নিত্যসম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিতে পাই প্রথমে না হয় পশ্চাতে চা থাকিবেই, তা না হইলে মেজাজ একেবারে বেঠিক্ হইয়া যাইবে। তা মন্দ নয়—চা খেয়ে শরীর একটু তাজা করে নিয়ে প্রার্থনা করাটা মন্দ নয়।

প্র। কেন ভাই! ছেলে বেলায় পিসিমার কাছে শুনেছি, খালি পেটে থাকিলে অসুখ করে, সেই জন্য কিছু খেয়ে নিয়ে কাজে লাগা ভাল নয় কি?

জ্ঞা। চুপ কর ভাই! আর বলিস না। পিসিমার কাছে শোনা গল্প সবগুলিই কি বিশ্বাস করিয়াছ, না সেই মত কার্য্য করিয়া থাক। কত রাক্ষস, রাক্ষসীর, ভূত প্রেতিনীর গল্প শুনিয়াছ, সে গুলিও কি ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক। যাক্ সে কথা—এখন যা বলি তাই শোন।

প্র। তুমি অত যত্ন নিয়ে কথাগুলি বল্‌ছো, আমি আর বসে বসে কাণ দিয়ে শুন্‌তে পার্‌বো না?

জ্ঞা। না প্রমোদা, এ সকল ঠাট্টা নয়, এ কার্য্যগুলিকে সাধারণতঃ লোকে সংসারের অতি ক্ষুদ্র কার্য্য বলিলেও আমি এ গুলিকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করি। সুতরাং এ সকল বিষয় লইয়া হাস্য পরিহাস করিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক জানিবে। যদি এ সকল কথায় তোমার কোনও উপকার হয় মনে কর তবে আমি বল্‌তে প্রস্তুত আছি। নচেৎ নহি।

প্র। রাগ কর কেন ভাই! ভাল না লাগ্‌লে আমি কি এমন বৈকাল বেলায় দুঘণ্টা পিয়ানো না বাজাইয়া তোমার কাছে ছুটিয়া আসি?

জ্ঞা। পিয়ানো আবার কবে হ'লো?

প্র। তা বুঝি জাননা? সেদিন আমি জেদ্ করে বল্লেম যে, হারমোনিয়ামটী একেবারেই ভাল নয়, তাহার পরিবর্ত্তে একটী ভাল পিয়ানো চাই। তা তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, "দেখা যাক্" বলে চলে গেলেন। তার পরে ৩৫০৲ টাকা দিয়ে এই পিয়ানোটী এনে দিয়াছেন।

জ্ঞা। ভাল, শুনে সুখী হলেম যে তুমি অতগুলো টাকা জমিয়ে স্বামীর হাতে দিতে পেরেছ।

প্র। তা কেন? তাঁর হাতে ১০০৲ টাকা ছিল, বাকি টাকা বোধ হয় ধার ক'রে নিয়েছেন।

জ্ঞা। বটে! বোধ হয় ধার ক'রে। সেটা ঠিক্ জাননা—জানিবার প্রয়োজনও বোধ হয় দেখ নাই। জিনিষ পেলেই হ'ল, কোথা হ'তে কি উপায়ে আসিল তাহা আর দেখিবার প্রয়োজন কি? "সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলম্।"

প্র। তুমি ভাই! কথায় ফেরে যাহোক্ খুব বলে নিচ্ছ।

জ্ঞা। বল্‌বার মত কাজ কল্লেই বল্‌তে হয়। আমি না বলি অপর একজন বলিবে। কেহ না দেখে, কেহ কিছু না বলে, তোমার ব্যবহার ও বিবেচনার ফল সময়ে তোমার সংসার-তরুতে ফলিবেই ফলিবে। তোমাদের পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কাহারও অবিদিত থাকিবে না। যাক্ সে কথা— যাহা বলিতেছিলাম, সংসারের দ্বিতীয় কর্ম্ম এই যে, গৃহে যদি কোনও রোগী, শিশু, আতুর বা অক্ষম ব্যক্তি থাকে, তবে তাহাদের ব্যবস্থা করা এবং সকলের বিধিমতে পথ্যাদির বন্দোবস্ত করা। তৃতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে অথবা দাসদাসীর দ্বারা গৃহাদি পরিষ্কার করা এবং তৎপরেই সাধারণের আহারাদির ব্যবস্থা করা বিধেয় এবং সকলের আহারাদি উপযুক্তরূপে সমাধা হইল কিনা তাহাও পরিদর্শন করা উচিত।

প্র। তোমার ব্যবস্থামতে গৃহিণীর নিজের আহারটী দেখিতেছি সর্ব্বপশ্চাতে পড়িল।

জ্ঞা। অগ্রে হইবার ব্যবস্থা কোনও দিন ছিলনা ও কোনও দিন হওয়াও উচিত নহে। তুমি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, জননীরূপিণী হইয়া কি করিয়া গৃহের একটী প্রাণী অভুক্ত থাকিতে নিজে ভোজন করিতে পার? বাটীস্থ সকলের আহার হইলে তোমারদেখা উচিত কোনও অজানিত অতিথি অভ্যাগত অথবা তোমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্নের প্রত্যাশায় কেহ উপস্থিত আছে কিনা? যদি থাকে তবে গৃহের মঙ্গলার্থ তাহারও বিধিমত পরিচর্য্যা করা উচিত। এমন কি গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগের প্রতিও যেন ত্রুটী না হয়। তৎপরে নিজে যে ভোজন করা যায় তাহা শীতল কদন্ন হইলেও সুস্বাদু পলান্নের অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

প্র। তুমি তাহলে নিত্য পলাও খাও দেখ্‌ছি।

জ্ঞা। অদ্যশ্ব একবার সেই উপাদেয় অন্নের আস্বাদন পাইলে কেহই আর তাহা ত্যাগ করিতে পারিবে না।

প্র। আহারান্তে কার্য্যের কিরূপ ব্যবস্থা তাহা জানিতে বড়ই উৎসুক হইতেছি।

জ্ঞা। অবশ্য একটু নিদ্রা দিবার ব্যবস্থা আমি কখনই করিব না, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কারণ, দিবানিদ্রা যে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি করে এবং শরী-

রকে একেবারে জড় করিয়া তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহারের পর সাংসারিক এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আছে, যাহা সে সময়ে না করিলে আর সমস্ত দিবসে হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। যথা?

জ্ঞা।—যথা—ঘর দ্বার প্রভৃতি পরিষ্কার করা, শয্যাদি রচনা। বালকবালিকাদিগের বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। তুমি হয়ত বলিবে এগুলি দাসদাসী এবং পাচক প্রভৃতির কায।

প্র। আমিত তাই মনে করি।

জ্ঞা। তা নয়, ওটী তোমার ভ্রম। ঐ সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিলে হৃদয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, অপরে করিলে তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমার সংসারের কার্য্য তুমি না করিলে, না দেখিলে, তাহাতে যে আনন্দ তাহা তুমি নিজে উপভোগ করিতে পারিলেনা, অপর পক্ষে বেতনভোগী লোকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্যগুলি করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোনও আনন্দ অথবা শান্তি নাই। কাযেই সংসারের যে সুখ তুমি স্বেচ্ছায় উপভোগ না করিয়া অপরের উপর ভার দিলে, তাহারাও তাহা উপভোগ করিতে পারিল না।

প্র। তুমি ভাই! মিষ্টি করে বেশ দু চার কথা শুনাচ্ছ।

জ্ঞা। আমিত ভাই! পূর্ব্বেই বলেছি যে, রাগ করলে চল্‌বে না। একটু ঘা দিয়ে কথা গুলো না বসালে হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে বস্‌বে কেন?

প্র। তোমার কথাগুলি হৃদয়ে যে ভাবে বস্‌ছে তা যে আর কখনও ভুলবো এমন মনে হয় না।

জ্ঞা। আমিও তো তাই চাই।

প্র। হ্যা ভাই জ্ঞানদা, তুমি একটী কথা বল্‌তে একেবারেই ভুলে গিয়েছ।

জ্ঞা। বুঝেছি—ভুলি নাই বলি নাই কেন শুন্‌বে সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ।

প্র। তা কোন কার্য্যেই ত নামটী মাত্র কর্‌লে না।

জ্ঞা। নাম করলেইত সাধারণ হ'য়ে গেল, জিনিষটা যে অসাধারণ। যেমন সকল কার্য্যের প্রারম্ভে সিদ্ধিদাতা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে—সেইরূপ সংসার-ধর্ম্মের সকল কার্য্যই স্বামীকে লইয়া। তাঁহার সন্তোষ ও তৃপ্তি কল্পনা না করিয়া তুমি সংসারের কোনও কার্য্য করিতে পার না। যদি কর তবে তাহার ফল শুভ নহে। সংসার ধর্ম্মের এইটী প্রধান সূত্র ও মূল মন্ত্র ইহা মনে রাখিবে।

প্র। সাধ্যমত তোমার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিব।

জ্ঞা। তুমি তবে এখন কিছুক্ষণ জপ করিতে থাক; আমার কিছু কায আছে, এখন উঠলেম।

প্র। আমিও তবে চল্লেম—দেখি তোমার কথামত কত দূর কার্য্য ক'রতে পারি। সময়ান্তরে আরও অনেক বিষয় শুনিবার ইচ্ছা রহিল।

ভগবান্ ভক্তের অধীন।

প্রেমিক ভক্তের অসাধ্য কি সংসারে। সে যে হাতে পেয়ে ত্রিলোকের নাথ যা মনে লয় তাই করে।

ভগবান্ ভক্তের অধীন, সচরাচর একথা শুনিতে পাওয়া যায়। উপরে যে একটী সঙ্গীতের অংশ প্রদত্ত হইল, তাহাও এই প্রচলিত বাক্যের সমর্থন করিতেছে। এজন্য "ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু" ভগবানের একটী নাম। যদি একথাই মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে ভক্তদিগের জীবনেতিবৃত্ত দুঃখময় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাই কেন? ধর্ম্মবীর শাক্য সিংহকে তীর্থঙ্কর সন্ন্যাসীদিগের হস্তে কত নিগ্রহ পাইতে হইয়াছিল, ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্য দেবকে তাৎকালীন নবদ্বীপের শাক্তগণ কত লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন! বিশ্বাসীদিগের অগ্রণী যীশু স্ববংশীয় ইহুদিজাতির ষড়যন্ত্রে ক্রুশ কাষ্ঠে অম্লান চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ধর্ম্মপ্রাণ মহম্মদ স্বজাতীয় বিড়ুইনদিগের উৎপীড়নে অস্থির হইয়া জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হয় বল, ইহাঁদের কেহই ভক্ত ছিলেন না, না হয় বল, ভগবান্ ভক্তবৎসল নহেন। যদি তাহাই হইবেন তবে এই সকল ভক্ত এরূপ দুর্ব্বিষহ যাতনা পাইলেন কেন! তাঁহারা কি দুঃখে পড়িয়া তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হয়েন নাই? ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি নিষ্ক্রিয় রহিলেন কেন? তিনি যখন ভক্তের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, তখন তাঁহাদের দুঃখের সময় উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে নিপীড়িত হইতে দিলেন কেন? তাঁহার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই ভক্তদিগকে রক্ষা করা উচিত ছিল। তাহা করেন নাই, ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ভগবান্ ভক্তের অধীন নহেন।

সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে, ভক্তই ভগবানের অধীন এবং ভগবানের ষোল আনা অধীনতা স্বীকার না করিলে কেহ ভক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যখন ভক্ত এইরূপ অবস্থায় উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা থাকে না। ভগবানের ইচ্ছাই তখন তাহার মধ্য দিয়া কাজ করে। এজন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে এক স্থলে লিখিত আছে,—"রাধা কৃষ্ণ দোঁহে মিলি হয় এক জন। এক আত্মা দুই বপু লীলার কারণ।" এ স্থলে রাধা শব্দে আরাধনাকারী ভক্ত এবং কৃষ্ণ শব্দে আকর্ষণকারী ভগবান্ বুঝাইতেছে। সাধনের চরম সীমায় উভয়ের দেহগত পার্থক্য থাকিলেও আত্মাগত কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তখন ভক্তের জীবনে যাহা কিছু ঘটিতে থাকে, তাহাই তিনি ভগবানের ইচ্ছানুমোদিত মনে করেন এবং তাহা দুঃখজনক হইলে অক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করিয়া যান এবং সুখকর হইলে উৎফুল্ল

হয়েন না সাধারণ মনুষ্যেরা ভক্তদিগের এই জীবনরহস্য সহজে অনুভব করিতে পারে না। তাহারা নিজ নিজ জীবনের আদর্শ লইয়া ভক্তদিগের জীবন পরিমাপ করিতে যাইয়াই বিষম গোলে পড়ে। তাহারা যেমন দুঃখকে ভয়ের চোখে দেখে ও সুখকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে যায়, ভক্তগণও তাহা করিয়া থাকেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ভক্তদিগের জীবনের দুঃখের আধিক্যের সামঞ্জস্য করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ভক্ত যাহা মনে লয় তাহাই করিতে পারেন, এ কথার সত্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু ভক্তের মন যে পরিবর্ত্তিত হয়, তিনি যে সাধারণ মানবীয় মনের প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া উঠেন, সুতরাং তাঁহার মনে সাধারণ মানুষের ন্যায় যাহা,তাহা আসিবে না, একমাত্র ভগবানের ইচ্ছানুমোদিত যাহা, তাহাই আসিবে, কাজেই তাহা পূর্ণ হইবে। তাই বলি, ভক্ত যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে একথা ষোল আনা সত্য। তাই বাহিরের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, ভগবান্ ভক্তের অধীন। যতদিন ভক্ত হইতে না পারিব, ততদিন অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, কারণ মানব-মন সাধারণতঃ ভগবানকে অতিক্রম করিয়া চলে। কাজেই বলিতে হয় যে ভগবান্ অভক্তের অধীন নহেন।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

কাশ্মীর।

অসীম-সৌন্দর্য্য-রত্নাকর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নাম কোন্ ভারতবাসীর নিকট অবিদিত? ইহার নির্ম্মল বায়ু, সুপেয় জল, নয়ন-মনোহর উৎস, অভ্রভেদী গিরিমালা, নির্ম্মল শৈলরাজিবেষ্টিত হ্রদ, বিবিধ বর্ণের কুসুমনিচয়, সুগন্ধি কেশর, স্বভাবসুন্দর নরনারী, মনোহর শিল্প, ত্রিভুবনবিখ্যাত সূক্ষ্মকারুকার্য্যখচিত পশমী শাল, এবং নানাবিধ কারুকার্য্যের কথা কে না শুনিয়াছে? জগতে যাহা আশ্চর্য্য, যাহা কিছু সুন্দর আছে, সকলই কাশ্মীরে বর্ত্তমান, এই ধারণা বহুকাল হইতে আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। দেশে বিদেশে, শত শত পুস্তকে এই দেশের প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বনামখ্যাত ইংরাজ কবি টমাস্ মুর তাঁহার প্রণীত "লালা রুখ্" নামক কবিতায় কাশ্মীরকে অমর করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই সেই কবিতা পাঠ করিলে কাশ্মীরকে অমরধাম বলিয়া ধারণা হয়। একজন ইংরাজ এতই মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি এক চিনার বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং কেবল "লালা রুখ্" পড়িতেন। স্বাস্থ্যলাভোদ্দেশে অনেক শ্বেতাঙ্গ বোম্বাই বা করাচি বন্দরে নামিয়া

একেবারে কাশ্মীরে গমন করেন এবং সেখানে নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, কাশ্মীরে স্বাস্থ্য-প্রদ জলবায়ুর গুণে সকল পীড়াই সত্বর আরোগ্য লাভ করে। সেই জন্যই ঐ সঞ্জীবনী জলবায়ুর গুণে মুগ্ধ হইয়াই তাহারা কাশ্মীরকে "জগতের স্বাস্থ্যনিবাস" (World's Sanitarium.) আখ্যা দিয়াছেন।

যে দেশের এত প্রশংসা শ্রুত হয়, সে দেশ কাহার না দেখিবার বাসনা হয়? কিন্তু ইচ্ছা হইলেই সকল সাধ সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। "উথায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।" নিরন্ন ভারতবাসী, যাহাদের অর্থ এবং অবকাশ দুয়েরই নিতান্ত অভাব—যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সূত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-চিন্তায় জীবনের এক তৃতীয়াংশ ভাগ অতীত হইয়া যায়, তাহারা কিরূপে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে? অনেকের অর্থ আছে কিন্তু অবকাশ নাই, আবার যাহার অবকাশ আছে তাহার অর্থ নাই। সকল সময়ে এ দুইএর একত্র সংঘটন ঘটিয়া উঠে না। আমাদেরও বহুদিন হইতে কাশ্মীর দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপরোক্ত কারণে ঘটিয়া উঠে নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় একবার সুবিধা হইয়াছিল, সেবার যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু কাশ্মীরে সকল সময়ে যাইবার সুবিধা নাই, কেন নাই তাহা পরে বলিব। মোটের উপর অনেক অনুসন্ধানে জানিলাম, শরৎকালের প্রারম্ভে যাওয়াই প্রশস্ত। সেবারে সে সময়ে আমাদের ছুটি ছিল। আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু কালবিলম্ব না করিয়া শারদীয়াপূজাবসানে যাত্রা করিলাম। হাবড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের পঞ্জাব মেলে চড়িয়া বরাবর রাওলপিণ্ডি সহরে রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিলাম। সেখানে আমাদের কলিকাতাস্থ একটী প্রতিবাসী কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন, তাঁহার গৃহে অতিথি হইলাম। দেখিলাম তিনি এবং আরও কয়েকটী ভদ্রলোক একত্র মিলিয়া 'মেস' করিয়া আছেন। বহু দিবস পরে তাঁহারা স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর মুখ দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন তাহা আর কি বলিব? আমাদিগকে কোথায় রাখিবেন, কি করিয়া সুখী করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, গল্প ফুরায় না। বাঙ্গালার অবস্থার কথা, স্বদেশী-আন্দোলনের কথা, ন্যাসন্যাল কলেজের কথা, বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নানা কথায় রাত্রি হইয়া গেল, চর্ব্ব্য চোষ্য নানাবিধ আহার করিয়া পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, বাবু মৎস্যের চেষ্টায় গিয়াছিলেন একটী বৃহৎ মাহসির মৎস্য আনিয়াছেন। কাজেই কমিটি বসিয়া গেল, কি করিয়া সদ্ব্যবহার হইতে পারে। এ বিষয়ে নানাপ্রকার সৎপরামর্শ চারিদিক্

হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল, অবশেষে ঘোরতর গণ্ডগোলের পর, সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত পলাণ্ডএর ব্যবস্থা হইল। অতি পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন ব্যাপার সম্পাদিত করিয়া সহর পরিদর্শনে বাহির হওয়া গেল।

এই স্থানে রাওলপিণ্ডি সম্বন্ধীয় দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদিগের অসন্তোষের কারণ হইবে না।

রাওলপিণ্ডি পঞ্জাবের অন্তর্গত সীমান্ত প্রদেশ বলিয়া ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের এখানে প্রধান সেনানিবাস। যুদ্ধবিগ্রহের যাবতীয় উপকরণ এখানে বর্ত্তমান। বড় বড় ইংরাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা রক্ষিত সহরটী লেহ নামক ক্ষুদ্র নদীর উভয় পার্শ্বে, এবং সমুদ্রতট হইতে ১৭৬২ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই নদীর উত্তরকূলে দেশী সহর; অপ্রশস্ত, অপরিষ্কার, জনাকীর্ণ রাস্তা, রাস্তার দুই পার্শ্বে পাথরের বড় বড় বাড়ি, উপরে থাকিবার স্থান, নীচে পঞ্জাবী, পেশোয়ারীদিগের বিপনি। নদীর অপর তীরে গোরা বাজার (cantonment.) ও সেনানিবাস। এখানকার রাস্তা বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার। অনেক স্থানে উদ্যানসংলগ্ন, ইংরাজী ধরণের বাটী। একটী রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাজার। তথায় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের আমদানি দেখিলাম। মুলতান, পেশওয়ার, লক্ষ্মণঝোলা, মরি, ধারওয়াল প্রভৃতি স্থানজাত দ্রব্যে পূর্ণ। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় কার্পাশ ও পশমী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে দেখিলাম।

আফিস, আদালত, বিদ্যালয়, প্রভৃতি সমস্তই এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই বাঙ্গালীদিগের এই পল্লীতে বাস। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। একজন বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুও অত্যন্ত সুযশের সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

লেহ নদীর জল কর্দ্দমাক্ত ও স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া, একটী ক্ষুদ্র শৈলের উপর, তত্রস্থ প্রস্রবণ বৃহৎ জলাধারে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সেই জলাধার হইতে নল দিয়া সহরের জল সরবরাহ হয়। এই গিরিপ্রস্রবণের জল অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। পূর্ব্বে এই প্রদেশের জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল; কিন্তু এখন প্লেগ, কলেরা ও বসন্তের প্রভাবে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সহরের চারিদিকে বিকীর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব বেশ প্রমাণ হয়। তবে বর্ত্তমান নগর যে আধুনিক, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। হিন্দুরাজ্য বিধ্বস্ত হইলে এই প্রদেশ গক্কর জাতির অধীনে কিয়ৎকাল ছিল; তাহার পর মুসলমানেরা উহাদিগকে পরাজিত করিয়া আপন অধীনে আনয়ন করে। পরে মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে এবং শিখদিগের অভ্যুদয় সময়ে শিখ সর্দ্দার গুর্জর সিংহের অধীনে এই দেশ শাসিত হইত। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ পঞ্চনদের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে এই প্রদেশও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ সাম্রাজ্য বৃটিস্ সিংহের

করতলস্থ হইলে এই প্রদেশ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভুক্ত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই স্থানে বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু চরমুখে সংবাদ পাইয়া ইংরাজ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়ায় পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। রাওলপিণ্ডি নগরে পদচ্যুত আমীর, সাহ সুজা বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে লর্ড ডফারিন তাৎকালিক আমীর আবদর রহমানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক বৃহৎ দরবার করেন। এই রাওলপিণ্ডি নগরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গাম ঘটিয়াছিল। লোকে উন্মত্ত হইয়া গির্জা প্রভৃতি পুড়াইয়া দিয়াছিল। এই হাঙ্গাম করার অপরাধে লালা হংসরাজ প্রভৃতি কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হন। পরে মাসত্রয়ব্যাপী বিচারের পর ইঁহারা নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

গীতার ব্যাখ্যা।

গীতা জগতে অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থরাশি এই গীতার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কাব্যাংশেও গীতা অতুলনীয়। ইহার অভিনেতা স্বয়ং ভগবান্ ও ভারতের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। স্থান কুরুক্ষেত্র। ভারতনারীগণের মধ্যে এখন ধর্ম্মভাবের শিথিলতা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পরনিন্দা, তাসক্রীড়া এবং অলসভাবে দিন না কাটাইয়া, যদি তাঁহারা এই মহা গ্রন্থখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন এবং জীবনে তাহার ফল দেখাইতে পারেন, ভারতনারী নিজ গৃহে পুণ্যের শুভ্রালোক বিভাষিত করিতে সমর্থ হইবেন। আমি সরল ভাষায় গীতা হইতে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যখন দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে তাহার পিতৃব্যপুত্র পঞ্চপাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি দিবেন না বলিয়া অন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই আত্ম-বিগ্রহ শান্তির জন্য, যথোচিত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষস্থ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নৃপতিমণ্ডল যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে সমবেত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তম জ্ঞাতিকুলে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ। প্রকৃত বীরের ন্যায় সদর্পে গ্রীবা উন্নত করিয়া—

ধনঞ্জয় কহিলেন প্রভু পদ্মনাভে।
না করিব যুদ্ধ আমি ছার সব ভবে॥

আমি নিজ হস্ত জ্ঞাতিশোণিতে কলঙ্কিত করিতে পারিব না। ভিক্ষান্নলব্ধ দ্রব্যে জীবনযাপন গৌরবজনক মনে করিব। আমার হৃদয় মহাশোকে ও বৈরাগ্যে বিহ্বল হইতেছে, এই ভাব, ধরার সামান্য অধিকার কেন, সুররাজ্যের

অধিকারও বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ভগবান্ বলিলেন,—

আকুলতা পরিপূর্ণ স্থির অচঞ্চল—
সমুদ্রে মিলিত হয় নির্ঝরণীজল।
তেমনি ব্রহ্মেতে কর সব সমর্পণ,
লাভালাভ ধনঞ্জয়! করোনা গণন॥

ধনঞ্জয় তথাপি অটল রহিলেন। ভগবান্ বলিলেন, তুমি স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করিবে। অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্! স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির-লক্ষণ কি?

ভগবান্ বলিলেন,

সমস্ত কামনা যেই করে বিসর্জ্জন,
আত্মাতেই আত্মানন্দ ভুঞ্জে অনুক্ষণ,
প্রজ্ঞা যার আত্মাতেই স্থির ভাবে রয়,
আত্মারাম সে সাধুরে স্থিতপ্রজ্ঞ কয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে কেন আমাকে এই ঘোরতর অপকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।

ভগবান্ বলিলেন, কর্ম্ম না করিলে লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। অকর্ম্মা থাকিতে কেহ পারে কদাচিত; স্বভাবগুণেতে জীব কর্ম্মে নিয়োজিত।

জীবকে প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। অজ্ঞানীরা সকাম ভাবে যে কর্ম্ম করে, জ্ঞানীরা তাহা নিষ্কাম ভাবে করেন। তুমি যে দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতেছ অর্থাৎ যুদ্ধে বিরত হইতে চাহিতেছ, ইহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্! কোনটী সুকর্ম্ম, কোনটী দুষ্কর্ম্ম এবং কর্ম্ম-হীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব? ভগবান্ বলিলেন, ঈশ্বরজ্ঞান লাভার্থে কর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুটীর কোনটী শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বলিলেন, উভয়ই শ্রেষ্ঠ, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম্মযোগী সর্ব্ব-ভূতেই পরমাত্মাকে দর্শন করে, সে কর্ম্ম করিয়াও পদ্মপত্র যেমন সলিলে অনার্দ্র-ভাবে বাস করে, কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।

ব্রহ্মে সমর্পিয়া পার্থ! কর্ম্মে হও রত।
না হবে পাপেতে লিপ্ত পদ্মপত্র মত॥

(ক্রমশঃ)

নিবেদন।

বামাবোধিনীর হিতৈষিণী ভগ্নীগণ সকলে বিদিত আছেন, যে বামাবোধিনী এখন পিতৃহীনা, এবং স্বর্গগত ৺ উমেশ চন্দ্রের অভাবে সে ভগিনীগণের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক্ষণে আমা-দের কর্ত্তব্য সেই সাধুপুরুষের কীর্ত্তিকে সজীব করিয়া রাখা। বামাবোধিনী কেবল অকাতরে অক্লান্তভাবে নারী-

গণের নিমিত্ত আজীবন কার্য্য করিতেছে। এজন্য সকল ভগিনীগণ ইহার নিকট চির-কাল ঋণী। অতএব ইহাঁর প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? এবং সেই কৃত-জ্ঞতার অনুষ্ঠানও আবশ্যক। মানবের সদাশয়ের পরিচয় শুধু বাক্যে প্রকাশ হয় না, সংসারে উহা কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজন হয়। এই কর্ত্তব্য ভাবিয়া মাননীয়া ভগিনী শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা অগ্রসর হইয়া উক্ত কর্ম্মবীর সাধুর স্মৃতি রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি বিদুষী ভগিনীগণকে আহ্বান করিয়া যে সভা গঠন করেন তাহা কাহারই অবিদিত নাই, তৎকালোচিত কার্য্যও আশাজনক হইয়াছিল। ৺উমেশচন্দ্রের ভক্তশিষ্যা ও উপকৃতা ভগিনীগণ যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইহাই আশা হইয়াছিল যে, আমাদের স্বদেশী ভগিনীগণ বুঝিয়াছেন,—এক্ষণে আমাদের ব্রত, নিয়ম, শুভ-অনুষ্ঠান সকল কেবল অন্তঃপুরের সীমাবদ্ধ নহে। ইহা আর শুধু আপন আপন স্বামী পুত্রের কল্যাণ উদ্দেশেই সাধিত করিয়া তৃপ্তি ও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, শুধু বেশ-ভূষায় এখন তারা অর্থ অপচয় করে না, গুণের আদর, সৎকর্ম্মের মর্য্যাদা ও সাধুর পূজা করিতে শিখিয়া তাহারা সংসার ও সমাজকে উন্নত করিতে শিখিয়াছে।

যে মহাত্মা নারীগণের শিক্ষার নিমিত্ত শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কোন কষ্টই গ্রাহ্য করেন নাই। আজ তাঁহার অকস্মাৎ বিয়োগজনিত গুরুতর অভাব যাঁহারা প্রাণে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত শুধু বাক্যের দ্বারায় নহে, সাধ্যমত কার্য্যে প্রকাশ করিয়া, প্রকৃত সাধুভক্তির পরিচয় দেন। বাঙ্গালী পুরুষগণের একটা কলঙ্ক শুনা যাইত "বাক্যবীর," কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে এক্ষণে সে কালিমা মুছিবার উদ্যোগ হইয়াছে। কিন্তু রমণী-গণেরও কি সেই আখ্যা লওয়া অদৃষ্টে ঘটিবে। যাহারা সংসার ও সমাজের শুভদাত্রী, মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি স্বরূ-পিণী, তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে সমুৎসুক হইলেই উন্নতির দ্বার উদ্ঘা-টিত হইবে।

ভগ্নী স্বর্ণপ্রভা বসু মহাশয়া ভীষণ শোক ও রোগাচ্ছন্ন হইয়াও তদীয় অনুষ্ঠিত ৺উমেশচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে বিমুখ হন নাই। এক্ষণে বঙ্গরমণী মাত্রেরই এই সদাশয়া মহিলার সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহানগরী রাজধানী কলিকাতানগরী বিদুষী মহিলাগণের শীর্ষস্থানীয় ও অধিকাংশ ভগিনীরা উক্ত মহাত্মার ভক্ত। তাঁহারা এ সকল অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝিয়াও কেন যে নিরুৎসাহী, তাহা বুঝা যায় না। এ সকল মহৎ ব্যাপার এক জনের দুই জনের আয়ত্তাধীন নহে। আমরা সকল ভগ্নীগণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সদানুষ্ঠানের অনুরাগিণী

হইব। "সত্য" একও ধ্রুব ইহা নিশ্চিত। দলাদলি, মতান্তর এ সকল পরিত্যাজ্য। যখন আমরা সমস্ত বল একত্র করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইব, তখনি আমাদের দেশের অভাব মোচন হইবে।

আর্য্যনারীর সুপ্রকৃতি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে রমণী-শক্তির কার্য্যকারিতার শত শত নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমরা অশিক্ষিতা বঙ্গনারী। অদ্য এই প্রবাসিনী দীনা হীনা ভগিনীর নিবেদন যে ৺উমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি ভাণ্ডারের নিমিত্ত তথাকার উপযুক্ত শক্তিশালিনী ভগিনীগণ পুনরায় সভা আহূত করিয়া নিশ্চেষ্টগণের উত্তম উৎসাহ জাগাইয়া তুলুন এবং সত্বর যদ্দ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া যায়, সেই উপায় করুন।

দেবতার পূজা যেমন নিত্য বিধেয়, সাধু মহাত্মাও সৎকর্ম্মশীল মানবের পূজাও তদ্রূপ নিত্য কর্ত্তব্য। এই সেই দিন আমরা সকল ভগ্নীতে বামাবোধিনীর প্রতিষ্ঠাতার ও নারীশিক্ষার পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষীর নিমিত্ত অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিয়া হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিয়াছি ও সকলেরই অন্তঃকরণে তাঁহার গুণগাথা চিরদিন সমভাবে অঙ্কিত থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, কিন্তু ভগ্নী স্বর্ণপ্রভার আদর্শ অতি উচ্চ ও অনুকরণীয়। এক্ষণে অব্যাঘাতে অবিলম্বে যাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবেন ইহাই বিশেষ অনুরোধ।

বিনীতা নিবেদিকা ভগ্নী
শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী

মিলন।

পশ্চিম দেশবাসী বাবু সুরযমল একজন অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার জমিদারী তালুক অনেক স্থানে আছে। একশত আশী খানা গ্রাম তাঁহার তালুকের মধ্যে, এতদ্ভিন্ন বাড়ী বাংলা বিস্তর আছে।

এক কথায় বলিতে গেলে তিনি একজন বেশ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই।

তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা সকল পথিকের নয়ন মুগ্ধ করে। বাড়ীখানির চতুষ্পার্শ্বে মনোহর উদ্যান। সম্মুখে কত প্রকার পুষ্পবৃক্ষ রহিয়াছে, গোলাপ, বেল, চামেলি, যুঁই রজনীগন্ধা, চাঁপা, কামিনী, বকুল, টগর ইত্যাদি পুষ্পের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। এক পার্শ্বে আম জাম লিচু কাঁঠাল নাশপাতি আলুচার বৃক্ষগুলি ফলভারে নত হইয়া রহিয়াছে। উদ্যানের অপরপার্শ্বে একটী বৃহৎ সরোবর, তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, বৃক্ষ-সমূহের

প্রতিবিম্ব পড়িয়া অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে, এবং স্থানটী শীতল হইয়া রহিয়াছে।

শ্রাবণের সমস্তই গত, নিদাঘের প্রখরতা আর নাই। মার্ত্তণ্ডদেব এখন গমনোন্মুখ হইয়াছেন, ধরণী নিস্তব্ধরূপ ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের একটীও পল্লব নড়িতেছে না। দেখিতে দেখিতে নিশাদেবী নিজ সহচরী তারকারাজির সহিত মিলিত হইয়া আকাশমার্গে উদিত হইলেন। কৃষকেরা লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া গাভীগণসহ নগরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিগ্রহদেবের সান্ধ্য-আরতি শেষ হইল। সুরযমলের গৃহের কক্ষে কক্ষে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। এমন সময়ে উদ্যানের সরোবর-তীরে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা কপোলে কর বিন্যস্ত করিয়া গাঢ় চিন্তাযুক্তা হইয়া বসিয়া আছে। ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বালিকা তথাপি উঠিল না। ধীরে ধীরে শীতল সমীরণ বহিতে লাগিল, এবং আকাশে মেঘ দেখা দিল। বায়ুর সন্ সন্ শব্দে পৃথিবী ধূলীময় হইয়া উঠিল, এবং মেঘগর্জ্জনের সহিত দুই চারি ফোঁটা করিয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। কিন্তু বালিকার চিন্তা অপসৃত হইল না। এমনই অন্যমনস্ক-ভাবে বসিয়া রহিয়াছে যে, বাহ্যবস্তুর প্রতি কিছুই লক্ষ্য নাই। এরূপ সময়ে আর একটি সুন্দরী পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া অতি ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "কিশোরী ভাই! তুমি এখানে রহিয়াছ? আমি সকল স্থানে তোমাকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে এখানে আসিলাম। এই ঘোর অন্ধকার, বৃষ্টি পড়িতেছে, আর তুমি এখানে একাকী বসিয়া আছ, তোমাকে না দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী সেই পর্য্যন্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, এস শীঘ্র গৃহে যাই।"

এই কথা শুনাতে কিশোরীর চমক ভাঙ্গিল এবং অতি বিষণ্ণভাবে বলিল, "যমুনা! মা কি আমাকে খুঁজিতেছেন?" যমুনা বলিল, "সই! তেবে ভেবে আর কি করবি বল্। এই এমন ঠাণ্ডা, আর গায়ে জল পড়্ছে, আজই যে অসুখ কর্ব্বে। শরীরের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখ, মায়ের প্রাণে আর দুঃখ দিস্‌নে ভাই।" কিশোরী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাইত এতখানি যে রাত্রি হইয়াছে, ও মেঘ করিয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যমুনা তোর কাছে আমার কিছুই লুকানো নাই, ভাই, সকলি জান, আমার শরীর থাকায় আর কি সুখ, কেবল মা বাবার জন্যই কষ্ট হয় যে, পাছে আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁদের মনে আঘাত লাগে, সেই জন্যই আমি উঁহাদের সম্মুখে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াই। কিন্তু যমুনা আর আমি পারি না, যার জন্য এ দেহ মন প্রাণ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে সে একবার ফিরিয়াও দেখেনা, তবে আর এ জীবন ধারণে প্রয়োজন কি?" এই বলিতে বলিতেই খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তখন কিশোরী ও যমুনা উভয়ে

দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিল। এখন কিশোরী ও যমুনার পরিচয় দি।

সুরযমলের সংসারে তাঁহার স্ত্রী সুচিন্তা ও একমাত্র কন্যা রাজকিশোরী। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায়, কিশোরী মা বাপের অতিশয় স্নেহের পাত্রী ছিল।

যমুনা কিশোরীর সখী, দুজনে ভারি ভাব, উভয়ে উভয়কে না দেখিলে এক দণ্ড থাকিতে পারে না, দেখিতেও উভয়ে একই প্রকারের। কিশোরী যেমন রূপবতী, গুণবতীও তদ্রূপ। সুরযমল স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং নিজেও অতিশয় জ্ঞানবান্ এবং বুদ্ধিমান্ পুরুষ। এজন্য স্ত্রী ও কন্যাকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাতে আবার কিশোরী পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, সেজন্য তাহার উপর সমস্ত ভালবাসা, এবং রীতিনীতি শিক্ষাও খুব ভাল করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর সকল বিষয়ে কাহাকেও সুখী করেন না।

কিশোরীর কোন বিষয়েরই অভাব ছিল না, কেবল এক বিষয়ে সে অতিশয় অসুখী, কিশোরী একমাত্র সন্তান বলিয়া সুরযমল ও সুচিন্তার ইচ্ছা ছিল না যে, তাহার বিবাহ দিয়া আপনাদের নিকট হইতে দুর শ্বশুরালয়ে পাঠান, তাহাতে উভয়ের অতিশয় কষ্ট হইবে ভাবিয়া এরূপ স্থানে পাত্র স্থির করিয়াছিলেন যাহাতে, কিশোরী তাঁহাদের নিকটেই আজীবন থাকে। সৌভাগ্যবশতঃ সুরযমলের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইয়াছিল।

তাঁহার জামাতার পিতা মাতার কেহই বর্ত্তমান ছিল না এবং পৈতৃক সম্পত্তিও বিস্তর ছিল। ছেলেটী দেখিতে শুনিতে ভাল, লেখা পড়াও করিতেছে এই সমস্ত দেখিয়া কিশোরীর সহিত অতি সমারোহে বিবাহ দিয়াছেন এবং আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছেন। ইচ্ছা যে, খুব ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া আপনাদের কাছে রাখিবেন।

সুরযের পুত্র সন্তান ছিল না, কাজেই কিশোরী তাঁহার সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে।

কিন্তু মানুষে যাহা ভাবে তাহা হয় না, সুরযেরও সকল মনোমত হইয়াছিল, কেবল জামাতা তেজকুমার কন্যাকে ভাল না বাসাতে তাঁহার মনে বড় কষ্ট ছিল, এবং সেই দুঃখই কিশোরীর মনঃপীড়ার কারণ। কেন যে এরূপ, কেহই বলিতে পারে না।

এদিকে তেজকুমারের স্বভাব চরিত্র অনিন্দনীয়, কোনরূপ দোষ ছিল না এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি, ভালবাসাও যথেষ্ট ছিল, কেবল কিশোরীর প্রতি তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে সকলেই অসুখী হইয়াছিল। সুচিন্তাও সর্ব্বদা ভাবিতেন কেমন করিয়া জামাতার মন ভাল হইবে, কত ঠাকুর দেবতার পূজা করিতেন, যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, সকল সময়েই তিনি সেই চিন্তাতেই থাকিতেন।

প্রতিবাসিনীদের জিজ্ঞাসা করিতেন, তেজকুমারের কেন এরূপ হইল। তাঁহারা

বলিতেন, "বিবাহের সময় যখন স্ত্রী আচার হয়, সেই সময় 'ছাঁউনি নাড়া' ফুল যদি কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে সরাইয়া লয়, তাহাতেই এরূপ হয়। তা আমাদের বোধ হয় রাজকিশোরীরও তাহাই হইয়াছে। তা না হলে তোমার জামাইয়ের স্বভাবও খুব ভাল, এমন কেন হবে, কোন্ চোক্‌খাগি এইরূপ করেছে"।

সুচিন্তা প্রতিবাসিনীদের নিকট ইহা শুনিয়া অতিশয় ম্রিয়মাণা হইতেন এবং বলিতেন,—"বোন্! তোরা কেউ বল্‌তে পারিস্ কি করে এ ভাল হয়।" একদিন প্রতিবেশিনীদের সহিত একটী বৃদ্ধা আসিয়াছিলেন, তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বৌমা! আমরাত কিছুই জানিনে, তবে আমাদের পাড়ায় জগতসিংহের মেয়ের নাকি ঐরূপ হয়েছিল, তাই তার ভাই কোথা থেকে একটা শীকড় এনে দেয়, উহা ধারণ করিলে 'স্বামী বশ' হয়। আর তাতে তার খুব উপকার হয়েছে। নামটা যে মনে আসছেনা, আমর! ঐ যে বলে, কি ব'লে 'বশীকরণ', মেয়েকে জামাই ভালবাসে, যা মানত করে তাই পায়।" ইহা শুনিয়া একটী যুবতী পরিহাস করিয়া কহিলেন, "ঠানদিদি! তুমি কেন আনিয়ে ঠাকুরদাদাকে বশ করনা।" ঠান্‌দিদি বলিলেন, "আমার আর বুড়ো বয়সে কি হবে, তোরা সব কর, তোদেরি এখন চাই, আমরা দেখি। বৌমা! তোমাদের যমুনা সকল সংবাদ জানে, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর"।

ইহা শুনিয়া গৃহিণীর যমুনাকে ডাকিতে আদেশ হইল। লছমনিয়া দাসী ডাকিতে গেল এবং পথিমধ্যেই কিশোরী ও যমুনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিল, তাহাদের মাতাঠাকুরাণী ডাকিতেছেন। কিশোরী ও যমুনা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিল, সেজন্য কিশোরী প্রথমেই নিজ কক্ষে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল এবং যমুনাও কাপড় ছাড়িয়া লইল। তখন দুই সখীতে মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুচিন্তা কিশোরীকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে মা? এই অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে, বোধ করি ভিজে গিয়েছিস্।" কিশোরী বলিল, "মা আমরা বাগানে পুকুরের ধারে বসেছিলাম, বৃষ্টি পড়িতেই উঠিয়া আসিয়াছি, এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, বলিয়া, মাতার নিকট উপবেশন করিল এবং যমুনা তাহার পার্শ্বে বসিল।

গৃহিণী যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যমুনা! তুমি নাকি জান, আমাদের পাড়ায় সিংহের মেয়েকে এক রকম কি ওষুধ দিয়েছে, তাতে উপকার হয়।" যমুনা উত্তর করিল, "হ্যাঁ মা! আমি জানি সিংহের মেয়ে শ্যামরাণীর ভাই কলিকাতা বেড়াইতে গিয়াছিল, সেখান থেকে কি পুথি এনেছে, তাই সকাল সন্ধে পড়ে ও সেই রকম কোরে কি করে, তাতেই খুব উপকার। মা আমাদের কিশোরীর জন্য আনাওনা।" গৃহিণী বলিলেন, "কর্ত্তাকে বলিয়া আনাইব"।

নগরের এক প্রান্তে বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত একটী কুটীরে দুই ব্যক্তি উপবেশন করিয়া আছেন। একের দেহ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত, তিনি মৃগচর্ম্মাসীন। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু শরীরে বল বীর্য্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে শ্রীমদ্ভগবৎগীতা খোলা রহিয়াছে, ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে অপর যুবাপুরুষটী আসিয়া দূরে কুশাসনোপরি বসিয়া একমনে সাধুপুরুষের মুখনিঃসৃত ভগবৎ মাহাত্ম্য শ্রবণে চিত্তনিবেশ করিয়া আছেন।

যখন তাঁহার পাঠ সাঙ্গ হইল, পুস্তক হইতে মুখ উত্তোলন করিতেই যুবা উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সাধুপুরুষ, "তেজকুমার কুশলে আছত ?" বলিয়া যুবাকে বসিতে আদেশ করিলেন। তেজকুমার দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক, গৌরবর্ণ, আয়ত লোচনে দীপ্ত উৎসাহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বলিলেন, "গুরুদেব! আপনার কৃপায় সকলি শুভ, কেবল আমার প্রাণের একমাত্র বাসনা যাহা, আপনার অবিদিত নাই "জননী জন্মভূমিয়" দুঃখ দূর করা। এই ব্রত যে দিন হইতে লইয়াছি, সেই চিন্তাই আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারি না, এমন কি আমার পত্নী কিশোরীর সম্বন্ধেও যথোচিত কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। সেও আমার এরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহতা হইয়া আছে। এখন কিরূপে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে তাহারই উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। গুরুদেব তেজকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদুহাস্য করতঃ কহিলেন, "বৎস! তোমার সঙ্কল্প মহৎ, ইহাতে তোমার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু পুত্র! ইহা কি একদিনের, কিম্বা একটী লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইবার কার্য্য ? তবে তোমাকে উপদেশ দিতেছি, প্রথমতঃ তুমি সর্ব্বসাধারণকে "একতা" মহামন্ত্র শিখাইতে পার ও তাহাতে যদি সফলকাম হও, তাহা হইলে জানিবে বৎস! দুঃখিনী জননীর উদ্ধারসাধন নিকট প্রায়। অতএব তুমি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গিয়া "গৌর যেরূপে নদীয়ায় হরিনাম বিলাইয়াছিলেন," তুমি সেইরূপে "একতা মন্ত্র" প্রচার কর, ও সকল লোকের হৃদয়ে যাহাতে ঐ বাণী দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় তাহারই চেষ্টা কর, তাহাতে কালবিলম্ব করিও না। আর এক কথা বলিব, তুমি আমার মা লক্ষ্মীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। তোমার গোড়াতেই ভুল দেখিতেছি। স্ত্রী স্বামীর সকল বিষয়েই সহকারিণী, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সম্পদে, বিপদে। তোমার শরীর-মনের অর্দ্ধেক অংশ তাহাতে রহিয়াছে। অতএব তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কিরূপে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইবার বাসনা করিতেছ ? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমার বিদ্যার ব্যুৎপত্তি আছে জানিয়া অধিক আর বলিতে চাহি না, এখন তুমি গৃহে যাও এবং যাহা যাহা বলিলাম তাহারই অনুষ্ঠান কর।" এই বলিয়া সাধুপুরুষ ধ্যানমগ্ন

হইবার উপক্রম করিলেন। তেজকুমার প্রণিপাতপূর্ব্বক বিদায় লইলেন।

যমুনা শ্যামার নিকট হইতে তাহার ভাই যে পুঁথী আনিয়া দিয়াছে, তাহা লইয়া আসিয়া কিশোরীকে দিয়াছে, কিশোরী পুস্তক লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছে, ঠিক্ সেই সময়েই তেজকুমার সেই কক্ষে ধীর পদবিক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে অনিমেষ লোচনে কিশোরীর সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিলেন। কিশোরী এমন ভাবমগ্ন হইয়া পাঠ করিতেছিল যে, তেজকুমারের আগমন কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি, অযত্ন বিন্যস্ত হইয়া কপালে ও গণ্ডদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পরিধানে একখানি সামান্য কালাপেড়ে স্বদেশী শাড়ী, হস্তে কয় গাছি চুড়ি, ও গলায় একটী সূক্ষ্ম সুবর্ণহার (ইহা তাঁহার মাতার নিতান্ত অনুরোধ অঙ্গচ্যুত করিতে পারিতেন না)। ইহাতেই কিশোরীর দেহের লাবণ্য সমধিক উজ্জ্বল দেখাইতেছে। চিন্তাক্লিষ্ট মলিন মুখ, তবুও তাহাতে কত সুষমা বিরাজ করিতেছে।

তেজকুমারকে তদবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, হঠাৎ বায়ুর বেগবশতঃ দ্বার বন্ধ হইয়া গেল, ও সেই শব্দে কিশোরী চমকিয়া যেমন মস্তকোত্তোলন করিল অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইয়াই পুনরায় নত হইয়া গেল। বিবাহের পর এই ভাবে এই প্রথম দর্শন।

কিশোরী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এই পুস্তকের এমনি কোন গুণ অবশ্য আছে যদ্দ্বারা তাহার আকর্ষণে তেজকুমারকে তাহার নিকটে লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না, প্রেমপূর্ণ লজ্জা তাহাকে বাধা দিল। তেজকুমার ধীরে ধীরে আসিয়া কিশোরীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং তাহার মৃণালসদৃশ কোমল হস্ত দুইখানি নিজ হস্তে লইয়া অতি করুণস্বরে কহিলেন, "কিশোরী! তোমার প্রতি এতদিন অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। বল প্রাণাধিকে! আমায় ক্ষমা করিবে কি ?" কিশোরী কি বলিবেন, তাঁহার আনত লোচনযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিজিয়া গেল। তাঁহার বাক্যকথনের ভাষা মুখে বলিবার সামর্থ্য রহিল না।

তেজকুমার তখন কিশোরীর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল সাদরে মুছাইয়া বলিলেন, "কিশোরী! আর কাঁদিওনা, তোমার চক্ষের জল আমার হৃদয়ে অতিশয় বেদনা দিতেছে, আজ হইতে তোমার সকল কষ্টের অবসান হইল। তুমি আমার সকল দোষ ভুলিয়া যাও। আমার জীবনের আজ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। গুরুদেবের কৃপায় চক্ষুরুন্মিলনের অবসর ঘটিয়াছে। কিশোরী! তুমি বালিকা হইলেও মহাশক্তির অংশ, আমি তোমার বল না পাইলে সংসারে উন্নতি করিতে পারিব না। আমার দাম্পত্যজীবন এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল

আমি কি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা বলিয়া জানাইবার আবশ্যক নাই। তুমি দেখিতেই পাইয়াছ অবনতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলাম। কিশোরী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "কেন তুমি এত অনুতাপ করিতেছ? হতাশ হইবারত কোন কারণ নাই, এখনি কি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাকে তুমি যে পথে লইয়া যাইবে আমি নির্ভয়ে অগ্রসর হইব। গৃহে বাহিরে, সমাজে, সংসারে, অথবা ইহলোকে পরলোকে হউক আমি চিরসঙ্গিনী চিরদাসী"। তেজকুমার হর্ষবিস্ময়ে মগ্ন হইয়া কিশোরীর হস্তস্থিত পুস্তক লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি বই," খুলিয়া দেখেন "পতিব্রতাধর্ম্ম"।

এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একদল গৈরিকবসনধারী যুবক সঙ্কীর্ত্তন লইয়া বাহিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণী আপনাদিগকে ডাকিতেছেন। ইহা শুনিয়া তেজকুমার সত্বরে সেই সন্তানের দলকে অভ্যর্থনা করিতে গেলেন।

নূতন সংবাদ।

বাঙ্গলা সংক্ষেপে লিখন প্রণালী—গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন—এখন হইতে পুলিশের লোকদিগকে বাঙ্গলায় সংক্ষেপলিখন প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে ইংরাজী সর্টহ্যাণ্ড প্রণালীর ন্যায় বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিলে তাহা দ্রুত লিখিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের সম্মান—ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বম্বের আঞ্জুমান ইসলামিয়া সভায় সমাজসংস্কার উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, বোম্বায়ের গবর্ণরের পত্নী কর্ত্তৃক এই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি বোম্বাই হইতে সুরাট, বরোদা ও আহম্মদাবাদে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

অর্দ্ধোদয় যোগ ও স্বেচ্ছাসেবক—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, রেলের ষ্টেশন মাষ্টার প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা স্বেচ্ছাসেবকদের অসীম স্বার্থত্যাগ ও যত্ন দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে ধন্যবাদ দিবার জন্য কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ মেরী কার্পেণ্টারহলে ভলণ্টিয়ারদিগকে আহ্বান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

দান—এলবার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালে একটী রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার পিতা ৺মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্নের নামে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য এক ঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য বাবু রামচন্দ্র গোয়েঙ্কা ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ছোট লাট গত সোমবার সেই ঘাটের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

পোর্টুগালে অরাজকতা—সম্প্রতি ইউরোপে পোর্টুগালে তথাকার রাজা, রাণী ও যুবরাজ এক গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে রাজদর্শনের জন্য অনেক লোকসমাগম হয়। জনতার মধ্য হইতে ক্রমান্বয়ে তিন জন লোক রাজার গাড়ীতে গুলি নিক্ষেপ করিয়া রাজা ও যুবরাজকে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে, গুলি রাণীর গায়ে লাগে নাই। এই হত্যার কারণ কিছুই জানা যায় নাই। এই দুর্ঘটনায় সকলেই চমকিত হইয়াছেন।

মৃত্যু—কলিকাতা পাইকপাড়ার কুমার সতীশ চন্দ্র সিংহ গত মাঘ মাসে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

সরস্বতীপূজা—গত সরস্বতীপূজার দিন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীদিগের পূজা দর্শনার্থ বড়লাটপত্নী লেডী মিণ্টো লেডী ভায়েলেট ইলিয়ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বিদ্যালয় দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহিলাসমিতি—অর্দ্ধোদয়যোগের সেচ্ছাসেবকদিগকে তাহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারার্থে ধন্যবাদ দিবার জন্য কলিকাতা মহানগরীর সম্ভ্রান্ত মহিলারা গত ২৩এ মাঘ মেরী কার্পেণ্টর হলে মিলিতা হইয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী সভাপত্নীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নূতন আইন—বিলাতে আইন পাশ হইয়াছে যে, ষোল বৎসরের নিম্ন বয়স্ক কোন বালক ধূমপান করিলে সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চরিত্র সংশোধন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে। এই আইনের প্রচলন এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দান—পোস্তার রাণী শ্রীমতী কস্তুরী মঞ্জরী দাসী বেলগেছিয়ার এল্‌বার্ট ভিক্টর হাঁসপাতালের দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

খুলনা প্রদর্শন—খুলনার শিল্প প্রদর্শনী মেলা উপলক্ষ্যে তত্রত্য জজপত্নী শ্রীমতী পালিত প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন।

বামারচনা।

গৌরী-কুণ্ড।

১

পুণ্যময়ী গৌরী-কুণ্ড প্রণমি তোমায়
তোমার নির্ম্মল-নীরে,
তোমার পবিত্র তীরে,
সুরাঙ্গনা সিদ্ধ-হস্তে শুদ্ধতা ছড়ায়।

২

মস্তকে কেদারেশ্বর, নিম্নে ভাগীরথী
মধ্যে তুমি সুসলিলা,
চারিদিকে বাঁধাশিলা,
সম্মুখে শতেক সিড়ী কে রেখেছে গাঁথি।

৩

(তব) দক্ষিণে শ্মশান ঘাট, নীলকণ্ঠ বামে,
ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার,
কোটি শিব চারিধার,
শ্রবণ-ইন্দ্রিয় তৃপ্ত কল কল গানে।

৪

তোমার নির্ম্মল-নীরে মৎস্য কেলি করে,
পেকারবে হংসকুল,
অর্ঘ থায় দলে ফুল,
সমীর মেদুরে বয়, শান্তি পরে ঝরে।

৫

কাশীধামে গৌরী-কুণ্ড অতি মনোরম,
গঙ্গাতীরে অপরূপ,
সৌন্দর্য্যের শতস্তূপ,
বেগবতী জাহ্নবীর নাভি-পদ্ম সম।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

দানের পূর্ণতা।

সৈকতের পদতলে অর্পে নদী প্রতিদিন
হৃদয়ের পূজা সমাচার,
ধরারে প্রদানে তরু, স্নিগ্ধ আলিঙ্গনময়
অবারিত ছুয়ার সম্ভার।
শূন্যেরে শবদ দেয়, নিত্য নব ছন্দময়
কত গীত কত মোহ তান,
দিবস জগত কাছে করে নিত্য নিবেদন,
আলোকের উপকার দান।
ধরণী বসন্তে দেয় হরিত বসনময়
মঞ্জুরিত যৌবন চেতন,
অনিল আকাশপদে, দেয় নিত্য বিলাইয়া
উথিলিত পরাণ আপন।
ফুল সে ঝরিয়া পড়ি সমাপ্ত জীবন গাথা
দেয়গো তরুর পদতলে,
হরষে বিটপী দেয় স্বপ্নালস ছায়াখানি
তার মধুর শয্যার তরে ঢেলে,
ঊর্ম্মি দেয় অবিশ্রাম উদার আনন্দবার্ত্তা
পার্শ্ববর্ত্তী সখাটীরে তার,
নীরব দিগন্ত দেয় বিস্তৃত আশ্রয় খানি
প্রতিধ্বনিটীরে'বার বার।
আঁধার নিশীথ কাছে করেগো সম্ভ্রম-ব্রেভ
ঘন স্নিগ্ধ ছায়াটীরে দান,
বিশ্বের ছুয়ারে নিত্য প্রকৃতি দানেগো হাসি
সৌন্দর্য্যের সব দীপ্তি গান।
এ সব দানের হায়! সার্থক কোথায় করে
ছুটী হৃদয়ের ছুটী গান,
নাহি হয় যতক্ষণে, অমর মিলন গানে
পরস্পরে আদান প্রদান।

লজ্জাবতী বসু

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন
হইতে প্রকাশিত।

No. 535. Registered No. C. 134. March, 1908.



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৩৫ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩১৪। মার্চ্চ, ১৯০৮। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২১
২। ভক্তকবি তুলসীদাস ৩২৩
৩। বিষয় মোহের পরিণাম ৩৩০
৪। আমরা কি চাই ৩৩০
৫। বেহুলা ৩৩৪
৬। দুঃখ কি ? ৩৩৮
৭। স্নেহোপহার ৩৪১
৮। প্রণয়ে প্রমাদ ৩৪২
৯। ইতর প্রাণীর নিকট প্রেমের শিক্ষা ... ৩৪৬
১০। পাঁচন ও মুষ্টিযোগ ৩৪৮
১১। নূতন সংবাদ ৩৪৯
১২। পুস্তকাদি সমালোচনা ৩৫০
১৩। বামারচনা—
প্রার্থনা (শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী) ৩৫১
কোকিল (শ্রীমতী ইন্দুবালা সরকার) ৩৫২

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৵০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি প্রকা জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সে পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খা ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ডুড় ডুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতক

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য মাশুল ॥০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা পেটফাঁপ বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্ত আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের উ অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুফ লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা; ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৪নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 535. March, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৫ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩১৪। মার্চ্চ, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানদান—দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী প্রসারের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ফেলো নির্ব্বাচিত হইবেন।

সামরিক দণ্ড—রুষ জাপানের যুদ্ধের সময় পোর্ট আর্থার বন্দরে পরাজিত হইয়া যে সকল রুষ সেনাপতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, সামরিক বিচারে তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল রিস এবং ফক এই দুই জন সেনাপতির প্রাণদণ্ড এবং জেনারেল ষ্টোশিল ও মিরনফের দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পাবনা জেলা সমিতি—পাবনা জেলা-সমিতির অধিবেশন ২৮শে ও ২৯শে মাঘ শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতায় সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

মৃত্যু—পঞ্জাবের ছোটলাট সার ডেন্‌জিল ইবেটসন্—যিনি লালা লজপৎ রাও ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন—ছুটী লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ—১২ই ফাল্গুন সোমবার হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি অনরেবল্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। এত কালের পর বঙ্গের পুণ্যশ্লোক মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শবসাধনার ফল ফলিল। বালবিধবার বিবাহই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথমে একটী বালিকার বৈধব্য দর্শনেই

অর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইয়া এই শুভকার্য্যে নিজের দেহ, মন, ধন, প্রাণ, আত্মা সমর্পণ করেন। আশুতোষ বাবুর কন্যার, ৯ বৎসর বয়সে, ৺বঙ্কিম চন্দ্রের দৌহিত্রের সহিত বিবাহ হয়। অল্পদিন পরেই কন্যাটী বিধবা হয়। এক্ষণে কন্যার বয়স ১৩ বৎসরের অধিক নহে। পাত্রটী সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ যুবক। জজ আশুতোষ বাবু কৌলীন্যমর্য্যাদায় বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভায় ও পদ-গৌরবে ভারতে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজি ধর্ম্ম-বীর তেজস্বী মহাত্মা আশুতোষ যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা বিধবা-বিবাহের ইতি-হাসে চিরস্মরণীয়। এক্ষণে আশা করা যায়, তাঁহার এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে সাধারণে কুণ্ঠিত হইবেন না। যখন দেখিতে পাওয়া যে, অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে আবার বিবাহ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, তখন বালবিধবাদিগের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করাকে উন্মত্তপ্রলাপ বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গ-সমাজের বহুতর গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিবাহে যোগ ও সহানুভূতি দান করিয়াছেন। দয়াময় জগদীশ্বর এই নব দম্পতীর উপর অশেষ কল্যাণরাশি বর্ষণ করুন।

মিরাটে বৈশ্য আগরওয়ালা বংশে শ্রীমতী গঙ্গাদেবী-নাম্নী একটী ঊনবিংশ-বৎসর-বয়স্কা বিধবার সহিত লালা নিয়াধর সিংহ নামক ২৪ বৎসরের এক যুবকের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রাবাস। বিলাতে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রদিগের বাসের জন্য বাটী নির্ম্মাণার্থ অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত তত্রত্য কতিপয় সদাশয় মহিলা যে মেলার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে খরচ বাদে ৮৬৫৫ টাকা আয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যুবরাজপত্নী, মিঃ বেলফোর, মিঃ এস-কুইথ, লর্ড রিপন, লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড রে, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, ভিজিগাপটমের মহারাণী ও ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাণী ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মহিলা-শিল্প-মেলা—আগামী ২০ শে মার্চ্চ শুক্রবার কলিকাতা বেথুন কলেজে মহিলা-শিল্প-সমিতির উদ্যোগে ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর অধিনেত্রীত্বে একটী বিরাট মহিলা-শিল্প-মেলার অধিবেশন হইবে। ছোটলাট-পত্নী লেডী ফ্রেজার মেলার দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। এই মেলা তিন দিন মাত্র থাকিবে এবং ইহাতে আদৌ পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। কেবলমাত্র স্বদেশ-জাত দ্রব্যই ইহাতে প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

অলৌকিক সাধুমাত্রেরই চরিত্র অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। অনন্ত লীলাময় হরি যে আধারে আত্মলীলা প্রকাশ করেন, তাহা যে অলৌকিক হইবে, বিচিত্র কি? ঈশ্বরের লীলাভূমি মহাত্মারা দর্শন-বিজ্ঞান-গণ্ডীর বহির্ভূত, যুক্তি-তর্কের অতীত; মানবের বুদ্ধি ও কল্পনা তথায় পরাভূত। এ দেশে কোনও মহাত্মারই ঐতিহাসিক বিবরণ নিঃসংশয়রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। প্রাচীন আচার্য্যেরা কেহই নিজ নিজ গ্রন্থে আপনাদের লৌকিক পরিচয় দিয়া যান নাই। তাঁহারা আত্মপরিচয় দিবেন কি, সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়াই জ্ঞানচর্চ্চায় ও লোকশিক্ষায় নিমগ্ন থাকিতেন, এবং এই মহাযোগে সিদ্ধি লাভ করিলেই আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। অতএব তুলসীদাস বিষয়ে ধারাবাহিক সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। প্রচলিত কিংবদন্তী বা প্রবাদ-বাক্য, মহাজনগাথা, এবং তদীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে ঘটনাবিশেষের আভাসমাত্র অবলম্বন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

মহাত্মা তুলসীদাস ভক্তিযোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। তিনি সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যেই ভগবৎসত্ত্বা ওতপ্রোতভাবে অনুভব করিতেন। এক ফকির ঈশ্বরকে অলক্ষ্য ভাবিয়া সর্ব্বদাই "অলক্ষ্য অলক্ষ্য" বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। সে ব্যক্তি তুলসীর নিকট আসিয়া ঐ কথা বলায়, তুলসী বলিয়া উঠিলেন;—"রে নির্ব্বোধ! যে দয়াময়ের অস্তিত্ব সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ও মন-প্রাণ-আত্মার প্রতি অংশে প্রতিক্ষণ স্বতই প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহা জাগতিক পদার্থের অনুরেণুতে জাজ্বল্যমান, সেই নিত্য সত্যই যদি অলক্ষ্য, তবে এ জগতে লক্ষ্য কি? রে মূঢ়! ভগবানের নাম জপ কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইবি।"

তুলসীর এক একটী গাথা (দোঁহা) বৈকুণ্ঠচ্যুত অমৃতবিন্দুর ন্যায় পাপিতাপীর সন্তাপ হরণ করে। আধ্যাত্মিক মহিমায় তুলসী-গাথা অতুলনীয়, উপমাসৌষ্ঠবেও উহা নিরুপম। ভাবের অবতারণায় ও উহার পূর্ণ বিকাশে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দিভাষায় তিন জন মহাকবি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ,—তুলসী-দাস, সুরদাস ও কেশবদাস। তন্মধ্যে ওজস্বিতায় সুরদাস, মাধুর্য্যে তুলসীদাস প্রধান; তৃতীয় মহাকবি কেশবদাস, সুরদাস ও তুলসীদাসের নিম্নে। নিম্ন-লিখিত মহাজন-গাথায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা;—

"সূর সূরয তুলসী শশী উড়ুগন কেশবদাস।
অবকে কবি খদ্যোতসম যঁহ তঁহ করহি প্রকাশ॥

সুরদাস সূর্য্যসম ভুবনে প্রকাশ,
শশিসম তুলসীর মধুর বিলাস,
সুকবি কেশবদাস তারকার প্রায়,
খদ্যোত-সমান অন্য কবি সমুদায়।

প্রেমভক্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে, রচনার চাতুর্য্যে ও পদাবলীর সৌকুমার্য্যে হিন্দি-রামায়ণ জগতে এক অপূর্ব্ব বস্তু, এই জন্য হিন্দিরামায়ণ-প্রণেতা তুলসীদাসকে হিন্দুস্থানের লোকেরা ভগবান্ বাল্মীকির অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ বিষয়ে একটী প্রাচীন গাথা আছে, যথা ;—

"জনক ভূপতি নানকা শুকদেব ভএ কবীর,
বাল্মীকি তুলসী ভএ উধব সুর-শরীর॥
—জনক ভূপতি গুরু নানক-শরীর;
শুকদেব অবতীর্ণ হইয়া কবীর,
বাল্মীকি তুলসীরূপে জগতে প্রকাশ;
কৃষ্ণসখা উদ্ধব আপনি সুরদাস।"

সুবিখ্যাত মহাত্মা নাভাজী (১) স্বপ্রণীত "ভক্তমাল" গ্রন্থে তুলসীদাসকে বাল্মীকি বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন ;—

"ত্রেতা কাব্যনিবন্ধ করি শতকোটি রামায়ণ,
এক অক্ষর উদ্ধরে ব্রহ্মহত্যাদি পরায়ণ ;
অব ভক্তন সুখ দেন বহুরি লীলা বিস্তারী,
রামচরণ-রস-মত্ত রটত অহনিশি ব্রতধারী।
সংসার অপারকে পারকো, সুগমরূপ নৌকা লয়ো
কলিকুটিলজীব নিস্তারহিত বাল্মীকি তুলসী ভয়ো।"

(১) তুলসীদাস যখন দিল্লী হইতে বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন নাভাজীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। নাভাজী তুলসীর প্রভাব দেখিয়া তাঁহাকে বাল্মীকির অবতার বলিয়াই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই শ্লোক রচনা করেন।

ত্রেতাযুগে শতকোটি শ্লোকে রামায়ণ, (১)
বিরচিলা মহর্ষি বাল্মীকি তপোধন ;
এক এক বর্ণ তার এত গুণ ধরে,
শ্রুতিমাত্র ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হরে ;
অহর্নিশ রামপদে মগ্ন মুনিবর,
ভক্তসুখ তরে লীলা করিলা বিস্তর ;
করিবারে অনায়াসে ভবসিন্ধু পার ;
রামায়ণ সুখসাধ্য তরণী তাহার ;
কলির কুটিল জীবে করিতে নিস্তার,
বাল্মীকি তুলসীরূপে ভবে অবতার।

বস্তুতঃ প্রেম-ভক্তির অবতার, কবিত্ব-প্রতিভার জলন্ত-মূর্ত্তি তুলসীকে সাক্ষাৎ বাল্মীকি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব স্বপ্রণীত "উপাসক-সম্প্রদায়ে" তুলসীদাসের রামায়ণকে বাল্মীকিরামায়ণের হিন্দি অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; বস্তুতঃ উহা সংস্কৃত রামায়ণের ভাষান্তর নহে, উহা কাব্য-জগতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, প্রেম-ভক্তি ও প্রতিভার অভিনব উৎস। হিন্দুস্থানের যদি এক জন বাল্মীকিরামায়ণ পড়ে, তবে সে স্থলে শত সহস্র ভক্ত তুলসীর রামায়ণ পড়ে। তুলসীর রামায়ণই হিন্দুস্থানের নিত্য-পাঠ্য গীতা ভাগবত। কথিত আছে, তুলসীর অযোধ্যায় অবস্থানকালে, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র হিন্দিভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে তুলসীদাসকে স্বপ্নে আজ্ঞা-

(১) এইরূপ প্রবাদ, বাল্মীকি শতকোটি শ্লোকে রামায়ণ রচনা করেন, এবং ঐ সকল শ্লোক নানা লোকে বণ্টন করিয়া দেন। মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা বিষয়েও এইরূপ প্রবাদ।

দেশ করায়, তিনি সংবৎ ১৬৩১, চৈত্র শুক্লনবমীতে মঙ্গলবারে রামায়ণ রচনা আরম্ভ করেন।

"সংবৎ সোলহসৌ ইকতীসা,
করৌ কথা হরিপদ ধরি শীশা।
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা,
অবধপুরী যহ চরিত প্রকাশা॥"

অর্থাৎ—সংবৎ ১৬৩১, চৈত্র, শুক্লনবমীতে, মঙ্গলবারে, অযোধ্যা নগরে, শ্রীহরির পাদপদ্ম শিরে ধারণপূর্ব্বক এই রামচরিত প্রকাশিত হইল। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের কিঞ্চিৎ অধিক।

তুলসীর রামায়ণ হিন্দিভাষায় রচিত হইতেছে জানিয়া বারাণসীর পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন,—ভগবৎ-কথা দেশী ভাষায় রচনা করা বাতুলতা। দেবচরিত্র দেবভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে রচিত না হইলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। তুলসী ইহার উত্তরে, নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন ;—

"হরিহরযশ সুরনরগিরা বর্ণহিঁ সন্ত সুজান।
হাংড়ী হাটক চারু চির রাঁধৈ স্বাদ সমান॥"
—সংস্কৃত বা দেশী ভাষা যাহে চায় মন,
হরিহরকীর্ত্তি তাহে করহ কীর্ত্তন ;
ভাল চিড়া দুগ্ধে যদি রাঁধহ পায়স—
মৃৎপাত্রে বা স্বর্ণপাত্রে তাহা তুলারস।

অর্থাৎ ভাল চিড়া ও ভাল দুগ্ধ লইয়া, মাটির হাঁড়িতে পায়স রাঁধ, বা সোণার হাঁড়িতেই রাঁধ, তাহাতে স্বাদের তারতম্য হয় না। এমন সত্য, এমন সরল, স্বাভাবিক ও বিশদ দৃষ্টান্ত ও উপমা তুলসী কবি-তার প্রতি ছত্রে দীপ্যমান। বারাণসীর যে সকল পণ্ডিত, হিন্দিভাষায় রামায়ণ-রচনার জন্য তুলসীকে গালি দিয়াছিলেন, তাঁহারা এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া তুলসীকে ধন্যবাদ সহ এই শ্লোকটী উপহার দেন ;—

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতঃ॥"
—জঙ্গম তুলসীতরু এ তুলসীদাস,
যাহাতে পরমানন্দ-পত্রের বিলাস ;
বিচিত্র কবিতাগুচ্ছ মঞ্জরী তাহার,
রাম-মধুকর যাহে করেন বিহার।

কথিত আছে, মধুসূদনাচার্য্য নামক জনৈক দণ্ডী পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উপহার লইয়া স্বয়ং তুলসীদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পণ্ডিতসমাজের আন্তরিক ধন্যবাদ সহ উহা দান করিয়াছিলেন, এবং তুলসীকে প্রথমে তাঁহারা নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া বারবার তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

একদা এক নরঘাতক মহাপাপী রাম-নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে কাশীধামে উপস্থিত হয়। তুলসী-দাস উহাকে স্নান করাইয়া, আপন পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা সভা করিয়া তথায় তুলসীকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,—এ মহাপাপীর পাপক্ষয় কিরূপে হইল? আপনি ইহাকে পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইলেন কেন? তুলসী কহিলেন,—তোমরা যে সকল পুথি পড়িয়াছ, সে সকল ছিন্ন করিয়া ধূলায় নিক্ষেপ কর,

হায়! হায়! তোমরা রামনামের মাহাত্ম্য পড়িয়াও জানিতে পার নাই; রামনামের প্রভাবে ইহার পাপক্ষয় হইয়াছে। পণ্ডিতেরা কহিলেন,—বিশ্বেশ্বরের এই পাষাণনির্ম্মিত বৃষ যদি ইহার হস্তের প্রসাদ ভোজন করে, তবে ইহার পাপক্ষয় বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস হয়। তখন তুলসীদাস প্রসাদ প্রস্তুত করিয়া ঐ পাপীর হস্তে দিয়া সকলের সঙ্গে মন্দিরে গমন করিলেন, এবং পাপীকে ঐ প্রসাদ পাষাণ-বৃষের মুখে দিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি প্রসাদ বৃষের মুখে ধরিবামাত্র, বৃষ মুখ ব্যাদান করিয়া তাহা ভোজন করিল। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণেরা লজ্জিত হইয়া তুলসীর পদতলে পতিত হইলেন।

কাশীধামে একদা শাস্ত্রার্থ লইয়া বৈষ্ণবে ও যোগিগণে বিবাদ বাঁধিয়াছিল। বিচারে যোগিগণের পরাজয় হওয়ায়, যোগিসম্প্রদায়ের গুরু নিজ শিষ্য পরাক্রান্ত সুবাদার দ্বারা বৈষ্ণবগণের কণ্ঠী (মালা) হরণ করাইলেন। সুবাদারের লোকেরা শেষে তুলসীর কণ্ঠী হরণ করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তাহাদের চরণ অসাড় হইয়া পড়িল। গতিশক্তি রোধ হওয়ায় তাহারা চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। স্বয়ং সুবাদারও তন্মধ্যে ছিলেন। তাহারা তখন সকলেই দেখিল,—তথায় সে তুলসীমূর্ত্তি নাই, তৎপরিবর্ত্তে যমকিঙ্কর সদৃশ এক ভয়ঙ্কর পুরুষ মুদ্গরহস্তে আরক্তলোচনে তাহাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত। তখন তাহারা ত্রাহি ত্রাহি শব্দে তুলসীর চরণে শরণাপন্ন হইল। তুলসী তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং অপহৃত কণ্ঠী গুলি বৈষ্ণবদিগকে প্রত্যর্পণ করাইলেন।

একদা এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় পত্নী সতী হইবার জন্য শবদেহের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাইতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে তুলসীদাসকে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। তৎক্ষণাৎ তুলসীর মুখ হইতে,—"তুমি পতিসৌভাগ্যবতী হও" এই আশীর্ব্বাদ বাহির্গত হইল। এ কথা শুনিয়া মৃতের ভাইবন্ধুরা বলিলেন,—"ঠাকুর! ইনি ত আজি বিধবা হইয়াছেন, ইহাঁর পতির শবদেহ সৎকারার্থ গঙ্গাতীরে নীত হইতেছে, ইনিও সতী হইতে চলিয়াছেন। অতএব আপনার এ আশীর্ব্বাদ কিরূপে ফলিবে?" তুলসী কহিলেন,—"এখন ইহার অগ্নিসংস্কার করিও না। আমি একটু বিলম্বে আসিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্রের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই ঐ মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। বোধ হইল যেন সে গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল। সে উঠিয়াই রামনাম করিতে করিতে দ্রুতপদে গিয়া তুলসীর পদতলে পতিত হইল। তখন সমবেত জনমণ্ডলী হইতে "জয় রাম জয় রাম" ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলে গিয়া তুলসীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

একদিন কাশীধামে মাঘমাসের দারুণ শীতে অতি প্রত্যূষে তিনি গঙ্গায় আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া জপ করিতেছেন, এক বেশ্যা ইহা দেখিয়া বলিল,—অহো! এ ব্রাহ্মণের নিজ শরীরে বিন্দুমাত্র মমতা নাই। তুলসী সে কথা শুনিলেন। অনন্তর তিনি জল হইতে উঠিয়া নিজ শুষ্ক বস্ত্রে গঙ্গাজল ছিটাইয়া তাহা পরিধান করিলেন। জল ছিটাইবার সময় এক ছিটা জল সেই বেশ্যার গাত্রে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ বেশ্যার মায়ামোহ দূর হইল, সে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, যমযাতনা, ব্যভিচারাদি পাপের ফলস্বরূপ বিবিধ নরক, প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিল। অনন্তর সে ভয়বিহ্বলচিত্তে তুলসীর শরণাপন্না হইয়া সমস্ত বিষয়বাসনা পরিহারপূর্ব্বক, তুলসীর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষিতা হইল। নিজ পাপকর্ম্মে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন দীনসেবায় অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল। কথিতও আছে,—

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতাহি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥"
—সাধুর দর্শনমাত্রে পুণ্যলাভ হয়,
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়;
ফলিতে তীর্থের ফল বিলম্ব হইবে,
সাধুদর্শনের ফল সদ্যই ফলিবে।

তুলসীর জীবনে এরূপ এবং ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যতর অসংখ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। ফলতঃ তাঁহার এমনি মোহিনী শক্তি, যে, তিনি যখন যে স্থানে থাকিতেন, তাঁহার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া শতশত নরনারী তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইত। তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোকের শোকতাপ দূরে যাইত, এবং হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত। তাঁহার এক একটী কথা, মৃতসঞ্জীবনী সুধার ন্যায় লোকের নবজীবন সঞ্চার করে। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় ও বদন অচিন্ত্যশক্তি শব্দব্রহ্মের লীলাভূমি। প্রবলপ্রতাপ যবনসম্রাটের অধিকারে তাঁহার অভ্যুদয়। যবনেরা তাঁহার উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল। তিনি প্রহ্লাদের ন্যায় একমাত্র ধর্ম্মবলে সে সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

তুলসীর জন্ম ও কর্ম্ম সকলি অদ্ভুত। তুলসীদাস বান্দাজেলায় রাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে কেহ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ কেহ বা সরযূপারী ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার জন্মসংবৎসর কোনও মতে ১৫৮৯, কোনও মতে ১৫৮৩। অতএব তিনি প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তুলসীর পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী, গোত্র পারাশর। তুলসী মূলনক্ষত্রের প্রথম চরণে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তদীয় পিতামাতা তৎক্ষণাৎ সেই সদ্যোজাত শিশুকে পরিত্যাগ করেন। মুহূর্ত্তচিন্তামণি নামক জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে;—

"অথোচুরন্তে প্রথমাষ্টঘট্যো
মূলস্য শাক্রাস্তিমপঞ্চনাড্যঃ।
জাতং শিশুং তত্র পরিত্যজেদ্ বা
মুখং পিতাস্যাষ্টসমা ন পশ্যেৎ॥"

অর্থাৎ—মূলনক্ষত্রের প্রথম আট ঘটিকা

এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের অন্তিম তের ঘটিকাকে 'অভুক্ত মূল' বলে। এ সময় যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, পিতামাতা সেই শিশুকে তখনি পরিত্যাগ করিবে, অথবা ৮ বর্ষ উহার মুখদর্শন করিবে না। এই জন্যই তুলসী স্বকৃত বিনয়পত্রিকায় লিখিয়াছেন ;—

"জননি জনক তজ্যো জনমি করম বিধি হুঁ সৃজ্যো অবডেরে"—অর্থাৎ আমার জন্মমাত্রেই পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন ; বিধাতা আমাকে ভাগ্যহীন কারয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নৃসিংহদাস নামক এক সাধু সেই সদ্যোজাত শিশুকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে তাহাকে লইয়া শূকরক্ষেত্র নামক স্থানে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন, এবং পরম যত্নে উহার লালনপালন করিতে লাগিলেন। উক্ত সাধু অতিশয় রামভক্ত ছিলেন, তদীয় সহবাসে শৈশবেই তুলসীর রামভক্তির সঞ্চার হয়। শিশুকে তিনি নিজ শিষ্য করিয়া সমগ্র রামায়ণ পড়াইলেন। তুলসী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, দীনবন্ধু পাঠক নামে কোনও মহাত্মা তুলসীকে রামভক্ত, সৎকুলোদ্ভব ও সচ্চরিত্র জানিয়া, নিজ সুন্দরী কন্যা রত্নাবলীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। তুলসী ঐ কন্যার রূপলাবণ্যে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, নিমেষমাত্র তাহার অদর্শন সহিতে পারিতেন না। কন্যার পিতা কন্যাকে নিজগৃহে আনিবার জন্য বারংবার লোক পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তুলসী কিছুতেই পত্নীকে যাইতে দিলেন না। অনন্তর কন্যার ভ্রাতা আসিয়া ভগিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিয়াও যখন অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন একদিন তুলসী বাজারে দ্রব্যাদি কিনিতে গিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহার শ্যালক আসিয়া ভগিনীকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তুলসী গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে না দেখিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। অনন্তর উন্মত্তের ন্যায় সুদূর শ্বশুরালয়ে ছুটিলেন। তাঁহার স্ত্রী সবেমাত্র পিত্রালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণামাদি করেন নাই, এমন সময় স্বামীকে তথায় উন্মত্তবৎ উপস্থিত দেখিয়া ক্রোধে ও লজ্জায় অধীর হইলেন, এবং তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—নাথ! আমার এই অস্থিচর্ম্মময়, মলমূত্রাধার দেহে তোমার যে আসক্তি, এ আসক্তি যদি ভগবান্ রামচন্দ্রে হইত, তবে কি সৌভাগ্যই লাভ করিতে! তুমি আমায় যে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তাহা ভৌতিক, অনিত্য ও জ্বালাময় ; কিন্তু ভগবানের সৌন্দর্য্য দিব্য, জ্যোতির্ম্ময়, নিত্য ও আনন্দময়"।

তুলসীপত্নীর উক্তিবিষয়ে নিম্নলিখিত গাথা প্রচলিত আছে ঃ—

"লাজ না লাগত আপকো, দৌরে আয়হু সাথ।
ধিক্ ধিক্ ঐসে প্রেমকো, কথা কহহুঁ মৈং নাথ!
অস্থিচর্ম্মময় দেহ মম তাসোং জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরামমেং হোত, নতৌ ভবভীতি॥

—লাজ লজ্জা তেয়াগিয়ে
ছি ছি নাথ! এলে ধেয়ে,
অস্থি চর্ম্ম দেহে মোর যে তৃষ্ণা তোমার ;
শ্রীরামে সঁপিলে তাহা
কি সৌভাগ্য হ'ত আহা!
অনায়াসে তরে যেতে ভব-পারাবার।

অহো! কি শুভযোগেই তুলসীপত্নীর মুখে ঐ কথা বাহির হইল! প্রিয়তমার ঐ কয়টী কথায়, অশনিপাতে গিরিচূড়ার ন্যায় তুলসীর বজ্রকঠিন মোহাবরণ চূর্ণ হইয়া গেল। ভগবান্ দেখিলেন,—ইহার এ তৃষ্ণার, এ আসক্তির গতি ফিরিলে কোটি কোটি পাতকীর পরিত্রাণ হইবে, জীবলোকের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। মঙ্গলময় কখন কি অভিপ্রায়ে কোন্ আধারে কি উপলক্ষ্যে কি ঘটনা ঘটান, তাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধির অতীত। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে হৃদয়ে, তপ্তকটাহে পিশিতপিণ্ডের ন্যায় অলঙ্ক কামনাসকল ফুটিতেছিল, নিমেষমাত্রেই সে হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর বৈরাগ্য প্রবেশ করিল, সকলি শীতল হইয়া গেল। অহরহ চক্ষের উপর দেখিতেছি,—

"ক্বচিদ্ বাদিত্রনৃত্যাদি সেব্যতে মুদিতৈর্জনৈঃ।
রুদ্যতে চাপরৈরার্ত্তৈর্ধারাশ্রুনয়নাননৈঃ॥"

অর্থাৎ—কোনও গৃহে উৎসবমগ্ন জনমণ্ডলীর গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির হর্ষধ্বনি, আবার ঠিক্ সেই সময় অপরগৃহে অশ্রুপ্লাবিত শোকার্ত্তগণের গগনভেদী হাহারব! সুখদুঃখের এই আলোক-ছায়ায় সাংসারিক বস্তুমাত্রই আক্রান্ত। এই ছিল, এই নাই ; হৃদয়ে জ্বালাময়ী স্মৃতিমাত্র রাখিয়া সকলি চলিয়া যায়। আজি কোথা সেই পিতা-মাতা? কোথা সেই ভাই-ভগিনী? কোথা সেই বালাবন্ধু? সে সময় ভাবিতাম,—এ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিবে না, এ জীবন এইরূপ উৎসবেই কাটিবে। কিন্তু হা অনিত্যতা! তুমি সর্ব্বনাশিনী স্মৃতিমাত্র রাখিয়া সকলি হরণ করিতেছ, সকলি হরণ করিয়াছ, এখন কেবল অনুতাপ ও অশ্রুপাত যাঁহারা সময় থাকিতে এই অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সহস্র বিঘ্ন বাধা পায়ে ঠেলিয়া শাশ্বত মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্। যাঁহারা মনে করেন,—সংসারের এই উপস্থিত কার্য্যটী শেষ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইব এবং তখন ভগবৎপ্রসঙ্গে মনোনিবেশ করিব, তাঁহারা কি ভ্রান্ত!

"সমাপ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ যো হরিং স্মর্ত্তুমিচ্ছতি।
সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স মূঢ়ঃ স্নাতুমিচ্ছতি॥"

—সংসারের সব কার্য্য করি' সমাপন,
যে জন করিতে চায় হরিকে স্মরণ ;
তীরে সিন্ধু-তরঙ্গের খেলে অবসান,
সে মূঢ় করিতে চায় সিন্ধুজলে স্নান।

তরঙ্গও থামে না। স্নান করাও হয় না।

এই ভব-সমুদ্রে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, পর্ব্বতাকার তরঙ্গ, হুড়পাড় করিয়া আস্ফালন করিতে করিতে আসিতেছে,

দিবারাত্রি ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। দৃষ্টিকে তরঙ্গের দিকে না দিয়া ঈশ্বরের দিকে ফিরাও, অজেয় শক্তি লাভ করিবে। তুলসী গৃহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে কপর্দ্দকও লইলেন না। কৃপাসাগর রামচন্দ্রের দর্শনলালসা, সন্নিপাতবিকারের তৃষ্ণার ন্যায় তাঁহার অন্তরে জ্বলিতে লাগিল। যিনি অহল্যাপাষাণীর উদ্ধার-কর্ত্তা, শ্রমণাচণ্ডালীর মুক্তিদাতা, গুহক-চণ্ডালের সখা; বনের ঋক্ষবানরগণও যাঁহার প্রেমালিঙ্গনের অধিকারী; যাঁহার নামের গুণে ঘোর দস্যুও অমরপূজিত বাল্মীকি হইয়াছিলেন, সেই পতিতপাবন রামচন্দ্র এ চণ্ডালেও কৃপা করিবেন, তিনি এই আশায় বুক বাঁধিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিষয় মোহের পরিণাম।

"শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীনভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চ-ভিরঞ্চিতঃ কিম্॥

শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—পঞ্চগুণ
একে একে পঞ্চ জীবে করে তারা খুন।
কুরঙ্গ, পতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ ও বারণ,
স্ব স্ব গুণে বদ্ধ হয়ে হারায় জীবন।
বংশীরবে মুগ্ধ মৃগ মরে ব্যাধ-শরে,
পতঙ্গ রূপের মোহে হুতাশনে মরে।
আমিষে লোলুপ মীন নিহত বড়িশে,
গন্ধে অন্ধ অলি মরে কেতকীর পাশে।
করিণীর স্পর্শ-সুখে করী ত্যজে প্রাণ,
এক একগুণে করে সম ফল দান।
একাধারে পঞ্চ গুণে অনুরক্ত নর,
তরিতে কি পারে কভু সংসার-সাগর!

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

আমরা কি চাই।

(২)

বাঁচিতে হইলে আমাদের যাহা যাহা চাই তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এখন আমাদের নিজেদের প্রধান প্রধান যে কয়টী অভাব আছে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

প্রথম অভাব—নৈতিক সাহসের। অনেক জিনিষ ভাল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নূতন বলিয়া আমরা তাহা করিতে সাহস করি না। অনেক প্রথা আমাদের আছে, যাহা সমাজের জীবনীশক্তিকে দিন দিন ক্ষীণ করিতেছে। বক্তৃতায় বা কাগজে কলমে আমরা তাহাদিগকে অনেকবার বৈতরণী পার করিয়া দিয়া আসি, কিন্তু কাজের বেলা প্রায়ই পশ্চাৎপদ হই। আবশ্যক হইলে পুরাতন প্রথা বর্জ্জন ও নূতন প্রথা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা আজও আমাদের জন্মায় নাই। জাপানের দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে জলন্ত, কিন্তু আমাদের জীবন্ত রক্ষণশীলতার কাছে তাহা নিষ্প্রভ। দেখিয়াও আমরা দেখি না, শুনিয়াও শুনি না, পড়িয়া আছি অসাড় মৃতপ্রায়। নৈতিক সাহস যতদিন না আমাদের মনে বলবৎ হইবে, ততদিন আমরা নিজেদের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা কিছু করিতে পারিব না। অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সম্পাদন করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে বর্ত্তমানকালের প্রচণ্ড প্রতি-যোগিতায় ও কঠোর জীবনসংগ্রামে আমাদিগকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হইবেই।

দ্বিতীয় অভাব—আত্মনির্ভরতার। ইহা আমাদের নাই বলিলেই হয়। সকল বিষয়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী। ইহা বহু-কাল হইতে পরপদানত থাকার অন্যতম ফল। অনেক দিন হইতে নিজেদের অনেক কাজ আমরা নিজে করি নাই, বিদেশীয় রাজার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। কাজে কাজেই নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার অভ্যাস আমরা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটী সহজে বুঝা যাইবে। গাঁয়ে বড় জলকষ্ট। সকলেই বেশ অনুভব করিতেছি। কিন্তু কষ্ট সহ্য করিতেছি মুখ বুজিয়া। জোর কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে সম্মুখে পাইলে, যদি ভরসা কুলায়, দুঃখের কথা তাঁহাকে জানাইতেছি, বা জেলা বোর্ডে বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পাঠাইবার জন্য দরখাস্তে সই করিতেছি। কিন্তু গাঁয়ের পাঁচ জনে মিলিয়া কিছু চাঁদা তুলিয়া একটা কুয়া যে আমরা নিজে কাটাইয়া লইতে পারি, এ কথা কাহারও মনে উঠে না। একটা কথা আমরা ভাবি না—নিজের কাজ নিজে যেমন করিতে পারা যায়, অন্যে তাহা পারে না। আমার হাঁটা অন্যে হাঁটিয়া দিলে হয় না।

তৃতীয় অভাব—উদ্যোগিতার। আমরা হইতেছি গড্ডলিকা-প্রবাহ, নূতন কাজ করিতে পারি না ও চাই না। কাহাকে সাহস করিয়া নূতন কিছু করিতে দেখিলে, আমরা কত ভীত হই বা তাহাকে বিদ্রূপ করি। আমাদের মধ্যে কথাই আছে, "ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়"। তৃতীয় ভাগের "গোপাল"ই আমাদের আদর্শ চরিত্র। কিন্তু এখন কতকগুলি "রাখালের" দরকার হইয়া পড়িয়াছে। যাহা স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষেরা কল্পনায় আনিতেও বোধ হয় অক্ষম ছিলেন, এমন অনেক কাজ করা এখন আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে ভরসা ও উদ্যোগিতা কোথায়? সাগর লঙ্ঘিবার ও গিরি ডিঙ্গাইবার লোক চাই, এবং তাহা বেশী পরিমাণে। জলে জঙ্গলে থাকার লোক চাই, এবং তাহা বেশী পরিমাণে। যদি না পাওয়া যায়, আমাদের কোন আশা নাই।

চতুর্থ অভাব—স্বাধীনভাবে কাজ করার

অনভ্যাস হেতু মৌলিকতার। উদ্ভাবনী-শক্তি আমাদের একপ্রকার লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের এক মূল সূত্র হইতেছে,—যে অঙ্গের চালনা না হইবে, তাহা ক্রমে শুষ্ক হইয়া গিয়া লোপ পাইবে। এ নিয়ম কেবল শারীরিক অঙ্গের প্রতি খাটে তাহা নয়, মানসিক বৃত্তির প্রতিও খাটে। বহুকাল হইতে স্বাধীনভাবে কাজ করার অভ্যাস আমাদের গিয়াছে। উপর-ওয়ালাদের হুকুম তামিল করাই মুসলমান আমল হইতে প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিন্তা করেন উপরওয়ালারা, তাঁদের আজ্ঞা প্রতিপালন করেন তাঁবেদারেরা। অধিক দিন তাঁবেদারি করিলে চিন্তাশক্তির হ্রাস হইয়া আসে এবং মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমাদের তাহাই হইয়াছে। নূতন কিছুই আমরা উদ্ভাবন করিতে পারি না, বুদ্ধি খরচ করা ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করা সহজ এবং তাহাকেই আমরা ধর্ম্মের স্থানে দাঁড় করাইয়াছি।

পঞ্চম অভাব—একতার। পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে আমরা জানি না। এরূপ কাজ করিবার অক্ষমতা আমাদের একপ্রকার—মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা ইহার অন্যতম মূল কারণ বলিয়া অনুভূত হয়। জাতিভেদ বহুকাল হইতে দেশে আছে, এবং পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কাজ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এই প্রথা একতার যে কতদূর প্রতিকূল তাহা "বার রাজপুত তের হাঁড়ী" এই প্রবচনেই প্রকাশ। সকলেই নিজে নিজের হাঁড়ী লইয়া ব্যস্ত, এক হইয়া কাজ করিবে কখন? সকলেই নিজের বা জোর নিজ জাতির ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, মিলিয়া মিশিয়া সাধারণের কাজ কিছু করিবার সময় পাইবে কিরূপে? একেত জাতি-ভেদ চিরন্তন প্রথা, তাহার উপর মুসলমান আমল হইতে ধর্ম্মভেদ আসিয়া জুটিয়াছে। পূর্ব্বে যে ইহা ছিল না তাহা নয়; হিন্দুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও পরস্পরের প্রতিকূলাচরণ বরাবরই আছে, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে বৈরিতা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে এক প্রকার তাড়িত এবং বিভিন্ন মতাবলম্বীদের দ্বেষ ও শত্রুতা কখন খুব বেশী দূর গড়ায় নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ গুরুতর, এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। অনেক দিন একত্র থাকা নিবন্ধন উভয়ের মধ্যে কতকটা ঔদার্য্য যে জন্মায় নাই তাহা বলা যায় না; কিন্তু যাহাদের মধ্যে গোঁড়ামি প্রবল, তাহাদের পক্ষে উদারতা অবলম্বন করা এক প্রকার অসম্ভব; এবং হিন্দু মুসলমানের ভিতর এরূপ লোকের অভাব নাই। সুবিধা পাইলেই তাহারা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা দেখাইতে কৃপণতা করে না। গোঁড়া হিন্দুর কাছে মুসলমান অস্পৃশ্য "নেড়ে" এবং গোঁড়া মুসলমানের কাছে হিন্দু ঘৃণার্হ "কাফের" বই আর কিছু নয়। হিন্দুর মধ্যে ছত্রিশ জাতি, হিন্দু মুসলমানত অনেক দিন হইতে আছে। উপরন্তু আবার এখন খৃষ্টান আসিয়া জুটিয়াছে। সাধারণ খৃষ্টীয় প্রচারকের হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে গালি দেওয়া এক প্রধান কাজ। যেখানে তাহাদের প্রতিবিধি আছে, সেখানে ধর্ম্মবিদ্বেষবহ্নি অন্য স্থান অপেক্ষা একটু বেশী করিয়া জ্বলিয়া থাকে।

প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছাড়া দেশে ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ও আছে। অনেক হিন্দু আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মদের উপর খড়্গহস্ত। এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে যে হিন্দুর প্রতি বিরাগ একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। যেখানে মানুষ আছে, সেখানে দলাদলি একরূপ স্বাভাবিক নিয়ম। ইহার উপর এই দুর্ভাগ্য দেশে এত কারণ জুটিয়াছে যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদ আরও বেশী হয় না, ইহা অনেক সময় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। দেশে একতার অভাব একরূপ সংক্ষেপতঃ বিবৃত হইল এবং ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবারও কিয়ৎপরিমাণে চেষ্টা করা গেল।

ষষ্ঠ অভাব—অধিনায়কের অধীনে কার্য্য করিবার ক্ষমতার। ইহা একতার অভাবের এক ফল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। "ক্ষমা ঘৃণা" আমাদের মধ্যে বড় কম। ঠিক আমার মতটী অপর সকলে গ্রহণ করিলেন না বলিয়া যদি আমার তাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজ চলা ভার। পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে ত্যাগ-স্বীকার ও ক্ষমা ঘৃণা চাই। কার্য্যকালে যে মতটা গ্রহণ করা হয়, তাহা প্রায়ই ব্যক্তি-বিশেষের মত হইতে পারে না। অনেক সময় উহা প্রধান প্রধান মতের ফল মাত্র। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক মহৎ দোষ এই যে, ইহার মধ্যে অনেকে স্ব স্ব প্রধান হইতে চান। এক জনের অধি-নায়কত্ব স্বীকার করা তাঁহারা অমর্য্যাদার বিষয় মনে করেন। সকলেই "প্রথম" হইবার জন্য লালায়িত, "দ্বিতীয়" হইবার মাধুর্য্য কেহ বুঝিতে পারেন না। "সকলে বিক্রেতা, হাটে ক্রেতা কেহ নাই।" ফল এই দাঁড়াইয়াছে, দল বাঁধিয়া কাজ করা আমাদের হয় না। আজ অনেক চেষ্টা করিয়া একটী দল গঠন করা হইল। কাল দেখিতে পাইবে,—ইহার ভিতর দলাদলি প্রবেশ করিয়াছে। "ক" বলিতেছেন "খ"-এর অধীন হইয়া কাজ করা আমার হইতে পারে না। কিসে আমি তাঁর অপেক্ষা ন্যূন? তিনি কেন আমার অধীন হইয়া কাজ করুন না? "গ" বলিতেছেন, আমাকে যদি নেতা কর ভালই, নতুবা আমি চলিলাম। হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্ব স্বীকার করিবেন না, এবং হিন্দু নেতার অধীনে কাজ করা মুসলমান কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। অবস্থা যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা প্রকৃত কিনা পাঠক পাঠিকারা বিচার করিয়া দেখুন।

সপ্তম অভাব—বিশ্বাসের। এটীও আমাদের মূলগত অনৈক্যের অন্যতম ফল

বলিয়া মনে হয়। পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে আমরা জানি না। কতকটা কারণ আমাদের সাধুতার অভাব। মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা কতকটা আমাদের অনভ্যস্ত হওয়ায়, উহা হইতে যে যে গুণ জন্মে, তাহা আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা আমাদের ভিতর বড় প্রবল। নিঃস্বার্থভাবে যে কাজ করা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। লোকের সকল কাজের মূলে স্বার্থ থাকিবে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস। এক জন লোক মিউনিসিপাল কমিশনার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সংবাদ পাইলেই আমরা আলোচনা করিতে বসি,—তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলি,—"ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াইবে" লোকটা কখনও এত বোকা হইতে পারে না। এরূপ অবিশ্বাস যে কেবল অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে। শিক্ষিত দলের মধ্যেও ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন বঙ্গলক্ষ্মী মিল কিনিবার কথা উঠিয়াছিল, তখন একজন কংগ্রেস ও স্বদেশী-ভক্ত উকীলের সঙ্গে আমার ঐ সম্বন্ধে কথা হয়। প্রথমেই বলা দরকার যে, লোকটী বড় ভাল এবং সত্য সত্যই দেশের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। তাঁহাকে আমি বলিলাম,—"স্বদেশহিতৈষিতার খাতিরে নিদান দুই এক খান অংশ কিনুন না।" তিনি বলিলেন, "দেখুন রক্ত-উঠা কড়ি, না দেখিয়া শুনিয়া যাহাতে তাহাতে ব্যয় করা যায় না। দৃষ্টান্তটী উকীলবাবুর উপর কটাক্ষ করিবার জন্য দিলাম না; আমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করিবার অক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য দিলাম। উপরে বলিয়াছি,—এরূপ হইবার কতকটা কারণ আমাদের সাধুতার অভাব। দুই চারি জায়গায় বিশ্বাস করিয়া লোকে ঠকিয়াছে, কাজেই সহজে আর বিশ্বাস করিতে চাহে না।

বেহুলা।

(কাব্যাংশ)

ক্ষেমানন্দ—ও—কেতকাদাস বিরচিত "মনসা-মঙ্গলের" নায়িকা বেহুলা। বেহুলা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নিছনী গ্রামের সায়বেণে নামক বণিকের কন্যা। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে বা বাল্যজীবনে কোন অমানুষী ঘটনার উল্লেখ নাই। বেহুলার বাল্যকাল সাধারণ বালিকার ন্যায় অতিবাহিত হয়। ক্রমে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিবাহ-কাল উপস্থিত হইলে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চম্পক—সাধারণতঃ চাম্পাইনগর—নামে প্রসিদ্ধ কোন গ্রামে চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ নখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির হয়। চাঁদ সদাগর একজন সুপ্রসিদ্ধ বণিক্, ধনে, মানে,

কুলে, শীলে, তিনি গন্ধবণিক্‌জাতীয়দিগের অগ্রগণ্য—চাঁদ পরম শৈব। চাম্পাই নগরে এখনও তাঁহার পূজিত দুইটী শিলাময় শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আকারে এরূপ প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ কুত্রাপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। সেই দুইটী শিবমূর্ত্তি লইয়া চাঁদ সদাগর প্রতিদিন দামোদর নদে স্নান করিতে যাইতেন। চাম্পাই নগর দামোদর নদের তীরবর্ত্তী। চাঁদ সদাগর বড়ই মনসাদ্বেষী ছিলেন, তিনি আপনিতো মুখে মনসার নাম করিতেন না—অবজ্ঞা করিয়া "চ্যাং মুড়ী কাণী" বলিতেন, অন্যকেও তাঁহার পূজা করিতে দিতেন না। চাঁদের পত্নী সনকা সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসা দেবীকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, স্বামীকে লুকাইয়া তাঁহার পূজা-র্চ্চনা করিতে ছাড়িতেন না, দৈবাৎ চাঁদ তাহা জানিতে পারিলে তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতেন। মনসার প্রতি চাঁদ বেণে ঈদৃশ বৈরভাব পোষণ করিতেন বলিয়া মনসা দেবীও তাঁহার প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি চাঁদের ছয়খানি লোহাই সমেত সওদাগরী নৌকা নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, চাঁদের সাত পুত্রের মধ্যে ছয়টীকে সর্পাঘাতে শমনসদনে পাঠাইয়াছিলেন, ইহাতেও চাঁদ মনসার প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই, তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ খড়্গহস্তই ছিলেন। নখিন্দরের বিবাহ বেহুলার সহিত স্থির হইলে মনসা দেবী বেহুলাকে ছলনা করিবার জন্য বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সায়বেণের পুষ্করিণীতে উপস্থিত হয়েন। সায়-দুহিতা বেহুলা স্নান করিবার উপলক্ষে বালচাপল্য বশতঃ সন্তরণ দিতে দিতে দৈবাৎ ব্রাহ্মণীর গায়ে তাঁহার পাদোদক স্পর্শ করে। ব্রাহ্মণী সূত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ইহা অপেক্ষা আর কি সুযোগ পাইবেন, তাহা পাইয়া বেহুলার সহিত বিতণ্ডা উপস্থিত করিলেন—অবশেষে তাঁহাকে নিদারুণ অভিশাপ দিলেন যে, বেহুলা প্রথম পতি-সহবাস-রাত্রিতেই বিধবা হইবে। সর্প-দংশনে তাঁহার স্বামীর প্রাণ যাইবে। ইহার অন্যথা হইবার নহে। বেহুলা তখন বুঝিলেন যে, মনসা দেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তাহা না হইলে প্রতিদিনই স্নান করে, সন্তরণ দেয়—কই, অন্য দিনতো এমন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

পুত্রের বিবাহবার্ত্তা শুনিয়া চাঁদ-নিন্দিনী সনকা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি স্বামীকে নির্ব্বন্ধ সহকারে মনসার কোপশান্তির যুক্তি দিলেন। স্বামী তাহাতে সমধিক রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। মানুষ হইয়া দেবতার সহিত বাদ করিলে পরিণামে যে অশেষ দুঃখ পাইতে হয়, সনকা পুরাণ ও ইতিহাস হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই বুঝিলেন না—তবে মনসা যাহাতে নখিন্দরের কেশ-স্পর্শ করিতে না পারেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে করিতে পুত্রের বাসের জন্য নিকটবর্ত্তী শাতালী পর্ব্বতে লৌহনির্ম্মিত গৃহরচনার

বন্দোবস্ত করিলেন—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার নির্ম্মাণকার্য্যে ব্রতী হইলেন। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার বাসরগৃহ প্রস্তুত হইল। মনসা ভাবিলেন,—চাঁদ বিষম প্রমাদ ঘটাইল। লৌহময় গৃহে সর্পের প্রবেশ সুখসাধ্য নহে। অতএব তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি সেই বাসরগৃহের দেওয়ালে একটী ছিদ্র করিয়া রাখেন। বিশ্বকর্ম্মা অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাহাই করিলেন। মনসা দেবীও নিশ্চিন্ত হইলেন। নিরূপিত দিবসে মহা আড়ম্বরের সহিত চাঁদ পুত্রকে লইয়া নিছনী নগরে উপস্থিত হইলেন। যথানিয়মে বেহুলার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হইয়া গেল। অতঃপর হৃষ্টচিত্তে চাঁদ জ্ঞাতিকুটুম্বগণ সহ আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া চাম্পাই নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পুরাঙ্গনাগণ ও প্রতিবেশিমণ্ডলী বেহুলার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া শত মুখে সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। অঙ্গনাগণের বিশ্বাস, এমন রূপ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। বধূর রূপের সুখ্যাতি শুনিয়া সদাগরের সুখের সীমা রহিল না। ফুলশয্যার রাত্রি বর কন্যা শাতালী পর্ব্বতের লৌহময় বাসগৃহে অতিবাহিত করিবেন স্থির হইয়াছিল। গৃহনির্ম্মাণাবধি তাহাতে রক্ষী নিযুক্ত ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নখিন্দর অভিনব প্রণয়িনীর সহিত শাতালীর লৌহময় গৃহে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিকালে নখিন্দর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে বেহুলা অন্ন ব্যঞ্জন ও শীতল জলে স্বামীর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিলেন। তাহার পরে উভয়ে পাশকীড়ায় রজনীর অধিকাংশ যাপন করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। মনসা দেবীর আজিকার রাত্রিতে নিদ্রা নাই, তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতেই হইবে। তিনি নানাজাতীয় বিষধর সর্পকে শাতালী পর্ব্বতে পাঠাইলেন। অনেকেই সেই লৌহময় গৃহ দুষ্প্রবেশ বলিয়া ফিরিয়া আসিল। তিনটী সর্প বেহুলা সুন্দরী কর্ত্তৃক ধৃত হইল। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া পতির প্রাণের নিমিত্ত প্রহরীর কার্য্য করিতেছিলেন, মনসার অভিশাপ তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক ছিল। ত্রিযামার অন্ত্য যামে বেহুলার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি অঘোরে ঘুমাইতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টাতেও তাঁহার নিদ্রার ঘোর ঘুচিল না। এই সুযোগ পাইয়া কালীয় নামে তীব্র বিষধর-সর্প বিশ্বকর্ম্মা-রচিত ছিদ্র দিয়া লৌহগৃহে প্রবিষ্ট হইল। সুবর্ণের দীপে গৃহ আলোকিত, নবদম্পতী ঘোর নিদ্রাভিভূত। সর্পজাতি ক্রূর হইলেও বিনাপরাধে কাহাকেও দংশন করে না বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তদনুসারে কালীয় নাগকে অপরাধের সুযোগ অন্বেষণ করিতে হইল। কালীয় নাগ মনসার আজ্ঞায় তাঁহাদের প্রাণনাশের জন্য উপস্থিত, কিন্তু সেই দীপালোক-সমুদ্ভাসিত নবদম্পতীর রূপ-মাধুরী দর্শনে তাহাকেও কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদের শয্যা-পার্শ্বে স্তম্ভিতভাবে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। এই অবসরে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-

কালে কালীয়নাগের অঙ্গে নখিন্দরের পাদস্পর্শ হইল। এই অপরাধ পাইয়া নাগ তাঁহাকে দংশন করিল। বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া নখিন্দর জাগ্রত হইলেন, বেহুলাকে ডাকিয়া জাগাইলেন। পতির মুখে সর্পদংশনবার্ত্তা শুনিয়া বেহুলা অধীর হইলেন। কালীয় নাগকে দেখিতে পাইয়া সোণার জাঁতি নিক্ষেপে তাহাকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে কালীয়ের পুচ্ছচ্ছেদ ঘটিল, কালীয় প্রস্থান করিলেন। অচিরে নখিন্দরের প্রাণবিয়োগ হইল। বেহুলা কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে বনের পশু, গাছের পাখীও অস্থির হইল। বেহুলার চীৎকার ক্রন্দনধ্বনি শাতালী পর্ব্বত হইতে চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে পৌঁছিল। সনকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুত্রবধূর ক্রন্দনধ্বনিতে তিনি বিকলচিত্ত হইয়া শাতালী পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। লোহার বাসরে প্রবিষ্ট হইয়া পত্নীক্রোড়গত নখিন্দরের শবদর্শনে পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অসাবধান বলিয়া বেহুলাকেও যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। প্রভাতের বায়ু ধীরে ধীরে অর্দ্ধ-জাগরিত চাঁদ সদাগরের কর্ণে তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি বহন করিতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দুঃসংবাদ জানাইল। চাঁদ ছয়টী পুত্রের শোকে পূর্ব্ব হইতেই সমধিক ব্যথিত ছিলেন। তাহার উপর নখিন্দরের মৃত্যুসংবাদ তাঁহার পূর্ব্ব শোক শতগুণে বৃদ্ধি করিল। তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন; অবিলম্বে শাতালী পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শোকের হাট বসিয়াছে—আত্মীয় স্বজন সকলেই সমবেত—সকলেরই চক্ষে জল, সকলেরই মুখে হায় হায় শব্দ। চাঁদ সদাগর অনেকটা শোক সম্বরণ করিলেন, পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। বেহুলা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—তিনি মৃতপতিকে ভেলায় লইয়া জলে ভাসিয়া যাইবেন, আর যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে জীবিত করিবেন। সত্যবান্‌সীমন্তিনী সতী সাবিত্রী ব্যতীত আর কাহাকেও এরূপ দুঃসাধ্য প্রতিজ্ঞা করিতে শুনা যায় না। সাবিত্রী সতী সাধ্বী, পতিব্রতা বেহুলাও তাঁহার অনুকৃতি। সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—বেহুলা মৃতপতির শব লইয়া জলে ভাসিয়া যাইবেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। কদলী বৃক্ষের মান্দাস বা ভেলা প্রস্তুত হইল। বেহুলা নখিন্দরের শব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। মান্দাস গাঙ্গুর নদীর জলে ভাসিয়া চলিল। গাঙ্গুর নদী এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে। উহা বর্দ্ধমান জেলার বৈদ্যডাঙ্গা, রসুলপুর, আমাদপুর প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল। অদ্যাপি কোন কোন স্থানে তাহার চিহ্ন আছে।

দুঃখ কি ?

বালিকা বয়সে বিধবা হইয়া আমি হতভাগিনী বলিয়া সকলের নিকটে করুণার পাত্রী হইয়া উঠিলাম। যে আমায় দেখিত, সেই বলিত "আহা"। চারি দিক্ হইতে সকলের সমবেদনা ও সহানুভূতি পাইয়া ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাই আমার বৃথা হইয়াছে। কারণ সংসারের সুখ ভোগ করা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। যাঁহারা সৌভাগ্যবতী, তাঁহারা বুঝি সকলেই সুখস্বর্গের উচ্চতম স্তরে অধিরোহণ করিয়া শান্তির বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, আর আমি অভাগিনী সেই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া একেবারে অসুখিনী, অশান্তির নরকে পতিত হইয়াছি।

মনের সন্তাপ বাড়িতে লাগিল, ভাবিলাম, "ভগবান্! আমি তোমার চরণে কি এমন অপরাধ করিয়াছি, যে শুধু আমারই জন্য এই অশান্তির নরক সৃষ্টি করিয়াছ?" এই কথা লইয়া একদিন ভগবান্‌কে জোর করিয়া ধরিলাম। প্রতিমূর্ত্তিতে যে ভগবান্ বিরাজিত থাকেন, তাহা হিন্দুকুলকন্যা আমি শৈশব হইতেই শিখিয়াছিলাম। পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, কায়মনোবাক্যে ডাকিলাম, "দয়াময়! শুনিয়াছি সুখ দুঃখের নিয়ন্তা তুমি,—ন্যায়বান্ সূক্ষ্ম বিচারক তুমি,—আমার মত পাপী কি জগতে আর কেহ নাই, তাই একা আমাকেই কেবল এই দণ্ড প্রদান করিয়াছ? সকলেই যখন আমাকে দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করে, তখন কি জগতে আমিই সকলের চেয়ে বেশী দুঃখী? মা আমার দুঃখে শোকাকুল হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, বাবা আমায় দেখিলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সমবয়স্কাগণ আমাকে দেখিলে মুখ ভার করিয়া লয়, ভাইভগিনীরা সকলেই আমার দুঃখে দুঃখিত, বিরস বদন, আমার হইয়াছে কি? আমি আর ত কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, তাই নিভৃতে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, "হে নারায়ণ! কি করিলে আমার এ দুঃখ দূর হয়, তাহা তুমি বলিয়া দিতে পার নাকি?"

শুনিলাম, মনে মনেই যেন কে বলিয়া দিল, তাহা তখন ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। বলিলেন, "দুঃখ কিসের? সংসারে সকলের নিত্য যাহা ঘটিয়া থাকে, তোমারও তাহাই হইয়াছে, সৃষ্টিছাড়া কিছুই হয় নাই। তাহাতে আর তোমার দুঃখ কি? আর দেখ, জগতে সকলেই দুঃখী, সুখ বলিয়া একটী পরম পদার্থ যাহা আছে, তাহা কেহই পাইবার ইচ্ছা করে না। কি করিলে যে সেই সুখ পাওয়া যায়, তাহাও কেহ জানে না, অথচ সেই সুখকে ধরিবার জন্য বিপরীত পথে, বিপরীত চেষ্টায়

ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং দুঃখেরি এক একটা আকৃতিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। দুঃখের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে লোকে কল্পনায় সুখের নাম দিয়া তাহারই কামনা করে। কিন্তু দুঃখ,—চিরকালই দুঃখ,—তাই যখন তাহার কল্পিত ছদ্মবেশ খসিয়া পড়ে, তখন আবার লোকে দুঃখের সেই ভয়ানক বীভৎস আকার দেখিয়া, আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠে। জগৎ সংসার শূন্য বোধ করে, তাহার প্রাণের যেটুকু প্রফুল্লতা ও সন্তোষ, তাহা বিনষ্ট হইয়া, তাহাকে মলিন ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়। এই যে দুঃখ,—তাহা সুখের বিচ্ছেদে নয়, কিন্তু দুঃখের উপর দুঃখ। দুঃখ অনিত্য, সুখ নিত্য। যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি আছে, প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহার পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর নিত্য সংঘটিত হইতেছে, সেরূপ বস্তু মাত্রেই দুঃখ। যাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, প্রকৃতির নিয়ম যাহা স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা চিরস্থায়ী,—তাহারই নাম সুখ। একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই কেবল এই নিত্য সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তোমরা সংসারে সচরাচর যে সকল বস্তুকে সুখ বলিয়া মনে কর, বস্তুতঃ তাহা সুখ নয়, আকারভেদে দুঃখেরি নামান্তর। কারণ, তাহা পরিবর্ত্তনশীল, সংসারের ধন-মান, পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, আমোদপ্রমোদ, ভোগবিলাস প্রভৃতি যাহা তোমরা সুখকর বলিয়া পাইতে চাও, তাহা সমস্তই দুঃখ। কারণ সংসারই অনিত্য এবং দুঃখময়, অর্থাৎ আজ আছে, কাল নাই। তোমরা ত তাহা প্রতিদিন অনুভব করিতেছ।

আশ্চর্য্য এই যে, এ মহাদুঃখ নিবৃত্তির উপায় কেহ জানিতে ইচ্ছাও করে না। মানুষ এই দুঃখের ছলনাকেই ভালবাসে, বার বার প্রতারিত হইয়া, বার বার প্রাণে আঘাত পাইয়াও লোকে কিছুতেই এ দুঃখের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে চায় না। মানুষ এমনই ভ্রান্ত! তা তুমি যদি এ দুঃখের নিবৃত্তি করিতে চাও, ভালই ত, আমি তোমাকে সুখের সন্ধান ক্রমেই বলিয়া দিব। আর জানিও, দুঃখই ভগবানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার সোপান, দুঃখের তাড়না না পাইলে লোকে সত্যপথ বা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে আগ্রহান্বিত হয় না।"

শুনিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রাণে যেন একটা অননুভূত আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল, বিশ্বাসের স্থান ভ্রান্তি অধিকার করিল, ভাবিলাম, উহা কিছুই নয়, আমারই পাগল মনের একটা খেয়াল।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। বাবা আমার দুঃখময় জীবনকে শান্তিময় করিবার জন্য কত হিতোপদেশ দিতেন, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কত ধর্ম্মপুস্তক আমার পাঠের জন্য আনিয়া দিতেন। স্নেহময়ী মা আমার, সর্ব্বদা আমায় চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, পাছে আমি কোন সময় নিজের দুঃখ

অনুভব করিয়া বিষণ্ণ হই। পাড়াপ্রতিবাসিগণ বলিতেন, "আহা, তোমার জন্মটা ত বৃথা হইল, এখন ধর্ম্মকর্ম্মের কাজে জীবনের দিন কটা কাটাইয়া দাও। অতি দুঃখেও তখন আমার হাসি পাইত, মনে করিতাম, সকলেই যদি দুঃখী, তবে আমারই বা এমন কি হইয়াছে যে, সংসারের সকলের করুণদৃষ্টি আমার উপর পড়িয়াছে? কিন্তু মনের প্রকৃতিসিদ্ধ অভাব ও অশান্তি সময়ে সময়ে যখন প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিত, তখন আবার ভাবিতাম, সত্য সত্যই বুঝি আমার মত দুঃখী জগতে আর নাই।

তারপর ক্রমেক্রমে শুনিতে লাগিলাম, "আজ অমুকের একমাত্র উপযুক্ত পুত্র মারা পড়িয়াছে," "আজ অমুকের স্ত্রী বিধবা হইয়াছে।" আবার একদিন শুনিলাম—"আজ অমুক ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে" ইত্যাদি। নিত্যই এইরূপ শুনিতে পাই, সর্ব্বদাই শোকস্থানে গিয়া দেখি, অপরাপর ব্যক্তিগণ সেইরূপেই শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনাদান করিতেছেন, কেহ কেহ বা আপন মৃত আত্মীয়বর্গের জন্য শোকাকুলমানসে শোকাশ্রু ফেলিয়া সন্তপ্তশোকার্ত্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণে সহানুভূতি ঢালিয়া দিতেছেন। কাল আমার শোকে যাঁহারা সান্ত্বনা দান করিয়া গিয়াছেন, আজ আমিই আবার তাঁহাদের শোকে একবার 'আহা' বলিয়া আসিলাম। সংসারের সর্ব্বত্রই এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, আজ আমার যে দুঃখ, কাল অপরের হয়ত তাহাপেক্ষাও অধিক দুঃখের কথা শুনিলাম। আবার আর একজনের হয়ত পাষাণদ্রবকারী মর্ম্মদাহ ও কাতরতা দেখিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারি না। ক্রমে জ্ঞানচক্ষু ফুটিতে লাগিল, দেখিলাম,—দুঃখের করাল মূর্ত্তি, রোগ, শোক, মোহ, দারিদ্র্য প্রভৃতি শত শত বদন বিস্তার করিয়া, জগত সংসার গ্রাস করিবার জন্য লালায়িত। তাহার সেই জ্বলন্ত লেলিহান রসনার গ্রাস হইতে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র কাহারও নিস্তার নাই। সকলেই দুঃখের করাল গ্রাসে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সেদিন ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, এখন তাহার যথার্থতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। সত্যই ত জগতে কেহই তবে সুখী নয়, তবে আর দুঃখ কিসের জন্য? সকলেরই প্রায় এক দশা—ইহাই মানবমনের সান্ত্বনার একটা প্রধান কারণ।

সেই অবধি নিজের দুঃখ ভুলিয়া কেবল পরের দুঃখের প্রতি ব্যথিতহৃদয়ে চাহিয়া দেখিতাম। কত সাজান সোণার সংসার ছার খার হইয়া যাইতেছে, কত হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর মুখ বিষাদের আঁধারে মলিন হইয়া যাইতেছে, কত নির্ম্মল প্রাণে কালিমা সঞ্চার হইতেছে। দেখিয়া দেখিয়া মনে হইত, হায়! হায়! এই ত সংসারের সুখ,—এই সুখে আমি বঞ্চিতা হইয়াছি বলিয়া আমার আত্মীয় স্বজন এত শোকাকুল, ব্যথিত। আর আমি নিজেও না বুঝিয়া এই সুখের অভাবে হৃদয়ের মধ্যে সহস্র অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া, সাধ করিয়া দিবানিশি তাহাতে দগ্ধ হইতেছি। হায়! মানুষের কি ভ্রান্তি!

সংসারের এই দুঃখময় সুখের প্রলোভন হইতে মুক্ত হইলেই যদি এই ভীষণ দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তবে হে দয়াময় জগদীশ! সকল মনুষ্যহৃদয়, সকলের প্রাণ হইতে কেন এই ঘোর আসক্তির মোহ দূর করিয়া দাও না? কেন লোকে আমার মত ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া নরকের আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছে?

জনৈক বিধবা।

স্নেহোপহার। *

১
সংসারের সুখময়ী
বড় আদরের ধন,
কত ব্রতে যজ্ঞে হোমে
তব শুভ আগমন।

২
পিতামহ-আশীর্ব্বাদে,
মা বাপের পুণ্যবলে,
শাপভ্রষ্টা রমারূপে
উপনীতা ধরাতলে?

৩
আনন্দ-উল্লাস কত
শুভ জন্মদিনে তব,
সাধনার সিদ্ধি সম
মনে হয় অনুভব।

৪
আহা! সেই চিরানন্দ
ম্লান, নিরানন্দ-রূপে,
দৈন্য-অভিশাপ-ভরা
পদ্ম যথা অন্ধকূপে।

৫
মঙ্গলপ্রতিমা খানি
অশুভ অশান্তি-বেশে
নিরুপমা জ্যোৎস্নাবতী
সুপ্তা—প্রাণহীন দেশে!

৬
সে যে কি নীরব ব্যথা
মরমের হাহাকার,
বলিতে মিলে না ভাষা
সীমাহীন যাতনার!—

৭
আজি সে কোয়াসা নিশি
দূর করি অন্ধকার,
উথলিল শুভাশীষ
স্নেহময় বিধাতার।

৮
জনকের স্নেহ, দয়া,
মহত্ত্ব, শূরত্ব বলে,
কমলা! এ সুখ-রবি
সমুদিল স্বর্ণাচলে।

* ১২ই ফাল্গুন, সোমবার, হাইকোর্টের মহামান্য জজ অনরেবল শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বালবিধবা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শ্রীমতী মানকুমারী কর্ত্তৃক লিখিত।

৯

শীতের কুহেলি শেষ
বসন্ত উঠিল জাগি,
এ আনন্দ-আমন্ত্রণ
সমস্ত "স্বদেশ" লাগি।

১০

বাসন্তী সপ্তমী নিশা
মলয়সমীর বয়,
পাপিয়ার কলকণ্ঠ
ধ্বনিছে গগনময়।

১১

বাজিছে মঙ্গল-বাদ্য
সুমঙ্গল শঙ্খ সনে,
বহিছে আনন্দ-ধারা,
সুহৃদের দুনয়নে।

১২

কমলা কমলা-রূপে
শোভিছে বরের বামে,
নব লক্ষ্মী-নারায়ণ
বিরাজিত ধরাধামে!

১৩

সুখে থাক প্রাণাধিকে!
হয়ে সতী পতিব্রতা,
প্রাণে প্রাণে মিশামিশি
পাদপে লতিকা যথা!

১৪

সীমন্তে সিন্দুর শুভ
চিরদিন পর সুখে;
হাতে থাক্ শাঁখা লোহা,
হাসি থাক্ সোণা-মুখে।

১৫

পবিত্র বিমল প্রেমে
পূর্ণ হোক যুগ হিয়া,
বসুধা ভরুক যশে
শুভ্র সুধা ছুটাইয়া।

১৬

অভাগী বঙ্গের সদা
মুছাইও আঁখিনীর,
তোমাদের সম্মিলন
শুভ হোক জননীর।

১৭

যুগল জীবন দিও
পায়ে ঢালি বিধাতার,
স্নেহের কমলা মম!
লহ স্নেহ-উপহার।

শুভাকাঙ্ক্ষিণী
একজন "দিদি"।

প্রণয়ে প্রমাদ।

এ বেশ কথা যে আমি মরলে তুমিও মরবে। আমার প্রাণ বাহির হইলে মুহূর্ত্ত কালের জন্য অপেক্ষা না করে তোমার প্রাণও বাহির হইবে। এই বলিয়া স্ত্রী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

স্বামী। দেখ জবা! তোমার মত স্ত্রী

যদি আমাকে হারাইতে হয়, তবে জেনো এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি পৃথিবীতে থাকতে পারব না।

"তা বেশ" এই বলিয়া স্ত্রী একখানি "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" ও একখানি "প্রেম ও ফুল" বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। স্বামী বই দুখানি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এরা মোচ্চোর, পাজী, পাষণ্ড। যে স্ত্রী মরিলে আবার বিবাহ করে, তাহার ন্যায় নরাধম পৃথিবীতে নাই।

স্ত্রী। এ কথা বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু বিশ্বাস করেও করতে পাচ্ছিনা। কারণ তাঁহারা তোমাদেরই জাতি অর্থাৎ পুরুষ ত বটে।

স্বামী। ছি জবা! তুমি পুরুষজাতিকে বড় অবজ্ঞা কর। ইহা বুঝিতে পার না যে সব পুরুষই কি এক রকম।

স্ত্রী। পুরুষ আবার ভাল মন্দ কি? সবই এক।

স্বামী। ছি জবা! এ সব কথা কি তোমার মুখে শোভা পায়? তোমার স্বামী যে তোমা-গত প্রাণ।

যাক্ সে কথা এখন, একটু মহাভারত পাঠ করা যাক্। এই বলিয়া স্ত্রী একখানি রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারত বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন। স্বামী কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর মহাভারত পড়িলেন। ভীষ্মবধ, কর্ণবধ, অভিমন্যুবধ পড়িলেন। তাহার পর বই পার্শ্বে রাখিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। স্ত্রীও অতিগম্ভীর ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরিহাস-প্রিয়া স্ত্রীর এরূপ গম্ভীর ভাব দর্শন করিয়া স্বামী কহিলেন, ও কি?

স্ত্রী। পুরাকালের বীর কবিদের কথাই ভাবিতেছি। দেখ, তাঁহারা সব ভারত-বাসীরইপূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু এখন তাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন ভারতের কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাস বা কিম্বদন্তীই ইঁহাদের পূর্ব্ব-খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পরিচয়স্থল। মহাভারত ও রামায়ণ, স্বদেশপ্রেমিকতা ও নিঃস্বার্থ রাজভক্তির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসের একটী মহাযোগ। স্বদেশের গৌরব-গরিমা ও পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই বীরগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যে বিস্ময়কর বীরত্ব ও অসীম আত্মত্যাগের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রাজস্থান ব্যতীত জগতের ইতিহাসে আর কোন জাতির বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সেরূপ উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। পুরাকালে রোগের আতিশয্য বড় ছিল না, অতএব কোন বীরই শয্যার উপর দেহত্যাগ করিতেন না। ইহা কবি-জনের অতিরঞ্জন অথবা কপোলকল্পিত কথা নহে। ইহা যথার্থ কথা—নিরলঙ্কার, বিশদ, সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য। যাহাদের মনে মনে এরূপ ধারণা আছে যে, হিন্দু বীরগণ স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তাঁহারা একবার এই প্রদীপ্ত কাব্য অনুশীলন করিয়া দেখুন।

স্বামী। ভারতবাসিনীগণের পতিভক্তিও অতি উচ্চ। এমন নারীচরিত্র অন্য কোন স্থানে নাই।

স্ত্রী। এ কথা ধ্রুব সত্য। এই সব গ্রন্থ সতীচরিত্রের প্রদীপ্ত আদর্শ। ভারতবাসিনীগণ যেমন পতির আদর জানেন, ভারতবাসীর নিকটেও সতী নারী সেইরূপ আদরণীয়া। দুর্গোৎসব, গঙ্গাপূজা, উমার্চ্চনা প্রভৃতি ক্রীড়াই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। রামায়ণ ও মহাভারত দুইই অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু প্রভেদ দেখা যায়।

স্বামী। কি প্রভেদ?

স্ত্রী। বেদব্যাস অপেক্ষা বাল্মীকিই সতীচরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

স্বামী। কিসে?

স্ত্রী। পঞ্চ স্বামী কর্ত্তৃক রক্ষিতা মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী হইতে সীতার চরিত্র অধিক অনুকরণীয়।

স্বামী। তবে তুমি মহাভারতকে অপছন্দ করিতেছ?

স্ত্রী। না না, মহাভারতের নিন্দা কে করিতে পারে? রুক্মিণী, সত্যভামা, সুভদ্রা ও উত্তরাদি নারীর চরিত্র কি চমৎকার। গান্ধারী ত চরিত্রে অতুলনীয়া। কবি অতি বিচক্ষণতার সহিত ও অতি সূক্ষ্ম তুলিকা দ্বারা গান্ধারীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। দানে, ধর্ম্মে, ক্ষমাতে, নিষ্ঠাতে, ধীরতা ও সহিষ্ণুতাতে, সৌন্দর্য্যে, বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে, প্রতিভাতে, সর্ব্বোপরি সতীত্বে তাঁহার চরিত্র শোভমানা ছিল। একাধারে এ সমুদয় গুণই গরীয়সী গান্ধারীর উন্নত ও কোমল হৃদয়ে অধিকার লাভ করিয়াছিল। গান্ধারী অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, পিতা তাঁহাকে অন্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, তখনই তিনি বস্ত্র দ্বারা আপন চক্ষুযুগল বন্ধন করিয়া ভাবি স্বামীর ন্যায় দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া রহিলেন। এই লাইন কয়টী পাঠ করিলেই গান্ধারীর হৃদয়ে-মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

"শুনিলা গান্ধারী তাঁর পিতা মহাশয়
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সনে দিবে পরিণয়।
তখন পতির প্রতি ভক্তির কারণ
বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিলেন যুগল নয়ন॥

রাজকৃষ্ণ রায়—মহাভারত।

সত্যবাদিনী ও সত্যপরায়ণা দেবী গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নিজ চক্ষু আবৃত করিয়া চিরান্ধের ন্যায় অন্ধ সাজিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু মূল মহাভারত হইতে কাশীদাসী মহাভারতের স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। কাশীদাসী মহাভারতে এমন সকল ঘটনা আছে যাহা নাকি মূল মহাভারতে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না এবং তাহার মধ্যে অধিকাংশই অশ্লীল, ও শ্রুতিকটু। কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে সেই সব অমূলক কথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

স্বামী। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক এবং ইহা অতি দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করি।

স্ত্রী। এই দেখ না, সুভদ্রা-চরিত্রটাকে কাশীরামদাস কি কুৎসিত করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর স্ত্রী হইলেও তিনি সেই পঞ্চ পতিরই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। দান, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা ইত্যাদি বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃতা ছিলেন। কিন্তু কাশীদাস দ্রৌপদীর চরিত্রপটেও ভাল রং ফলাইতে পারেন নাই। গান্ধারী এক দিকে অপার বীর্য্যশালিনী, অপরদিকে কুসুম-কোমলা। এক দিকে কঠোর কর্ত্তব্যপালিকা, অপর দিকে স্নেহময়ী ও সত্যবাদিনী। কিন্তু কাশীদাস গান্ধারীকেও উপযুক্ত করিয়া গড়িতে পারেন নাই। সতী সত্যভামা, ধর্ম্মাধার রুক্মিণী দেবী, কুন্তী, মাদ্রী কাহারও চরিত্র উপযুক্তরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। কাশীদাস কর্ণচরিত্রকে এমন বিকৃত করিয়াছেন যে, কাশীদাসী মহাভারতকে কর্ণকলঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির, শল্য ইত্যাদি বীরগণের চরিত্রও ঠিক গঠন করিতে পারেন নাই।

স্বামী। মূল রামায়ণ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণেরও অনেক প্রভেদ। কিন্তু কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস এক মহাভারত ও রামায়ণ লিখিয়াই অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের সেই সাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি লইয়া অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী। তা যাই বল, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষত্ব গুণ ত ছিলই। তাঁহাদের জীবনচরিত পড়ি নাই, জানি না তাঁহারা কয় বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আবার ঐ কথা। এত যে বলি, —যে সব পুরুষই একপ্রকার হয় না, তাহা তুমি বুঝিতেই চাও না।

স্ত্রী। পুরুষের মধ্যে সবই এক। তবে হাজারের মধ্যে একটী আর আধটী।

স্বামী। একটী আর আধটী কি?

স্ত্রী। পত্নীপরায়ণ। স্ত্রী মরিলে আবার বিবাহ করে না। পুরুষের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রী বিয়োগের পর বিবাহ করেন না, তাঁহারা দেবতা। দেবতার নাম করলেও পুণ্যি। তাঁহারা পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রগাঢ় পত্নীপ্রেমের ও অসাধারণ বীরত্ব গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

স্বামী। তবু ভাল, দুটী চারটী পুরুষও তোমার চক্ষে সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

"আচ্ছা গল্প এইখানেই শেষ হোক্," বলিয়া জবা অন্য ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

স্বামী শান্ত স্ত্রীর গমনে বাধা দিতে সাহস না করিয়া কেবল হতাশ নেত্রে স্ত্রীর গমনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে স্ত্রীর পরিত্যক্ত বিছানায়

পড়িয়া "বাণী" প্রণেতা রজনী বাবুর হাসির গানগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

বিংশতিবয়স্কা জবা ও ২৩ বৎসর বয়স্ক শান্ত বাবুর এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্য দিয়া আরো বিংশতি বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের কোন পুত্র বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল না।

(ক্রমশঃ)

ইতর প্রাণীর নিকট প্রেমের শিক্ষা।

স্কটল্যাণ্ডদেশীয় সুবিখ্যাত সাহিত্য-সেবী পণ্ডিত সারওয়াল্টার স্কটের বাল্য-জীবনে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটী সামান্য হইলেও ইহাতে বিশেষ শিক্ষিতব্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে। একদা স্কট্ একটী কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কুকুরটী আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রহারে কুকুরটীর একখানি পা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সে ভগ্ন পা লইয়া প্রহারকর্ত্তার পদলেহনে প্রবৃত্ত হইল। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্কট্ অনুতাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার ঐ নৃশংস কার্য্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই; এবং ঐ ঘটনা হইতে তিনি দয়াশীলতা, ও মহত্ত্ব, অনুভব করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কদাপি বিরত হয়েন নাই।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশু এক স্থানে বলিয়াছেন,—"যদি কেহ তোমার এক গালে প্রহার করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রহার করিবার জন্য অন্য গাল ফিরাইয়া দাও।" আমাদের দেশীয় নীতি-শাস্ত্রবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "মাতৃবৎ পরদারেষু পর-দ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥" ইহার অর্থ, যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরের বস্তুকে লোষ্ট্রের মত এবং সকল জীবকেই আপনার ন্যায় দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। চাণক্য পাণ্ডিত্যের জন্য যে আদর্শ নিদর্শন করিয়াছেন, যীশুখৃষ্ট সকলের জন্য সে আদর্শ ধরিয়া দিতেছেন। কিন্তু এতদ্বিধ মহান্ উপদেশ পাইয়াও লোক প্রেমিক হইতে পারিল কই? যাঁহারা খৃষ্টান নাম গ্রহণে খৃষ্টের শিষ্য বলিয়া জগতের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহারাও প্রহার-কারীকে উল্টে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হয়েন না। প্রহারকারী আততায়ীকে

প্রেম করিবেন, এত দূরের কথা, অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিরপরাধীকেও প্রহার করিতে উদ্যত হয়েন। বালক স্কটের জীবনেই এরূপ ঘটিয়াছে এমত নহে, নিরীহ কুকুরটীকে নিরর্থক প্রহার করিয়া তিনিই কেবল নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, অনেক বয়স্ক পুরুষ এবং বয়স্ক মহিলা জীবনের অনেক কাজে এরূপ অপ্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা কেবল ইতর প্রাণীর প্রতিই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন এমত নহে, তাঁহারা মানবজাতিকেও অনেক সময় দুর্ব্ব্যবহারে পীড়িত করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তির কথা বলিতেছি না, অনেক সময় বন্ধু ও আত্মীয়গণও তাঁহা-দিগের অবৈধ ব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। অজ্ঞ ক্রোধী ব্যক্তি-গণই প্রহার দ্বারা ক্রোধের পর্য্যবসান করিয়া থাকে, কিন্তু শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিরা তদ্রূপ ব্যবহার না করিলেও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কিংবা অপরের বস্তু বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নৃশংসতার পরিচয় দিয়া থাকেন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে তাহাদের কোন ফলোদয় হয় না। তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অপ্রেম কিছুতেই অপসারিত হয় না। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে আত্ম-সংযমন করিতে পারেন না। লোভের কারণ উপস্থিত হইলে বলপূর্ব্বক অপরের স্বত্ব বিলুপ্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহাদিগের জীবন উল্লিখিত কুকুরটীর জীবন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কুকুরটী কোন ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ে নাই, কোন ধর্ম্মোপদেশ শুনে নাই, অথচ প্রহারকারী আততায়ীকে দংশন না করিয়া পদলেহনে প্রেমের পরিচয় দিয়াছিল। বীরত্বাভিমানী গর্ব্বিত মানুষ এতাদৃশ পদলেহনকে ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করিতে পারে। তাহাদের "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতি প্রহারকারীকে পুনঃ প্রহার করিবার জন্যই ব্যবস্থা প্রদান করিবে, কিন্তু প্রেমের উচ্চ-আদর্শ তাহা নহে। যীশু যাহা উপদেশ দিয়াছেন, কুকুরটী যাহা ব্যবহারে দেখাইল, তাহাই প্রেমের উচ্চ আদর্শ। স্কট্ মানুষ, স্কট্ খৃষ্টান, স্কট্ ভাল মন্দের তারতম্য করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি ব্যব-হারে কুকুরের পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তাই বলি, ইতর প্রাণী হইতেও মানুষের অনেক শিক্ষিতব্য রহিয়াছে। মানুষ বিবেকের অভিমান করিয়া জীবজগতে শ্রেষ্ঠ আসন লইবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু পশ্বাদি ইতর প্রাণী স্বাভাবিক সংস্কার বশতই হউক, কিম্বা শিক্ষাজন্যই হউক, সময় সময় যেরূপ সাধুতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকে, মানুষ তাহা দেখাইতে পারে না! মানুষের বিবেক থাকিলে কি হয়? যদি বিবেক সাধু ইচ্ছার সহিত যোগ করিয়া কাজ করিতে না পারে, বিবেক যাহা ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ইচ্ছা যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে সে বিবেকের মূল্য অতি

কম। এইরূপ বিবেকযুক্ত মানুষকে অনেক সময় পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীতে স্থান দিতে প্রবৃত্তি হয়। তাই বলি, মানব! তুমি যদি আপনার গৌরব রক্ষা করিতে চাও, তুমি যদি বিবেককে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে চাও, তাহা হইলে প্রেমের দীক্ষা লইয়া আপনাকে ভুলিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে স্বার্থপরতার পূতিগন্ধময় পঙ্কিলতা সরাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রেমের সুগন্ধিযুক্ত ফুল ফুটাইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে উল্লিখিত কুকুরের অনুকরণে আততায়ীকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। পালাজ্বরের ঔষধ। জ্বর হওয়ার পর দিবস প্রাতে থুলকুড়ী (থানকুনী) পাতার স্বরস (জলযুক্ত না করিয়া খাঁটি রস) দুই তোলা, পানের স্বরস দুই তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে জ্বর বন্ধ হয়।

২। হাঁপানির ঔষধ। রক্ত পুনর্ণবার শিকড় চারি আনা, সাদা জীরা আড়াইটী এক সঙ্গে বাটিয়া তিন দিবস প্রাতে সেবন করিলে হাঁপানী রোগ দূর হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে কলাগাছ সম্বন্ধীয় সমস্ত খাদ্য পরিত্যাগ করিবে।

৩।—স্বরভঙ্গের ঔষধ। সৈন্ধবের সহিত কচি কুলপাতা গব্যঘৃতে ভাজিয়া ঐ ঘৃতসহ উহা অবলেহন করিলে স্বরভঙ্গ নিবারণ হয়।

৪। রক্তপ্রদরের ঔষধ। বকুল পাতার রস দুই তোলা, অর্দ্ধ তোলা চিনি সহ তিন দিন প্রাতে সেবন করিলে রক্ত বন্ধ হইবে।

৫। চক্ষুওঠার ঔষধ। কচি বেলপাতা দুই তিনটী, টাট্‌কা ছাগ দুগ্ধের সহিত পরিষ্কৃত প্রস্তরের পাত্রে উত্তমরূপে বাটিয়া তাহাতে ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া সিসির মধ্যে ছিপি আঁটিয়া রাখিবে, এবং তাহা বারংবার বিন্দু বিন্দু চোখে লাগাইবে। প্রত্যহ টাট্‌কা দুগ্ধ ও কচি বেলপাতা দিয়া প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শীঘ্র আশ্চর্য্য উপকার হয়।

৬। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ। একটী পিঁয়াজের অগ্রভাগ কাটিয়া ঐ পিঁয়াজের মধ্যে একটু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সর্ষপপরিমাণ আফিঙ দিবে, এবং সেই ছিন্ন অগ্রভাগটী (মুখুটী) পেঁয়াজের ছিন্ন মুখে চাপা দিয়া সমস্ত পিঁয়াজটী তপ্ত ভস্ম মধ্যে রাখিবে, মুখুটীর দিক্‌টী যেন ছাই চাপা না পড়ে, আগাটুকু যেন বাহিরে থাকে। এইরূপে বহুক্ষণ রাখিয়া, উহা মন্দ উত্তাপে সিদ্ধ হইলে, ঐ পিঁয়াজটী অনাবৃত স্থানে সারা রাত্রি রাখিবে। প্রাতে সমস্ত পেঁয়াজটী চর্ব্বণ করিয়া খাইয়া বাসি জল পান করিবে। এইরূপ তিন চারি দিন সেবন করিলে প্রবল রক্তামাশয় সারিয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। ৭ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা মূক-বধির-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীমুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীমতী ম্যাকফার্‌সন পারিতোষিক বিতরণ করেন। কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উক্ত দিবসে হইয়াছে।

২। ১০ই মার্চ্চ। কলিকাতা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের বালিকাদিগের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মহারাণী পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণকালে আগামী ১০ই এপ্রিল ভারতের জয়পুরের মহারাজকে ডাক্তার অব্ ল (D. L.) উপাধি দিবেন শুনা যাইতেছে।

৪। ৯ই মার্চ্চ সোমবার প্রাতে স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং ১০ই মার্চ্চ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতায় অনেকে আলোক ও পুষ্পমালায় গৃহ সুসজ্জিত করিয়াছিল।

৫। "কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দু জাতির হ্রাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি?"—এই বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই প্রবন্ধলেখককে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এবং তাঁহার প্রবন্ধটী বঙ্গদর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা যাইবে। লিখিত প্রবন্ধ, আগামী ১২ই আশ্বিনের মধ্যে ১৯নং ষ্টোর রোড—বালীগঞ্জ, কলিকাতা—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিতব্য। বিচারক:—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী।

৬। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী রাজাম্মল সারঙ্গননিয়া নাম্নী একটী মহিলা বি, এ, পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৭। সীমান্তে জাকাখেলদিগের বিরুদ্ধে ইংরাজরাজ যে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ফলে সীমান্তবাসিগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ঘটক ও অনুসন্ধান—বিবাহ, ধর্ম্ম, নীতি ও সামাজিক মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মুকুন্দচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক কলিকাতা, ৯২।৪ নং কর্পরেসন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০ আনা মাত্র। এই পত্রিকাখানিতে বিবাহ, ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা আছে। অধুনা সমাজে ঘটক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অভাব। নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ স্থলেই ঘটকের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল স্বার্থান্ধ অশিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা অনেকেই অনেক সময় প্রতারিত হন। সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত এই পত্রিকায় সকল ধর্ম্ম, শ্রেণী ও জাতির পাত্র পাত্রীর রূপ ও গুণ বর্ণনা করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন ও বিবাহকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অতি আনন্দের বিষয়। বঙ্গসমাজে বিবাহব্যাপার অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, শিক্ষিত লোকেরা মধ্যস্থ হইয়া যদি সৎপাত্র পাত্রীনির্ব্বাচন ও ব্যয় সংকুলানের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকা বহু দিবস হইল প্রকাশিত হইয়া, ইহার স্বত্বাধিকারী নিরুদ্দেশ হওয়ায় এতদিন বন্ধ ছিল, এক্ষণে পুনরায় রীতিমত প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

২। প্লেগ-সংহিতা বা আর্য্যস্বাস্থ্যবিধান।—শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। এই পুস্তকে প্লেগের উৎপত্তি, প্লেগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত, সভ্যতার সহিত মহামারির আবির্ভাব, প্লেগের টীকা সঙ্গত কি না, প্লেগের ঔষধ, ইত্যাদি নানা বিষয় যত্নের সহিত শাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক মত সংগ্রহ করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে অতীব হিতকারী গ্রন্থ। বহুদর্শী গ্রন্থকার হিন্দুর জ্যোতীষ বিজ্ঞানাদির বহুলশাস্ত্র সমালোচনা পূর্ব্বক ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়াছেন, সে সকল কথা সর্ব্বসাধারণের বিশেষরূপে পড়িবার ও বুঝিবার বিষয়, এবং তাহা পড়িলে ও বুঝিলে যথাশক্তি তদনুরূপ জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিলে অতি উপাদেয় ফললাভ হইতে পারে।

৩। অঞ্জলি—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত অভিনব গীতিকাব্য, কলিকাতা ৩৬ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। জীবেন্দ্র বাবু সাহিত্য জগতে অপরিচিত নন। তাঁহার এই অঞ্জলি প্রাপ্তে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। পুস্তিকাখানি ভক্তি, প্রীতি প্রেম ও সম্মিলন এই চারিভাগে বিভক্ত। কবিতাগুলি কবিহৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস। রচনা সরল ও মধুর। প্রতি পদ্যেই গ্রন্থকারের মধুর প্রেম ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ইনি নব নব রত্নদানে আমাদের মাতৃভাষাকে শোভিত করুন।

বামারচনা।

প্রার্থনা।

মা!

আর চাহিব না,
চাহিতে দিও না,
চাহিবার কিছু রেখনা ভবে,
বুঝেছি বাসনা,
পূরে না পূরে না
আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি কভু না হবে।
কর্ম্ম ভোগ কত,
ভুঞ্জি নানা মত,
হর্ষে বেঁধেছিনু সুখের বাসা,
সারাটী জীবন,
চাহিয়াছি ধন,
চাহিয়াছি সুখ, যশের আশা।
চাহি স্নেহ মান,
প্রেমে প্রতিদান,
চাহিতে চাহিতে জীবন গেল,
নিত্য নানা মত,
চাহিতেছি কত,
বাসনা কই মা ফুরায়ে এল?
মিটে এক আশা,
আবার পিপাসা,
শুধুই পিয়াসে দহিল প্রাণ,
চাহিতেছি যত,
দিতেছ সতত,
তথাপি অতৃপ্তি, দুঃখেরি ভাণ।

বুঝেছি এবার,
অভাব আমার,
কিছুই রাখনি জগত-মাঝে,
অভ্যাসের ফলে,
অতৃপ্তির বলে,
দেহি দেহি শুধু সকল কাজে।

চাহিবার ফল,
অতৃপ্তি কেবল,
জানিয়া বুঝিয়া কামনা তবু,
যত ঢাল সুধা,
মেটে না এ ক্ষুধা,
এবার চাহিলে দিও না কভু।
হতাশ হইয়ে,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
মাগো! অশ্রুজল ফেলেছি কত,
কৃতঘ্ন এ প্রাণ,
ভুলে, তোর দান,
তোমারে অবজ্ঞা করেছে শত।
তথাপি তোমার,
করুণা অপার,
বরদাত্রীরূপে দিয়েছ দেখা,
গেছে অবসাদ,
পূর্ণ আজি সাধ,
মুছাও এবার করম-লেখা।

কিছু চাহিব না,
চাহিতে দিও না,
চাহিবার কিছু রেখনা ভবে,
অতৃপ্ত হৃদয়,
শান্ত কভু নয়,
বাসনা ঘুচিলে প্রশান্ত হবে।

কোকিল

(ইরাজী হইতে অনুবাদিত)

১

এস হে কোকিল আজি
বসন্তের দূত সাজি
নিকুঞ্জ কাননে তুমি সুবেশী অতিথি,
দিয়াছেন বিশ্বপতি
তোমারে আসন পাতি,
কানন গাইছে তব আগমনী-গীতি।

২

'ডেসি' ফুটি থরে থরে
প্রান্তর শোভিত করে
অমনি শ্রবণে তুমি ঢাল স্বরধারা,
কেমনে নির্দ্দিষ্টক্ষণ
জানি কর আগমন ?
পথ দেখাইয়া দেয় বুঝি কোন তারা ?

৩

নিকুঞ্জ মাঝারে থাকি
ডাকে নানাজাতি পাখী,
শুনি সে মধুর গীতি জুড়াল শ্রবণ,
চিরানন্দময় তুমি,
তোমা সনে আজ আমি
সমাদরে বসন্তেরে করি সম্ভাষণ।

৪

যবে কানন ভিতরে,
বালক ভ্রমণ করে
প্রস্ফুটিত-'প্রিমরোজ'-চয়ন-মানসে,
ক্ষণেক হয়ে স্তম্ভিত
শুনিয়ে তব সঙ্গীত
অনুকারি ওই স্বর গায় সে হরষে।

৫

(এই) গীতি-পূর্ণ উপত্যকা
ত্যজি যাও মধুসখা
রবি শস্য হয় যবে মুকুলে শোভিত,
অন্য কোন বসন্তেরে
সম্ভাষিতে সমাদরে
অন্যত্র অতিথিবেশে হও উপনীত।

৬

তোমার আকাশ ভাই !
নিরমল সর্ব্বদাই
সদাই হরিতবর্ণ নিকুঞ্জ তোমার ;
তোমার সঙ্গীতে ভাই !
বিষাদের কণা নাই
তোমার বরষে নাই শীতের সঞ্চার।

৭

তোমা সনে নিরবধি
উড়িবার শক্তি যদি
থাকিত, অক্লান্ত পক্ষে আমি পিকবর !
তোমা সনে বর্ষে বর্ষে
সারা ধরা ভ্রমি হর্ষে
হইতাম বসন্তের চির-সহচর।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

No. 536. Registered-No. C. 134. April, 1908.



স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৬ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩১৪। এপ্রেল, ১৯০৮। | ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সূচীপত্র।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৫৩
২। ভক্তকবি তুলসীদাস (পণ্ডিত শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন) ৩৫৬
৩। আমরা কি চাই (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, এ) ৩৬২
৪। বেহুলা (শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত) ... ৩৬৮
৫। বীরনারী জিন মেরী গায়েন (শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু) ৩৭১
৬। গোধন রক্ষা (শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র) ৩৭৩
৭। কাব্য লেখা সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত রাসকিনের অভিপ্রায় (শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম,এ) ৩৭১
৮। গৃহ চিকিৎসা... ... ... ৩৮০
৯। নূতন সংবাদ ৩৮১
১০। বামারচনা—
কাশী (শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র) ৩৮২
অশ্রুধারা (শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী) ৩৮৩
১১। ১৩১৪ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৮৪

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷০, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ৩৲ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধি-মথিত

সোমেশ্বর-রসায়ন।

অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, গ্রহণী ও ধাতুঘটিত পীড়া ইত্যাদি বি প্রকার জটিল রোগের মহৌষধ।

অম্লপিত্ত শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সোমেশ্বর রসায়ন সেবন করুন, সেবন পরক্ষণেই অম্লপিত্তের বুকজ্বালা, নাভির চারি পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ দারুণ বেদনা, চোঁয়া ঢেকুর, পেট ফাঁপা, পেটে ও বুকে ব্যথা, মুখ দিয়া জল উঠা, পেট ঠোশ থাকা ইত্যাদি উপসর্গ শীঘ্রই উপশমিত হইবে।

যাঁহাদের আহারান্তে ভুক্তদ্রব্য বমন দ্বারা উঠিয়া যায়, তাঁহারা ২ দাগ খাই ইহার যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে সরল মল নির্গত হ অম্লজনিত হৃদ্রোগ যথা বুক ধুড় ধুড় করা বা ধড় ধড় করা নিবারণ হইবে।

অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি থাকিলে সেবন করুন জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, সকল দ্রব্যে রুচি হইবে, ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

গ্রহণীরোগে ব্যবহার করুন বারংবার মলত্যাগ, আমাশয় মল, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদ আশু নিবারিত হইবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন ঔষধ বলিয়া ইহা সকল রোগেই হিতকর

৮ দিন সেবনের উপযোগী ৮ আউন্স এক শিশি সোমেশ্বর রসায়নের মূল্য ১৷ মাশুল ৷৷০ আনা।

শ্বাসারি।

(হাঁপানি কাসির ইহাই মহৌষধ)।

"শ্বাসারি" সেবনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না। কাসিতে কাসিতে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হই না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিট সাঁটিয়া ধরা বা ব্যথা পেটকাঁপা বা মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালকবালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ী কাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই ঘড় ঘড় করা, বুকে বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনে কমিবে।

কাসরোগের পক্ষে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। যে সকল রোগীর শ্বাস কাস নিয়ত বর্ত্তমান আছে, বিশেষতঃ রাত্রির শেষে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অবিরত কাসিতে হয় ও গয়ের উঠে অথচ হাঁপানির টান থাকে, তাঁহারাও এই "শ্বাসারি" সেবন করুন, সপ্তাহমধ্যে সুস্থতা লাভ করিবেন।

১৬ দাগ পূর্ণ এক শিশি "শ্বাসারি"র মূল্য ১৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৷০ আনা; মোট ২৲ টাকা পড়ে।

কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ,

৪নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার,

কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 536. April, 1908.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৫ বর্ষ। ৫৩৬ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩১৪। এপ্রেল, ১৯০৮। } ৮ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পশ্চিমাঞ্চলে বৈশ্য কন্‌ফারেন্স—এ বর্ষের বৈশ্য কন্‌ফারেন্স মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকল্পে উক্ত সভায় এবার অনেকগুলি উপাদেয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বৈশ্যজাতি নানা শ্রেণী, নানা সম্প্রদায়ে ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তাহাদের শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত সমস্ত পার্থক্য দূরীভূত করিয়া, যাহাতে সমগ্র বৈশ্যজাতি একতাসূত্রে গ্রথিত হয়, যাহাতে সামাজিক কুপ্রথা সকল অপসৃত হয়, যাহাতে সামাজিক ও পারিবারিক, ধর্ম্মঘটিত বা বিষয়ঘটিত বিবাদ-বিসংবাদের সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তি হয়, যাহাতে সংস্কৃত ও হিন্দি শিক্ষার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হয়, যাহাতে বালিকারা ও গৃহিণীরা অবস্থামত সুশিক্ষা লাভ করিয়া সামাজিক ও পারিবারিক উন্নতির সহায়তা করিতে পারেন, যাহাতে বিধবারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিতা ও বিবিধ শিল্পাদি বিদ্যায় শিক্ষিতা হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সেই সকল সদনুষ্ঠানই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বৈশ্যজাতিমধ্যে বিবাহাদি উৎসবে বারবনিতার নৃত্যগীতাদি-প্রথা প্রচলিত আছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলে সমবেত হইয়া ইহা দর্শন ও শ্রবণ করেন, এই কুপ্রথার উচ্ছেদ বিষয়ে, এই বৈশ্য-সভা এবার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বৈশ্য বালকেরা যাহাতে শিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ে পাশ্চাত্যজাতির অবলম্বিত বৈজ্ঞানিক সমুন্নত প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে, ধনাগমের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারে, তৎপক্ষেও এই সভার আন্তরিক উদ্যোগ। ঈশ্বর এই সভার সাধু উদ্দেশ্য সফল করুন।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসৃত হউক।

ভারতের সর্ব্বজনীন বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়—আজি মঙ্গলময়ের কৃপায় দেবী এনি বেসান্তের মহীয়ান্ সঙ্কল্প ফলোন্মুখ হইল। বহুদিনাবধি তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল যে,—ভারতবর্ষে একটী জাতীয় বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং উহার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার ভারত-সন্তানগণের হস্তে ন্যস্ত হউক। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান্, ব্রাহ্ম, শিখ, জেরোষ্ট্রিয়ান্ প্রভৃতি যে জাতির যত বিদ্যালয় আছে, সমস্তই অবিরোধে সম্মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্যে এই বিরাট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক একটী অঙ্গস্বরূপ হউক। ভারতের মহোন্নতিকল্পে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ের জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাধনা ও চিন্তার সামঞ্জস্য ও সঙ্গমক্ষেত্র এই বিশ্ববিদ্যালয় হউক। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নেতারা সমপ্রাণ সহোদরের ন্যায় সৌহার্দ্দ মিলিত হইয়া ইহার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হউন।

এ ব্যাপার অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবি-রত্ন মহাশয় তাঁহার "অকিঞ্চনের নিবেদন" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—"আমরা সকলেই এক মায়ের (জন্মভূমির) সন্তান। এই ভারতবসুন্ধরায় আমাদের ঈশ্বরদত্ত—পৈতৃক ও মাতৃক স্বত্ব, জন্মাধীন স্বত্ব, স্বাভাবিক স্বত্ব, আমাদের কৌলিক ও মৌলিক স্বত্ব; আমাদের অস্থি, মাংস, মজ্জা, শোণিত, প্রাণময় ও অন্নময় কোষ, সকলি এই মাতৃভূমির উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট। এই ভূতধাত্রী যখন আমাদের সাধারণ জননী এবং এই ভূতধাত্রীর স্রষ্টাও যখন সেই—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", তখন আমরা সকলেই এক পরিবার। অতএব অসংখ্য বিষয়ে আমাদের অসংখ্য ভেদ থাকিলেও, আমাদের সাধারণ সন্ধিস্থল বা সংযোগ-ভূমি—ঈশ্বর ও জন্মভূমি। ঈশ্বরে ও জন্ম-ভূমিতে যদি সকলের অনুরাগ অচল হয়; জন্মভূমির সমুন্নতিই যদি সকলেরি অদ্বৈত লক্ষ্য ও অদ্বৈত সাধনা হয়; আমরা যদি ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া একই—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবই; পথে কোনও বিঘ্নবাধা আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। যেমন সাগরোন্মুখী নদীরা নানা পথে প্রধাবিত ও নানা বাধায় প্রতিহত হইয়াও, সেই মহাসাগরেই পতিত হয়, তেমনি, আমরা ত্রিশ কোটি, সমপ্রাণ ও একলক্ষ্য হইয়া চলিলে, সমস্ত্রে বাধা সত্ত্বেও আমাদের সিদ্ধি-ক্ষেত্র—সেই মহাসঙ্গমে গিয়া মিলিব।"

বেসান্ত দেবী এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করি-বার জন্য যাহা করিয়াছেন ও যাহা করি-তেছেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইংলণ্ডেশ্বর, তদীয় প্রধান মন্ত্রী, ভারত-সচিব, ভারত গবর্ণর, ভারতের নানা সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান নেতা প্রভৃতিকে তিনি নিজ উদ্দেশ্য জানাইয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছেন। ঈদৃশ সঙ্কল্পে অনুমোদন না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না।

এনি বেসান্ত বক্তৃতাকালে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—সমগ্র ভারত-বর্ষ যাহাতে ভারতবাসীর স্বায়ত্বশাসন-তন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার জন্য এখন হইতে আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে, কেননা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র জগতের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে একটী বিশ্বজনীন মহাসম্মিলনের শুভদিন আসি-তেছে। এ সময় যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হস্তে দেন, তবে এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই উক্ত মহাসম্মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে চিরকাল পূজিত হইবেন এবং ব্রিটিশ জাতির পুণ্যমহিমা এই জগতে অক্ষয়-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। যে স্বাধীনতার উপাসক তেজীয়ান্ ব্রিটিশ জাতির উদ্যমে এমেরিকার ঘৃণিত দাসত্বপ্রথা নিবারিত হইয়াছে, যাঁহাদের শিক্ষায় ও আদর্শে আজি এদেশে স্বদেশভক্তির নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এ অধম পতিত মহাজাতির উদ্ধারসাধন তাঁহাদেরি সাধ্যায়ত্ত।

এ জগতে দেবী আনিবেসান্তের উদয়, ভারতের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার ফল। কোটি কোটি ভারতবাসীর কৃত-জ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি অনন্তকাল জীবিত থাকিবেন। এ পতিত জাতির উদ্ধার-সাধনের জন্য তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ পতিতপাবনী মহাশক্তিরূপে প্রেরিতা।

দান—বহরমপুরের স্বনামখ্যাত জমি-দার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সাহেব বহরমপুর ইাসপাতালে বিনা ব্যয়ে রোগী-দিগের চিকিৎসার জন্য ৫০,০০০ হাজার টাকা ও বহরমপুর কলেজে এণ্ট্রান্স ও এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বৃত্তির জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সুশ্রূষাকারিণী নাই-টিঙ্গেল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদিগের সেবা করায় ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের জন-সাধারণ ভক্তি উপহার স্বরূপ তাঁহাকে ৭।০ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি সেই টাকা নিজে গ্রহণ না করিয়া তাহা নাইটিঙ্গেল হোম নির্ম্মাণের জন্য দান করেন। সম্প্রতি লণ্ডন সহরে নাগরিক অধিকার পত্র একটী সুবর্ণ-পাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দান করা হয়। তিনি সেই পাত্র গ্রহণ না করিয়া তাহার মূল্য ২৮০০৲ টাকা সুশ্রূষা-কারিণীদের আশ্রমে দান করিয়াছেন।

মাদ্রাজে অশান্তি—স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের কারামুক্তি উপ-লক্ষে মাদ্রাজে টিউটিকরিনের অধিবাসীরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য অনেক দোকান সুসজ্জিত করিয়া-ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে কোনও দোকানদারকে বেত্রাঘাত করায় জন-সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করে এবং পুলিশও লোকের উপর গুলি চালায়। ফলে কতকগুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সভা—পাশ্চমাঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তত্রত্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য গত ১৮ই মার্চ্চ

কলিকাতা টাউনহলে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। ভারত-সম্রাট্ ছুর্ভিক্ষধন-ভাণ্ডারের অভিভাবকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

তুলসীদাস গৃহত্যাগী হইয়া নানাস্থান ভ্রমণকরত কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রত্যহ মণিকর্ণিকাতীর্থে স্নান করিয়া শিবের চরণে প্রার্থনা করিতেন, —হে দয়াময় বিশ্বেশ্বর! তুমি আমাকে রামভক্তি দান কর। নরহরি নামে এক মহাপ্রভাব সাধু তুলসীর ঐকান্তিকী ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তুলসীকে আশা ও উপদেশ দান করিলেন। নরহরির কৃপায় তুলসী সাধনাবিষয়ে অনেক গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে নগরের বাহিরে গিয়া শৌচাদি সম্পন্ন করিতেন। শৌচান্তে জলপাত্রে যে জলটুকু অবশিষ্ট থাকিত, ফিরিবার সময় সেই জল পথের এক বৃক্ষমূলে ঢালিয়া দিতেন। একদিন সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া দেখিলেন,—পাত্রে জল নাই। বৃক্ষে জল দেওয়া হইল না, ভাবিয়া একটু দুঃখিতভাবে দাঁড়াইলেন, এমন সময় বৃক্ষ হইতে এক ভূতযোনি বলিয়া উঠিল,—"আজি জল দিতে না পারায় দুঃখিত হইও না। আমি এই বৃক্ষে বাস করি, তোমার প্রদত্ত জল আমি অলক্ষ্যে প্রত্যহ পান করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তুলসী কাতরস্বরে তাহার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে মহাপুরুষ! আপনাকে নমস্কার! আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই বর দিন, যেন আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করি।" প্রেতযোনি কহিল,—"সে ক্ষমতা আমার নাই; তবে তোমাকে এক উপায় বলিতেছি শুন! এই স্থানের কিছু দূরে কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক মন্দিরে প্রত্যহ বৈকালে রামায়ণ কথা হইয়া থাকে। এক মলিনবস্ত্রধারী কুরূপ পুরুষ প্রত্যহ তথায় রামায়ণ শুনিতে আসেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে তথায় আসিয়া সর্ব্বশেষে চলিয়া যান। তিনিই সাক্ষাৎ হনুমানজী। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি কৃপা করিলেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে।" তুলসীদাস নিরূপিত সময়ে কর্ণঘণ্টাদেবালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—পূর্ব্বোক্তরূপ একটী পুরুষ তথায় সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইলেন, এবং কথারম্ভ হইলে, জনতা হইতে একটু দূরে বসিয়া ভক্তিগদগদভাবে রামায়ণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কথাভঙ্গের পর সেই পুরুষ সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন, তুলসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। নির্জ্জনে তাঁহাকে একাকী পাইয়াই তুলসী সরোদনে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং রামদর্শনার্থে কাতরভাবে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিলেন। সেই পুরুষ তুলসীকে প্রত্যাখ্যান করিতে নানা কৌশল করিতে লাগিলেন, কিন্তু তুলসী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, দৃঢ়ভাবে তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—আপনি দয়া করিয়া রামদর্শনের উপায় যতক্ষণ না করিবেন, ততক্ষণ কিছুতেই আপনার চরণ ছাড়িব না। কাশীধামে কোনও ভূতযোনি আমাকে আপনার সন্ধান জানাইয়া বলিয়াছেন,—তিনি যতক্ষণ না রামদর্শনের উপায় করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার চরণ ছাড়িও না। তখন হনুমানজী তুলসীকে রামমন্ত্র দান করিয়া কহিলেন, —তুমি চিত্রকূটে গমন করিয়া একান্তভাবে এই মন্ত্র জপ কর, ঐ স্থানেই তুমি রামচন্দ্রের দর্শন পাইবে। তুলসী চিত্রকূটে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদা তুলসী চিত্রকূটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন,—একটী হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দুইটী আশ্চর্য্যরূপ রাজকুমার অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী অপূর্ব্ব শ্যামবর্ণ ও অপরটী অপূর্ব্ব গৌরবর্ণ। তুলসী চমকিত হইয়া দেখিতে দেখিতে ঐ দুই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তুলসী মুগ্ধ হইয়া দেখিলেন বটে, কিন্তু উঁহারাই যে, রাম-লক্ষ্মণ, তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অনন্তর হনুমানজী পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,—তুলসি! তুমি চিত্রকূটে কিছু দেখিলে? তুলসী কহিলেন,—হাঁ! চিত্রকূটে দুই অপূর্ব্ব কুমার দেখিলাম; কিন্তু তাঁহাদিগকে মৃগয়াশীল জানিয়া আর সে দিকে দৃষ্টি রাখি নাই। হনুমান্ কহিলেন,—হায় হায়! আরাধ্য বস্তুকে তুমি সম্মুখে পাইয়াও দেখিলে না? চিনিলে না? উঁহারাই রাম-লক্ষ্মণ। এ কলিযুগে দেবদর্শন বারংবার ঘটে না। তখন তুলসী হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি হতভাগ্য! কি কুকার্য্য করিলাম! আমি জাগিয়া ঘুমাইলাম! চিন্তামণি সম্মুখে পাইয়াও পলকমধ্যে হারাইলাম! যখন চলিয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল!"

"যখন চলিয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙ্গিল" —তুলসীর এ কথাটীর যাথার্থ্য মানবগণ অহরহঃ অনুভব করিতেছে, তথাপি কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।" এই জন্যই বলিয়া থাকে,—"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না।" সময় ও সুযোগ থাকিতে মানব যদি বুঝিয়া চলিত, যদি যথাকালে স্বকর্ত্তব্য প্রাণ ভরিয়া সম্পন্ন করিত, তবে আপন অনুতাপের তুষানলে আপনি দগ্ধ হইত না, তাহার জ্বালাময় হৃদয় ও মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া প্রতপ্ত নিশ্বাস-পরম্পরা উত্থিত হইয়া তাহাকে শোষণ করিত না।

"চলিয়া গেলে ঘুম ভাঙ্গে"—অধিকাংশ মানবের এই দশা! যখন প্রাণের

পরমারাধ্য ত্রিলোকীসুদুর্লভ পিতা-মাতা এ জগতে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন, জানিনা, কি এক মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম! তখন মনে হইত, আমার এই অবস্থাই স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী, এ জীবন এরূপেই কাটিবে। কিন্তু হায়! যে দিন তাঁহারা চলিয়া গেলেন, সেই দিন তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলাম, সেই দিন পিশাচী মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। এখন মনে হয়, আবার যদি একটীবার তাঁহাদের দেখা পাই, তবে কি করি? আমার এই দেহ-মনপ্রাণ ও আত্মা একসঙ্গে বাটিয়া তাঁহাদের চরণে লেপন করি; যুগপৎ উভয়ের চরণ বুকে করিয়া মরিয়া যাই; যুগবৎ উভয়ের গলা ধরিয়া সেই যুগল বক্ষে লয় হইয়া যাই; অথবা অনন্তকাল অনিমিষনেত্রে তাঁহাদের অভয়, অমৃতময়, সর্ব্বদুঃখহারী, প্রাণারাম রূপ দর্শন করি; যুগপৎ উভয়ের কপোলে কপোল সংলগ্ন করিয়া, মা-মা-বাবা-বাবা!" বলিয়া ডাকিতে থাকি; অথবা, তাঁহারা যাহা ভালবাসেন, যাহা করিলে তুষ্ট হন, নিরন্তর তাহাই করি, আর বলি,—আমি তোমাদিগকে ফেলিয়া কোথাও যাইব না, পলকের জন্যও তোমাদিগকে চক্ষুর অন্তরাল করিব না, প্রাণান্তেও তোমাদের অবাধ্য হইব না, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। গভীর নিশীথে যখন সমস্ত বিশ্ব নিস্তব্ধ, তখন আমি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদি ও তোমাদিগকে ডাকি, তোমরা কি তাহা শুনিতে? আমার অশ্রুধারায় সমস্ত শয্যা সিক্ত হয়, আমার আর্ত্তনাদে নিঃশব্দা নিশীথিনী চমকিত হয়, অন্ধকারেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তোমরা কি তাহা জানিতে পার?

দয়াময় পিতঃ! দয়াময়ি মা! তোমরা আজি নিরাময় অশোক ব্রহ্মলোকে দিব্য রূপে ও দিব্য তেজে প্রদীপ্ত হইয়া বিহার করিতেছ। তোমরা আমার অন্তঃসাক্ষী; আমার মনের কথা, যাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, তাহা জানিতেছ। সেই সকল পূর্ব্ব স্মৃতি, যাহা আমার আত্মার সহিত জড়িত হইয়া আছে, সেই সকলের উন্মাদকর উত্তেজনা আমাকে অভিভূত করিতেছে; চাপিবার জন্য ভুলিবার জন্য যতই চেষ্টা করি, সে সকল স্মৃতি ততই প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সে সকল স্মৃতির আদি, অন্ত ও মধ্য তোমরাই। আমি উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইয়া অহোরাত্র সেই স্মৃতিময় রাজ্যেই বাস করিতেছি। তোমাদের প্রস্থানের পর এই সুদীর্ঘ কালে এ জীবনে কত বিপ্লব, কত পরিবর্ত্তন, কত সংঘর্ষ ঘটিল, কিন্তু সে সকলি ভুলিয়া যাই; মনে হয় যেন,—মধ্যে কোনও ব্যবধান পড়ে নাই, সেই আমি ও সেই তোমরা অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই স্থান, সেই ক্ষণ, সেই সব কথা, সেই কার্য্য অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই উৎসব, সেই আনন্দ অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। যেন সেই আমি, সেই তোমরা, সেই সব আত্মীয় অবিচ্ছেদে বিদ্যমান। আমি সেই স্মৃতি ও সেই কল্পনায় ডুবিয়া গিয়াছি, যেন সেই বয়সে ও সেই অবস্থায় অবিকল রহিয়াছি। কিন্তু হায়! মরীচিকার ন্যায় সেই কল্পনা-কুহক যে মুহূর্ত্তে অপসৃত হয়, তখনি হৃদয় তুষানলে দগ্ধ হইতে থাকে।

এ যে কি যাতনা! বলিতে পারি না, এ বেদনা কোন্ স্থান হইতে উঠিতেছে তাহা হাত দিয়া দেখাইতে পারি না, এ পীড়ার ঔষধ নাই। তুলসীদাস! তুমি যে সাধনার বলে তোমার হারানিধিকে আবার পাইয়াছিলে, এবং পাইয়া আর হারাও নাই, এ হতভাগাকে সেই সাধনা, সেই মহামন্ত্র শিখাইয়া দাও।

তুলসীর মর্ম্মভেদিনী কাতরতা দেখিয়া হনুমান্ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, —"বৎস! অভীষ্ট-দর্শনে তোমার যেরূপ প্রাণশোষিণী তৃষ্ণা, তুমি আবার সেই দয়াময়ের দর্শন পাইবে।" ইহা বলিয়াই হনুমান্ অন্তর্হিত হইলেন।

অভাষ্ট বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে, স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে, যেখানেই থাকুক, সে বস্তুটী দেবতা, মনুষ্য বা যে যোনি প্রাপ্ত হউক, তাহা সেই অদ্বৈত পরমাত্মার সহিত অনুস্যূত।

"যস্মিন্নিমানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
ওতাভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণাইব॥
যস্মিন্ নিত্যে ততে তন্তৌ দৃঢ়ে শ্রগিব তিষ্ঠতি।
সদসদ্ গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বাঙ্গে
বিশ্বকর্ম্মণি॥"

—হারসূত্রে রত্নরাজির ন্যায়, সেই ভূতনাথে এই ভূতমণ্ডল প্রবেশ ও অবস্থিতি করিতেছে, অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের নিত্য ও সুদৃঢ় সূত্ররূপে সেই বিশ্বকর্ম্মাই সর্ব্বত্র বিস্তৃত। বিশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলি তিনি; সৎ অসৎ সকল বস্তু তাঁহাতেই গ্রথিত। জাগতিক সমস্ত পদার্থের আত্মায় আত্মায় কি এক নিগূঢ় ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, তাহার তত্ত্বনিরূপণ মনুষ্যশক্তির অতীত। একান্তভাবে তন্ময় হইয়া চিন্তা করিলে, পরলোকগত আত্মীয়ের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখা যায়, তাঁহার সঙ্গে ইচ্ছামত কথাবার্ত্তাও ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না (১)।

ভক্ত একান্তভাবে ডাকিলে, ভগবান্ অরূপ হইয়াও, ভক্তের কাতর প্রার্থনায়, তাহার ধ্যেয় মূর্ত্তিতেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু। কিন্তু সে ভক্তি ও সে তৃষ্ণা চাই। স্বয়ং বারংবার এ সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তুলসী লিখিয়াছেন;—

"অজ অদ্বৈত অনাম অলখরূপগুণরহিত জো।
মায়াপতি সোই রাম-দাসহেতু নরতনু ধরেউ॥"

—যিনি অজ, অদ্বৈত, অনাম, অলক্ষ্যরূপ, গুণরহিত, সেই মায়াপতি রাম ভক্ত দাসের

(১) এই প্রবন্ধলেখক কয়েকবার তাহার কয়েকটী পরলোকগত আত্মীয়কে দেখিয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছে।

জন্য নরদেহ ধারণ করেন। শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে ;—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।"

—সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি নিজ অদ্বৈত স্বরূপকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ অনন্ত ভক্ত-মণ্ডলীর "আদুরে গোপাল," তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই, ভাবেরও অন্ত নাই, রূপেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে নামে, যে ভাবে, যে রূপে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল হরি সেই নামে, সেই রূপে ও সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও নাম, একই ভক্তি-সাগরের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ উপাধিভেদ মাত্র। কালীই বল আর দুর্গাই বল, হরিই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর কৃষ্ণই বল, যে নামে ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে, তোমার ধ্যান আন্তরিক হইলে, সেই ভক্তদুঃখহারী হরি অবশ্যই তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই ভগবান্, ভক্তের হৃদয়পীঠে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম।

নিজ প্রাণারাম মূর্ত্তিতে ভগবদ্দর্শন, তুলসীর জীবনে বহুবার ঘটিয়াছিল। তিনি বৃন্দাবনে গিয়া এ ঘটনা অনেককে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তিনি ব্রজপুরীর চৌরাশী ক্রোশ পরিসর পরিভ্রমণ করেন ; তাঁহার হৃদয়ে কেবল রাম ধ্যান এবং মুখে কেবল "সীতা-রাম।" কিন্তু বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র "রাধাকৃষ্ণ" ভিন্ন, কাহারও মুখে অন্য নাম নাই। তুলসী একদা বৃন্দাবনে এক কুটীরে বসিয়া আছেন, এক বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিল,—আসুন্ গোঁসাইজী! আপনাকে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখাই। ইহা বলিয়া সে তুলসীকে মদনগোপালের মন্দিরে লইয়া গেল। তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য অনেকে তাঁহার সঙ্গে চলিল। তুলসী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—বেদিকার উপর মদনগোপালমূর্ত্তি মুরলীহস্তে বিরাজমান। তুলসী বলিয়া উঠিলেন ;—

"কহা কহোঁ ছবি আজকী, ভলে বনে
হৌ নাথ!
তুলসী মস্তক জব নবৈ, ধনুষবাণ লো
হাথ॥"

—অহো! নাথ! তোমার এ মূর্ত্তি যতই সুন্দর হউক না কেন, তুলসী তোমার চরণে মস্তক নত করিবামাত্র, তোমাকে ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র হইতে হইবে। ইহা বলিয়া তিনি সেই মূর্ত্তির পদে পতিত হইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল ;—বেদিকার সে মদনগোপাল মূর্ত্তি নাই, সেইস্থানে অপূর্ব্ব দূর্ব্বাদলশ্যাম, ধনুর্ব্বাণধারী রঘুনাথ রামচন্দ্র বিরাজমান। তখন, "জয় রাম!—জয় জয় তুলসীদাস।" ইত্যাদি আনন্দনাদে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইল। এই ঘটনার পর তত্রত্য বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার কি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি নাই? তুলসী হাস্য করিয়া কহিলেন,—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে হ্যভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥"

—শ্রীনাথ, জানকীনাথ, অভেদ উভয়, দোঁহে এক পরমাত্মা নাহিক সংশয় ;
তথাপি সে সীতানাথ কমললোচন—
রাম মম হৃদয়ের সরবস্ব ধন।

ক্রমে তুলসীর অলৌকিকী শক্তি ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীর কথা দিল্লীশ্বর সাজাহান বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। বাদসাহ তুলসীকে ঐন্দ্রজালিক (বুজরুক) ভাবিয়া, তামাসা দেখিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তুলসী সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ তাঁহাকে বলিলেন,—শুনিলাম, তুমি বুজরুক ; তোমার বুজরুকি কিছু আমাকে দেখাও। তুলসী যথোচিত সম্মান ও বিনয় সহকারে কহিলেন,—আমি বুজরুকি জানিনা, আমি কেবল রামনাম জানি, আমার কাছে আশ্চর্য্য পদার্থ কিছুই নাই। বাদসাহ কহিলেন,—কে তোমার সে রাম? তাহাকে দেখাও, নহিলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তুলসী নীরব রহিলেন। বাদসাহ ক্রোধান্ধ হইয়া আজ্ঞা দিলেন,—এই বদমাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে অনাহারে ফেলিয়া রাখ। তুলসী প্রফুল্লবদনে কারাগারে নীত হইলেন। সম্রাটের আদেশে ভৃত্যেরা তুলসীর উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। তুলসী বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানমগ্ন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে এক ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল। অকস্মাৎ অদ্ভুতমূর্ত্তি, মহাকায় লক্ষ লক্ষ বানর আসিয়া দিল্লী আক্রমণ করিল। নগরের প্রাচীর, দুর্গ, তোরণ, অট্টালিকাসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। নগরবাসীরা ভয়বিহ্বল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। বাদসাহের দুর্গতির একশেষ হইল। তখন বাদসাহের মন্ত্রিগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাদসাহকে নিবেদন করিল,—হে রাজরাজেশ্বর ঈশ্বরকল্প! দিল্লীশ্বর! আপনি যে হিন্দু ফকিরকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, স্বয়ং হনুমান্‌জী তাঁহার গুরু। সেই দুর্জ্জয় মহাবীর হনুমান্ এ ভীষণকাণ্ড বাঁধাইয়াছে। আপনি অবিলম্বে ঐ ফকিরকে সম্মানপূর্ব্বক কারামুক্ত করুন, নহিলে আরো সর্ব্বনাশ ঘটিবে। বাদসাহ তখন নিরুপায় হইয়া তুলসীকে কারামুক্ত করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুলসী বাদসাহকে বলিলেন,—আপনি আমার আরাধ্য দেবতা রামচন্দ্রকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; প্রথমেই তিনি নিজে না আসিয়া কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ বানরের দৌরাত্ম্যে দিল্লীনগর একপ্রকার উৎসন্ন হইয়াছিল। তুলসীদাস বাদসাহের নিকট বিদায়কালে তাঁহাকে প্রাচীন দিল্লীনগর

পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, এজন্য বাদসাহ পুরাতন নগর পরিত্যাগ করিয়া সাহজহানাবাদ (সাজাহানবাদ) নামক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে বানরগণের এই উপদ্রবের কথা প্রসিদ্ধ কবি প্রিয়াদাস অতি ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

দিল্লীনগরে একদা কবিকুলসূর্য্য সুরদাস ও কবিকুলচন্দ্র তুলসীদাস, এ উভয়ের একত্র সমাগম হয়। সুরদাস কৃষ্ণভক্ত, তুলসী রামভক্ত। একদিন উভয়ে একসঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময় বাদসাহের হস্তী ক্ষেপিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। সুরদাস ভীত হইয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন,—"ওহে তুলসি! আমার ঠাকুর নন্দদুলাল দুধের ছেলে, তিনি এ প্রকাণ্ড মত্তহস্তী হইতে আমাকে রক্ষা করিতে অক্ষম। তোমার ঠাকুর রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণধারী যুবা, তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অতএব আমি পলায়ন করিলাম, তুমি এখানে বসিয়া থাক।" তুলসী সুরদাসের ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া, স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। হস্তী তুলসীকে সম্মুখে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। হস্তী তাঁহার সম্মুখে আসিবামাত্র, অকস্মাৎ শূন্যপথে এক সাংঘাতিক বাণ আসিয়া হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ করিল, হস্তী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর সুরদাস তথায় আসিয়া, সম্মুখে মৃত হস্তী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—তুলসি! এ ব্যাপার কি? তুলসী কহিলেন, —কিছুই জানি না, আমি সম্মুখে কেবল ধনুর্দ্ধারী রামমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি।

(ক্রমশঃ

আমরা কি চাই।

(৩)

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আমাদের কি কি জিনিষ চাই, এবং আমাদের প্রধান প্রধান গুটিকতক অভাবের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইলেই হইবে না। কোন জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার কি কি রোগ আছে তাহা জানিলেই পর্য্যাপ্ত হইল না। রোগের কোন প্রতিকার আছে কি না এবং যদি থাকে তাহা কি, এজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের অবস্থা বড় শোচনীয়, রোগ বড় কঠিন। কিন্তু কোন রোগ আরাম হইবার নয় এ বিশ্বাস যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়াস করিতাম না। বিশেষ চেষ্টা করিলে এখনও আমরা বাঁচিতে পারি। তাহার জন্য আমাদের কি করা আবশ্যক নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) লোকশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিক্ষা সাধারণ হওয়া আবশ্যক। কি ধনী কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ কি নিম্নতম জাতি, কি হিন্দু কি মুসলমান, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, জাতীয় উন্নতির জন্য সকলেরই শিক্ষার প্রয়োজন। সকলকেই যে, এক শিক্ষা পাইতে হইবে তাহা নয়। যাহাকে যেরূপ কাজ করিতে হইবে, তাহার শিক্ষা সেইরূপ হওয়া চাই। যদি আমরা এক জাতি বলিয়া গণ্য হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে যে কত কাজ করিতে হইবে তার ইয়ত্তা নাই। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এ সব কাজে বরাতি চলে না। অন্যের উপর ভার দেওয়া চলে না। কাজ আমাদের নিজেদের করিতে হইবে। যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, এবং লোকের অন্নসংস্থান হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। যাহাতে আমরা দেশজাত অধিকাংশ জিনিষ কাজে লাগাইতে পারি এরূপ শিক্ষা চাই। যাহাতে আমাদের সামান্য জিনিষের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে না হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে কতকগুলি ভাবুক ও চিন্তাশীল লোকের প্রয়োজন। সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষা না পাইলে লোকে উহা হইতে পারে না। সেই জন্য সুকুমার বিদ্যার আলোচনা আবশ্যক, উচ্চ দর্শন বিজ্ঞান ও গণিতের আলোচনা আবশ্যক, নানা ভাষার আলোচনা আবশ্যক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। বাহুল্যভয়ে বেশী কথা লিখিলাম না। কিন্তু দেশের সকল লোকে উচ্চশিক্ষা পাইতে পারে না। এবং সকলেরই ভাবুক হইলে চলে না। উচ্চশিক্ষা পাইতে যে কাহারও বাধা থাকিবে, একথা বলিতেছি না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেশের অধিকাংশ লোকের উহা পাওয়া সম্ভবপর নয়। উহা বহু সময় ও অর্থ সাপেক্ষ এবং উহাদ্বারা সকল জাতির আবশ্যকীয় কাজ হয় না। সেই জন্য কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক, এবং বেশীর ভাগ লোকের শিক্ষা কার্য্যকরী হইলেই যথেষ্ট। ব্যবহারিক শিক্ষা আমাদের প্রধান অভাব। যাহাতে নগরে নগরে ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিবার সময় হইয়াছে। কোথায় কিরূপ ব্যবহারিক শিক্ষার আবশ্যক, তাহা স্থির করিতে হইবে। কোন নগরে চামড়ার কাজ ভাল হইতে পারে। সেখানকার ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উহা শিক্ষা দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। কোথাও রেশমের কাজ ভাল হইবার সম্ভাবনা। সেখানে উহা শিখাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বেশ কৃষিপ্রধান; নানা স্থানে কৃষিবিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত হওয়া চাই। দুই চারিটী ভাল ব্যবহারিক কলেজ চাই। তাহা হইলে ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সেখানে গিয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুবিধা পাইবে। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত করিতে হইবে, এবং যাহাতে পাঠার্থীরা কার্য্যকরী শিক্ষা পায়

তাহা দেখিতে হইবে। নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় আবশ্যক। সেখানকার শিক্ষাও কার্য্যকরী হওয়া চাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, হস্ত ও চক্ষুর শিক্ষা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়। মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নাটক উপন্যাস পড়িয়া কার্পেট বুনিয়া বা ইংরাজী সংস্কৃত প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনার সময় কাটাইবার সুবিধা হইবে না। প্রায় সকলকেই সন্তানাদি লালনপালনের এবং গৃহস্থালীর ভার লইতে হইবে এবং অনেককেই তাদের স্বামীপুত্রের কাজে সাহায্য করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ত থাকিবেই, কিন্তু কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থাও বিশেষরূপ চাই। আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, সংসার চালান ও গৃহস্থালীর ব্যাপার বিদ্যালয়ে ভাল করিয়া নাই হউক, মোটামুটি শিখান যাইতে পারে। শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে স্ত্রীলোকদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় এবং বিদ্যাটা নিতান্ত পুথিগত না হয়। শিক্ষা যদি ক্রিয়াসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থিনীদের পক্ষে সংসারের অনেক কাজ সোজা হইয়া পড়িবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্য সকল দিকে সুবিধা হইলেও, অধিকাংশ বালিকা জোর ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে। তাহাদের পাঠ্য নির্ব্বাচনের সময় এ কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা দরকার।

দেশের যেরূপ অবস্থা, অনেক বিষয়ের উচ্চতম শিক্ষা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার অনেক বিষয় এখানে হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষার্থী পাঠান বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় যে দেশীয়দের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাসমিতি হইয়াছে, তাহা একটী সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ঐ সমিতিকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া এবং যাহাতে উহার কার্য্যকারিতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের সকলের উচিত। কতকগুলি লোক বিদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভাল করিয়া শিখিয়া আসিলে তাঁহারা দেশের অন্য লোককে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন; এবং কালে ঐ সব বিদ্যা আমাদের মধ্যে এত উৎকর্ষ লাভ করিবে যে, বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠাইবার আবশ্যক আর হইবে না। জাপানে এখন অনেকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দেশে ইতিমধ্যে আমরা যে দুই একটা কল কারখানা খুলিতে পারিয়াছি, তাহাতে যতদূর সম্ভব শিক্ষানবিশ লওয়া দরকার। কল কারখানা শুধু জিনিষ তৈয়ারির উপায় নয়, লোককে হাতে কলমে শিক্ষা দিবারও এক পরিষ্কৃষ্ট উপায়। শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশে কতকগুলি গবেষণাগার চাই। যে সব বিদ্যায় উন্নতি গবেষণা সাপেক্ষ, তাহাদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলার আবশ্যক নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গবেষণাগার গুটিকতক স্থাপন না করিলে দেশের উন্নতি

হওয়া অসম্ভব। ইহাতে যে অনেক টাকা চাই তাহা বলা বাহুল্য। টাকার অভাবে স্বর্গীয় মহাপ্রাণ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভা হইতে এ পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কাজ হইল না।

একটা কথা এখানে বলা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। মানুষ মানুষ, যন্ত্র নয়, ইহা যেন ভুলিয়া না যাওয়া হয়। অনেক উন্নতিশীল দেশে ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী শিক্ষা এত দূর গড়াইয়াছে যে, মানুষ কলে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে গিয়া এবং প্রতিযোগিতা প্রবল হওয়ায় অনেক স্থানে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সুলভ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করাই মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঠিক্ উহা নয় বলিয়া মনে হয়। পণ্যদ্রব্য মানুষের জন্য, মানুষ পণ্যদ্রব্যের জন্য নয়, এ শিক্ষার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের কোমল ও উচ্চবৃত্তি সমুদায়ের উচ্ছেদের সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ সম্ভাবনার প্রতিকারার্থ দেখিতে হইবে যে, কোন শিক্ষাই যেন আত্মা-বিহীন না হয়। সকল শিক্ষার স্থলে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা চাই। সকলেরই কোমল ও উচ্চ মনোবৃত্তির উন্মেষ হওয়া আবশ্যক। ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম-ভাব, সত্যপ্রিয়তা, স্বদেশহিতৈষিতা লোক-হিতৈষণা প্রভৃতি বৃত্তি সকলও স্ফুরিত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে মানুষ হওয়া যায় না। ইহা ছাড়া সৌন্দর্য্যবোধ-বৃত্তিরও সম্যক্ বিস্তার বিকাশ হওয়া চাই। সেই জন্য যে যে কাজ বা ব্যবসা করুক না কেন, কিছু কিছু সাহিত্য বা সুকুমার বিদ্যা ও কলা চর্চ্চা সকলেরই করা উচিত। নিজের গণ্ডীর বাহিরে যদি আমরা না যাইতে শিখি, তাহা হইলে জীবন নিরানন্দময় হইয়া উঠে, এবং জন্মগ্রহণ করা বৃথা বলিয়া মনে হয়। জীবনের সকল সময় কেহ কাজ করে না, বা করিতে পারে না। বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা বাদ দিলেও খুব ব্যস্ত লোকেরও হাতে এমন সময় থাকে, যাহাতে কোন কাজ করা যাইতে পারে না, বা করার দরকার হয় না। যদি সাহিত্যাদির চর্চ্চা কিছু কিছু থাকে, তাহা হইলে জগতের কোথায় কি হইতেছে জানিতে একটু আগ্রহ হয়, এবং সময় এমন করিয়া কাটান যাইতে পারে যাহাতে নিজের ও আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশি-বর্গের উন্নতি সাধন হয়, এবং জীবনের ভার অনেকটা কমিয়া যায়।

এখন একটা কথা উঠিতে পারে। আমি যে "দান সাগরি কর্ত্ত" দিলাম, সকল দিক্ বিবেচনা করিলে উহা কি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে? দেশ শুদ্ধ নর-নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে, উচ্চ শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা, নিম্ন শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চ্চা সকলেরই ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে। ইহাও ছেলেখেলা নয়। বন্দোবস্ত করিবেই বা কে এবং তাহার টাকাই বা

কোথায়? সব জানি। কিন্তু বাঁচিতে হইলে উহা যে আমাদিগকে করিতেই হইবে তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? কোন কাজ করিতে হইলে দুইটী জিনিষ দেখা আবশ্যক। প্রথম, উহা সুচারুরূপে করিতে হইলে কি কি দরকার, দ্বিতীয়, আমাদের পক্ষে উহার কতটুকু করা সম্ভবপর। সকল কাজেরই একটা আদর্শ থাকা চাই। তাহা হইলেই বুঝা যায় আমরা উহার কতটুকু করিতে পারিয়াছি, এবং কি পরিমাণে উহা বাকী আছে। আদর্শবিহীন কাজ কখনও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। উপরে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া দরকার। এক দিনে ও একবারে যে, আমরা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইব তাহা কেহ মনে করে না। কিন্তু যদি আমরা বাঁচিতে চাই, শিক্ষা সম্বন্ধে এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুবৃহৎ কাজ দুই দশ দিনে হইবার নয়, এবং ইহা বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ। ইহার জন্য সরকার হইতে যত টাকা পাওয়া যায় তাহা আমাদিগকে লইতে হইবে, এবং তাহা ছাড়া দেশের লোককেও টাকা খরচ করিতে হইবে। দেশে যে সব ধনকুবের আছেন তাঁহাদিগকে অনেক অনাবশ্যক বিষয়ে খরচ কমাইয়া এই সর্ব্বহিতকর দেশরক্ষাকারী কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতে হইবে। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দেশের কয়েকজন মহাত্মা অকাতরে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। ইহাদের ন্যায় লোক বেশী হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এবং সময়ে যে অনেকে ইহাদের পদানুসরণ করিবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে? কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন,—এই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা কেবল ধনীদের কাজ। যিনি যাহা দিতে সক্ষম, তাঁকে তাঁহা দিতে হইবে। কেহ বুদ্ধি দিবেন, কেহ সময় দিবেন, কেহ অর্থ দিবেন। আমি এক টাকা দিতে পারি, তাহাই আমার দেওয়া উচিত, আর এক জন হাজার টাকা দিতে পারেন, তিনি তাহাই দিন। যদি এক জন লোক অপর এক জনকে কিছু শিখাইতে পারেন, তাহা বড় কম কাজ হইবে না। যাঁর বুদ্ধি আছে, তিনি কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করুন, এবং কার্য্যকর্ত্তাদিগকে পরিচালন করুন। অনেকের সমবেত চেষ্টা যদি থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই আমরা তাহার সুধাময় ফল দেখিতে পাইব।

শিক্ষার ভাষা কি হইবে? যতদূর সম্ভব বাঙ্গালা। বর্ত্তমান অবস্থায় উচ্চশিক্ষা এবং নিদান কিয়ৎপরিমাণে মধ্যশিক্ষা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় হইতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বতোমুখী উন্নতি না হইতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত গত্যন্তর নাই। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি চাই। সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক এবং উন্নত সাহিত্য জাতীয় উন্নতির পৃষ্ঠপোষক। বিদেশীয় ভাষা কখন জাতীয় শিক্ষার ভাষা হইতে পারে না।

লোকশিক্ষার ব্যবস্থা যদি ভালরূপ হয় তাহা হইলে আমরা আর যাহা চাই তাহা আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের আবশ্যক নাই, আনুসঙ্গিক দুই এক কথা বলিলেই চলিবে।

(২) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। শরীর ভাল না হইলে আমাদের দ্বারা কোন কাজ হইবে না। শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য আগে চাই। মানুষ শুধু আত্মাময় নয়, সে শরীর ও আত্মার জড়িত জীব। তুমি যতই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হও না কেন, রোগে তুমি যদি নির্বীর্য্য হইয়া পড়, শান্তির অভাবে যদি তুমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়, দেশের কথা দূরে থাকুক, নিজেরই কোন কাজে তুমি লাগিবে না। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামের জল নিকাশের উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। এ সবের জন্য যদি কেবল জেলা বোর্ড বা কর্ত্তৃপক্ষদের মুখের দিকে তাকাইয়া আমরা বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কলির কয় দিন আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গ্রামের শিক্ষিত ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে কথায় ও কার্য্য দ্বারা অপর সাধারণকে গ্রামের উন্নতির কাজে লাগাইতে হইবে। কিসে গ্রামের বালক বালিকাদের শরীর রোগশূন্য হইতে পারে তাহা লোককে বুঝাইতে হইবে। যাহাতে গ্রামের ছেলেরা ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু শারীরিক পরিশ্রমের প্রতিকূল। এই নৈসর্গিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমাদিগকে চলিতে হইবে এ কথা যেন মনে থাকে। এখানে কেবল পল্লীগ্রামের উল্লেখ করিলাম, কারণ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী, এবং আমাদের পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সহর অঞ্চলের অবস্থার আভাষ পূর্ব্বে কিছু দিয়াছি। এখন এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, স্বাস্থ্যকর নগর দেশে বড়ই কম, এবং প্রায় সকল নগরেই গড় পড়ভ মৃত্যুর হার খুব বেশী। ইহাদের বিশেষ উন্নতি আবশ্যক।

(৩) দেশে কৃষির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার উন্নতি সাধন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষিবিদ্যালয়ের কথা উপরে বলিয়াছি। যাহাতে পূর্ব্ব প্রচলিত ফসল সকলের উন্নতি হইতে পারে, এবং অর্থকরী নূতন ফসল কতকগুলি প্রচলিত হইতে পারে, তাহার বিধিমতে চেষ্টা করা চাই। সকল বড় জমিদারের বা তালুকদারের তাঁদের প্রজার উন্নতিকল্পে এবং দেশের ভাবী মঙ্গলার্থে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রাখা উচিত হইয়াছে। ইহা সংখ্যায় নিতান্ত কম হইলে চলিবে না। ঐ সব ক্ষেত্র হইতে তাঁদের প্রজারা যতদূর

সম্ভব শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর অবস্থা কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাদের উন্নতির দিকে যদি আমরা মন না দিই তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে ইহারা লোপ পাইবে। কিসে প্রচুর পরিমাণে ইহাদের খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিসে ইহাদের বংশের উন্নতি সাধিত হইয়া ইহারা প্রচুর পরিমাণে ভাল দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে, এবং ভাল করিয়া হলকর্ষণাদি কার্য্য করিতে পারে, কিসে ইহাদের মধ্যে মড়ক নিবারিত হইতে পারে, এ সব কাজের ভার আমাদের উপর। আমরা না করিলে আর কেহ করিবার নাই।

(ক্রমশঃ)

বেহুলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কলার মান্দাস বামে দক্ষিণে নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণ বেহুলার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল, অনেকেই তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কেহ কেহ তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিল, কেহ বা তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিল। মনুষ্য-মাত্রেই সংসারের সকল লোককে আপনার মত জ্ঞান করে—সরলপ্রকৃতি সাধু তজ্জন্যই দুষ্টের দুরভিসন্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না, দুষ্ট দুরাত্মারাত সাধুর সরলতা জনিত সুখাস্বাদে বঞ্চিত। গাঙ্গুর নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ, যাহার যেমন মন সে তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে নানা কথা বলিতে লাগিল—বেহুলা আর কাহার কোন কথার উত্তর দিলেন দিলেন না, তবে ব্যক্তি বিশেষকে তিনি একবারে উপেক্ষাও করিলেন না। পথিমধ্যে বেহুলার অনেক বিপদও ঘটিয়াছিল, নদীজল মধ্য হইতে বোদালী প্রভৃতি শঙ্খচুক মৎস্যাদি জলজন্তুগণ তাহার স্বামীর শব আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইল না—সে সকল আপদ অত্যাপাতে যদি পরিত্রাণ ঘটিল, পথিক ও গ্রামবাসীগণের ভয় উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহ লোভ প্রদর্শনে তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিল, কেহ বা তাহার জন্য অত্যাচারের ভয় দেখাইল, কেহ বা চিকিৎসকের ভাণ করিয়া তাঁহার স্বামীর জীবন দানের লোভ দেখাইল, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিল না। পতিপরায়ণা সতীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কিছুতেই দুর্ব্বল হইল না—তিনি, বলে না হউক, কলে কৌশলে অনুনয় বিনয়ে, পাত্র বিশেষে ভয় প্রদর্শনে সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিয়া আপনার পথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যায়—নখিন্দরের শব ক্রমেই পচিতে লাগিল—পূতিগন্ধে চতুর্দ্দিকের বায়ু দূষিত হইল, বেহুলার মনে বিকার নাই—তিনি সেই শবরক্ষার নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহার অনেক তথ্যই তাঁহার সংগ্রহ করা ছিল।

এইরূপে গাঙ্গুর নদীর জলে ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা গঙ্গার সহিত গাঙ্গুর নদীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ভাগীরথীর পবিত্র বারিধারায় অবগাহন করিলেন, স্বামীর শবও উত্তমরূপে গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইলেন, তাহার পর বিস্তৃতাঙ্গী সুরধুনীর জলে ভাসিয়া চলিলেন, গঙ্গার তরঙ্গে মান্দাস প্রতিক্ষণেই টল্ মল্ করিতে লাগিল, বেহুলা তাহাতে ভীত হইলেন না, ইষ্ট দেবতার উপর আত্ম-নির্ভর করিয়া চলিলেন, ক্রমে তিনি মুক্ত-বেণী ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি শেষ হইল, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইল। তাহাতে উষার আসন পড়িল। গাছে পাখী ডাকিল। সেখানে আসিয়া একটু অন্তরালে থাকিয়া বেহুলা দেখিলেন, একটী রজকী মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য উপস্থিত হইল, সে বস্ত্রের বোঝা নামাইয়া, কোলে একটী শিশু ছিল তাহাকে স্তন্য দানের পর মারিয়া ফেলিল—শিশু অচেতন স্পন্দহীন অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া রহিল, রজকী বস্ত্র ক্ষালনে প্রবৃত্ত হইল; বেহুলার যাওয়া হইল না, ভেলা বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সমস্ত দিনের পর রজকী সায়ংকালে বস্ত্রগুলিকে গুছাইয়া মোট বাঁধিল, মোট মস্তকে করিয়া শিশুটীকে পুনর্জ্জীবিত করিল, জীবিত শিশুকে কোলে লইয়া স্তনাদান করিতে করিতে সে আপনার পথে অগ্রসর হইল। বেহুলা রজকীর আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া তাহাকেই আপনার ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল বিবেচনা করিলেন, সে রাত্রি আর অগ্রসর হইলেন না। তথায় অবস্থিতি করিলেন। রাত্রি অবসান হইল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেদিনও প্রভাতে রজকী শিশুপুত্রকে স্তন্য দান করিতে করিতে জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ আপন শিশুকে চৈতন্যশূন্য করিল, এবং আপনার কাজে নিবিষ্ট হইল। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, রজকী মোট বাঁধিল, ছেলেকে কোলে লইল, আপনার পথে অগ্রসর হইবে এমন সময় বেহুলা নিকটস্থ হইয়া তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইল, রজকী অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে উঠাইল, এবং তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইল। বেহুলা কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা তাহাকে জানাইলেন। রজকীকে মাতুঃষসা (মাসী) সম্বোধন করিলেন, রজকী তাঁহাকে পরদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন, বেহুলা তাহাই করিলেন। তাহার নাম নেত রজকী, সে স্বর্গবাসী সুরগণের বস্ত্র ক্ষালন করিত। পরদিন প্রাতে সে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে বেহুলা নিজে বস্ত্র ক্ষালন করিবার কথা বলিলেন, রজকী বলিল—"বস্ত্রগুলি দেবতাদের, তাঁহারা স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব,

কাপড় কাচা ভাল না হইলে অভিশাপের ভয় আছে, তুমি পারিবে না।" বেহুলা নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া একখানিও কাপড় কাচিতে পান এরূপ প্রার্থনা জানাইলেন। বেহুলার ঐকান্তিকতা দর্শনে রজকী সম্মত হইল, বেহুলা প্রাণপণ যত্নে কাপড়খানিকে কাচিল—নেত যে সকল কাপড় কাচিয়াছিল বেহুলার কাচা কাপড় তাহা অপেক্ষা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইল, সন্ধ্যাকালে নেত কাপড়গুলিকে গুছাইয়া লইয়া দেবলোকে গেল, বেহুলাও সঙ্গে চলিলেন, সেখানে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন, নেত ধোপানী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি সমন্বিত দেবসভায় উপস্থিত হইয়া বস্ত্রগুলি অর্পণ করিল। বেহুলা যে কাপড় কাচিয়াছিলেন, সেখানি মহাদেবের—তিনি দিগম্বর বলিয়াই প্রসিদ্ধ, সাধ করিয়া কখন কোনদিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, বস্ত্র দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন, নেতকে বলিলেন, "নেত! আজি যে কাপড়ের বড়ই বাহার বাড়িয়াছে, একদিনও তো এমন কাপড় কাচা দেখি না।"

নেত উত্তর করিল, আমার এক ভগ্নীর কন্যা আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, সেই আপনার কাপড়খানি কাচিয়াছে।

দেবাদিদেব বলিলেন,—তাহাকে তো কখন দেখি নাই—দেখাইতে পার?

এই কথা শুনিয়া নেত ধোপানী তাঁহার নিকট বিদায় লইল এবং বেহুলার নিকটে আসিয়া সকল কথা বলিল। বেহুলা তাহার সমভিব্যাহারে দেবসভায় গমন করিলেন। তিনি যে তৌর্য্যত্রিকী বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, নেত সে পরিচয় পাইয়াছিল। স্বর্গবাসী দেবগণ বড়ই বিলাসী—স্বর্গসুখের কথা বলাই বাহুল্য, স্বর্গসুখের তুল্য সুখ আর কোথাও নাই, কিছুই নাই, সেই স্বর্গবাসীরা যে বিলাসী হইবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? নেত দেবসভায় বেহুলার নৃত্যগীতজ্ঞতার পরিচয় দিলে সকলেই একবাক্যে তাঁহার নৃত্য দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বেহুলাও সসম্ভ্রমে তাঁহাদের চরণতলে প্রণত হইয়া আপনার ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন। অনুমতি পাইয়া তিনি নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন, দেবসভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহাদেব বেহুলার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে বেহুলা সজলনয়নে আপনার পরিচয় দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার সুগোচর করিলেন এবং মৃত স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। মনসাদেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন না—দেবসভার আজ্ঞা পাইয়া নেত ধোপানী তাঁহাকে ডাকিতে গেল; মনসা দেবী ঘরে বসিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন, সর্ব্ব প্রথম আসিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু নেতর নির্ব্বন্ধে তাহার সমভিব্যাহারিণী হইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই তাঁহারা দেবসভায় উপস্থিত হইলে ভুজঙ্গজননী মনসাকে দেখিয়া সকলেই সাদর সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

বেহুলা কৃতাঞ্জলিপুটে দেবগণ সমীপে পুনরায় মনসার ক্রোধে স্বামীর প্রাণনাশের সকল কথা বিবৃত করিলে, দেবী বলিলেন—"বেহুলার শ্বশুর গ্রামে গ্রামে আমার পূজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহার সকল পুত্র নষ্ট করিয়াছি ও সাত খানি ভরানৌকা ডুবাইয়াছি, তথাপি তাহার জ্ঞান হয় নাই, আমার অসম্মান করে।"

বেহুলা শ্বশুরের ত্রুটী মানিয়া লইলেন, আর বলিলেন, ভবিষ্যতে আর তাঁহার অসম্মান হইবে না, শ্বশুর ভক্তিসহকারে আপনার পূজার্চ্চনা করিবেন।"

মনসা ঠাকুরাণী দেবগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বেহুলাকে তাঁহার স্বামীর কঙ্কালগুলি আনিতে বলিলেন, বেহুলা দৈবশক্তি প্রভাবে ত্রিবেণীর ঘাট হইতে নখিন্দরের কঙ্কালগুলি লইয়া সুরলোকে পঁহুছিলে মনসা দেবী সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহার অভিনব কলেবরের পুনর্গঠন করিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিলেন। সমাগত দেবগণ মনসাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। মৃতপতিকে জীবিত পাইয়া বেহুলা স্বামীর অগ্রজ ছয় জনের এবং শ্বশুরের সপ্ততরীর পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা জানাইলে দেবী তাহাতে কৃপণতা করিলেন না। বেহুলার চেষ্টা যত্নে চাঁদ সদাগরের সাত পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিল, সাত ডিঙ্গার পুনরুদ্ধার হইল। বেহুলা সেই গাঙ্গুর নদীর বক্ষে সপ্ততরী, ছয় ভাসুর ও স্বামীকে লইয়া চাম্পাই নগরে উপস্থিত হইয়া শ্বশুর শ্বশ্রূর চরণ যুগলে প্রণত হইলেন। সকলেই বেহুলাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—অতঃপর চাঁদ মনসার মাহাত্ম্য মানিয়া লইলেন, নানা উপচারে মহা আড়ম্বরে তাঁহার পূজা করিলেন, এবং অবশিষ্ট জীবন সাত পুত্র, সাত বধূ ও বহু পৌত্র পৌত্রীকে লইয়া কিছুকাল সংসারসুখ ভোগের পর ইহলোক লীলা সম্বরণ করিলেন।

শ্রীঅম্বিকা চরণ গুপ্ত।

বীরনারী জিন মেরী গায়েন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পরীক্ষারাশির বিষম আঘাতে যখন মেরী গায়েনের প্রতিভাপূর্ণ কর্ত্তব্যাশাসিত জীবন ভগবানের আশীর্ব্বাদের বলে বলীয়ান্ হইয়া কঠোর সংসারপথে চলিতেছিল, তখন তিনি বল ও শান্তি লাভ করিবার ব্যাকুলতায় হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া, শয্যাশায়িনী হইলেন। "হয়ত এযাত্রা আপনার রক্ষা নাই," চিকিৎসক যখন অনেক সন্তর্পণের সহিত এ কথা তাঁহাকে জানাইলেন, তখন মেডেম

গায়েনের আনন্দের সীমা রহিল না। তরুণবয়স্কা মেরীর জীবন এত অসহ্য ক্লেশপূর্ণ ছিল যে, তিনি মৃত্যুকে প্রসন্নমুখে আলিঙ্গন করিতেও ভীত হইলেন না। ঠিক্ এই সময়ে কাউণ্ট গায়েনের অনেক সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সংবাদেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। পার্থিব দুঃখরাশির নিকট তিনি শির অবনত করিয়াছিলেন। সংসারের কোন কষ্টই তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা ক্লেশ দিতে সমর্থ নহে, ইহা তিনি দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যদ্বারা সকলকে উত্তমরূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল অপরিসীম রোগযাতনা ভোগের পর তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যের মুখ দর্শন করিলেন। এখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করাতে, তাঁহার স্বামীর কোপানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া নিশিদিন এই সাধ্বীর সুকোমল জীবন দগ্ধ করিতে লাগিল। "তোমার দেখি ঈশ্বরভক্তি স্বামিভক্তি অপেক্ষা অধিক," এই বলিয়া বাতরোগাক্রান্ত, শয্যাশায়ী, বৃদ্ধ ও অপদার্থ স্বামী, পত্নীর নির্য্যাতনে সচেষ্ট হইল। মেডেম গায়েনের উপাসনার বিঘ্ন সম্পাদন জন্য মাতা ও পুত্রে অনেক কুমন্ত্রণা চলিতে লাগিল। স্বামীর রোগশয্যা সম্মুখে, কিম্বা ঐ পিশাচী শ্বশ্রূর প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকা ভিন্ন তাঁহার কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। দুঃখিনী মেরী অনন্যোপায় হইয়া যখন সেলাই দ্বারা সময় কাটাইবার প্রয়াস পাইতেন, তখনও তিনি উপাসনার্থে মুখ নাড়েন কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য পাষণ্ডদল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত।

মেরীর অন্ধকারপূর্ণ জীবনের আরম্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পাছে পিতার সংসর্গগুণে সেও ঐরূপ পিশাচপ্রকৃতি লাভ করে, এই আশঙ্কায় কত যত্ন ও অসীম ধৈর্য্যবলে পুত্রটীর শিক্ষা ও সুমতি দানের জন্য প্রাণপাত করিতেন, তাহা অবর্ণনীয়। মেরী জিনের সমস্ত আশা ভরসাস্থল ও কুজ্ঝটিকাপূর্ণ জীবনের আলো ঐ সন্তানকে পর্য্যন্তও জননীর প্রতি অবজ্ঞা ও অপমান করিতে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এই ভীষণ পরীক্ষাসাগরে একমাত্র প্রার্থনাই তাঁহার সম্বল ছিল। তিনি ঐ সময়ে দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছিলেন, "পৃথিবীর কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, মনেও হয় না। সুতরাং তাহাদের অনাদর, অবজ্ঞা ও তাড়না, কিছুতেই হৃদয়ের প্রগাঢ় শান্তি বিনষ্ট হয় না। সংসারের পক্ষে আমি মৃতা। ঈশ্বর আমাতে বাস করেন। তিনিই জীবনের জীবন ও ঘোর তিমিরসাগরে ধ্রুবতারা। তাঁহার বলেই আমার পরীক্ষাহত ক্ষীণ প্রাণ শক্তিশালী"। পাঠক! মেরী গায়েনের হৃদয় শুধু প্রার্থনার বলে কি অতুল শান্তিপূর্ণ ও সবল হইয়া কঠোর কর্ত্তব্যপথে অনাহতভাবে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করুন। এই মহীয়সী মহিলার জীবনীপাঠে কে বলিতে সাহসী হইবে যে, ঈশ্বরদর্শন কল্পনার কথা! মেরী গায়েন

যে সকল মনোহর কবিতাস্তবক গ্রন্থন করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্যজগতে তাহার অমিয়া সৌরভে চিরকাল নর নারীর হৃদয়কে উন্মত্ত ও বিমুগ্ধ করিবে। সময়ান্তরে ঐ সকল কবিতার ভাবাংশ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

ক্রমশঃ।

গোধন রক্ষা।

ভারতে নিত্য বহুসংখ্যক গোধন ধ্বংস হওয়াতে, সমগ্র ভারতবাসীর যেরূপ অনিষ্ট হইতেছে, অবশিষ্ট ধ্বংসোন্মুখ গোধনকুলকে অচিরে রক্ষা না করিলে, এবং গোজাতির বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে যে, কিছুদিন পরে ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর মহা অনিষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিত। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ এদেশে আগমন করিয়া, যেমন আমাদিগের শিল্প, পণ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য, নষ্ট করিয়া সমুদয় ভারতবাসীকে নিতান্ত হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, তেমনি প্রতিদিন এই গোধনগুলিকে ভক্ষণ করতঃ ভারতবাসীর অনায়াসলব্ধ গোদুগ্ধ পানে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন এবং ইঁহাদের উন্নতির সর্ব্ববিধ যত্নের অভাবে ইঁহারা দিন দিন রোগগ্রস্ত ও বলহীন হইয়া পড়িতেছেন। আজ ভারতবাসীর সে প্রতিভা বীর্য্য নাই, সে তেজ দর্প নাই, সে সাহস বিক্রম নাই, সে উদ্যম দৃঢ়তা নাই,—বলকারক খাদ্যাভাবে ভারতবাসী আজ নিস্তেজ ও হীনবল। গোদুগ্ধই ভারতের জল বায়ুর উপযোগী, উৎকৃষ্ট বলকারক খাদ্য। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; এ দেশে নিত্য মাংসাহার করা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য ও অনিষ্টকর। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, মাংস অপেক্ষা দুগ্ধ আটগুণ অধিক বলকারক। পরন্তু দুগ্ধ সাত্ত্বিক আহার, মাংস রাজসিক আহার। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, সাত্ত্বিক আহার সমগ্র মানবজাতির পক্ষে অতীব মঙ্গলকর। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রকার মনুও সর্ব্ববিধ মাংসাহার যে আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ তাহা নিম্ন শ্লোকেই দেখাইয়াছেন;—

মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

(মনু ৫ অ, ৫৫ শ্লোক।)

পাশ্চাত্য দেশবাসিগণই যে কেবলমাত্র গোকুলকে ধ্বংস করিতেছেন তাহা নহে, যে অবধি মুসলমানগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সময় হইতে গোবংশ ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে পাশ্চাত্য দেশবাসীরা যেরূপ বহুসংখ্যক গোধন নিধন করিতেছেন, তাহার তুলনায় মুসলমানগণ শতাংশের একাংশও করেন নাই। বস্তুতঃ ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আদৌ গোমাংস ভক্ষণ করেন না।

যাঁহারা বা গোমাংস আহার করেন, তাঁহারা অনেকেই প্রত্যহ খান না। পর্ব্ব উৎসব ব্যতীত দৈনিক শাক শব্জী, ডাল, অন্ন, দুগ্ধ, মৎস্য খাইতেই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্য গোমাংস-ভক্ষক মুসলমানের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের অভ্যাসবশতঃ তাঁহাদের গোমাংস ভক্ষণ ব্যতিরেকে দিন অতিবাহিত হয় না। আবার আমাদিগের দেশেরও কতকগুলি পাশ্চাত্য শিক্ষানবিশী অবিমৃষ্যকারী হিন্দু পুরুষ ও মহিলা পাশ্চাত্য অনুকরণ করতঃ গোরক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, গোমাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত ঘৃণা ও দুঃখের বিষয়। এই গোমাংসভক্ষক সাম্প্রদায়িকেরা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, অতি প্রাচীনকালের মুনি ঋষিগণও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। পুরাকালের কয়েকজন মুনি ঋষি যে গোমাংস আহার করিয়াছিলেন ইহা অলীক বাক্য নহে বটে (১) কিন্তু তাঁহারাই যখন বুঝিতে পারিলেন যে, গোমাংস ভক্ষণ অপেক্ষা গোজাতির রক্ষণই দেশের ও দেশবাসীর পক্ষে মহাহিতকর, তখন হইতেই তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ যে মহাপাপ, তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতে হিন্দুর পক্ষে গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত। এমন কি তাঁহারা গোমাংসাহারী ব্যক্তির সহিত হিন্দুর একত্র পান ভোজনেও যে মহাদোষ, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, অধুনা নব্য সভ্য সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ পুরাকালের মুনি ঋষিদিগের দেশহিতকর নিষেধবাক্য অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, গোমাংস ভক্ষণ করিলেই কি যত পাপ হয়? মৎস্য, মেষ, ছাগ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করায় কি পাপ হয় না? জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, সর্ব্বজীবহত্যাই মহাপাপ! গো হননেও যে পাপ হয়, ক্ষুদ্র শফরীর বধেও সেই পাপ। তবে যে মৎস্যভোজী, সে শুধু প্রাণিহত্যাজনিত পাপই অর্জ্জন করে, গোখাদক প্রাণিহত্যাজনিত পাপও অর্জ্জন করে এবং গোধনকুলকে নিধন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে গোদুগ্ধ পানে বঞ্চিত করার মহাপাপও অর্জ্জন করে। এই সভ্য সাম্প্রদায়িকেরা গো-বধ হেতু যে পাপ হয় সেই মহদ্বাক্য কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। ইহাদিগের সমীপে গোধন রক্ষার কথা উত্থাপিত করিলে ইহারা গোঁড়ামি বলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক সে কথা উড়াইয়া দেন।

(১) প্রাচীন আর্য্যগণ যৎকালে হিমালয় পার হইয়া ভারতে আসিয়া বাস করেন, তৎকালে অসহ্য শীতপ্রধান ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতিতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। শীত প্রধান স্থানে বাস করায় তাঁহারা অনেকে গো মাংস ভোজন করিতেন। ক্রমশঃ যখন উষ্ণ প্রধান দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা বিকীর্ণ হইয়া পড়িলেন তখন শাস্ত্রে গোমাংস ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল। প্রায়ই দেখা যায় এদেশের গোমাংসভোজীরা কুষ্ঠাদি বীভৎস রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে গাভীকে লোকমাতা বলিয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধ শৈশবে কিছুদিন মাত্র সেব্য, কিন্তু গোদুগ্ধ সর্ব্বাবস্থায় মুমূর্ষুকাল পর্য্যন্ত সেবনীয়। যাহার মলমূত্র পর্য্যন্ত অশেষ মঙ্গলের আধার, তাহার ন্যায় মহোপকারী—অবশ্য রক্ষণীয় জীব এ জগতে আর কি আছে জানি না।

এইরূপে তিন সম্প্রদায়ের গো-ভক্ষণে এদেশের গোজাতির সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। দিনে দিনে গো-ভক্ষকের সংখ্যা এরূপ ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলে, ভারত হইতে যে গোজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাণিজ্যনিপুণ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণেরও বোধ হয় ইহাই অভিপ্রেত যে, ভারতের গোবংশ সমূলে নির্ম্মূল হইলে বিলাতি জমাট দুগ্ধ এদেশে সরবরাহ করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে লইয়া যান। হায়! আজ ভারতবাসিগণ গোধনকুলের রক্ষার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! গোধনকুল বিনাশ হেতু ভারতের যে কি গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কেহই দেখিয়াও দেখিতেছেন না, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আজ ভারতবাসিগণ জাতীয় জীবনের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট। জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে জাতির শারীরিক ও মানসিক বিপুল শক্তির প্রয়োজন। শক্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে জাতির পুষ্টিকর আহারের আবশ্যক। দুর্ব্বলের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি কুত্রাপি সংসাধিত হয় না। দুর্ব্বল ব্যক্তি ঘোর তমোভাবাপন্ন, ভয়-মোহ, নিদ্রা, আলস্য, লজ্জাবন্ধন প্রভৃতি অসৎ গুণের দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন। বলিষ্ঠ ব্যক্তি রজোগুণসম্পন্ন—তাঁহারা নিরলস, উদ্যোগী, সাহসী, কর্ম্মশীল ও বীর্য্যবান্। জ্ঞান হইলে, মনুষ্য রজোগুণ হইতে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়। আজ বলকারক সাত্ত্বিক আহার অভাবে ভারতবাসী দুর্ব্বল হইয়া ঘোর তমোভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

বিলাসিতার মোহে আক্রান্ত হইয়া ভারতবাসী আজ বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, মটরকার, বিলাতি, কুকুর, বিলাতি পাখী ইত্যাদি ক্রয় করত যে টাকা অপব্যয় করিতেছেন, সেই টাকায় যদি গোধন রক্ষা করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের মহান্ উপকার করা এবং স্বকীয় পুণ্য সঞ্চয় হয়। আজ যদি আমাদের পূর্ব্ব পিতৃপিতামহের সঞ্চিত গোধনগুলি বংশপরম্পরানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত হইত, তাহা হইলে কি বৎসরে বৎসরে অজন্মা দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি নরনারী অকালে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইত? শস্যাভাবে সকলে গো-দুগ্ধ পানেই জীবন ধারণ করিতে পারিত। চিকিৎসকেরা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে,—মনুষ্যের শরীররক্ষার উপযোগী সমুদায় পদার্থই গো-দুগ্ধে বিদ্যমান আছে। পুরাকালে দুগ্ধ ঘৃত এত সুলভ ছিল যে তখনকার লোকেরা

প্রচুর পরিমাণে ঘৃত দুগ্ধ ভক্ষণ করিয়া উদ্বৃত্ত ঘৃতে নিত্য হোমাদি করিতেন। সেকালের অধিকাংশ লোকই সাগ্নিক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকে একটু ঘৃত দুগ্ধ খাইতে পান না, হোমাদি করিবেন কি প্রকারে? সুতরাং পুরাকালের সেই পুণ্যপ্রদ বৈদিক হোমাদি ক্রিয়া এখন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আজকাল গোধনের সংখ্যা হ্রাস হওয়া বশতঃ খাঁটি গো-দুগ্ধের মহা অভাব হইয়াছে। যদিও পশ্চিমাঞ্চলে কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় বিস্তর কম। আইন আকবরীতে দেখা যায়,—পূর্ব্বে খাঁটি গো-দুগ্ধ টাকায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সের পাওয়া যাইত, বর্ত্তমান সময়ে অতি কষ্টে সহরে টাকায় চারি সের সাড়ে চারি সের দুগ্ধ মিলে। পশ্চিমাঞ্চলে টাকায় বার তের সেরের অধিক পাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে গো দুগ্ধের সচ্ছলতা প্রযুক্ত ক্ষীর, সর, দধি, ননী, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর ও তৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সমূহ সুলভে পাওয়া যাইত। আকবরের সময়ে গব্য ঘৃত যেখানে টাকায় পাঁচসের ছিল, আজকাল গো-সংখ্যার অল্পতা হেতু গব্য ঘৃত সেখানে টাকায় চৌদ্দ ছটাক হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘৃতের প্রচুরতা নিবন্ধন ঘৃত-পক্ক উপাদেয় মিঠাইয়ের খাদ্য সামগ্রীও অতি সুলভ ছিল; অধুনা দুগ্ধের অভাবে দুগ্ধোৎপন্ন এবং ঘৃতপক্ক আহার্য্য বস্তু সমস্তই অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে। উৎসব ও পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে সহরে সন্দেশ আশি নব্বুই টাকা মণ হয়, ক্ষীর পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা মণ হইতেও দেখা যায়; এবম্প্রকার যাবতীয় দুগ্ধোৎপন্ন বা ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি অধিকতর মহার্ঘ্য হইয়া থাকে। এবং দিনে দিনে মহার্ঘ্যতার মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত দরিদ্র ভারতবাসী—যাহারা একাহ্নে উদর পূরিয়া আহার করিতে পায় না, তাহারা এই সকল দ্রব্য অধিক মূল্য দিয়া কি প্রকারে খরিদ করিতে পারে? এদেশের দুগ্ধ ও অন্নই প্রধান খাদ্য, কিন্তু অন্ন তো বহুদিনই বিদেশের অধিকৃত হইয়াছে, গো-দুগ্ধও নিঃশেষ প্রায়। দেশের তণ্ডুল দেশে রাখিবার আপাততঃ কোন উপায় নাই, যে হেতু বিদেশী বণিক্‌গণ দ্বিগুণ অর্থ দিয়াও এ দেশ হইতে ধান্য স্বদেশে লইয়া যাইবেন। সে স্থলে দরিদ্র দুর্ব্বল ভারতবাসীর প্রতিযোগিতা করা সহজসাধ্য নহে। দুগ্ধ রাখিবার এখনও কিঞ্চিৎ উপায় আছে; ভারতের সমগ্র ইতর ও ভদ্রমণ্ডলী কেবলমাত্র গোপদিগের প্রতি গোধন রক্ষার ভার অর্পণ না করিয়া, যদি সকলেই অবস্থা অনুসারে গো পোষণ করেন এবং প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি গাছ প্রতিষ্ঠা, পুকুর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মের ন্যায় "শ্রীকৃষ্ণ গোশালা" সদৃশ এক একটী স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাইয়া বা গোচারণভূমি ক্রয় করিয়া দেন, তবে গো-রক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। যাঁহারা গোশালা

প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার বহন করিতে ও গো পোষণ করিতে অক্ষম, তাঁহারা ক্ষমতা অনুযায়ী চাঁদা দান করিয়া যদি ভারতের প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক পল্লীতে শ্রীকৃষ্ণ-গোশালার ন্যায় সম্মিলিত সাহায্যে এক একটী গোশালা স্থাপন করেন এবং তাহাদিগের বল, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রমোন্নতির বর্ত্তমান সময়োপযোগী উপায় নির্দ্ধারণ ও তাহার অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে অনেক গোধনের জীবন রক্ষা হয় ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ঐ সকল স্থান হইতে উত্তম গো-দুগ্ধ খরিদ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। ঐ সকল গাভীর গর্ভোৎপন্ন বৃষগুলিকে বিনামূল্যে কৃষকনিচয়কে প্রদান করিলে তাহাদের পক্ষে বহুল উপকার হইতে পারে। কেননা এক জোড়া বলদ এখন আশি পঁচাশি টাকার কমে পাওয়া দুঃসাধ্য। এত অধিক মূল্যে দরিদ্র কৃষকগণ বলদ ক্রয় করিয়া দারুণ ঋণভারাক্রান্ত হইয়া অবশেষে কৃষিকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু যদি সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে তাহারা বিনামূল্যে বলদগুলি পায়, তাহা হইলে পুনরায় কৃষি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাহারা অধিক শস্য উৎপন্ন করাইতে পারে এবং স্বচ্ছন্দে তাহাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখন গোধন রক্ষার বিষয়ে কেহই মনোযোগী নহেন। গোপগণ এ সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞানে সকলেই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের স্বার্থপরায়ণ অর্থপিশাচ এই গোপগণ আজকাল গো-রক্ষণে যত্নবান্ না হইয়া গোধননেরই সহায়তা করিতেছেন। গাভী প্রসব হইলে কিছুদিন পরে তাহার শাবকটীকে কসাইকে বিক্রয় করেন, এ দিকে দুগ্ধ দোহনের সময় বিচালী নির্ম্মিত একটী কৃত্রিম গোবৎস গাভীর সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়েন। পুনশ্চ অধিক দুগ্ধ লাভের আশায় গাভীকে ফুকা দেন। আহা! ফুকা দেওয়া হেতু গাভীর সে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা পর্য্যবেক্ষণ করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। কিন্তু নির্ম্মম নরপিশাচ গোপগণ সে ভয়ানক লোমহর্ষণ কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন না। সেই ফুকা দেওয়া বিষতুল্য দুগ্ধ পান করতঃ কত শিশু প্লীহা যকৃতাদিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, কত রোগীর ব্যাধি গুরুতর বৃদ্ধি পাইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় তাহাদিগের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বারংবার ফুকা দেওয়া হেতু এবং সমুচিত আহার অভাবে অচিরে কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া গাভী যখন দুগ্ধ দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়, তখন তাহাকে দুই এক মাস উপযুক্ত আহার করান হয়। পরে একটু হৃষ্ট পুষ্ট হইলে নৃশংস কসাইকে অধিক মূল্যে গোপগণ গাভীটি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এইরূপে গোধনকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানকালের গোপগণ আঢ্য হইবার

আশায় জগন্মাতা গৃহলক্ষ্মীদের ধ্বংসের সহায়তা করেন বটে, কিন্তু এই জঘন্য পাপ ব্যবসা দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বিশেষ ধনবান্ হইতে পারিয়াছেন? যাঁহারা বা সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই কোন প্রকার অন্যায় অপব্যয়ে সেই অর্থ নিঃশেষিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু পুরাকালের গোপগণ গো-রক্ষা করতঃ এত অর্থ সঞ্চয় করিতেন যে, তদ্দ্বারা এক একটী রাজত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন। গোপরাজ নন্দঘোষ তাহার প্রমাণ স্থল। তিনি যত্ন সহকারে গোধন রক্ষা করত বিপুল অর্থ লাভ করিয়া গোকুলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে গোপেরা তো প্রাণপণে গোধন রক্ষা করিতেনই, এতদ্ভিন্ন রাজা, মহারাজ, জমিদার, ইতর, ভদ্র, সর্ব্বসাধারণেই গো-পোষণ করিতেন। তাঁহারা গোধনের সম্মান ও মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলেন এবং তন্নিমিত্ত ভগবতী বলিয়া গোধনের পূজা করিতেন। এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং গোচর্য্যা ও গোচারণ করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে রাখালরাজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাকালের মহিলাগণ অপমান না ভাবিয়া স্বহস্তে গো-দোহন করিতেন, তন্নিমিত্তই কন্যাদিগের দুহিতা আখ্যার উৎপত্তি। পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষের যত্নেই গো বংশের অত উন্নতি হইয়াছিল। সামান্য ত্রুটি বশতঃ ও গোহত্যার গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইতে সহজেই ইহা অনুমান করা যায় যে, গোজাতিকে হিন্দুরা কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং কত মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। গো-জাতিকে প্রাণে মারিলেই গোবধ পাতক হইত না, সাবিত্রী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যম বলিয়াছিলেন,—

গোমাহারং প্রকুর্ব্বন্তং পিবন্তং যো নিবারয়েৎ।
যাতি গো-বিপ্রয়োর্মধ্যে গোহত্যাঞ্চ লভেত্তু সঃ॥
দণ্ডেনৈকান্তাড়য়ন্ মূঢ়ো যো বিপ্রবৃষবাহকঃ।
দিনে দিনে গবাং হত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
দদাতি গোভ্য উচ্ছিষ্টং ভোজয়েদ্ বৃষবাহকম্।
ভোজয়েদ্ বৃষবাহায়ং স গোহত্যাং লভেদ্ ধ্রুবং॥

পূর্ব্বে রাজাধন লইয়া রাজায় রাজায় পরস্পরের মধ্যে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তদ্রূপ গোধনের নিমিত্তও ঘোরতর যুদ্ধ হইত। সেকালে যাঁহার সুন্দর সুলক্ষণাক্রান্ত ধেনু থাকিত, অন্যে ছলে বলে কৌশলে যে প্রকারেই হউক তাঁহার সেই পয়স্বিনীটী আপন আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। পুরাণে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিরাট রাজার গোধন-হরণ তাহার একটী প্রমাণ। তখনকার লোকেরা অর্থের অপেক্ষা গোধনের মর্য্যাদা অত্যধিক জ্ঞান করিতেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সমস্ত রাজ্য-ধনের বিনিময়ে বশিষ্ঠ মুনির সকাশে একটী গোধন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবোপম মুনিবর সেই বিপুল বিভব প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যরূপ গোধনটীকে কোনমতে মহারাজ বিশ্বামিত্রকে লইতে দেন নাই। আর আমরা এমনি কৃতঘ্ন যে, যিনি জন্মভূমির সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যিনি তৃণাদি ভক্ষণ করতঃ গোমাতা-রূপে অতীব রক্ত-বল-বর্দ্ধক, মেধাশক্তি-দায়ক নিজ স্তন্য-ক্ষীর-সুধা নিত্য আমাদিগকে পান করাইয়া, আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন—যে দেবী ভগবতীর দুগ্ধ বিশ্বপ্রপঞ্চকের সকল প্রাণীর দুগ্ধাপেক্ষা সুমিষ্ট রুচিকর ও সুগন্ধ-বিশিষ্ট, যাঁর অস্থি, চর্ম্ম, চর্ব্বি, শোণিত, শৃঙ্গ, ক্ষুর এমন কি মলমূত্র পর্য্যন্তও মানবের মহোপকারী, সেই প্রাণদাত্রী জগন্মাতা গো-লক্ষ্মীর রক্ষার্থে আমরা বিরত! ধেনুতে ভগবানের প্রত্যক্ষ বিভূতি বিদ্যমান বলিয়া ইনি আবহমান কাল হইতে ভগবতী আখ্যায় বিভূষিতা। ইহাকে আমরা কোন্ প্রাণে নিষ্ঠুর গোপদিগের দ্বারা নারকী কসাইয়ের হস্তে তুলিয়া দিতেছি? আসুন ভ্রাতাভগ্নীগণ! আমাদের পূজ্য আর্য্য পিতৃমাতৃগণের ন্যায় রূপময়ী জন্মভূমি লক্ষ্মী-স্বরূপা ধেনুকুলের রক্ষা জন্য প্রাণপণে যত্নবান্ হই।

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

কাব্য লেখা বিষয়ে মহাপণ্ডিত রাস্‌কিনের অভিপ্রায়।

রাসকিন্ (Ruskin) তাঁহার কোনও গ্রন্থে (Modern Painter) লিখিয়াছেন যে, পড়িতে হইলে শ্রেষ্ঠ কবিতাই পড়া উচিত। মধ্যবিৎ রকমের কবিতা লইয়া বিব্রত হইবার আবশ্যক নাই। উত্তম কবিতার অভাব নাই বরং এত অধিক আছে যে, এক জীবনে তাহা পড়িয়া শেষ করা যায় না। নিম্নশ্রেণীর কবিতা পচার করিয়া পাঠককে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কোনও কোনও যুবা কবি মনে করেন যে, তাঁহাদের কাব্যে কিছু না কিছু ভাল আছে, ক্রমশঃ উন্নতি হইবে। যদি উন্নতির আশা থাকে, তবে এখন লোককে বিরক্ত করা কেন? এই সকল কবির প্রতি রাস্‌কিনের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই। তিনি বলেন যে, সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও মনে করিলে কোনও কোনও ভাব কবিতাতে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোক এরূপে সময় নষ্ট করিতে চাহেন না, আর যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কবিতা ভাল বাসেন ও কাব্যের ধাতু বুঝেন, তাঁহারা বেসুরে গাহিতে অনিচ্ছুক। ইহা ছাড়া নিম্ন শ্রেণীর কবিতা উচ্চ-শ্রেণীর কবিতার অনেক হানি করে।

কাব্যের সরসতা ও মাধুর্য্য বিলুপ্ত হয়, ভাল ভাবও নিকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হয় ও পাঠকের অকারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়। সচরাচর যে সকল ভাব সাধারণ লোকের মনে উদয় হয় প্রায় তাহার নূতনত্ব নাই, কারণ সেই সব ভাব পূর্ব্বে কোনও না কোনও উচ্চ-শ্রেণীর কবি উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রাসকিন্ বলেন,—নিকৃষ্ট কবিতা না লিখিয়া উচ্চশ্রেণীর কবিগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম স্থলগুলি যদি আমরা নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ লোকের মন তাহাতে আকৃষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে যথার্থ উদারতা প্রকাশ করা হয় ও যথেষ্ট হিত সাধন হয়।

অধুনা আমাদের দেশে যে সকল কবিতা প্রকাশ হইতেছে, তাহার অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর। সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রে এই সকল কবিতার ছড়া ছড়ি হইয়া পড়িতেছে। রচনার মাধুর্য্য কিম্বা রস, ভাবের নূতনত্ব বা বৈচিত্র কিছুই নাই এরূপ কবিতা যত কম প্রকাশ হয় ততই ভাল।

কি চিন্তায়, কি লেখায়, কি ব্যবহারে যতই উচ্চ আদর্শ অবলম্বিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল। অনেকে উচ্চ উচ্চ বিষয় লইয়া কাব্যাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু নিজে সে সকল চরিত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম, গভীরতা ও প্রসার হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উচ্চ আদর্শগুলিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলেন, কিন্তু ভাষার মাদকতায় সেগুলিকে এরূপ চিত্তাকর্ষক করেন, যে, অপরিণতবুদ্ধি সাধারণ পাঠকেরা তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

গৃহ-চিকিৎসা।

১। রক্ত আমাশয়ের ঔষধ। লাল নটেশাকের-শিকড় ৵০ দুই আনা, এবং গোলমরীচ ৫ টী এক সঙ্গে বাটিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়।

২। বাধক বেদনার ঔষধ। কলমি শাকের রস এক ছটাক সেবন করিলে বাধক বেদনার উপকার হয়।

৩। পারদ সেবন ঘটিত শরীরে কোন প্রকার ফুস্কুড়ি প্রভৃতি হইলে আমরুল শাকের রস গায়ে মাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে। তিক্তা শাকের রস ও মূলার রস এক সঙ্গে সেবন করিলে মূত্র পথে পারদ নিঃসারিত হয়।

৪। বাত বেদনার ঔষধ। যে কোন স্থানে বাত বেদনা হইলে বুড়ি গোপানের রস, প্রদীপের তৈল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ এক সঙ্গে মিলাইয়া মালিস করিলে অচিরে বেদনা নিবারণ হয়।

৫। পারদ বিকারের কিম্বা বাতরক্তের ঔষধ। এক তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক এক সের দুগ্ধে জ্বাল দিয়া ডেলা ক্ষীরের মত করিয়া একুশটী বটিকা করিবে। প্রত্যহ তিন বেলা এক একটী বটিকা সেবন করিলে পারদ-দোষ ও বাত-রক্ত আরোগ্য হয়। এরূপ তিন সপ্তাহ সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালীন ঘৃতসৈন্ধবের পাকে নিরামিষ আহার করিতে হইবে।

৬। অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগের ঔষধ। অশ্মরী রোগ হইলে কিম্বা হইবার সম্ভাবনা হইলে কুলত্থ কলাই (কুলথী কড়াই) ও সজিনার ছাল উভয় এক তোলা করিয়া ঐ মিলিত দুই তোলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৭। মসিনা (তিসী) দুই তোলা এক পোয়া জলে চায়ের মত প্রস্তুত করিয়া খাইলে মূত্র-রোধ ও জ্বালা নিবারণ হয়।

নূতন সংবাদ।

১। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে গত ২১ শে মার্চ্চ ছোটলাট স্যার এণ্ড ফ্রেজার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া পরলোকগত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন।

২। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ পি সিংহ স্থায়িভাবে বঙ্গের এডভোকেট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থায়ী পদলাভ বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম।

৩। ১৮ ই ও ১৯ শে এপ্রিল ময়মনসিংহে মুসলমান প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইবে।

৪। সম্প্রতি বরোদার মহারাজা তাঁহার রাজ্যে মূকবধিরদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশে কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে দুইটী লোককে শিক্ষা প্রণালী অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মূকবধির শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রার্থনীয়।

৫। চিন গবর্ণমেণ্ট স্বীয় রাজ্যে যাহাতে কেহ আফিমের নেশা করিতে না পারে এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এবং ইংরাজরাজকেও তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্যে চিন অধিবাসীরা যাহাতে আফিমের নেশা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

৬। ভাগলপুর জেলা স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামজী শর্ম্মা কাব্যতীর্থ মহাশয়, যিনি বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দান করিবেন, ঘোষণা করিয়াছেন।

৭। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী সার হেন্‌রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান্ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর-

গ্রহণ করিতেছেন। শুনা যায় মিঃ এস্-কুইথ্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

৮। গত ১৮ ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা ফেডেরেসন্ হলে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট সভা হয়। সভায় প্রায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পাল মহাশয়কে দেওয়া হয়।

৯। সম্প্রতি কোন সম্ভ্রান্ত পাদ্রি ওভারটুন হলে বক্তৃতা কালে বলেন, —আমরা যখন বিলাত হইতে ভারতে মিসনের কার্য্যে আগমন করি তখন আমাদের মনে এই কথাই জাগরূক থাকা উচিত যে, আমরা একটী প্রাচীন-জ্ঞানোন্নত ধর্ম্মপ্রাণ জাতির নিকট যাইতেছি। এই মহাজাতি সেই প্রাচীন জ্ঞান-ধর্ম্মের গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

বামারচনা।

কাশী

(১)

কোথা কাশী বারাণসী পুণ্য তীর্থ ধাম?
যথা হর বিশ্বম্ভর, বিরাজিত বিশ্বেশ্বর,
মম চিত্ত তথা যেতে চাহে অবিরাম।

(২)

যে মানব কাশী মাঝে হেরে বিশ্বেশ্বরে,
জীব ভাব গিয়ে তার, হয় শিব ভাব সার,
পার্থিব সংসার চিন্তা থাকে না অন্তরে।

(৩)

কাশী তীর্থে বিশ্বনাথে নেহারিব কবে!
পেতে তাঁর দরশন, সতত ব্যাকুল মন,
দেবাদিদেবের দেখা কবে ভাগ্যে হবে?

(৪)

কাশী গিয়া বিশ্বনাথে করিলে দর্শন,
তবেই কি মুক্তি হয়, নতুবা কিছুই নয়,
তাই কি সে কাশী যেতে চাহে প্রাণমন?

(৫)

পাপী আমি জ্ঞানহীনা মোহান্ধ ললনা,
তাই ভাবি কাশী গিয়ে, বিশ্বেশ্বরে নেহারিয়ে,
হবে মোর মহা মুক্তি পুরিবে কামনা।

(৬)

বুঝিনা আমারি দেহ তীর্থ কাশী ধাম,
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময়,
পূত সে বিজ্ঞানময় পঞ্চকোষ নাম।

(৭)

স্বচ্ছ জ্ঞানধারা আদি গঙ্গা প্রবাহিত।
শান্তিময় পূত চিত্ত, সে মণিকর্ণিকা তীর্থ,
নিত্যজ্ঞান সুখানন্দ তথা বিরাজিত।

(৮)

শিবানী ভবানী বুদ্ধি আত্মা সে ভৈরব,
নিতাই অদ্বৈত ভূপ, পাপ পুণ্য সাক্ষী রূপ,
বিরাজিত দেহ মাঝে অযোনিসম্ভব।

(৯)

আমারি এ দেহ কাশী করিয়া নির্ম্মাণ,
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপ্রাণ, করিছেন অধিষ্ঠান,
মোহাচ্ছন্ন ভ্রান্ত আমি তাঁরে ভাবি আন।

(১০)

তিনি আমি ভিন্ন নই পারিনা বুঝিতে,
জ্ঞানহীনা তাঁরে তাই, ভেদ ভাবি সর্ব্বদাই,
ব্যষ্টি মাঝে সমষ্টিকে পাইনা দেখিতে।

(১১)

নিরখিলে দেহ মাঝে দেব বিশ্বনাথ,
হবেনা জনম আর, লয় পাব পদে তাঁর,
ব্যষ্টি মোর মিশে যাবে সমষ্টিষ্টির সাথ।

(১২)

যেতে চাহি বিশ্বনাথে হেরিতে কাশীতে
কবে দেহ-কাশী মাঝে নেহারিব বিশ্বরাজে,
ঐহিক বাসনা ত্যজি নিত্যানন্দ চিতে?

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

অশ্রুধারা

জাহ্নবীর তীর।

প্রথম সর্গ।

শান্তির ক্রোড়েতে সুপ্ত ধরণী সুন্দরী,
উপরে অনন্ত নীল চন্দ্রাতপ শোভে,
প্রস্ফুটিত অগণন তারামালা তায়,
পৌর্ণমাসী পূর্ণচন্দ্র অমল ধবল,
ঢালিছে জোছনা-রাশি ধরণী-অঙ্গেতে
দিগন্ত নীরব—
জননীর অঙ্কে যথা সুপ্ত নব শিশু;
এ হেন নিশিতে, কাহার ক্রন্দন,
ওই পশিছে শ্রবণে?
সংসার গরল পানে কোন হতভাগা
আমা সম বুঝি কাঁদে নির্জ্জনে বসিয়া?
কিম্বা কোন পুত্র শোকাতুরা!
প্রাণের পুতলিরত্ন—আশার মুকুল,
ঝরিয়াছে শূন্য করি হৃদি-বৃন্ত তার,—
অকালে, করাল কালে
পুত্র-রত্ন করি সমর্পণ,
তুলিয়াছে এ নিশায় মর্ম্মভেদী রোল?
না! বুঝি কোন নিন্দুর বিধবা!—
নির্জ্জন এ নিশি, ঊর্দ্ধে নীল নভো,
নিম্নে নীলিমা-সাগর,
শুদ্ধ দশদিশি,
অনন্ত জগত কোটি কোটি প্রাণী
সবে শান্তিতে মগন, সে শান্তিতে
বিধবা না হ'লে—
কোথা আর জ্বলে তবে অশান্তি-অনল?
হরি বল! হরি বল!—
এরূপেতে বিধবা কাঁদে না?
ধরিত্রী জিনিয়া ধৈর্য্য,
গভীর বারিধি সম গম্ভীর সে হৃদি,
হাসি মুখে বেদনা লুকায়,
নিভৃত নির্জ্জনে ঢালে তপ্ত অশ্রুধারা
জগতের কেহ তা জানেনা।

হায়! আমি কি বাতুল!
এ যে পরিচিত ত্রিদিব-সঙ্গীত—
মাতা জাহ্নবীর গীত?
মরি মরি কিবা অমিয় মাখান গান!
মাগো এই কি গো স্বরগীয় সুর?
ত্রিদিব নিবাসিগণে এইরূপে গায়?
হায়, কেমনে রাখিনি
কি সুধা ঢালিছ বামা জগত-শ্রবণে!
কিন্তু একি শুনি?
শোকোচ্ছ্বাস—মর্ম্মভেদী ভাষ,
কত যেন বেদনা মাখান সুরে।
দেবলোক-নিবাসিনী তুমি দেববালা,
কি জ্বালা মা তোর?
অভাগা নরের মত

কি বিষাদে কাঁদিছ গো ধরায় ফিরিয়া ?
তবে কিমা স্বরগেও জ্বালা আছে।
ত্রিদিবনিবাসিগণও কাঁদে
তবে আমাদের মত ?
মিলেছে গো ভাল !
আমিও কাঙ্গাল মাগো তুইও কাঙ্গালী,
মায়ে পোয়ে চল জুড়াইগে
পশি কোন নিভৃত গহনে, কিম্বা কোন
সুদূর প্রদেশে, যথা না প্রবেশে
কভু সংসারের গোল।
হেন দেশে সঙ্গে করি নেয়াইবে মোরে ?
আমি তোর কাঙ্গাল সন্তান,—
বল-না-মা !—নেয়াবে না মোরে ?
বুঝে'ছি ! কি আর বলিব,
পূর্ণ কর বাসনা তোমার,
কিন্তু মিনতি আমার !—
জীবন-গগনে যবে গোধূলি ছাইবে,
ঘোর মসীময় হেরিব চৌদিক্ বেড়ি
আঁধারে ডুবিলে পরে আয়ুসূর্য্য মোর,
তুলে নি'ও কোলে গো জননি ! (ক্রমশঃ)।

১৩১৪ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
নববর্ষ প্রণাম	২
অভ্যর্থনা ও আশা	২
ক্ষমা ও আশীষ ভিক্ষা ...	২
নববর্ষের নবচিন্তা-জগতের আশ্চর্য্য	৩
নূতন বৈশাখ	৪
আমেরিকার নারীসমাজ	১৩,৪৭
মহিলা সমিতি—বাদ প্রতিবাদ ...	৪২
প্রার্থনা	১১৮
বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব	১২৯
মহিলা-স্মৃতি সভা	১৪৫
নিবেদন	১৪৮
বামাবোধিনীর শুভ জন্মোৎসব সভা	১৫৩
জন্মদিনে	১৮০
বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব	১৮৭
বামাবোধিনীর পঞ্চচত্বারিংশ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ...	১৯৫
বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা	২১৬
হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের জীবনপ্রণালী	২৩৮
জ্ঞানদা ও প্রমোদার কথোপকথন	২৯৯

২। নারীচরিত ও নারী জাতির সৎকীর্ত্তি।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী ...	১৫
লেডী রিপণ	১৮
মীরাবাই	২৫১
সীতা	২৭১
বীরনারী জিন মেরী গায়েন	২৯৫,৩৭১

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
স্বভাবের শিক্ষা	৪৯
প্রেমের শক্তি বা পাশব শক্তি	৫৪
ভাগবতোপাখ্যান	৬৬
আতিথেয়তা	৭৭
কাল	৮২
ধর্ম্মের আদর্শ	১৩৯
প্রেমের জয় ও সিদ্ধিলাভের গূঢ়তত্ত্ব	১৭৫
শ্বেতকেতুর উপাখ্যান ...	২৭৬